অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র

এইচ জি ওয়েলস

কল্পগল্প সমগ্র

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত

এইচ জি ওয়েলস

কল্পগল্প সমগ্র

সম্পাদনা

সন্তু বাগ

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

যৌথ প্রয়াস

উৎসর্গ

অদ্রীশ বর্ধনের স্মৃতির উদ্দেশে

এইচ জি ওয়েলস

জন্ম থেকে মৃত্যু

পুরো নাম হারবার্ট জর্জ ওয়েলস। ব্রিটিশ। জন্ম ১৮৬৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। কমার্শিয়াল অ্যাকাডেমিতে লেখাপড়া করেন ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত। সার্টিফিকেট নেন বুককিপিং অর্থাৎ পদ্ধতিমাফিক হিসাব রাখার বিদ্যায়। ১৮৮০-তে শিক্ষানবিশি করেন উইন্ডসরের এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর কাছে। ওই বছরেই ছাত্র-শিক্ষক ছিলেন সমারসেটের একটি স্কুলে। ১৮৮০-৮১-তে শিক্ষানবিশ কেমিস্ট ছিলেন সাসেক্সে। ১৮৮১-৮৩-তে শিক্ষানবিশ বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন হ্যাম্পশায়ারের হাইড্স্ এম্পোরিয়ামে। ১৮৮৩-৮৪-তে ছাত্র-সহকারী ছিলেন মিডহার্স্ট
গ্রামার স্কুলে। ১৮৮৪-৮৭-তে পড়াশোনা করেন লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব সায়েন্সে, কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারেননি পরীক্ষায়।

শিক্ষকতা করেন ১৮৮৭-৮৮ সালে রেক্সহ্যামের হোল্ট অ্যাকাডেমিতে এবং ১৮৮৮-৮৯ সালে লন্ডনের হেনলি হাউস স্কুলে। ১৮৯০-এ বিএসসি ডিগ্রি পান ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে। দুই বিয়ে। প্রথম বিবাহ হয় খুড়তুতো বোন ইসাবেল মেরি ওয়েলসের সঙ্গে ১৮৯১ সালে—বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ১৮৯৫-এ। ওই বছরেই দ্বিতীয় বিবাহ হয় অ্যামি ক্যাথরিন রবিন্সের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যান ১৯২৭ সালে। দুই পুত্র। লেখক অ্যান্টনি ওয়েস্ট-ও তাঁর পুত্র—মা ছিলেন লেখিকা রেবেকা ওয়েস্ট। ১৮৯১-৯২-এ শিক্ষকতা করেন লন্ডনের ইউনিভার্সিটি টিউটোরিয়াল কলেজে।

পুরো সময়ের লেখক হন ১৮৯৩ সাল থেকে। ১৯২২ এবং ১৯২৩-এ ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের পক্ষে পার্লামেন্টের লেবার নির্বাচনপ্রার্থী হন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ছিলেন ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য। ১৯৩৬-এ ইউনিভাসিটি অব লন্ডন থেকে পান ডক্টরেট অব লিটারেচার সম্মান। লন্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সম্মানজনক সদস্যপদে থাকার পর দেহাবসান ঘটে ১৯৪৬ সালের ১৩ আগস্ট।

কল্পবিজ্ঞানের রচনাবলি

নভেল

দ্য টাইম মেশিন: অ্যান ইনভেনশন, ১৮৯৫।

দি আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো, ১৮৯৬।

দি ইনভিজিব্‌ল্ ম্যান, ১৮৯৭।

দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস, ১৮৯৮।

হোয়েন দ্য স্লিপার ওয়েকস, ১৮৯৯; পরিমার্জিত সংস্করণ, দ্য স্লিপার ওয়েকস, ১৯১০।

দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন, ১৯০১।

দ্য ফুড অব দ্য গডস অ্যান্ড হাউ ইট কেম টু আর্থ, ১৯০৪।

এ মডার্ন ইউটোপিয়া, ১৯০৫।

ইন দ্য ডেজ অব দ্য কমেট, ১৯০৬।

দ্য ওয়ার ইন দি এয়ার, অ্যান্ড পার্টিকুলারলি হাউ মি. বার্ট স্মলওয়েজ ফেয়ার্ড হোয়াইল ইট লাস্টেড, ১৯০৮।

দ্য ওয়ার্ল্ড সেট ফ্রি: এ স্টোরি অব ম্যানকাইন্ড, ১৯১৪।

মেন লাইক গডস, ১৯২৩।

দ্য শেপ অব থিংস টু কাম: দি আলটিমেট রেজোল্যুশন, ১৯৩৩ পরিমার্জিত সংস্করণ, থিংস টু কাম (ছায়াছবি কাহিনি), ১৯৩৫।

দ্য ক্রকেট প্লেয়ার, লন্ডন, ১৯৩৬, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৭।

স্টার বিগট্‌স্: এ বায়োলজিক্যাল ফ্যান্টাসিয়া, ১৯৩৭।

দ্য হোলি টেরর, ১৯৩৯।

ছোটগল্প সংকলন

দ্য স্টোলেন ব্যাসিলাস অ্যান্ড ইনসিডেন্টস, ১৮৯৫।

দ্য প্ল্যাটনার স্টোরি অ্যান্ড আদারস, ১৮৯৭।

থার্টি স্ট্রেঞ্জ স্টোরিজ, ১৮৯৭।
টেলস অব স্পেস অ্যান্ড টাইম, ১৮৯৯।
টুয়েল্‌ভ স্টোরিজ অ্যান্ড এ ড্রিম, লন্ডন, ১৯০৩; নিউ ইয়র্ক, ১৯০৫।
দ্য কান্ট্রি অব দ্য ব্লাইন্ড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, ১৯১১ পরিমার্জিত সংস্করণ, দ্য কান্ট্রি অব দ্য ব্লাইন্ড, ১৯৩৯।
দ্য ডোর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, নিউ ইয়র্ক ১৯১১; লন্ডন, ১৯১৫।
কমপ্লিট শর্ট স্টোরিজ, লন্ডন, ১৯২৭; 'দ্য শর্ট স্টোরিজ অব এইচ জি ওয়েলস' নামে —নিউ ইয়র্ক, ১৯২৯।
টোয়েন্টি এইট সায়েন্স-ফিকশন স্টোরিজ, ১৯৫২।
সিলেকটিভ শর্ট স্টোরিজ, ১৯৫৮।
বেস্ট সায়েন্স ফিকশন স্টোরিজ অব এইচ জি ওয়েলস, ১৯৬৬।

অন্যান্য রচনাবলি
নভেল: ৩৮টি।
ছোটগল্পসংকলন: ৬টি।
নাটক: ৩টি।
চিত্রনাট্য: ৫টি।
অন্যান্য: ৮৯টি।

এইচ জি ওয়েলস কল্পবিজ্ঞান ছাড়াও ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজবাদ এবং বিবিধ বিষয়ে লেখনী চালনা করে গেছেন অক্লান্তভাবে। কল্পবিজ্ঞানের নামগুলিই কেবল পুরো দেওয়া হল। অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে আছে তাঁর নানান বিষয়ের লেখা বই। সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, মার্কসবাদ নিয়েও লিখেছেন। স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। সম্পাদনাও করেছেন। মৃত্যুর ২০ বছর পর প্রতিষ্ঠিত এইচ জি ওয়েলস সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থপঞ্জি ও জীবনী (১৯৬৬, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৬৮)।

কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা
'দি আর্লি এইচ জি ওয়েলস' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন বার্নার্ড বারগোঞ্জি। কিঞ্চিৎ শ্লেষভরে এই প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, ওয়েলস যদি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে গত হতেন, তাহলে তাঁর তরুণ আমেরিকান বন্ধু স্টিফেন ক্রে-র মতো 'মুখ্যত সাহিত্য-

শিল্পী রূপেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।' ১৯০০-র পর থেকেই ৪৫ বছর ধরে অসীম প্রযত্নে 'পুস্তিকালেখন'-এর (প্যাম্ফলিটিয়ারিং) সুযোগ তাহলে পেতেন না। উচ্চসংস্কৃতির সমগ্র আকাশ জুড়ে ওয়েলস থেকে যেতেন দৃঢ়তরভাবে। জনসাধারণকে আলোকিত করতে গিয়ে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হত না এবং এই জেহাদের ছায়াপাতও তাঁর জীবনকে ম্লান করে তুলত না। ১৯০০-র পর কিছুটা আনাড়ির মতো মূল সাহিত্য উপন্যাস লেখার সুযোগ পেতেন না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, বার্গোঞ্জির মন্তব্য ত্রুটিহীন বললেই চলে। ১৮৯৪ থেকে ১৯০১-এর মধ্যবর্তী সময়ে ওয়েলস যা সৃষ্টি করে গেছেন, একদম প্রথমদিকের ছোটগল্প 'দ্য পলমল বাজেট' থেকে 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' পর্যন্ত, তার প্রতিটিই অত্যন্ত কল্পনাসমৃদ্ধ এবং শিল্পসুন্দর কল্পবিজ্ঞান, সমকালের অন্য কোনও নভেলিস্টের সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টির ধারেকাছেও আসতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তা ঘটেছে ওই সময়ের মধ্যেই। ১৯০০-র পরে ওয়েলস লিখেছেন মূল সাহিত্যের উপন্যাস, সমাজতন্ত্র, ভবিষ্য ফতোয়া, সাংবাদিকতা সংকলন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিশ্বকোষসম পর্যালোচনা—কিন্তু শিল্পগত তুলনায় কোনওটাই তাঁর প্রথমদিকের কল্পবিজ্ঞানের মতো উঁচুদরের নয়। ১৮৯৪ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে কল্পবিজ্ঞানের যে মান উনি নিজেই সৃষ্টি করে গেছেন, পরবর্তীকালে লেখা ওঁর বেশির ভাগ কল্পবিজ্ঞানই সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রসোত্তীর্ণ হয়নি।

ওয়েলসের সাহিত্যিক সত্তার সৌভাগ্য, বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলিতে ওয়েলস যা করেছেন তা প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত, তাই ঠাঁই পেয়েছেন অমর সাহিত্যিকদের পঙ্‌ক্তিতে। ১৮৯৪ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে উনি লিখেছেন ফ্যান্টাসি আর সায়েন্স-ফিকশন—সংখ্যায় বেশি কল্পবিজ্ঞানই। মোট ৬টি উপন্যাস এবং ৩০টিরও বেশি ছোটগল্প। বেশির ভাগই তৎক্ষণাৎ প্রশংসা পেয়েছে পাঠক এবং সমালোচকের। প্রথম উপন্যাস 'দ্য টাইম মেশিন'। সময় পর্যটন নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে যত গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে, সব ক-টিরই মূল আদর্শ এই উপন্যাসটি। 'দি আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো'-তে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গল্পকেই নতুন আঙ্গিকে বলা হয়েছে—কাহিনির নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সুইফটের রচনারীতিকে মনে করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের ক্ষমতা আছে মানবজাতটাকে লুপ্ত করে দেওয়ার—মানুষ নিজেই ধ্বংস টেনে আনবে নিজের—ভয়ংকর সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই কল্পবিজ্ঞানের হুঁশিয়ারিস্বরূপ চিরকালের আদর্শ তাঁর 'দি ইনভিজিব্‌ল্ ম্যান'। পরে এই ধরনের হুঁশিয়ার কল্পবিজ্ঞানগুলো লেখা হয়েছে এই উপন্যাসটিকেই মডেল করে। আন্তঃগ্রহ সংঘর্ষ নিয়ে লেখা প্রথম কাহিনি 'দ্য

ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'। 'হোয়েন দ্য স্লিপার ওয়েকস' জামিয়ানতিনকে অনুপ্রাণিত করেছে 'উই' এবং হাক্সলিকে 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' লিখতে। বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মহাকাশের পর্যটনের প্রথম স্বীকৃত বিবরণ লেখা হয়েছে 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' উপাখ্যানে।

প্রথমদিকের উপন্যাসসমূহের মতো আদর্শ হওয়ার যোগ্য কয়েকটা ছোটগল্পও। প্রকৃতির ভয়াবহতা ফাঁস করে দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান—এই উপাদান নিয়েই বর্তমান শতাব্দীতেই লেখা হয়েছে বিপুল পরিমাণ বিপর্যয়-সাহিত্য। প্রথমদিকের কয়েকটা গল্পে এই বিষয়টিকে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন ওয়েলস। 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-কে ডারউইনীয় রূপকথা হিসেবেও পড়া যেতে পারে। কিন্তু এটি ছাড়াও তিনি লিখেছেন মানুষখেকো অর্কিডের গল্প, শুঁড়ওয়ালা অতিকায় সামুদ্রিক জীব কেফালোপডের গল্প, দানবিক পক্ষী আর মাকড়সার গল্প, বিশ্ববিজয়ের পথে পিপীলিকাবাহিনীর গল্প, এবং 'দ্য স্টার' গল্পে উপহার দিয়েছেন জ্যোতিষ্ক বিপর্যয়ের ধ্রুপদী নিয়মানুবর্তিতার কাহিনি। এমনভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, পড়বার পর থ হয়ে বসে থাকতে হয়—সম্ভাবনাটা যে অলীক নয়—এই ধারণা নিয়ে শিহরিত থাকতে হয়। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে কল্পনায় প্রয়োগ করেছেন ওয়েলস তাঁর 'এ স্টোরি অব দ্য স্টোন এজ' গল্পে এবং এই প্রচেষ্টার অগ্রগণ্যদের অন্যতম তিনি। সায়েন্স এবং টেকনোলজির বিপদ সম্বন্ধে আবার হুঁশিয়ারি এবং ভর্ৎসনা তুলে ধরেছেন 'দ্য নিউ অ্যাকসিলারেটর' এবং 'এ ড্রিম অব আরমাগেডন' গল্প দুটিতে—প্রথম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন 'দি ইনভিজিব্‌ল্‌ ম্যান' উপন্যাসে। 'এ ড্রিম অব আরমাগেডন' গল্পে স্বপ্নাতুর ব্যক্তি বলছেন কাহিনিকারকে—'আহাম্মকের মতোই মানুষ এইসব জিনিস বানিয়ে চলেছে।' ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃস্বপ্নে স্বপ্নাতুর ব্যক্তিটি দেখেছিলেন যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা। বলেছিলেন, 'বীবর যেভাবে বাঁধ নির্মাণ করে, কিন্তু একবারও ভাবে না যে, নদীপথ ঘুরিয়ে দিয়ে বন্যায় জমি ভাসিয়ে দিতে চলেছে!'

১৯০১-এ কল্পবিজ্ঞানের প্রবাহ স্তব্ধ হয়নি ওয়েলসের লেখনীতে, কিন্তু কালদেবতা কেড়ে নিয়েছিলেন তাঁর সৃজনী ক্ষমতা, অবক্ষয় ঘটিয়েছিলেন শিল্পদক্ষতার, প্রযত্নবিহীন হয়ে উঠেছিলেন ওয়েলস। ১৯০২ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে লিখেছিলেন ছ-টা ফ্যান্টাসি আর সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস এবং ডজনখানেক গল্প। ১৯১৪ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লিখেছিলেন আরও পাঁচটি সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস, তিনটে চিত্রনাট্য, এবং মূল সাহিত্য আর কল্পসাহিত্যের মাঝামাঝি এক্তিয়ারবিহীন অঞ্চলে বেশ কিছু রচনা। প্রথমদিকের গল্প-উপন্যাসে যেসব হুঁশিয়ারি আর উদ্‌বেগের প্রকাশ ঘটেছিল, শেষের কিছু লেখায় তাদের পুনরাবির্ভাব দেখা যায় এবং নতুন কথাও বলেন।

১৯০১-এর পর ওয়েলসের লেখা কল্পবিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য অধিকতর রাজনৈতিক সচেতনতা। বিশ্বজোড়া যুদ্ধছবি এঁকেছেন, পৈশাচিক অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, মাঝে মাঝে বিশ্বব্যাপী যন্ত্রযুগের রামরাজ্য তুলে ধরেছেন। ১৯০৩ সালে ট্যাঙ্ক যুদ্ধের ভবিষ্যকল্পনা করেছিলেন ওয়েলস (দ্য ল্যান্ড আয়রনক্ল্যাডস), ১৯০৮-এ বলেছিলেন, উড়োজাহাজ থেকে বোমাবর্ষণ করে শহরের পর শহর ধ্বংস করে দেওয়া হবে (দ্য ওয়ার ইন দি এয়ার), ১৯১৪-এ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের (দ্য ওয়ার্ল্ড সেট ফ্রি)। নাতসিবাদকে ব্যঙ্গ করেছিলেন 'দি অটোক্রেসি অব মি. পারহ্যাম' কাহিনিতে এবং বিষয়টি প্রয়োগ করেছিলেন 'দ্য হোলি টেরর'-এ। রামরাজ্য বিষয়ক তাঁর তিনটি উপন্যাস তৎকালীন অসাধারণ সমস্যাসংকুল প্রজন্ম পটভূমিকায় স্মরণযোগ্য সৃষ্টি (এ মডার্ন ইউটোপিয়া, মেন লাইক গডস, দ্য শেপ অব থিংস টু কাম)।

১৯৩৪ সালে সমালোচকদের একহাত নিয়েছিলেন ওয়েলস—'সাহিত্য সমালোচকদের এই অভ্যেসটি দুরারোগ্য। আমার প্রথমদিকের রচনাবলিতে যে সরলতা আর শিল্পসৌন্দর্য ছিল, এখন নাকি আর তা নেই। তাঁদের বিলাপেরও অন্ত নেই। শেষের দিকের লেখায় আমি নাকি তর্কপ্রিয় হয়ে উঠেছি।' আত্মরক্ষার্থে যা লিখেছিলেন ওয়েলস তা যথার্থ। বরাবরই তিনি সমকালের বিষয় নিয়ে লিখেছেন, 'জনসাধারণের জীবনপ্রবাহ'র সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছেন। এই পর্যন্ত ওঁর যুক্তিতে খাদ নেই—সত্যিই বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করেননি যে, আঙ্গিক আর কল্পনাশক্তির ঘাটতিতে সমাচ্ছন্ন থেকেছে তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলো। বিতর্কমূলক লেখা লিখেছেন জর্জ অরওয়েল এবং ওয়াল্টার মিলার জুনিয়রও—তর্কপ্রিয়তার জন্যেই তাঁরা বিপুলভাবে স্বনামধন্য। তাঁদের এই খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায়, 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য পরিত্যাগ করে 'পুস্তিকালেখন' সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করে ওয়েলস ভুল সাহিত্য করেননি। অসহিষ্ণুতা আর বিরক্তিপ্রবণতা দিয়ে তাঁর শিল্পের ধার তিনি শুধু নষ্টই করে গেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কৃতিত্বের পরিমাণ বিরাট। তুলনা হয় না ওয়েলসের সেরা রচনাবলির—শব্দরূপসমৃদ্ধির জমকালো দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তাঁর এই লেখাগুলো। প্রথমদিকের অন্য কোনও কল্পবিজ্ঞান লেখক এত পথের উন্মোচন ঘটিয়ে যেতে পারেননি। বিশ্বব্যাপী খ্যাতির দিক দিয়েও তিনি অসাধারণ। পৃথিবীর সব দেশেরই প্রতিটি কল্পবিজ্ঞান লেখক তাঁর লেখা পড়েছেন এই শতাব্দীতে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দুনিয়ায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যা, অথবা আধুনিক কলাশিল্পের দুনিয়ায় পাবলো পিকাসো যতখানি, কল্পবিজ্ঞানের দুনিয়ায় এইচ জি ওয়েলস ঠিক সেইরকমই কিংবদন্তিসম পুরুষ।

প্রকাশকের কথা

বাংলায় এইচ জি ওয়েলসকে নিয়ে চর্চা অনেকদিনের। শুরু হয়েছিল সম্ভবত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তাঁর অনুবাদ এবং সম্পাদনায় 'অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির' থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশ পেয়েছিল দশটি গল্পের একটি সংকলন 'এইচ জি ওয়েলসের গল্প'।

১৯৫৫ সালে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অনুবাদে 'প্রাচী ভারতী' থেকে প্রকাশিত হয় 'অদৃশ্য মানুষ'। ১৯৬৯ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনুবাদে 'বাক সাহিত্য' প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পেয়েছিল 'এইচ জি ওয়েলসের শ্রেষ্ঠ গল্প'। একই সঙ্গে 'অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির' থেকে এক এক করে প্রকাশিত হতে থাকে 'দি ইনভিজিব্‌ল্‌ ম্যান', 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন', 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস', 'দ্য ফুড অব দ্য গডস' ইত্যাদি উপন্যাস। অনুবাদ করেছিলেন অমিয়কুমার চক্রবর্তী, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং নিলাদ্রীশিখর বসু। পরে ১৯৮৬ সালে সেগুলি একত্রিত করে 'অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির' থেকেই অমিয়কুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছিল 'এইচ জি ওয়েলস অমনিবাস' নামের সুবিশাল বইটি। অমিয়কুমার চক্রবর্তীর অনূদিত গল্প-উপন্যাসগুলি নিয়ে 'এইচ জি ওয়েলস অমনিবাস' নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে তুলি-কলম থেকে ২০০১ সালে। এছাড়াও সুধীন্দ্রনাথ রাহা এবং দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে কয়েকটি উপন্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে 'দেব সাহিত্য কুটির' থেকে যথাক্রমে ১৯৮৫ এবং ১৯৯৪ সালে।

অদ্রীশ বর্ধন ১৯৬৩ সালে ‘আশ্চর্য!’ পত্রিকা প্রকাশের সময়েই স্থির করেছিলেন, নিয়মিত বিদেশি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলায় কল্পবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলবেন। ভারতবর্ষের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের পত্রিকা ‘আশ্চর্য!’ কয়েক বছরের আয়ুষ্কালে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অদ্রীশ চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন। অথচ আচমকাই এক অনভিপ্রেত বিচ্ছেদ তাঁর জীবনটাই বদলে দিল। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত অদ্রীশ বন্ধ করে দিলেন পত্রিকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবারও তিনি ফিরে এসেছিলেন তাঁর স্বপ্নের কাছে। একটি সাক্ষাতকার থেকে জানা যায়, সেই সময়ে ভোর-রাতে তাঁর নিয়মিত ঘুম ভেঙে যেত এবং তিনি শোক ভুলতে তুলে নিয়েছিলেন অনুবাদের কাজ। এই ভাবেই এইচ জি ওয়েলসের ‘কল্পগল্প সমগ্র’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে গ্রন্থপ্রকাশ থেকে। তার পরেও ‘কিশোর মন’ পত্রিকার সম্পাদনা কালে অনুবাদ করেছিলেন ওয়েলসের আরও দুটি কল্পবিজ্ঞান গল্প—‘দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস’ এবং ‘ডেভিডসনের আশ্চর্য চোখ’। সেই দুটি রচনাও এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বইটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে অসংখ্য পুরানো অলংকরণ। এই ম্যাগাজিনগুলোতেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ওয়েলসের গল্পগুলি। এর মধ্যে 'দ্য নিউ রিভিউ', 'পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন', 'দ্য পল মল গেজেট', 'অ্যামেজিং স্টোরিজ', 'দি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ', 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বাজেট', 'দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অলংকরণশিল্পীদের মধ্যে ওয়ারইক গোবলে, ফ্রাঙ্ক আর. পল, বেঞ্জামিন এডুইন মিন্‌স, কসমো রোয়ি, ডবলু. স্মল, এ. ফরেস্টিয়ার, এল. ডাভিয়েল, এ. ওয়ালিস মিল্‌স, ক্লাউদে এ. শেপারসন, সি. জে. স্ট্যানিল্যান্ড, নিকোলা কিউটি প্রমুখের নাম করা যায়। এদের মধ্যে নিকোলা কিউটি সানন্দে 'টাইম মেশিন' উপন্যাসে তাঁর করা অলংকরণগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া বইতে ব্যবহৃত অন্যান্য অলংকরণগুলো স্বত্বাধীন নয়, অর্থাৎ পাবলিক ডোমেনের অন্তর্গত।

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে বইটি। বইটি পুনঃপ্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন অদ্রীশ বর্ধন ও তাঁর পুত্র অম্বর বর্ধন। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বেশ কিছু গল্পের ছবি জোগাড় করে দিয়েছেন সোহম গুহ। সুজিত কুণ্ডু একটি নতুন উপন্যাস খুঁজে দিয়েছেন। এ ছাড়াও সোহম গুহ ও অভিষেক ঘোষ কয়েকটি গল্পের বর্ণবিন্যাস করেছেন। বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন দেবকুমার মিত্র। লে-আউট বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন দেবজ্যোতি গুহ, সুদীপ দেব এবং দীপ ঘোষ। এক হারানো সময়ের উজ্জ্বল জলছাপ এই বইয়ের পাতায় পাতায়। যাঁরা সেদিনের তরুণ, তাঁরা নতুন করে রোমাঞ্চিত হবেন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও মুগ্ধ হবে অদ্রীশ বর্ধনের অনুবাদে এইচ জি ওয়েলসের লেখা কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম সেরা এই রচনাগুলি পাঠ করে, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। অদ্রীশ বর্ধন বইটির পুনঃপ্রকাশ দেখে যেতে পারলেন না, এই আমাদের একমাত্র আফসোস। আশা করি অদ্রীশ বর্ধনের স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন আমরা করতে পারব বইটির পুনঃপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

সূচিপত্র

উ প ন্যা স

গ ল্প

উ প ন্যা স

'The Time Machine' প্রথম প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক আকারে 'The New Review' পত্রিকায় জানুয়ারি থেকে মে ১৮৯৫ সালে। 'Henry Holt and Company' পুস্তকাকারে উপন্যাসটি সে বছরেরই মে মাসে প্রকাশ করে। সময় পরিক্রমার উপর সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ হিসাবে এখনও উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। এখনও অবধি উপন্যাসটি থেকে অনেকবার রেডিয়ো নাটিকা, সিনেমা হয়েছে এবং কমিকস ফরম্যাটেও এটি যথেষ্ট জনপ্রিয়। মে ১৯২৭ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories' পত্রিকায়। অদ্রীশের কলমে গল্পটি প্রথম অনূদিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'আশ্চর্য!' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায়। ১৯৮৪ সালে অদ্রীশ 'কিশোর মন' পত্রিকার শারদীয়া ১৯৮৪ সংখ্যায় এটিকে কমিক্সের জন্য অ্যাডাপ্ট করেন।

টাইম মেশিন
(Time Machine)

১। সূচনা

আদি-অন্তহীন সময়ের পথে যাঁর পর্যটন, তাঁকে সংক্ষেপে 'সময়-পর্যটক'ই বলব। খুব জটিল একটা বিষয় আমাদের বোঝাচ্ছিলেন তিনি। কথা বলতে বলতে তাঁর ধূসর চোখ দুটো চিকচিক করে উঠছিল—সদা-পাণ্ডুর মুখেও লেগেছিল উত্তেজনার রক্তিম আভা। চুল্লির গনগনে আগুনে ঘরের আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছিল—আর তারই মাঝে কিম্ভূতকিমাকার চেয়ারগুলোয় মহা-আয়াসে নিজেদের এলিয়ে দিয়ে শুনছিলাম ওঁর বক্তৃতা। অস্থিসার লম্বা আঙুল নেড়ে নেড়ে ভদ্রলোক তাঁর অসম্ভব থিয়োরির দুর্বোধ্য পয়েন্টগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের।

'মন দিয়ে শুনুন আমার প্রতিটি কথা। সবাই যা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে, এমন কতকগুলো ধারণা আমি পালটে দেব যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে। যেমন ধরুন-না কেন, স্কুলে যে-জ্যামিতি আপনার শিখেছেন, তা যে আগাগোড়া একটা ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, তা আপনাদের কারওই জানা নেই।'

বাধা দিয়ে তার্কিক স্বভাবের লালচুলো ফিল্বি বলে ওঠে, 'আমাদের বয়সের তুলনায় বিষয়টা কিন্তু নিতান্তই—।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন।' বলেন মনস্তত্ত্ববিদ।

'ঠিক তেমনি শুধু দৈর্ঘ্য, বিস্তার আর বেধ থাকলেও ঘনক (CUBE)-এর কোনও আদত অস্তিত্বই নেই।'

'এখানেই আমার প্রতিবাদ—' শুরু করে ফিল্বি।

‘সবাই তাই জানাবে। বেশ তো, বলুন তাহলে, কোনও ক্ষণিক ঘনকের অস্তিত্ব সম্ভব?’

‘মোটেই বুঝলাম না।’ বলে ফিল্বি।

‘যে-ঘনকের স্থায়িত্ব এক কণা সময়ের জন্য নেই, তার অস্তিত্ব সম্ভব?’

আমতা আমতা করতে থাকে ফিল্বি।

সময়-পর্যটক আবার বলে চলেন, ‘তাহলেই বুঝতে পারছেন, যে-কোনও আদত বস্তুর চারদিকে চার রকমের ব্যাপ্তি থাকতেই হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ ছাড়াও থাকবে স্থায়িত্ব। অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তবিকই মাত্রার (DIMENSION) মোট সংখ্যা হল চার। প্রথম তিনটে স্থানের (SPACE), আর চতুর্থটি হল সময় (TIME)। চতুর্থটির অন্তহীন পথেই আমাদের জীবন গড়িয়ে এসে ফুরিয়ে যায় মৃত্যুর দোরগোড়ায়। আসলে প্রথম তিন মাত্রা আর সময়-মাত্রার মধ্যে বিশেষ কোনও তফাতই নেই। আমাদের চেতনাবোধ শুধু সময়-মাত্রার নিরবচ্ছিন্ন পথে যতিহীন গতিতে বয়ে চলেছে—এইটুকুই শুধু যা তফাত। এ ছাড়া চতুর্থ মাত্রার যে-সংজ্ঞা আপনারা শুনেছেন আজ পর্যন্ত—তা একেবারেই ভুল। কেমন, তা-ই নয় কি?’

‘সংজ্ঞাটা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই।’ স্বীকার করেন প্রাদেশিক মেয়র।

‘খুব সহজ সংজ্ঞা। আমাদের গণিতবিদরা বলেন যে, দৈর্ঘ্য, বিস্তার আর বেধ—স্থানের এই তিন মাত্রা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত। কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, তা-ই যদি হবে, তবে ওই তিন মাত্রার সঙ্গে সমকোণ করে চতুর্থ মাত্রার অবস্থানই বা সম্ভব নয় কেন? আর তা-ই ভেবেই চার মাত্রার জ্যামিতি লেখার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন সবাই। এই তো মাসখানেক আগেও নিউ ইয়র্ক ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটিতে প্রফেসার সাইমন নিউকোর্স এ নিয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়ে দিলেন আর পাঁচজন গণিতবিদকে। আপনারা জানেন, দু-মাত্রাওয়ালা সমতলে কীভাবে আমরা তৃতীয় মাত্রার ছবি আঁকি। তাঁরা বলেন, ঠিক এইভাবেই নাকি তিন মাত্রার মডেলের ওপর চতুর্থ মাত্রাকেও দেখানো সম্ভব। বুঝলেন তো?’

‘বুঝলাম।’ কপাল কুঁচকে বিড়বিড় করেন প্রাদেশিক মেয়র।

‘বেশ কিছুদিন ধরেই চার মাত্রার এই জ্যামিতি নিয়ে গবেষণা করছিলাম আমি। বিজ্ঞানীমাত্রই জানেন যে, সময় কেবল স্থানেরই আর-এক রূপ। আবহাওয়ায় খবর-আঁকা এই কাগজটা দেখলেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে আপনাদের। এই যে, এই লাইনটা—এটা গতকালের ব্যারোমিটারের পারার ওঠা-নামা নির্দেশ করছে। এবার দেখুন, গতকাল দিনের বেলায় কোথায় ঠেলে উঠছে লাইনটা, রাত্রে নেমে গেছে,

আবার আজ সকালে ঠেলে উঠেছে। স্থানের যে তিন মাত্রাকে আমরা জানি, তার কোনওটার ওপরেই কিন্তু পারা এ লাইন আঁকেনি। এঁকেছে সময়-মাত্রার ওপর।'

গনগনে আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে ছিলেন ডাক্তার—এবার তিনি মুখ খুললেন, 'স্থান-মাত্রার আর-এক রূপ যদি সময়, তবে স্থান আর তিন মাত্রার মধ্যে আমরা ইচ্ছামতো যেমন ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারি, তেমনটি সময়ের মধ্যে কেন পারি না?'

হেসে ওঠেন সময়-পর্যটক—'সত্যিই কি তা-ই? স্থানের তিন মাত্রার মধ্যে আমাদের গতিবিধি কি একেবারেই অবাধ? ডাইনে, বামে, সামনে, পেছনে গেলাম—অর্থাৎ শুধু দুটো মাত্রার ভেতরে ইচ্ছামতো চলাফেরা করলাম, কিন্তু ওপরে-নিচে আসা-যাওয়া কি সম্ভব? মাধ্যাকর্ষণ তো বাধা দিচ্ছে সেদিকে।'

'দিলেই বা? বেলুন তো রয়েছে সে-বাধা কাটাবার জন্য।'

'কিন্তু বেলুন আবিষ্কারের আগে ওপরে-নিচে খাড়াইভাবে চলাফেরা করার কোনও পন্থাই মানুষের জানা ছিল না।'

'কিন্তু লাফঝাঁপ দিয়ে ওপর-নিচে সামান্য নড়াচড়াও তো করা যেত?'

'ওপরে ওঠার চাইতে নিচে নামাটা ছিল আরও সহজ।'

'আরে মশাই, সময়ের মধ্যে তো আপনি তা-ও পারছেন না। বর্তমান মুহূর্ত থেকে দূরে চলে যাওয়ার কোনও ক্ষমতাই নেই আপনার।'

'ভুল করলেন মশায়, ভুল করলেন ওইখানেই। সারা দুনিয়া ভুল করছে ঠিক ওই জায়গাটিতে। বর্তমান মুহূর্ত থেকে আমরা নিয়তই দূরে সরে যাচ্ছি। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন সমান গতিতে আমাদের নির্মাত্রা, নির্বস্তু মানসিক স্থায়িত্ব সময়-মাত্রার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে—অনন্তকাল ধরে প্রবহমান এই অবিরাম গতির মধ্যে নেই যতির আয়েশ, অনিয়মের দিকহীনতা অথবা স্ব-ইচ্ছার শ্লথতা। পৃথিবীর পঞ্চাশ মাইল ওপরে ছেড়ে দিলে আমরা যেমন শুধু নিচের দিকেই নামতে থাকতাম—ঠিক তেমনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালপথে আমাদের যাত্রাও রয়েছে অব্যাহত।'

'কিন্তু অসুবিধেটা কী জানেন,' বাধা দিয়ে বললেন মনোবিজ্ঞানী, 'স্থানের তিন মাত্রার মধ্যে আপনি যেদিকে খুশি বেড়াতে পারেন—কিন্তু সময়ের মধ্যে তো আপনি তা-ও পারছেন না।'

'আমার আবিষ্কারের মূল উৎস তো সেইখানেই। ধরুন, অতীতের কোনও একটা ঘটনা চিন্তা করছেন আপনি। তৎক্ষণাৎ আপনার মন উধাও হয়ে যাচ্ছে পুরানো দিনের মাঝে। কিন্তু ইচ্ছেমতো আপনার মনকে আপনি সেখানে ধরে রাখতে পারছেন না। যেমন, মাটি থেকে ছ-ফুট লাফিয়ে উঠেও কোনও বর্বরই পারে না ছ-

ফুট উঁচুতে নিজেকে ধরে রাখতে। কিন্তু সভ্য মানুষের মাথা বর্বর মানুষের চেয়েও অনেক উন্নত। তাই বেলুন আবিষ্কার করে তারা যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হারাতে পারে, তবে নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করে সময়-মাত্রার মধ্যে পেছিয়ে যাওয়া অথবা যেদিকে ইচ্ছা যাওয়ার ক্ষমতাই বা তারা পাবে না কেন বলুন?'

'অসম্ভব।' শক্ত গলায় বলে ফিল্বি।

'কেন অসম্ভব?' শুধান সময়-পর্যটক।

'যুক্তি দিয়ে সাদাকে কালো প্রমাণ করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস তো আর গেঁথে দিতে পারেন না।'

'তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, এখন শুনুন, চার-মাত্রার জ্যামিতি নিয়ে গবেষণা করার পেছনে আমার আসল উদ্দেশ্যটা কী। অনেকদিন আগে আমার মাথায় একটা মেশিনের পরিকল্পনা আসে—'

'সময়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে!' উদ্‌গত বিস্ময় আর চাপতে পারে না পাশের ছেলেটি।

'চালকের ইচ্ছামতো স্থান আর সময়ের মধ্যে যেদিকে খুশি, যেভাবে খুশি, যতক্ষণ খুশি ঘুরে বেড়াবে সেই মেশিন।'

খুকখুক করে হেসে ওঠে ফিল্বি।

'যতসব গাঁজাখুরি থিয়োরি!' মুখের ওপর বলে দেন মনোবিজ্ঞানী।

'আমার কাছেও এটা একদিন থিয়োরি ছিল—ছিল অলীক অবাস্তব এক কল্পনা। এবং এ থিয়োরি আপনাদের সামনে কোনওদিনই হাজির করতাম না, যদি না—'

'এক্সপেরিমেন্ট!' আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না আমি। আপনি এবার হাতেনাতে আপনার ওই উদ্ভট থিয়োরি প্রমাণ করতে শুরু করবেন নাকি?'

'এক্সপেরিমেন্ট!' গোল গোল হয়ে ওঠে ফিল্বির চোখ।

'দেখাই যাক-না থিয়োরির মধ্যে গাঁজার পরিমাণটা কত!' শ্লেষভরে বলেন মনোবিজ্ঞানী।

সামান্য একটু হাসলেন সময়-পর্যটক। তারপর ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু নিয়ে প্যান্টের দু-পকেটে হাত ভরে এগিয়ে গেলেন বারান্দা দিয়ে ওপাশে। একটু পরেই ফিরে এলেন তিনি।

২। মেশিন

চকচকে ধাতুর তৈরি একটা যন্ত্র দেখলাম সময়-পর্যটকের হাতে। টাইমপিসের চেয়ে সামান্য বড় যন্ত্রটা, কিন্তু নিখুঁতভাবে তৈরি। হাতির দাঁত আর কয়েকটা স্বচ্ছ

ক্রিস্টালের কারুকাজও দেখলাম তার মাঝে। যন্ত্রটার বিচিত্র গঠন দেখে কৌতূহল না জেগে পারে না।

এরপরে যা ঘটল তা সত্যই অবর্ণনীয়। আটকোনা একটি টেবিল এনে রাখা হল আগুনের সামনে। ওপরে মেশিনটাকে বসিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনে বসলেন ভদ্রলোক। মেশিন ছাড়াও টেবিলের ওপর ছিল একটা শেড-দেওয়া ল্যাম্প—চিকমিক করছিল মডেলটা তার আলোয়। ঘরের মধ্যে এদিকে-সেদিকে আরও প্রায় ডজনখানেক মোমবাতি থাকায় আলোর অভাব ছিল না মোটেই। আগুনের একেবারে কাছেই বসেছিলাম আমি। সময়-পর্যটকের পেছনে বসল ফিল্বি। বাঁদিকে বসলেন ডাক্তার আর প্রাদেশিক মেয়র—ডানদিকে মনোবিজ্ঞানী, অল্পবয়েসি ছেলেটা রইল আমার ঠিক পেছনেই। প্রত্যেকেই চোখ-কান খুলে বেশ সজাগ হয়ে বসে—কাজেই এরকম পরিস্থিতিতে হাতসাফাই যে একেবারেই অসম্ভব, তা বুঝলাম সবাই।

আমাদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সময়-পর্যটক। তারপর টেবিলের ওপর কনুই রেখে দু-হাতের তালুতে আলতোভাবে ধরলেন মেশিনটাকে।

বললেন, 'ছোট্ট একটা মডেল—আর কিছু না। সময়ের মাঝে খেয়ালখুশিমতো ঘুরে বেড়ানোর অভিনব এক পরিকল্পনা। মেশিনটার নিখুঁত কারুকাজ, এদিকের এই সূক্ষ্ম রডটা, ওপাশের ওই লিভার—প্রতিটিই লক্ষ করার মতো, মনে রাখার মতো। খুবই খুদে এই মেশিন। কিন্তু একেই তৈরি করতে আমার পুরো দুটি বছর গেছে। লিভারটা টিপলে মেশিন উধাও হয়ে যাবে ভবিষ্যতের গর্ভে আর এটা টিপলে যাবে ঠিক উলটোদিকে—অতীতের হারানো পাতায়। এই আসনটা হল চালকের বসবার জায়গা। ভালো করে দেখে রাখুন মডেলটা—টেবিলের ওপর নজর রাখুন সবাই। পরে যেন বলে বসবেন না যে, ধাপ্পাবাজের মতো হাতসাফাইয়ের ভেলকি দেখিয়ে বোকা বানিয়েছি সবাইকে।'

পুরো এক মিনিট সব চুপচাপ। মনোবিজ্ঞানীর বোধহয় কিছু বলার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু কী ভেবে তিনিও বোবা হয়ে গেলেন।

সরু একটা লিভারের ওপর হাত রাখলেন সময়-পর্যটক। তারপরেই চট করে বললেন, 'না, আপনিই আসুন। এগিয়ে দিন আপনার আঙুল।'

ভয়ে ভয়ে তর্জনী এগিয়ে দেন মনোবিজ্ঞানী। সময়-পর্যটক আঙুলটা দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেন লিভারটা।

চিত্র ১.১ সময়-পর্যটক বললেন, 'ছোট্ট একটা মডেল—আর কিছু না।

চোখের সামনে দেখলাম, লিভারটা ঘুরে গেল। কোনও হাতসাফাই নেই, চোখের ধাঁধা নেই। কোনওরকম চালাকি থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু পরক্ষণেই এক ঝলক বাতাসে লাফিয়ে উঠল ল্যাম্পের আকাঁপা শিখাটা। দপ করে নিবে গেল ম্যান্টেলের ওপর রাখা একটা মোমবাতি।

আর, টেবিলের ওপর ছোট্ট মেশিনটা দুলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অস্পষ্ট হয়ে গেল তার নিখুঁত ধাতব অঙ্গ। সেকেন্ডখানেকের জন্য চিকমিকে তামা আর হাতির দাঁতের একটা ফিকে ভৌতিক ছায়া দুলে উঠল ছায়া-মায়ার মাঝে। আর তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেটুকুও। ল্যাম্প ছাড়া টেবিলের ওপর আর রইল না কিছুই।

ঠিক পুরো একটা মিনিট কারও মুখে কোনও কথা ফুটল না।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রথমে মনোবিজ্ঞানীই হেঁট হয়ে টেবিলের তলাটা দেখলেন।

আর প্রসন্ন মুখে হাসতে লাগলেন সময়-পর্যটক। ধীর-পায়ে এগিয়ে গেলেন ম্যান্টলপিসের সামনে—পাইপটা বার করে তামাক ঠাসতে লাগলেন আপন মনে।

হতভম্বের মতো আমরা এর-ওর মুখের দিকে তাকালাম। ডাক্তার ফস করে বলে ওঠেন, 'আরে মশাই, আপনি কি সত্যেই ভেবেছেন যে, ওই বিদঘুটে মেশিনটা সময়ের পথে হাওয়া খেতে গেল?'

'কোনও সন্দেহই নেই সে-বিষয়ে।' পাইপে আগুন লাগিয়ে মনোবিজ্ঞানীর দিকে ফিরে দাঁড়ান সময়-পর্যটক। মোটেই ঘাবড়ে যাননি, এমনি ভাব দেখিয়ে মনোবিজ্ঞানী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কাঁপা হতে একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মুচকি হেসে বলে চললেন সময়-পর্যটক, 'ল্যাবরেটরিতে বেশ বড় সাইজের একটা মেশিন শেষ হয়ে এল প্রায়। তারপর তো ইচ্ছে আছে, নিজেই একদিন বেরোব।'

এরপর আমরা কেউ আর কোনও কথা বললাম না। অথবা বলবার চেষ্টা করেও পারলাম না। সকৌতুকে আমাদের বিস্ময়-আঁকা মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন উনি, তারপর বললেন, 'আসুন, আসল টাইম মেশিনটা দেখাই আপনাদের।'

বলে, একটা মোমবাতি নিয়ে পা বাড়ালেন বারান্দার পথে। পিছুপিছু চুম্বকে টানা লোহার মতো আমরাও এগিয়ে গেলাম। লম্বা টানা বারান্দার দেওয়ালে আমাদের লম্বা ছায়াগুলো মোমবাতির কাঁপা শিখায় কেঁপে কেঁপে উঠে কেমন জানি শিরশিরে ভাবে ভরিয়ে দিল আমার অন্তর।

ল্যাবরেটরিতে এসে যা দেখলাম, তা ড্রয়িং রুমে চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া খুদে মেশিনটারই বিরাট সংস্করণ। কতকগুলো অংশ চকচকে নিকেলের তৈরি, সাদা হাতির দাঁতের কাজও দেখলাম কয়েক জায়গায়। পাথরে ক্রিস্টালও বসানো আছে এখানে-সেখানে। মেশিনটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এলেও কতকগুলো বেঁকানো ক্রিস্টালের ডান্ডা তখনও পড়ে ছিল পাশের বেঞ্চে। একটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম—মনে হল কোয়ার্টজের তৈরি।

ডাক্তার বললেন, 'আপনি কি মশাই তামাশা জুড়েছেন, না সত্যিই সময়ের পথে ঘুরে বেড়ানোর মতলব আঁটছেন?'

মাথার ওপর বাতিটা তুলে ধরে বললেন সময়-পর্যটক, 'এই মেশিনে বসেই আমি আমার অভিযান চালাব সময়ের বুকে—এই আমার প্রতিজ্ঞা। জীবনে এর চাইতে বেশি সিরিয়াস যে আর আমি হইনি—তা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন।'

৩। সময়-পর্যটকের প্রত্যাবর্তন

তখনও কিন্তু আমাদের কেউই টাইম মেশিনকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। দুনিয়ায় একশ্রেণির মানুষ আছে, যাদের চতুরতার পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। চতুর-চূড়ামণি সময়-পর্যটকও এই শ্রেণির মানুষ। নিত্যনতুন ফন্দি যাঁর মাথায় অহরহ গজাচ্ছে, তাঁর সব কথা হট করে বিশ্বাস করে বোকা বনতে মন চায় না কিছুতেই। ডাক্তারের সঙ্গে এ-বিষয়ে পরে আমার কথা হয়েছিল। তিনি তো বললেন, এ একটা রীতিমতো উন্নত ধরনের ম্যাজিক ছাড়া কিছুই নয়। মোমবাতি নিবে যাওয়ার সঙ্গে মেশিন উধাও হওয়ার নিশ্চয় সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে-সম্পর্কটা যে কী তা তিনি অনেক গবেষণা করেও আবিষ্কার করতে পারলেন না।

সেদিন সময়-পর্যটকের ড্রয়িং রুমে কয়েকজন রোজকার অতিথির মধ্যে আমিও ছিলাম। তাই পরের বেস্পতিবার যথাসময়ে হাজির হলাম রিচমন্ডে। গিয়ে দেখি আমার আগেই জনা চার-পাঁচ ভদ্রলোক জমায়েত হয়েছেন। একতাল কাগজ হাতে আগুনের চুল্লির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু আশপাশে কোথাও সময়-পর্যটকের টিকিটি দেখতে পেলাম না।

'সাড়ে সাতটা বেজে গেল', ডাক্তারই প্রথমে কথা বললেন, 'এবার ডিনার শুরু করা উচিত, কী বলেন?'

'কিন্তু গৃহস্বামী গেলেন কোথায়?' শুধাই আমি।

'এখনও এসে পৌঁছাননি। অবশ্য আমাকে একটা চিরকুটে লিখে গেছেন যে, তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে আমরা যেন সময়মতো ডিনার খেয়ে নিই।'

'ডিনার ঠান্ডা হতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় মোটেই।' বললেন নামকরা একটা দৈনিক সম্পাদক।

সুতরাং ঘণ্টা বাজিয়ে ডিনারের আদেশ দিলেন ডাক্তার।

অভ্যাগতদের মধ্যে আমি আর ডাক্তার ছাড়াও ছিলেন মনোবিজ্ঞানী, ব্ল্যাঙ্ক নামধারী সম্পাদক ভদ্রলোক, আরও দু-জন সাংবাদিক। এঁদের মধ্যে আবার দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি এমনই মুখচোরা যে, সারাটা সময় একবারও মুখ খুলতে দেখলাম না তাঁকে। ছুরি-কাঁটার সঙ্গে সমানে মুখও চলতে শুরু করে। গত হপ্তার রোমাঞ্চকর এক্সপেরিমেন্টের হাতসাফাইয়ের বর্ণনাটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছেন মনোবিজ্ঞানী, সম্পাদকমশাইও তাল মিলিয়ে মাঝে মাঝে রসালো টিপ্পনী ছাড়ছেন, এমন সময়ে কোনওরকম শব্দ না করে খুব আস্তে আস্তে বারান্দার দরজাটা ফাঁক হয়ে যেতে লাগল।

দরজার দিকে মুখ করে আমি বসেছিলাম, তাই আমারই চোখে পড়ল প্রথম। দরজাটা আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ খুলে যেতেই দেখলাম, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সময়-পর্যটক স্বয়ং।

'এ কী ব্যাপার?' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি।

'কী করে হল এমন অবস্থা?' এবার ডাক্তারের চোখে পড়েন তিনি।

আর, তারপরেই সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তাঁর ওপর।

ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ধুলোভরা কোটটা এখানে-সেখানে ছিঁড়ে গেছে, হাতাতে লেগেছে সবুজ রঙের ছোপ। উশকোখুশকো চুল; আর, অন্তত আমার তো মনে হল, ধুলোময়লার জন্যেই হোক বা সত্য সত্যই ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক, চুলগুলো আগের চাইতে যেন অনেক সাদা হয়ে গেছে। মুখ তার বিরং, বিবর্ণ, পাণ্ডুর। চিবুকে একটা দগদগে কাটার চিহ্ন, আর একটা শুকিয়ে এসেছে। দারুণ পরিশ্রমে তাঁর ভাবভঙ্গি কেমন জানি অবসাদময়, ক্লান্তিতে শিথিল। হঠাৎ জোর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলে যেমন হয়, তেমনিভাবে মুহূর্তের জন্য দোরগোড়ায় পা ঘষটালেন তিনি, তারপর ঘরে ঢুকলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। নির্বাক হয়ে আমরা তাকিয়ে রইলাম তাঁর পানে।

একটা কথাও বললেন না তিনি। বেদনায় মুখ বিকৃত করে টেবিলের কাছে এসে শ্যাম্পেনের দিকে আঙুল তুলে দেখলেন। তাড়াতাড়ি একটা গেলাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন সম্পাদক ভদ্রলোক। এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে দিয়ে যখন মুখ তুললেন, তখন ঠোঁটের কোণে তাঁর পুরানো হাসি আবার ফুটে উঠেছে ম্লান হয়ে।

ডাক্তার শুধান, 'কী ব্যাপার বলুন তো আপনার?'

প্রশ্নটা সময়-পর্যটকের কানে ঢুকেছে বলে মনে হয় না। নীরবে আর-এক গেলাস শ্যাম্পেন শেষ করে উঠে দাঁড়ান তিনি। গালে-মুখে-চিবুকে রক্তের আভা একটু একটু করে ফুটে উঠছিল। থেমে থেমে বললেন তিনি, 'এখন চলি আমি... হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে আসছি এখুনি। আমার জন্যে শুধু কিছু মাটন রেখে দিন— অনাহারে নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ শুকিয়ে এসেছে।' বলে পা টেনে টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। আর তখনই লক্ষ করলাম, তাঁর পায়ে জুতো নেই; ছেঁড়া মোজাজোড়া রক্তে মাখামাখি। আর কিছু দেখার আগেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আবার গুঞ্জন শুরু হয় ডিনার টেবিলে। সম্পাদক ভদ্রলোক আপন মনেই বিড়বিড় করতে থাকেন, 'প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর আশ্চর্য ব্যবহার।' বোধহয় পরের দিনের কাগজের শিরোনামটাই আওড়ে নেন তিনি।

আমি বললাম, 'জল্পনা-কল্পনা আপাতত বন্ধ রেখে আসুন। আধ-খাওয়া খানাটা এবার শেষ করা যাক। উনি ফিরে এলে সবকিছু শোনা যাবেখ'ন।'

'উত্তম প্রস্তাব।' বলে ছুরি-কাঁটা তুলে নিলেন সম্পাদক ভদ্রলোক। 'আচ্ছা মশায়, ভদ্রলোক না-হয় মেশিনে চড়ে এক পাক ঘুরেই এলেন। কিন্তু ভবিষ্যতের

মানুষগুলোর কাছে কি কোট ঝাড়বার ব্রাশ বা চুল আঁচড়াবার কোনও চিরুনিও নেই?'

দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই। আবহাওয়া অনেকটা লঘু হয়ে যাওয়ায় মনোবিজ্ঞানী আবার গত হপ্তার এক্সপেরিমেন্টের সরস বর্ণনা শুরু করেন। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই ফিরে আসেন সময়-পর্যটক। সাধারণ সান্ধ্য পোশাক তাঁর পরনে। চোখের দৃষ্টি তখনও কেমন জানি উদ্‌ভ্রান্ত।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন সম্পাদক, 'কী ব্যাপার মশায়? শুনলাম নাকি আগামী দিনগুলোতে বেড়াতে গিয়েছিলেন আপনি? তা রোজবেরির কী খবর শুনে এলেন, বলুন শুনি।'

নীরবে চেয়ারে এসে বসলেন সময়-পর্যটক। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, 'আমার মাটন কোথায়?'

'গল্প আগে!' চেঁচিয়ে ওঠেন সম্পাদক।

'চুলোয় যাক গল্প। পেটে দানাপানি না পড়লে একটা কথাও বলতে পারব না আমি। ধমনিতে বেশ কিছু পেপটোনের দরকার এখন।'

'একটা কথা শুধু বলুন। সত্যিই কি সময়ের পথে বেরিয়ে এলেন?'

'হ্যাঁ।' মুখভরা মাংস চিবুতে চিবুতে জবাব দিলেন সময়-পর্যটক।

'আপনি যা-ই বলুন-না কেন, লাইনপিছু এক শিলিং দেব আমি।' প্রত্যুত্তরে আর-এক গেলাস শ্যাম্পেন পান করলেন সময়-পর্যটক।

ডিনারের বাকি সময়টুকু আর বিশেষ কোনও কথা জমে না। খাওয়া শেষ হলে পর একটা সিগার ধরিয়ে বললেন তিনি, 'যে-কাহিনি আপনাদের শোনাব, তা যেমনি অবিশ্বাস্য, তেমনি আশ্চর্য রকমের সত্য। বিশ্বাস করা, না-করা অবশ্য আপনাদের অভিরুচি। বেলা চারটের সময়ে ল্যাবরেটরিতে ছিলাম আমি... তারপর থেকে পুরো আটটা দিন কাটিয়েছি আমি... এমনভাবে কাটিয়েছি, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না... কিন্তু সে বিরাট কাহিনি। শুনতে হলে আসুন, স্মোকিং রুমে গিয়ে বসি।'

স্মোকিং রুমে আরামকেদারায় বসার পর আবার শুরু করলেন, 'একটা শুধু শর্ত আছে, আমাকে কেউ বাধা দেবেন না। রাজি থাকেন তো বলুন।'

'কিন্তু একটা অলীক ব্যাপার শুনতে হলে—' মুখ খোলেন সম্পাদক।

'আজ রাত্রে কোনও তর্ক নয়, বড় শ্রান্ত আমি। অথচ না বললেও ঘুম হবে না আমার। যা বলব, তা-ই শুনতে হবে। কোনও বাধা নয়, রাজি?'

'রাজি।' বললাম সবাই।

তখন শুরু হল সময়-পর্যটকের আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনি। চেয়ারে হেলে পড়ে বলে যাচ্ছিলেন তিনি দ্রুততর গতিতে। লিখতে লিখতে কনুই পর্যন্ত টনটনিয়ে উঠছিল

আমার। নিশ্চয় খুব মন দিয়ে এ-কাহিনি পড়ছেন আপনারা। কিন্তু তবুও ল্যাম্পের আলোক-বলয়ের মাঝে বক্তার ফ্যাকাশে মুখ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। শুনতে পাচ্ছেন না তাঁর আবেগ-কাঁপা গমগমে কণ্ঠস্বর। আলোক-সীমানার বাইরে অন্ধকারে বসে রইলাম আমরা। আর দক্ষ শিল্পীর মিড়-গড়ক-গমক-মূর্ছনা সৃষ্টির মতো শব্দের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিলেন সময়-পর্যটক।

৪। সময়-পর্যটন

গত বৃহস্পতিবার আপনাদের কয়েকজনকে টাইম মেশিনের মূলসূত্রগুলি আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। অসমাপ্ত মেশিনটাও ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি। এখনও সেখানেই আছে মেশিনটা—এতটা পথ ঘুরে আসার ফলে একটু ময়লা হয়ে গেছে অবশ্য। তা ছাড়া হাতির দাঁতের একটা রড চিড় খেয়ে গেছে, তামার রেলিংটাও গেছে বেঁকে। বাদবাকি সব ঠিক আছে। ভেবেছিলাম, গত শুক্রবারেই শেষ হয়ে যাবে মেশিনটা, কিন্তু শুক্রবারে কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দেখলাম, একটা নিকেল রড প্রায় ইঞ্চিখানেকের জন্যে ছোট হচ্ছে। কাজেই নতুন করে তৈরি করতে হল রডটা। সেই কারণেই বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। আজ সকালে সম্পূর্ণ হল টাইম মেশিন। আর সকাল দশটার সময়ে শুরু হল তার জীবনযাত্রা। চারদিকে টোকা মেরে স্ক্রুগুলো আর-একবার দেখে নিয়ে কোয়ার্টজ রডে আরও এক ফোঁটা তেল ঢেলে দিলাম। তারপর চেপে বসলাম আসনে। খুলির কাছে পিস্তল ধরে আত্মহত্যা করার আগে মানুষের মনে যে বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, আমারও হল তা-ই। এক হাতে স্টার্ট দেওয়ার লিভারটা ধরে, অপর হাতে বেশ করে চেপে ধরলাম গতিরোধের লিভারটা। তারপর প্রথমটা ঠেলার পরমুহূর্তেই দ্বিতীয়টাও ঠেলে দিলাম। মনে হল, মাথা ঘুরে গেল আমার। দুঃস্বপ্নের ঘোরে মনে হল যেন তলিয়ে যাচ্ছি অতলে, আর তারপরেই চারপাশে তাকিয়ে দেখি, ঠিক আগের মতো অবস্থাতেই ল্যাবরেটরিতে রয়েছি আমি। কিছুই তো তাহলে হল না! মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হল, বুঝি-বা আমার মেধা শেষ পর্যন্ত ছলনা করলে আমায়। পরক্ষণেই আমার চোখ পড়ল ঘড়ির ওপর। এক মুহূর্ত আগেও তো ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়েছিল দশটা, কি খুব জোর দশটা বেজে এক মিনিটের ঘরে। আর এখন দেখলাম, কাঁটা দুটো ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিনটের ঘরে।

জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দু-হাতে আঁকড়ে ধরলাম স্টার্ট দেওয়ার লিভারটা, আর পরক্ষণেই এক ধাক্কায় ঠেলে দিলাম সামনের দিকে। ধোঁয়ার মতো আবছা হয়ে এল ল্যাবরেটরি, রাশি রাশি আঁধারে ভরে উঠতে লাগল ঘরটা। মিসেস ওয়াচেট ভেতরে এলেন, আমাকে যেন দেখতে পাননি এমনিভাবে এগিয়ে গেলেন

বাগানের দরজার দিকে। পথটুকু পেরতে বোধহয় তাঁর মিনিটখানেক লেগেছিল, আমার কিন্তু মনে হল যেন রকেটের মতো সাঁত করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এবার একেবারে শেষ ঘাঁটিতে ঠেলে দিলাম লিভারটা। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়ায় মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশার তমসা, পরের মুহূর্তেই রাত কেটে গিয়ে ফুটে উঠল ভোরের আলো। অস্পষ্ট আর আবছা হয়ে উঠতে লাগল ল্যাবরেটরি, আরও অস্পষ্ট... আরও... আরও। আবার রাত এল ঘনিয়ে, তারপরে আবার দিন, আবার রাত, আবার দিন—ক্রমশ অস্পষ্ট ভোমরার গুঞ্জনের মতো একটা ধ্বনি আবর্তের পর আবর্ত রচনা করে চলল আমার কর্ণকুহরে, আর-একটা অজানা, বোবা বিমূঢ়তা চেপে বসতে লাগল আমার মনের ওপর।

সময়-পর্যটনের সে অদ্ভুত অনুভূতি আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর, অস্বচ্ছন্দ সে-অনুভূতি। অসহায় অবস্থায় তিরের মতো সামনের দিকে উন্মাদ বেগে ছুটে যাওয়ায় যে-অনুভূতি, এ যেন অনেকটা তা-ই। যে-কোনও মুহূর্তে একটা প্রবল সংঘাতের আশঙ্কায় শিউরে উঠল আমার অন্তর। যতই এগিয়ে চললাম, কালো ডানা ঝাপটানোর মতো রাত কেটে গিয়ে ফুটে উঠতে লাগল দিনের আলো। দূর হতে দূরে সরে যেতে লাগল ল্যাবরেটরির ধোঁয়াটে রেখা—দেখলাম, আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে এক-এক লাফে এগিয়ে চলেছে সূর্য, এক-এক লাফে কাটছে এক-একটি মিনিট আর প্রতিটি মিনিট সূচনা করছে এক-একটি দিনের। মনে হল, ল্যাবরেটরি যেন ধ্বংস হয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে—খোলা বাতাসে এসে পড়লাম আমি। ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল গতিবেগ। ধীরগতি শামুকও চোখের পলকে মিলিয়ে যেতে লাগল দৃষ্টিপথের বাইরে। আঁধার আর আলোকের ঘন ঘন আনাগোনা বেজায় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল আমার চোখে। তারপরেই দেখলাম, সবিরাম আঁধারের মাঝে দ্রুতগতিতে কলা পরিবর্তন করে অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা আর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যার পথে গড়িয়ে চলেছে চন্দ্র—চারপাশে অস্পষ্টভাবে ঝিকমিক করছে ঘূর্ণ্যমান তারার রাশি। দেখতে দেখতে গতি আরও বেড়ে যেতে দিনরাতের স্পন্দন টানা একটা ধূসর রেখায় মিশে এক হয়ে গেল। আশ্চর্য গাঢ় নীল রঙে ঘন হয়ে উঠল আকাশ, গোধূলির শুরুতে যেমন সুন্দর বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে, এ যেন তেমনি। সূর্যের ঘন ঘন লাফ মিলিয়ে গিয়ে দেখা গেল শুধু আগুনের একটা টানা রেখা, যেন মহাশূন্যের মাঝে জ্বলজ্বলে এক তির্যক খিলান। আর অস্পষ্টভাবে বাঁকা রেখার মাঝে জ্বলতে-নিবতে লাগল চাঁদ। তারপর আর কোনও তারাই দেখতে পেলাম না, শুধু ঘন নীলের মাঝে একটা জ্বলজ্বলে বৃত্তের দপদপানি জেগে রইল আমার চোখের সামনে। চারপাশে দৃশ্যপটও কুয়াশার মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। যে-পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে এ-বাড়িটা, তার সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ধোঁয়ার মতো ধূসর পাথরের

রেখা আমার অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। দেখলাম, চোখের সামনে বৃদ্ধি পাচ্ছে গাছের সারি। এক-এক ফুৎকারে পালটে যাচ্ছে তার আকৃতি। বাদামি থেকে সবুজ, তারপরেই ধূসর। এরপরেই ডালপালা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে গেল শুকিয়ে। দেখলাম, বড় বড় প্রাসাদ গড়ে উঠছে, সুন্দর কিন্তু আবছা, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের মতো। সমস্ত ভূতল মনে হল পালটে যাচ্ছে, চোখের ওপর গলে গলে স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। ডায়ালের ওপর গতিনির্দেশক ছোট কাঁটাগুলোর গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। ক্ষণ পরেই দেখলাম, কর্কটক্রান্তি থেকে মকরক্রান্তির মধ্যে দুলছে সূর্যবলয় রেখা এক মিনিটেরও অল্প সময়ের মধ্যে, ফলে এক-এক মিনিটে পেরিয়ে যেতে লাগলাম এক-একটি বছর! আর মিনিটে মিনিটে সাদা তুষার-চাদর ঝলসে উঠতে লাগল পৃথিবীর ওপর, আর পলকের মধ্যে তা মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠতে লাগল সংক্ষিপ্ত বসন্তের ঝকঝকে সবুজাভা।

চিত্র ১.২ আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে এক-এক লাফে এগিয়ে চলেছে সূর্য।

যাত্রারম্ভের সে অস্বচ্ছন্দ অনভূতি আর ততটা তীব্র ছিল না। কীরকম জানি মূর্ছাবেশের মতো এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল আমার অন্তর। কী জানি কেন এলোমেলোভাবে দুলছিল মেশিনটা। কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি তখন এমনই অসাড় হয়ে উঠেছে যে, দুলুনি থামাবার কোনও প্রচেষ্টা আমি করলাম না। উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া একটা উন্মাদনায় অবশ হয়ে এল আমার সর্ব ইন্দ্রিয়, দুরন্ত বেগে ভবিষ্যতের গর্ভে ধেয়ে চললাম বাধাহীন গতিতে। প্রথমে গতিরোধের কোনও চিন্তাই আসেনি আমার মনে, শুধু ওই বিচিত্র অনুভূতি ছাড়া আর কোনও কিছুই উপলব্ধি করিনি তখনও। কিন্তু অচিরেই নতুন একটা চিন্তাধারা আমার মনে জেগে উঠতে লাগল—বিশেষ একটা ঔৎসুক্য আর সেই সঙ্গে বিশেষ এক আতঙ্ক—শেষে আমার সমস্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ল সেই চিন্তাধারা। চোখের সামনে ধাবমান জগতের ধোঁয়াটে পটপরিবর্তন দেখে ভাবলাম, না জানি মনুষ্যত্বের কী বিচিত্র বিকাশ, আমাদের আদিম সভ্যতার কী চরম অগ্রগতিই দেখব এবার! দেখলাম, বিরাট বিরাট জমকালো স্থাপত্য নিদর্শন, আমাদের এখনকার বাড়ির চাইতে অনেক বিপুল তাদের আকৃতি, আর তবুও যেন ঝিলমিলে কুয়াশা দিয়ে তা গড়া। দেখলাম, পাহাড়ের পাশের জমি উজ্জ্বল সবুজ রঙে ঝলমল করে উঠল, এমনকী শীতের প্রকোপেও অম্লান রইল তাদের ঔজ্জ্বল্য। চেতনার বিহ্বলতা সত্ত্বেও বুঝলাম, বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে পৃথিবী। আর তাই এবার গতিরোধের চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল আমার মনে।

আর তখনই অদ্ভুত একটা ঝুঁকির সম্মুখীন হলাম আমি। যে স্থানটুকু আমি বা আমার মেশিন দখল করে রয়েছে, সেখানে অন্য কোনও বস্তু থাকা খুবই সম্ভব। সময়ের মধ্যে দিয়ে দারুণ বেগে ধেয়ে চলার সময়ে অবশ্য এসব সম্ভাবনার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি; কেননা, এককথায় বলতে গেলে আমি সূক্ষ্মরূপে সংকীর্ণ জোড়পথে বাষ্পের মতো পিছলে যাচ্ছিলাম এক বস্তু থেকে আর-এক বস্তুর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু হঠাৎ গতিরুদ্ধ হওয়া মানেই পথে আসা যে কোনও বস্তুর অণুতে অণু গেঁথে যাওয়া, ফলে আমার প্রতিটি পরমাণু বাধার প্রতিটি পরমাণুর সঙ্গে এমন নিবিড় সংস্পর্শে আসবে, যার পরিণামে ঘটবে একটা কল্পনাতীত রাসায়নিক বিক্রিয়া—সম্ভবত দিগন্তবিস্তারী একটা বিস্ফোরণ, আর মেশিন সমেত রেণু রেণু হয়ে সম্ভাব্য সবকিছুর মাত্রা ছাড়িয়ে কোনও অজানায় আমার মিলিয়ে যাওয়া। মেশিনটাকে তৈরি করার সময়ে এ সম্ভাবনা বারবার ভেবে দেখেছি আমি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপরিহার্য ঝুঁকি হিসেবে তা আমি প্রসন্ন মনেই মেনে নিয়েছিলাম—বেঁচে থাকতে গেলে যেমন একটা-না-একটা ঝুঁকি মানুষকে নিতে হয়, এ-ও অনেকটা সেইরকম আর কী! কিন্তু সত্যিই

যখন সে ঝুঁকির মুখোমুখি হলাম, তখন আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। অচেনা-অজানা গতিবেগ, দীর্ঘকাল ধরে পতনের গা-গুলানো অনুভূতি আর মেশিনের অবিরাম ঝাঁকুনি-দুলুনির ফলেই বোধহয় আমার স্নায়ুও আর ধাতস্থ ছিল না। আপন মনে বললাম, না, থামা উচিত হবে না কোনওমতেই; কিন্তু পরমুহূর্তেই স্থির করলাম, থামতেই হবে। ধৈর্যহীন মূর্খের মতো আচমকা ঝুঁকে পড়লাম লিভারের ওপর—তৎক্ষণাৎ পাক খেতে খেতে উলটে পড়ল মেশিনটা, আর শূন্যপথে ছিটকে গেলাম আমি।

রাশি রাশি বাজের দামামা বেজে ওঠে আমার কানের পরদায়। মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম আমি। চারপাশে শুনলাম শুধু শিলাবৃষ্টির হিসহিসে শব্দ আর দেখলাম, উলটে-পড়া মেশিনের সামনেই নরম ঘাসজমির ওপর বসে রয়েছি আমি। তখনও সবকিছু ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগছিল—কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের ঘোর কেটে গেল। চারপাশে ভালো করে তাকালাম। বাগানের মধ্যে ছোটখাটো একটা লনের ওপর বসে ছিলাম আমি, চারপাশে রডোডেনড্রনের ঝোপ; আরও দেখলাম, বরফের অবিরাম আঘাতে রডোডেনড্রনের ঘন বেগুনি আর টুকটুকে লাল রঙের মুকুলগুলি ঝরে ঝরে পড়ছে মাটির ওপর। মেশিনটাকে মেঘের মতো ঘিরে ধরে নেচে নেচে উঠছিল শিলার টুকরোগুলো, ঠিকরে গিয়ে ধোঁয়ার মতো গড়িয়ে পড়ছিল মাটির ওপর। দেখতে দেখতে ভিজে সপসপে হয়ে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। আপ্যায়নের চমৎকার নমুনা। আপন মনেই বলি, 'অসংখ্য বছর পেরিয়ে যে তোমায় এল দেখতে, সে মানুষটার কী হালই করলে তুমি।'

তারপরেই ভাবলাম, বোকার মতো বসে বসে ভেজার কোনও মানে হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম। রডোডেনড্রনকুঞ্জের ওপারে অস্পষ্ট শিলাবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেখলাম, সাদা পাথরে খোদাই প্রকাণ্ড একটা আবছা মূর্তি। এ ছাড়া জগতের সবকিছু রইল অদৃশ্য।

আমার তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করা সত্যই কঠিন। শিলাবৃষ্টি যতই পাতলা হয়ে আসতে লাগল, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল সাদা মূর্তিটা। বেজায় উঁচু মূর্তি, একটা সিলভার বা গাছ তো কাঁধের কাছে গিয়ে ঠেকেছিল। আগাগোড়া সাদা মর্মরে তৈরি তার দেহ, আকারে অনেকটা ডানাওয়ালা স্ফিংক্স-এর মতো, কিন্তু ডানা দুটো খাড়াইভাবে নিচে না নেমে এসে শূন্যে মেলা রয়েছে, যেন উড়তে গিয়ে হঠাৎ স্থাণু হয়ে গেছে। বেদিটা মনে হল ব্রোঞ্জের তৈরি, ওপরে পুরু হয়ে জমে রয়েছে সবুজ কলঙ্ক। মুখটা ফেরানো ছিল আমার দিকেই, দৃষ্টিহীন চোখ দুটো যেন আমাকেই লক্ষ করছিল, ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ছিল হাসির ছায়া। রোদে-জলে ক্ষয়ে এসেছে মূর্তিটা, দেখলে জরাগ্রস্ত বলে মনে হয়। বেশ কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখতে লাগলাম—আধ মিনিট কি আধ ঘণ্টা তা জানি না। মূর্তির সামনে আছড়ে-পড়া শিলাবৃষ্টির চাদর কখনও গাঢ়, কখনও ফিকে—আর সেই সঙ্গে মূর্তিটাও যেন কখনও যাচ্ছে পিছিয়ে, কখনও আসছে এগিয়ে। শেষকালে ক্ষণেকের জন্যে জোর করে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, শিলাবৃষ্টির ঘন পরদা দ্রুত ফিকে হয়ে যাচ্ছে, সূর্যের স্বাক্ষর বুকে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে নীল আকাশ।

চোখ ফিরিয়ে আবার তাকালাম গুঁড়ি মেরে বসা সাদা মূর্তিটার দিকে। হঠাৎ আমার এই অভিযানের গোঁয়ারতুমি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম। অস্পষ্ট ওই পরদা একেবারেই মিলিয়ে যাওয়ার পর না জানি কী দৃশ্য দেখব আমি। মানুষ আজ কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে? নিষ্ঠুরতাই কি তাদের সহজ প্রকৃতি? এই সুদীর্ঘকাল পরে মানুষ যে তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে একটা অমানবিক নির্মম আর কল্পনাতীত শক্তিমান প্রাণীর পর্যায়ে নেমে যায়নি, তা কে বলতে পারে? হয়তো তাদের চোখে আমি আদিম বিদঘুটে আকারের ভয়ানকদর্শন বর্বর জানোয়ার ছাড়া আর কিছু না, যাকে দেখামাত্র নিধন করতে তৎপর হয়ে উঠবে তারা।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা বিপুল আকার দেখতে পেলাম। কমে-আসা ঝড়ের বুক চিরে অস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ফুটে উঠল সারি সারি মস্ত বড় বাড়ি, চওড়া আলশে, উঁচু থাম আর পাহাড়ের পাশে বনভূমি। হঠাৎ নিঃসীম আতঙ্কে আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। পাগলের মতো টাইম মেশিনের দিকে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি কলকবজাগুলো ঠিক করতে শুরু করে দিলাম। দেখতে দেখতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে উঁকি দিল অরুণদেবের সোনার মুকুট। ধূসর শিলাবৃষ্টি আরও দূরে সরে গেল, তারপর আবছা ভৌতিক ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল কোথায়। মাথার ওপর ফিকে বাদামি রঙের পেঁজা তুলোর মতো মেঘের রাশি গাঢ় নীল আকাশের পটে আলপনা আঁকায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চারপাশে উন্নত মাথায় দাঁড়িয়ে রইল উঁচু বাড়িগুলো, জলে ভিজে চিকমিক করতে লাগল তাদের অলংকরণ, এখানে-সেখানে স্তূপাকার হয়ে পড়ে রইল অগণিত অগলিত সাদা শিলাখণ্ড। এক অজানা জগতের মাঝে একা দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। খোলা বাতাসে উড়তে উড়তে মাথার ওপর ছোঁ মারতে উদ্যত বাজপাখি দেখে পায়রার মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেইভাবেই শিউরে উঠল আমার তনুমন। আমার আতঙ্ক আর কোনও শাসনই মানলে না। বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে একসঙ্গে কবজি আর হাঁটু দিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম লিভারটা! মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু একটা প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে উলটে গেল মেশিনটা। চিবুকে দারুণ লেগেছিল। এক হাত আসনের ওপর আর এক হাত লিভারের ওপর রেখে আর-একবার উঠে বসবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেদম হাঁপাতে লাগলাম আমি।

চিবুকের ওপর জোরালো ওই আঘাতে কেন জানি হঠাৎ আমার লুপ্ত সাহস আবার ফিরে পেলাম। সুদূর ভবিষ্যতের আশ্চর্য জগতের দিকে নিঃশঙ্ক সোৎসুক চোখে তাকালাম। কাছের একটা বাড়ির উঁচু দেওয়ালের অনেক ওপরে একটা গোলাকার জানালায় দেখলাম, মূল্যবান গরম পোশাক-পরা কয়েকটি মূর্তি। আমাকেও দেখেছিল ওরা, আমার দিকেই ওরা মুখ ফিরিয়ে ছিল।

তারপরই শুনলাম, কতকগুলো স্বর এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সাদা স্ফিংক্স-এর পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটন্ত মানুষের কাঁধ আর হাত নজরে এল। এদের মধ্যে একজন যে লনের ওপর মেশিন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, ছুটে এল সেইদিকে। ছোটখাটো একটা মানুষ, ফুট চারেক উঁচু হবে। পরনে টুকটুকে লাল রঙের টিউনিক, কোমরে চামড়ার বন্ধনী, পায়ে স্যান্ডাল বা বুশকিনের মতো একরকম জুতো। হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন, মাথাতেও কোনও টুপি নেই। তা-ই দেখেই সেই প্রথম লক্ষ করলাম, কী গরম সেখানকার বাতাস।

খুদে মানুষটাকে দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। দেহে-মুখে গরিমা মাখানো, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না এমনি শীর্ণ। ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্য বলে একটা কথা প্রায় শুনে থাকি আমরা, তার আরক্ত মুখ দেখে সেই কথাই মনে পড়ল আমার। ওকে দেখেই হঠাৎ আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। হাত তুলে নিলাম মেশিনের ওপর থেকে।

৫। স্বর্ণযুগ

পরমুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা—আমি আর আগামীকালের সেই বিশীর্ণ মানুষটি। সিধে আমার কাছে এসে চোখে চোখ রেখে হেসে উঠল সে। ভাবভঙ্গিতে শঙ্কার লেশমাত্র না দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। তারপরেই সে তার সঙ্গী দু'জনের দিকে ফিরে অদ্ভুত কিন্তু বড় মিষ্টি আর দ্রুত উচ্চারণে কী বললে।

আরও অনেকে ছুটে আসছিল, দেখতে দেখতে বোধহয় আট-দশজন এইরকম সুন্দর খুদে মানুষ ঘিরে ধরল আমাকে। একজন আমাকে কী বললে। আর তখনই বুঝলাম তাদের তুলনায় আমার গলার স্বর কী বিশ্রী কর্কশ আর মোটা। তাই মাথা নেড়ে কানের দিকে আঙুল তুলে দেখলাম আমি। আর-এক পা এগিয়ে আসে সে, একটু ইতস্তত করে, তারপর স্পর্শ করে আমার হাত। আরও কতকগুলো নরম ছোঁয়া অনুভব করলাম ঘাড়ে-পিঠে। আমি রক্তমাংসের জীব কি না, তা-ই পরখ করে নিল ওরা। ভয় পাবার মতো কিছু নেই, বরং এদের ছেলেমানুষি স্বাচ্ছন্দ্য, মিষ্টি সৌন্দর্য দেখে মনে গভীর আস্থা জেগে ওঠে। তা ছাড়া ওরা এত রোগা যে আমার তো মনে হল, ওদের ডজনখানেককে একগোছা আলপিনের মতো ছুড়ে দিতে পারি। ওদের টাইম মেশিনে হাত দিতে দেখে আমাকেও এবার তৎপর হয়ে উঠতে হল।

এতক্ষণে এ বিপদের সম্ভাবনা মোটেই মনে আসেনি। তাড়াতাড়ি স্টার্ট দেওয়ার লিভারটা খুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। তারপর ভাবতে লাগলাম, কী করে কথাবার্তা শুরু করা যায়।

আরও ভালো করে ওদের চেহারা দেখতে গিয়ে ফুটফুটে সৌন্দর্যের মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম। ঢেউতোলা চুলগুলো গাল আর ঘাড়ের কাছে এসে সুচালো প্রান্তে শেষ হয়েছে। মুখের ওপর দাড়িগোঁফের কোনও চিহ্নই নেই। আর কান তো আশ্চর্য রকমের ছোট। ছোট্ট মুখের হাঁ, ঘন লাল পাতলা ঠোঁট, এতটুকু চিবুকটাও সরু হয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে। চোখগুলো কিন্তু বেশ বড় বড়, ভাসা ভাসা চাহনি সে চোখে।

আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা না করে চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বাঁশির মতো নরম স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল ওরা। বাধ্য হয়ে আমিই শুরু করলাম। টাইম মেশিন আর নিজের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম। সময় জিনিসটা কী বোঝানোর জন্যে সূর্যের দিকে আঙুল তুললাম। তৎক্ষণাৎ লাল-সাদা চেক-কাটা পোশাক-পরা একজন খুদে মানুষ এগিয়ে এসে মেঘ ডাকার শব্দ নকল করে চমকে দিলে আমায়।

থতমত খেয়ে গেলাম আমি। সত্যিই কি এরা এত বোকা? জানেন তো, চিরকাল আমি বলে এসেছি, আগামীকালের মানুষরা জ্ঞানে-শিল্পে সব দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আগুয়ান হবে। আর, আট লক্ষ দু'হাজার সাতশো এক সালের একজন আচমকা শুধাল যে, সূর্য থেকে বাজ আমায় নিয়ে এসেছে কি না। পাঁচ বছরের ছেলের চাইতে ওরা বেশি বুদ্ধি ধরে বলে আমার মনে হল না। খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। মুহূর্তের জন্যে ভাবলাম, বৃথাই তৈরি করলাম টাইম মেশিনটা।

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে সূর্যের দিকে আঙুল তুলে বাজ পড়ার এমন এক আওয়াজ ছাড়লাম যে ওরা চমকে উঠল। এবার একজন এগিয়ে এসে একেবারে নতুন ধরনের একরকম ফুলের মালা পরিয়ে দিলে আমার গলায়। দেখে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। তারপরে প্রত্যেকেই এদিকে-সেদিকে দৌড়ে গিয়ে রাশি রাশি ফুল এনে ছুড়তে লাগল আমার দিকে। বেশ একটা মজাদার খেলায় মেতে উঠল সবাই। ফুলগুলো কিন্তু বিচিত্র ধরনের—কত অযুত বছরের প্রচেষ্টায় প্রকৃতি তাদের যে কত সুন্দর করে তুলেছে তা বোঝাতে পারব না। তারপর একজন প্রস্তাব করলে, খেলাটা কাছের বাড়িটায় সবাইকে দেখানো যাক। তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে চলল ওরা। সাদা মর্মরের স্ফিংক্স-এর পাশ দিয়ে ধূসর পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে ওদের উন্নত প্রতিভা সম্বন্ধে দৃঢ়মূল ধারণা আবার ফিরে এল আমার মনে। অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল আমার বুক।

বাড়িটার প্রবেশপথ যেমন উঁচু, তেমনি বিরাট তার আকার-আয়তন। অবাক হয়ে বিরাট তোরণের ওপাশে ছায়া ছায়া রহস্যময় পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। খুদে মানুষদের মাথার ওপর দিয়ে দেখলাম অযত্নবর্ধিত, অবহেলিত কিন্তু আগাছাহীন বড় সুন্দর একটা বাগান। দেখলাম, অদ্ভুত সুন্দর সাদা রঙের একরকম ফুল, পাপড়িগুলো মোমের মতো মোলায়েম। ফুটখানেক লম্বা বোঁটা সমেত ফুলগুলো এলোমেলোভাবে বুনো উদ্দামতায় ঝোপেঝাড়ে ফুটে রয়েছে। তোরণের খিলানে বিচিত্র কারুকাজ। খুব খুঁটিয়ে না দেখলেও মনে হল, প্রাচীন ফিনিশিয়ান অলংকরণের সঙ্গে তার যেন কিছু মিল আছে। যদিও ভেঙেচুরে গেছে, রোদে-জলে জীর্ণ হয়ে এসেছে, তবুও সে সৌন্দর্য একবার দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আরও অনেক খুদে মানুষ ঝকঝকে গরম পোশাক পরে তোরণের নিচে দাঁড়িয়েছিল, শুভ্র সুন্দর হাত নেড়ে জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি কলরোল তুলে ওরা আমায় অভ্যর্থনা জানালে। আর আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর কিম্ভূতকিমাকার ময়লা পোশাকে গলায় একরাশ ফুলের মালা ঝুলিয়ে ঢুকলাম তোরণপথে।
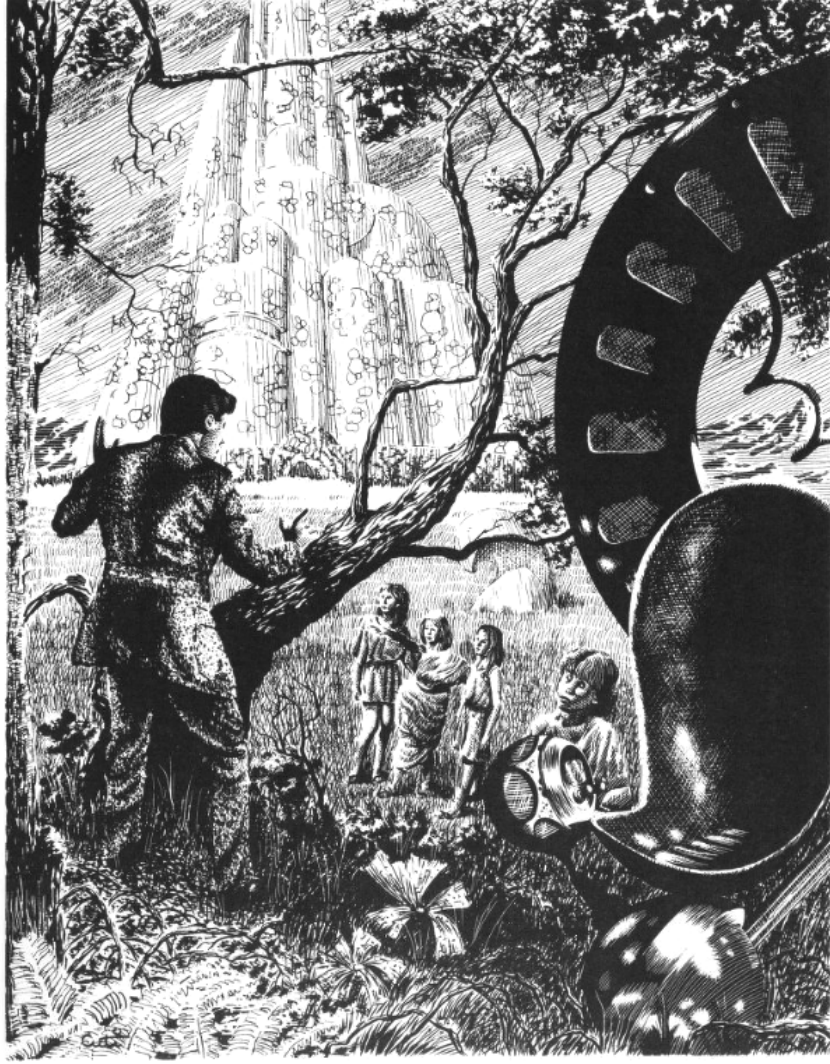
চিত্র ১.৩ মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা—আমি আর আগামীকালের সেই বিশীর্ণ মানুষটি।

বিশাল তোরণপথ শেষ হয়েছে সেই অনুপাতে বিরাট একটা বাদামি হলঘরে। জানলার কিছু স্বচ্ছ আর কিছু অস্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়ে স্তিমিত আলো আসছিল ভেতরে। বহু উঁচুতে অন্ধকারে মিশে আছে ছাদ। বড় বড় কঠিন সাদা চারকোনা পাথরের চাঁই দিয়ে বাঁধানো মেঝে, পূর্বপুরুষদের চলাফেরার ফলে বহু স্থানে ক্ষয়ে গেছে। মেঝে থেকে ফুটখানেক উঁচু চকচকে পাথরের অসংখ্য টেবিল। ওপরে রাশি রাশি ফলের স্তূপ। কতকগুলো কমলা আর রাস্পবেরির বড় সংস্করণ বলেই মনে হল, বাকিগুলো তো চিনতেই পারলাম না।

সারি সারি টেবিলের মাঝে অনেকগুলো গদি-মোড়া আসন ছিল। ওরা তার ওপরে বসে পড়ে আমাকেও বসতে ইঙ্গিত করলে। তারপর লোক-দেখানো কোনওরকম আড়ম্বর না করে দু'হাত দিয়ে ফল খেতে শুরু করে দিলে। খিদের চোটে আমিও

হাত চালাতে কসুর করলাম না। খেতে খেতে আরও ভালো করে দেখতে লাগলাম ঘরটাকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ঘরের জীর্ণ অবস্থা। জ্যামিতিক নকশায় তৈরি জানলার কাচগুলো অসংখ্য দাগে মলিন হয়ে উঠেছে, ভেঙেও গেছে অনেক জায়গায়। পরদাগুলোর ওপরেও পুরু হয়ে জমেছে ধুলোর স্তর। টেবিলের কোনাতেও দেখলাম চিড় ধরেছে। এসব সত্ত্বেও সবকিছু মিলিয়ে ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু সত্যিই অপূর্ব, জমকালো ছবির মতো সাজানো চারদিকে। প্রায় শ'দুয়েক লোক একসঙ্গে খাচ্ছিল ঘরটাতে, প্রত্যেকেই সাগ্রহে লক্ষ করছিল আমাকে। প্রত্যেকের পরনে একই রকমের কোমল কিন্তু মজবুত রেশমের চকচকে হালকা কাপড়ের পোশাক।

দেখলাম ফলই তাদের একমাত্র খাদ্য। সুন্দর ভবিষ্যতের এই খুদে মানুষগুলো সত্যিই গোঁড়া নিরামিষাশী। বাধ্য হয়ে আমাকেও আমিষপ্রীতি ত্যাগ করতে হয়েছিল। পরে অবশ্য দেখেছিলাম, ইকথিওসরাসের[১] পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোরু, ঘোড়া, মেষ, কুকুরও লোপ পেয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। ফলগুলো কিন্তু সুস্বাদু। বিশেষ করে তিনদিকে খোসাওয়ালা ময়দার মতো গুঁড়োয় ভরা একটা ফলের স্বাদ তো রীতিমতো লোভনীয়। সারা বছরেই পাওয়া যেত ফলটা। আমিও শেষ পর্যন্ত আমার মূল খাদ্য করেছিলাম এই ফলটিকেই। এত রাশি রাশি অদ্ভুতদর্শন ফলমূল তারা কোত্থেকে আনছে, তা না বুঝে প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য দেখেছিলাম কোথায় এদের আমদানির উৎস।

যা-ই হোক, দূর ভবিষ্যতের ফলাহার-পর্বের কথাই বলি আপনাদের। খিদের জ্বালা একটু কমতেই ঠিক করলাম, এদের ভাষা আমাকে শিখতে হবে। একটা ফল উঁচু করে ইশারায় নাম জিজ্ঞেস করলাম। ওরা তো প্রথমে হেসেই কুটি কুটি। শেষে, বেশ সুন্দর চুলওয়ালা একজন বোধহয় কিছু বুঝল। এগিয়ে এসে একটা দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করল সে। অনেক চেষ্টায় রপ্ত করলাম পুঁচকে শব্দটা। এইভাবে একটা একটা করে অন্তত বিশটা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য শিখে নিলাম। তারপর সর্বনাম আর 'খাওয়া', এই ক্রিয়াপদটাও শেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওই একঘেয়ে প্রশ্নোত্তরে ওরা বেশ ক্লান্ত আর অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছে দেখে ঠিক করলাম, রয়ে-সয়ে শিখে নেওয়া যাবে ওদের ইচ্ছেমতো। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে, এদের মতো শ্রমবিমুখ আর এত অল্পে পরিশ্রান্ত মানুষ আমি আর জীবনে দেখিনি।

৬। অস্তগামী মানবজাতি

অল্পক্ষণের মধ্যেই খুদে মানুষদের মধ্যেই একটা জিনিসের বিশেষ অভাব দেখলাম, তা হল আগ্রহ। ছেলেমানুষের মতো হুল্লোড় করে অবাক হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ওরা আমাকে ঘিরে ধরত, কিন্তু ক্ষণ পরেই আমাকে ছেড়ে ছুটত নতুন কোনও খেলার সন্ধানে। ডিনার খাওয়ার সময়ে যারা আমাকে ঘিরে বসেছিল, খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই দেখলাম তাদের অনেকেই আর নেই। এরপরেও যখনই বাইরে বেরতাম, কতশত পুঁচকে মানুষ ছুটে এসে ঘিরে ধরত আমাকে, কিন্তু আগ্রহ ফুরাতে বেশিক্ষণ লাগত না। যেন তাদেরই একজন আমি, এমনিভাবে কিছুক্ষণ হাসাহাসি হুটোপাটি করে চলে যেত অন্যদিকে।

বিরাট হলঘর ছেড়ে যখন বাইরে বেরলাম, সূর্য তখন ডুবুডুবু। লাল আভায় রাঙিয়ে উঠেছে চারদিক। ছেড়ে-আসা বিরাট বাড়িটা দেখলাম মস্ত চওড়া একটা নদীর উপত্যকার ওপর। আমাদের টেম্‌স নদী বর্তমান স্থান ছেড়ে মাইলখানেক দূরে সরে গেছে। ঠিক করলাম, মাইল দেড়েক দূরের পাহাড়টার চুড়োয় উঠে আট লক্ষ দু'হাজার সাতশো এক সালের পৃথিবীকে আশ মিটিয়ে দেখতে হবে। সালটা অবশ্য আমার মেশিনের ছোট ডায়াল থেকে পেয়েছিলাম।

পাহাড়ের ওপর একটু উঠতেই দেখলাম গ্রানাইটের বিরাট একটা স্তূপ। রাশি রাশি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে পরস্পর জোড়া পাথরের তৈরি ভাঙাচোরা উঁচু উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বিপুল একটা গোলকধাঁধা। এখানে-সেখানে রাশি রাশি প্যাগোডার মতো ছড়ানো ভারী সুন্দর গাছ, বোধহয় বিছুটি হবে। পাতাগুলোয় কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর বাদামি ছোপ, তা ছাড়া বিছুটির সে তীব্র জ্বলুনিও নেই তাতে। দেখেই বুঝলাম বিরাট কোনও স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপ সেটা। এরকম ধ্বংসস্তূপ এখানে-সেখানে অনেক দেখলাম। কিন্তু এই বিশেষ স্তূপটাতেই আমি এক অতি বিচিত্র অভিজ্ঞতার, বিচিত্রতর আবিষ্কারের সম্মুখীন হয়েছিলাম—কিন্তু সে কথা পরে আসছে।

চিত্র ১.৪ বাড়িটার প্রবেশপথ যেমন উঁচু, তেমনি বিরাট তার আকার-আয়তন।

উঁচু থেকে আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম। ছোট আকারের বাড়ি দেখতে পেলাম না কোথাও। স্বতন্ত্র গৃহস্থালিও উবে গেছে একেবারে। সবুজ প্রকৃতির মাঝে এখানে-সেখানে শুধু বিপুল আকারের মর্মর-প্রাসাদ। ইংলিশ কটেজের চিহ্ন নেই কোথাও।

'কমিউনিজ্‌ম্‌,' আপন মনেই বলি আমি।

আমার পেছনে তখনও জনা ছয়েক পুঁচকে মানুষ আসছিল। তাদের পানে চোখ পড়তে আচমকা আর-একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম। ওদের প্রত্যেকেরই একই পোশাক, একই রকম কেশহীন নরম মুখ আর মেয়েদের মতো সুডৌল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এতক্ষণ এই আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যটুকু চোখেই পড়েনি আমার। কিন্তু একটু ভাবতেই বুঝলাম আসল কারণটা। এ যুগের মানুষদের নারী-পুরুষের আকৃতি একই। শুধু পোশাকের বুনন আর অন্যান্য কয়েকটি তফাত দেখে বুঝে নিতে হয় নারী-পুরুষের

প্রভেদ। খুদে মানুষদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু বাপ-মায়েদের ছোট সংস্করণ। একটা জিনিস দেখেছি, এরপরেও ও যুগের খোকাখুকুরা শুধু দেহে নয়, মনের দিক দিয়েও অনেক অকালপক্ক।

নারী-পুরুষের এই অভিন্নতা দেখে খুব বেশি অবাক হলাম না। বরং ভাবলাম, এই তো স্বাভাবিক। যে যুগে দৈহিক বলের প্রাধান্য বেশি, সেই যুগেই তো পুরুষের শক্তি, নারীর ল্যবণ্য আর রকমারি পেশার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যে যুগে নিটোল নিরাপত্তা মানুষের জীবন ছেয়ে আছে সেখানে, এ ভেদাভেদ লোপ পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

পাহাড়ের ওপরের দিকে কিন্তু বড় বাড়ি আর একটাও দেখতে পেলাম না। তবে অত উন্নত যুগেও গুমটিঘরের মতো ছাউনির নিচে একটা কুয়ো দেখে একটু অবাক হলাম। যা-ই হোক, আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে খুদে মানুষরা অনেক আগেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছিল। এখন পাহাড়ের চুড়োয় এসে পৌঁছালাম আমি। নাম-না-জানা একরকম হলদে ধাতুর তৈরি একটা আসন দেখলাম সেখানে, লালচে রঙের মরচে আর নরম শেওলায় ছেয়ে গিয়েছিল ওপরটা। হাত দুটো গ্রিফিনের[২] ছাঁচে ঢালাই করা। এই আসনে বসে সূর্যের পড়ন্ত আলোয় দেখলাম প্রাচীন পৃথিবীর বিচিত্র রূপ। সূর্য তখন দিক্‌রেখার নিচে নেমে গেছে, সিঁদুরে আভার সঙ্গে সোনালি ঝিকিমিকিতে রঙিন হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। বহু নিচে পালিশ-করা ইস্পাতের তরোয়ালের মতো রয়েছে টেম্‌স নদী। সবুজ ভূমির মাঝে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে বিপুলাকার প্রাসাদ আর প্রাসাদ—কিছু কিছু ভেঙেচুরে গিয়ে মাটি আশ্রয় করেছে। ধরণির অবারণ বাড়ন্তে ভরা বাগিচার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে সাদা বা রুপোলি মূর্তি, কোথাও বা গম্বুজ আর চার কোণে থামের ছুঁচোলো শীর্ষবিন্দু। বেড়া দিয়ে ঘেরা কোনও স্থান নেই, মালিকানাস্বত্বের কোনও চিহ্ন নেই, কৃষিকাজের কোনও প্রমাণ নেই। সমস্ত ধরণি জুড়ে শুধু একটি বাগান, আর কিছুই নেই।

সেই অপরূপ সন্ধ্যায় এই দৃশ্য দেখে আমার বিজ্ঞানী বিচারবুদ্ধি-বিবেচনা যে সিদ্ধান্তে এল, তা সংক্ষেপে এই—

ক্ষীয়মাণ মানবজাতির মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। চাহিদা থেকে সৃষ্টি শক্তির—সুনিরাপত্তা জন্ম দেয় দুর্বলতার। যে সামাজিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করার প্রচেষ্টায় আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করছি, তার কুফল সেদিন উপলব্ধি করলাম। অযুত বছরের চেষ্টায় মানুষ জয় করেছে দুর্জয় প্রকৃতিকে, সমাজের শত সমস্যাকে। আর তাই অখণ্ড নিরাপত্তার মাঝে থেকে ধীরে ধীরে অনন্ত সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে তাদের শক্তি, মেধা, উদ্যম।

চাষবাস, বাগান তৈরি আর পশুপালন তারা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মানবজাতির প্রয়োজনে যেটুকু শুধু প্রয়োজন, তা ছাড়া বাদবাকি অদৃশ্য হয়ে গেছে ধরণির বুক থেকে। বাতাস দেখলাম মশকশূন্য, ছত্রাক বা আগাছার চিহ্ন কোথাও দেখলাম না। যেদিকে তাকাই শুধু সুন্দর ফুল, মিষ্টি আর ঝলমলে প্রজাপতি। ব্যাধি লোপ পেয়েছে চিরতরে। যে ক'দিন ছিলাম সেখানে, কোনও সংক্রামক রোগের সন্ধান পাইনি আমি। পচন আর ক্ষয় আর উদ্‌ব্যস্ত করে না মানুষকে।

সামাজিক ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ দেখলাম। জমকালো বাড়িতে ঝলমলে পোশাক-পরা ফটফটে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করছে, দৈনিক পরিশ্রমের কোনও বালাই নেই। সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোনও সংগ্রামের চিহ্ন দেখলাম না। ব্যাবসা, বাণিজ্য, দোকানপাট, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কিছুই আর নেই। সে এক সামাজিক স্বর্গ।

প্রকৃতি বিজয় যে সম্পূর্ণ হয়েছে, আমার সে বিশ্বাস মানুষদের দৈহিক খর্বতা, তাদের ধীশক্তির অভাব আর বড় বড় প্রচুর ধ্বংসস্তূপ দেখে বদ্ধমূল হল। সংগ্রামের পরেই আসে প্রশান্তি। শক্তি, উদ্যম, মেধায় বলীয়ান হয়ে উঠেছিল মানবকুল, তাই তাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়োগ করলে জীবনধারণকে সহজ করে তোলার প্রচেষ্টায়। সফল হল তারা, কিন্তু তারপরেই শুরু হল তার প্রতিক্রিয়া।

অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য আর নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা মানেই মানুষের চিরন্তন অশান্ত উদ্যমের পরিসমাপ্তি; অর্থাৎ যা আমাদের কাছে শক্তি, তা-ই এসে দাঁড়ায় দুর্বলতায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহের ভয়াবহতা এদের স্পর্শ করেনি। বুনো জন্তু বা রোগের প্রকোপ যে মানুষের মহাশত্রু, তা-ও তারা জানেনি। দৈহিক পরিশ্রমের কোনও প্রয়োজন হয়নি। যে বিশাল প্রাসাদগুলো দেখলাম, সেগুলো পূর্ববর্তী সংগ্রামশীল মানবজাতি গঠন করে সূচনা করে গেছে অসীম শান্তিভরা শেষ পরিচ্ছেদের। তাই নিরাপত্তার সোনার খাঁচায় মৃত্যু হল উদ্যম শক্তির। এল সূক্ষ্ম শিল্পচর্চা।

কিন্তু তা-ও লোপ পাবে ধীরে ধীরে। খুদে মানুষদের মাঝে সেই চিহ্নই দেখলাম আমি। সূর্যের আলোয় নাচ, গান আর ফুলপ্রীতি ছাড়া নতুন কোনও শিল্পবোধই নেই তাদের মধ্যে। এ-ও একদিন ক্ষীণ হয়ে হারিয়ে যাবে পরিতৃপ্ত নিষ্ক্রিয়তার মাঝে। বেদনা আর চাহিদার জাঁতাকল-নিষ্পেষ থেকেই শিল্পচেতনার প্রকাশ। কাজেই যেখানে নেই ক্লেশ, অভাব, দুঃখ—সেখানে শিল্পের মৃত্যু তো স্বাভাবিক!

জনসংখ্যা বৃদ্ধিও রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়া-সূত্র অনুসারে সংখ্যা আরও কমে আসছে। এত ধ্বংসস্তূপই তার প্রমাণ।

ঘনিয়ে-আসা আঁধারের মাঝে বসে জগতের এই আপাত অবিশ্বাস্য শেষ পরিণতির কথাই চিন্তা করলাম সেদিন।...

৭। শঙ্কা

মানুষের এই চরম বিজয়গৌরবের কথা ভাবছি, এমন সময়ে উত্তর-পূর্বের আকাশ রুপোর ধারায় ধুইয়ে দিয়ে উঠে এল দ্বাদশীর হলদেটে চাঁদ। নিচে খুদে মানুষের চলাফেরা আর দেখতে পেলাম না। মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গেল পেঁচাজাতীয় একটা নিশাচর পাখি। বেশ কনকনে ঠান্ডা অনুভব করলাম। এবার কোথাও ঘুমের আয়োজন করা দরকার। যে বাড়িটা আমি চিনি, সেটার খোঁজে তাকালাম নিচের দিকে। তখনই চাঁদের আলোয় ব্রোঞ্জের বেদির ওপর বসা সাদা স্ফিংক্স মূর্তিটা চোখে পড়ল। সিলভার বার্চটাও নজর এড়াল না। ফ্যাকাশে আলোয় ছায়াকালো রডোডেনড্রনকুঞ্জও দেখতে পেলাম। আর দেখলাম ছোট লনটা। কিন্তু এইটাই কি সেই লন? না, কখনওই নয়।

কিন্তু সত্যিই এইটাই সেই লন। কেননা, স্ফিংক্স-এর কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা মুখটা সেইদিকেই ফেরানো। আর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ যখন আমার রইল না, তখন আমার যে কী মনের অবস্থা হল, তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। কেননা, লনের মধ্যে টাইম মেশিনের কোনও চিহ্নই দেখতে পেলাম না আমি!

যেন চাবুকের ঘায়ে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলাম। টাইম মেশিন নেই, তার মানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে যাওয়ার পথ হল বন্ধ। পরের মুহূর্তে ভয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মতো ছুটে চললাম নিচের দিকে। একবার দারুণ আছাড় খেয়ে গভীরভাবে কেটে গেল মাথার কাছে, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ না করে উঠে দাঁড়িয়েই আবার ছুটলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। গাল আর চিবুকের ওপর দিয়ে রক্তের উষ্ণধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু আমার খেয়াল নেই। প্রতিমুহূর্তে মনকে আশ্বাস দিলাম, ওরা হয়তো মেশিনটাকে চোখের সামনে থেকে ঝোপঝাড়ে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু তবুও ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল আমার। ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে এই বয়সেও দু'মাইল পথ দশ মিনিটের মধ্যে পেরিয়ে এসে পৌঁছালাম লনে। বারকয়েক সজোরে চিৎকার করে ডাকলাম ওদের, কিন্তু কারও সাড়াশব্দ পেলাম না।

লনের আশপাশে টাইম মেশিনের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। এদিকে-সেদিকে পাগলের মতো ছুটতে লাগলাম—কিন্তু বৃথা। জাদুমন্ত্রবলে অত বড় মেশিনটা যেন একেবারে উবে গেছে। এই সময়ে হঠাৎ ওপরে চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। আমার সামনেই ব্রোঞ্জ বেদির ওপর মাথা তুলে বসে ছিল স্ফিংক্স—চাঁদের ধবধবে আলোয় চিকমিক করছিল তার সাদা ফ্যাকাশে মুখ। মনে হল, আমার দুরবস্থা দেখে যেন শ্লেষ-বঙ্কিম হাসি ফুঠেছে তার ঠোঁটের কোণে।

খুদে মানুষরা মেশিনটা লুকিয়ে রেখেছে কোথাও, এই বলে হয়তো মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। কিন্তু তা-ও তো সম্ভব নয়। আমি তো দেখেছি তাদের দৈহিক আর মানসিক শক্তির স্বল্পতা। আর সেই কারণেই আমি আরও ভয় পেলাম। বুঝলাম, মেশিনটাকে সরিয়েছে এমন এক শক্তি, যার সন্দেহ একেবারেই আসেনি আমার মাথায়। অবশ্য একদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। মেশিনটা যে-ই চুরি করুক-না কেন, চালাবার কোনও উপায় তার নেই। কেননা, স্টার্ট দেওয়ার লিভারটা আগে থেকেই রেখে দিয়েছিলাম আমার পকেটে।

কীরকম যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। মনে আছে, স্ফিংক্স-এর আশপাশে চাঁদের ফুটফুটে আলোয় ঝোপের মধ্যে এলোমেলো ছুটোছুটি শুরু করেছিলাম; একবার হরিণজাতীয় একটা সাদা জানোয়ার চমকে গিয়ে ছুট দিলে চোখের আড়ালে। মনে আছে, গভীর রাতে ঝোপেঝাড়ে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালিয়ে কেটেকুটে রক্তাক্ত করে ফেলেছিলাম আঙুলের গাঁটগুলো। তারপর রাগে-ভয়ে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলাম বিরাট পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে। অন্ধকার, নিস্তব্ধ জনশূন্য হলঘরটায় ছুটতে গিয়ে একটা ম্যালেকাইট টেবিলে হোঁচট খাওয়ায় ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গিয়েছিল আমার পায়ের হাড়। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধূলিধূসর পরদাগুলো পেরিয়ে গিয়েছিলাম ওদিকে।

ওপাশে গিয়ে দেখলাম আর-একটা হলঘর। খুব নরম গদি-মোড়া বিছানায় প্রায় বিশজন খুদে মানুষ শুয়ে ছিল। হঠাৎ মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে থেকে বিড়বিড় করে বকতে বকতে জ্বলন্ত কাঠি হাতে আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে, বিশেষ করে আমার শ্রীহীন উশকোখুশকো চেহারা দেখে নিশ্চয় অবাক হয়ে গিয়েছিল ওরা। তা ছাড়া দেশলাই কী জিনিস তা তো ওরা ভুলেই গেছে। দু'হাতে ওদের ঝাঁকানি দিয়ে উঠলাম আমি, 'আমার টাইম মেশিন কোথায়? কোথায় রেখেছ আমার মেশিন?' ওরা আমার এই অদ্ভুত মূর্তি আর আচরণ দেখে যেন বেশ মজা পেল। অনেকে হেসেই উঠল। কেউ কেউ অবশ্য একটু ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে রইল। আমার চারপাশে ওদের ওইভাবে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ ভাবলাম, এ কী বোকার মতো কাজ করছি আমি? দিনের আলোতেই তো দেখেছি, ভয় কী জিনিস তা এরা ভুলে গেছে। আমার এই দুরবস্থায় জোর করে ওদের ভয় পাইয়ে দেওয়া তো চরম বোকামো!

ফস করে কাঠিটা নিবিয়ে দিয়ে একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হাতড়াতে হাতড়াতে আবার বেরিয়ে এলাম চাঁদের আলোয় ধোয়া আকাশের নিচে। শুনতে পেলাম, আতঙ্কে চিৎকার করে ওরা এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে। চাঁদ ক্রমশ উঠতে লাগল ওপরে, কিন্তু এরপর কী যে আমি করেছি তা আর সঠিক মনে নেই।

উন্মাদের মতো কেঁদে চেঁচিয়ে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল ধ্বংসস্তূপ আর সবুজ প্রকৃতির মাঝে কতক্ষণ দাপাদাপি করে বেড়িয়েছি, তা জানি না। তারপর কখন জানি নিরাশায় আর পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে স্ফিংক্স-এর পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছিলাম, ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে ভুলে গিয়েছিলাম আমার সব দুঃখ।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়েছে। এক জোড়া চড়ুই আমার হাতের নাগালের মধ্যেই কিচিরমিচির শব্দে নেচে নেচে খেলা করছে।

ঘুমিয়ে ওঠার ফলে বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছিল শরীর। মনের সে অবসাদও আর ছিল না। প্রথমেই টাইম মেশিনের চিন্তা মনে এল। উঠে বসে ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। ফুটফুটে কয়েকজন খুদে মানুষ ঝরনার মতো মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ছুটোছুটি করছিল। ওদের ডেকে আকারে ইঙ্গিতে অনেকভাবে জিজ্ঞেস করলাম মেশিনটার খবর। কিন্তু হদিশ দেওয়া তো দূরের কথা, কেউ কেউ ফ্যালফ্যাল নিরেট আহাম্মকের মতো তাকিয়ে রইল, আর কেউবা হাসতে হাসতে চলে গেল অন্যদিকে। এক-একবার অদম্য ইচ্ছে হল, দু'হাতে চড়চাপড় মেরে শিক্ষা দিয়ে দিই পুঁচকে উজবুকগুলোকে। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে।

কী আর করা যায় ভাবতে ভাবতে লনের মাটি পরীক্ষা করতে গিয়েই আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। ঘাসজমির ওপর মেশিনটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন দেখলাম। আর দেখলাম, ছোট ছোট একরকম পদচিহ্ন, অনেকটা শ্লথের পায়ের দাগের মতো। দাগগুলো শেষ হয়েছে ব্রোঞ্জের বেদীর সামনে। খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, বেদীটা নিরেট নয় মোটেই, অনেকগুলো পর, ব্রোঞ্জের পাত জুড়ে তা তৈরি। জোড়ের মুখে বিচিত্র কারুকাজ করা। পাতগুলোর ওপরে অবশ্য কোনও চাবীর গর্ত বা হ্যাণ্ডেল দেখতে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হল ওগুলো নিশ্চয় খোলা যায় ভেতর থেকে। আমার টাইম মেশিন যে ওই বেদীর মধ্যেই সেঁধিয়েছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না আমার। কিন্তু কী করে যে ওখানে গেল, সে সমস্যার সমাধান করতে পারলাম না।

কমলা রঙের পোশাক-পরা জনাদুয়েক মানুষ ঝোপের মাঝদিয়ে এগিয়ে আসছিল, হাসিমুখে তাদের ডাকলাম আমি। ওরা আসতে ব্রোঞ্জের বেদীটা ইঙ্গিতে খুলে ফেলতে অনুরোধ করলাম। খুব সাধারণ অনুরোধ, ওরা তা বুঝতেও পারল। কিন্তু তারপরেই তাদের অদ্ভুত আচরণ দেখে বাস্তবিকই হতভম্ব হয়ে গেলাম। যেন নিদারুণ অপমানিত হয়েছে, এমনি ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলে সরে গেল ওরা। কিছুই বুঝলাম না। যাই হোক, আর একজন ফুটফুটে মানুষকে পাকড়ালাম। কিন্তু তার মুখেও সেই ভাবতরঙ্গ দেখে নিজেরই যেন লজ্জা হল। কিন্তু সে পেছন ফিরতেই আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। যেন-তেন-প্রকারেণ ও মেশিন আমার চাই-

ই। তিন লাফে গিয়ে খুদে মানুষটার জামা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলাম বেদীর কাছে। কিন্তু চোখেমুখে তার অপরিসীম আতঙ্কের ছবি দেখে মনটা আবার নরম হয়ে পড়ল—ছেড়ে দিলাম তাকে।

কিন্তু এত সহজে দমে যাবার পাত্র আমি নই। দমাদম শব্দে ব্রোঞ্জের পাতের ওপর ঘুষি মারতে শুরু করলাম। মনে হল, একটা কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনলাম ভেতরে। কে যেন খুক খুক করে হেসে উঠল। আমার ভুলও হতে পারে। নদীর ধার থেকে বড়সড় আকারের একটা পাথর তুলে এনে সমস্ত শক্তি দিয়ে মারতে লাগলাম সামনের পাতটার ওপর, কিছু কিছু অলংকরণ নষ্ট হয়ে পাতটা খানিকটা তুবড়ে গেল, কিছু ব্রোঞ্জের গুঁড়োও ঝরে পড়ল। কিন্তু তবুও অটল অনড় রইল সে দুর্ভেদ্য বেদী। দমদম শব্দ শুনে ফুটফুটে মানুষগুলো দূরে দূরে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, চোখে তাদের অদ্ভুত দৃষ্টি। শেষকালে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বসে পড়লাম আমি।

কিন্তু একনাগাড়ে কাঁহাতক আর বেদীটাকে চোখে চোখে রাখা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজে ডুবে থাকা খুবই সহজ আমার পক্ষে। কিন্তু নিষ্ক্রর্মা হয়ে বসে থাকার মতো কষ্টকর আর কিছু নেই। তাই এক সময়ে উঠে পড়ে এলোমেলোভাবে হাঁটতে শুরু করলাম। মনে মনে বললাম, 'ধৈর্য ধর। মেশিন যে-ই নিক না কেন, বেদীর ওপর দারুণ শব্দ শুনেই সে বুঝেছে, মেশিন নেওয়ায় তুমি খুশী হওনি। কাজেই হয়তো একদিন আপনি ফেরত দিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে জড়ভরৎ হয়ে বসে না থেকে দেখে নাও, প্রবীণ জগতের সবকিছু দু'চোখ ভরে দেখে নাও।'

তাই দেখতে বেরোলাম আমি। বিজ্ঞানী সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবকিছুই তন্ন তন্ন করে দেখলাম আর বিচার করলাম। তারপর একসময়ে ঢুকলাম বড় প্রাসাদটায়। লক্ষ্য করলাম খুদে মানুষগুলো যেন আমাকে এড়িয়ে থাকতে চায়। বোধ হয় ব্রোঞ্জের বেদী তুবড়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখে আমিও বিশেষ মেলামেশা করার চেষ্টা করলাম না। দিন দুয়েকের মধ্যে অবশ্য সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। আমিও ভাষা শেখার চেষ্টায় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ভাষা শেখার পেছনে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তা হল ব্রোঞ্জের বেদীর মধ্যে টাইম মেশিন সেঁধেনোর ব্যাপারটা তাদের মগজে, তাদেরই ভাষার সাহায্যে ঢোকানোর চেষ্টা। মেশিন উদ্ধার আমাকে করতেই হবে। সেজন্যে কোনও কিছুই করতে কসুর করলাম না আমি।

৮। ব্যাখ্যা

যতদূর চোখ যায়, দেখি টেম্‌স উপত্যকার মতোই অকৃপণ প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে ধরিত্রীর বুক। প্রতিটি পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলাম সেই একই দৃশ্য—প্রাসাদের পর প্রাসাদ, বিচিত্র তাদের গঠন কৌশল, জমকালো তাদের আকার। এক একটা

বাড়ি এক এক রকম সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। চারিদিক সবুজে সবুজ, এসেছে চিরবসন্ত, এনেছে শধ কড়ি, ফল আর ফল। এখানে সেখানে রুপোর মতো করুক করছে জলের রেখা। আর দূরে একটু একটু করে উঁচু হয়ে গিয়ে নীল পাহাড়ের তরঙ্গে মিশেছে সবুজ জমি, তারপর মিলিয়ে গেছে নিমল নীলাকাশের বুকে। কতকগুলো অদ্ভুত জিনিস কিন্তু চোখে পড়ার মতো। গোলাকার কূয়োর মতো কতকগুলো গভীর গর্ত—বিস্তর ছড়িয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। পাহাড়ে ওঠার সময়ে একটা দেখেছিলাম পথের ধারে। সবগুলোই ব্রোঞ্জে বাঁধানো, বিচিত্র কারুকাজ করা। বৃষ্টির জলরোধের জন্যে, ওপরে গুমটির মতো গোলগম্বুজ। এই সব কুয়োয় পাশে বসে নীচের কুচ্‌কুচে অন্ধকারের মধ্যে তাকালে জলের রেখা মোটেই দেখা যায় না, দেশলাইয়ের আলোর প্রতিফলন ফিরে আসে না ওপরে। প্রত্যেকটির মধ্যে শুনেছি বিশেষ একটি শব্দ ধুম্‌ ধুম্‌ ধুম্‌। বিরাট ইঞ্জিন অবিরাম ঘরে চললে এ জাতীয় শব্দ শোনা যায়। দেশলাইয়ের শিখার কাঁপন থেকে যা আবিষ্কার করলাম, তা আরও আশ্চর্য। দেখলাম, বাতাসের স্রোত বিরামবিহীনভাবে নেমে যাচ্ছে কুয়োগুলির মধ্যে। কাগজের ছোট্ট একটা কুচি ছেড়ে দিলাম কুয়োর মুখে। ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে নিচের দিকে না নেমে বাতাসের টানে সাঁৎ করে দৃষ্টির আড়ালে নেমে গেল কুচিটা।

এরপর ঢালু জমির এখানে-সেখানে দাঁড়ানো ছুঁচোলো থামগুলোর সঙ্গে কুয়োগুলোর একটা সম্পর্ক বার করে ফেললাম। দারুণ গরমের দিনে রোদে জ্বলা বালুকা বেলার ওপর যেমন বাতাসের অস্থির কাঁপন দেখা যায়, ঠিক তেমনি থিরথিরে কাঁপন দেখেছিলাম প্রতিটি থামের শীর্ষবিন্দুতে। এ সব থেকেই মাটির তলায় বাতাস চলাচলের একটা বিরাট পরিকল্পনা আঁচ করেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা যে কিছুটা ভুল, তা
বুঝলাম পরে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, ভবিষ্যতে যে লোকালয়ে আমি পৌঁছেছিলাম সেখানকার যানবাহনদি বা পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব বেশি আমি জানতে পারিনি। জানাও সম্ভব নয়। আগামী কাল আর ইউটোপিয়া[৩] সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আপনারা পড়েছেন। লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধান এক লাফে টপকে এমন এক সোনার যুগে গিয়ে পড়লাম, যেখানকার অভিনবত্ব আমাকে হকচকিয়ে তুলল। কাজেই স্বয়ংচালিত ব্যবস্থার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া সে যুগ সম্বন্ধে আর কিছু আপনাদের শোনাতে পারব বলে মনে হয় না আমার।

যেমন ধরুন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি আমি। শ্মশান বা সমাধিস্তম্ভ-জাতীয় কিছু চোখে পড়েনি। ভেবেছিলাম, দূরে কোথাও শ্মশান বা

গোরস্থান নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে ভাবনা ভাবতে গিয়ে আর একটা আশ্চর্য জিনিষ লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। খুদে মানুষদের মধ্যে বয়স্ক বা অক্ষম একজনও ছিল না। সব মানুষের বয়সই প্রায় সমান, সমান তাদের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য।

স্বয়ংচালিত সভ্যতা আর ক্ষয়িষ্ণু মানবজাতি সম্বন্ধে আমার থিয়োরী যে বেশিদিন টেঁকেনি, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এ ছাড়া কী আর ভাবা যায় বলুন? যতগুলো বিরাট প্রাসাদে আমি গেছি, সবগুলোতেই শুধু খাবার আর শোবার জায়গা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। কোনওরকম যন্ত্রপাতির চিহ্নও চোখে পড়েনি। কিন্তু খুদে মানুষদের ঝলমলে পোশাকগুলোও তো মাঝে মাঝে পালটানো দরকার। ওদের অদ্ভুত ডিজাইনের স্যাণ্ডেলগুলো এক রকম ধাতুর তৈরি, সেগুলোই বা আসে কোত্থেকে? অথচ সৃষ্টির স্পৃহা যে ওদের মধ্যে নেই, তা মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায়। দোকান নেই, আমদানীরও চিহ্ন নেই। সারাদিন শুধু মহাখুশীতে খেলাধুলো করে, নদীতে স্নান করে, ফল খেয়ে, ফুল ছুঁড়ে, রাত্রে দল বেঁধে ঘুমোনোই তাদের কাজ। কিন্তু কীভাবে যে সব চলছে, তা বুঝিনি।

আট লক্ষ দু'হাজার সাতশো এক সালের জগতে পৌঁছানোর পর তৃতীয় দিন কিন্তু আমি একজন সাথী পেলাম। অল্প জলে কয়েকজন খুদে মানুষ স্নান করছিল। বসে বসে দেখছিলাম আমি। হঠাৎ ওদের একজন স্রোতের টানে ভেসে গেল একটু দূরে। টান অবশ্য বেশি ছিল না, কিন্তু তবুও কেউ সাহস করলে না বেচারাকে বাঁচাবার। এ থেকেই বুঝে নিন কি রকম দুর্বল তারা। চোখের সামনে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে একজন ডুবে যাচ্ছে দেখে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। অল্প চেষ্টাতেই তাকে তুলে আনলাম তীরে। ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে। হাত-পা একটু ঘষতেই চাঙা হয়ে উঠল সে। এর পর থেকেই কিন্তু আমার সঙ্গিনী হয়ে উঠল মেয়েটি। সব সময়ে ছায়ার মতো লেগে থাকত আমার পাছু পাছু। আমিও একজন সাথী পেয়ে খুশী হলাম। একটু চেষ্টা করে নামটাও শুনলাম—উইনা। আমার এই ছোট্ট সাথীটির সঙ্গ কিন্তু দিন সাতেকের বেশি পাইনি—সেকথা পরে বলছি!

চিত্র ১.৫ চোখের সামনে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে একজন ডুবে যাচ্ছে দেখে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। অল্প চেষ্টাতেই তাকে তুলে আনলাম তীরে।

উইনার কাছ থেকেই আমি প্রথম জানলাম যে, ভয় এখনও এ জগৎ ছেড়ে যায়নি। দিনের আলোয় দিব্বি হেসে-খেলে বেড়াত সে, কিন্তু আলো ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে উইনার সাহস-ও ফুরোত। দেখেছি অন্ধকারকে, ছায়াকে আর যত কিছু কালো বস্তুকে ভয় করত সে। শুধু সে-ই নয়। রাত হলেই খুদে মানুষরা বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দল বেঁধে ঘুমোতে। আলো না নিয়ে তখন তাদের মাঝে যাওয়া মানে নিদারুণ ভয় পাইয়ে দেওয়া। আমি তো অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর কাউকেই ঘরের বাইরে একলা ঘুরতে বা ঘরের ভেতরে একলা ঘুমোতে দেখিনি।

সেদিন ভোরের দিকে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন ডুবে যাচ্ছি আমি আর সমুদ্রের কুৎসিত প্রাণীগুলো তাদের থলথলে ভিজে শুঁড় বোলাচ্ছে আমার মুখে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, আর কেন জানি মনে

হল ধূসর রঙের কোনও জানোয়ার এইমাত্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। অদ্ভুত শিরশিরে সে অনুভূতি, বোঝানো যায় না কিছুতেই। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম যে, ঘুমোনো আর সম্ভব হল না। আলোছায়ার মায়াময় পরিবেশে রহস্যময় হয়ে উঠেছিল চারিদিক—অন্ধকারের বুক চিরে আলোর নিশানা দেখা দিলেও তখনও সবকিছু যেন বর্ণহীন অপ্রাকৃত কুহেলী-ভরা। উঠে পড়লাম। বিরাট হলটা পেরিয়ে প্রাসাদের বাইরের উঠোনে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে হল ব্রাহ্মমুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের সূর্যোদয় দেখব।

চাঁদ তখন অস্তের পথে। চাঁদের মরা আলো আর ভোরের স্বচ্ছ কিরণ মিশে গিয়ে ফ্যাকাশে আধো আলোর সৃষ্টি হয়েছিল। ঝোপঝাড়গুলো তখন কালির মতো কালো, জমি ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা, আকাশ বিরং, বিষন্ন। ঠিক এমনি মুহূর্তে মনে হল যেন দূরে পাহাড়ের ওপর ভৌতিক মূর্তি দেখতে পেলাম আমি। ঢালু জমির ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে বেশ কয়েকবার চোখে পড়ল অস্পষ্ট কতকগুলো চেহারা। বার দুয়েক মনে হল বাঁদরের মতো একটা সাদা জন্তু পাহাড়ের ওপর বেগে দৌড়ে গেল। আর একবার মনে হল তাদেরই কয়েকজন কালো মতো একটা দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপের দিকে। খুব দ্রুত নড়াচড়া করছিল ওরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোথায় গেল, তা আর দেখতে পেলাম না—যেন ঝোপঝাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেল সবাই। তখনও চারিদিক অস্পষ্ট। ঠান্ডায় হোক বা যে কারণেই হোক, গা-টা বেশ শিরশির করে উঠল। দুই চোখ মুছে ভালো করে তাকালাম আমি।

পূর্বদিক ফরশা হয়ে উঠল আস্তে আস্তে। চারিদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম পাহাড়ের দিকে। সাদা মূর্তির কোনও চিহ্নই দেখলাম না। অন্ধকারের প্রাণী ওরা, তাই যেন আধো আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেল অপছায়ার মতো। আমার কিন্তু মনে হল টাইম-মেশিন খুঁজতে গিয়ে যে সাদা রঙের জানোয়ারটাকে আমি চমকে দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে এদের নিশ্চয় কোনও সম্পর্ক আছে।

স্বর্ণযুগের আবহাওয়া যে এ যুগের চাইতে কত বেশি গরম তা আমি আগেই বলেছি। এর কারণ ঠিক করে বলা কঠিন। সূর্য আরও বেশি গরম হওয়ার জন্যেও হতে পারে অথবা সূর্যের আরও কাছে পৃথিবীর সরে যাওয়ার ফলেও হতে পারে। কিন্তু কনিষ্ঠ ডারউইনের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল নয়, তারা ভুলে যায় যে সূর্য থেকে যেসব গ্রহের জন্ম, তাদের প্রত্যেকেই একে একে আবার ফিরে যাবে সূর্যে। আর যতবার ঘটবে এ ঘটনা, ততবারই নতুন তেজে দপ্ করে জ্বলে উঠবে সূর্য। হয়তো কাছাকাছি থাকা কোনও গ্রহ এই ভাবেই আশ্রয় নিয়েছে সূর্যের আগুন-

জঠরে। কারণ যাই হোক না কেন, সূর্যের কিরণ যে এখনকার চাইতে অনেক বেশি জ্বালা ধরানো, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

সেদিন বোধহয় চতুর্থ দিন। সকালবেলা চারদিক বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বড় বাড়িটির কাছে বিশাল ভগ্নস্তূপটার আনাচে-কানাচে গরম আর রোদ্দুরের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম। এই স্তূপটাতেই তখন আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতাম। এমন সময়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। ভাঙা চোরা ইমারতের একটা স্তূপে ওঠার পর সঙ্কীর্ণ একটা গ্যালারি দেখতে পেলাম, পাশের জানলাগুলো ধ্বসে পড়া পাথরের চাঁইয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। বাইয়ের চোখ ধাঁধানো আলো থেকে হঠাৎ ভেতরে তাকিয়ে নিকষ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। হাতড়াতে হাতড়াতে ঢুকলাম ভেতরে, চোখের সামনে তখনও লাল আঁকাবাঁকা রেখা ছাড়া আর কিছু দেখছি না। আচম্বিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। অন্ধকারের ভেতরে থেকে এক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে—বাইরের দিনের আলোর প্রতিফলনে জ্বলজ্বল করছে সে চোখ।

আমি বর্তমান যুগের মানুষ, তাই প্রথমেই বুনো জানোয়ারের সম্ভাবনা মনে এল। শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম সামনের জ্বলন্ত গোলাকার চোখ দুটোর দিকে। পিছু ফেরার মতো সাহসও ছিল না আমার। কিন্তু তারপরেই ভাবলাম, এখানকার মানুষ তো বেশ নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা মধ্যে বাস করে—তবে...! হঠাৎ মনে পড়ল অন্ধকারকে কী রকম যমের মতো ভয় করে এরা। সাহস একটু ফিরে এসেছিল, তাই সামনের দিকে এক পা এগিয়ে কথা বললাম আমি। ভয়ের চোটে গলার স্বর অবশ্য রীতিমতো কর্কশ আর বেসুরো শোনাল। সামনে হাত বাড়াতে একটা নরম জিনিসের ছোঁয়া পেলাম। তৎক্ষণাৎ চোখ দুটো সরে গেল পাশের দিকে, আর সাঁৎ করে সাদা মতো একটা কিছু পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পেছন দিকে! বলতে লজ্জা নেই, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎযন্ত্রটা ধড়াস করে একটা ডিগবাজী খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে—চট্ করে পেছন ফিরে দেখলাম আমার পেছনে রোদ-ঝলমলে পথের ওপর দিয়ে মাথা নিচু করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার মর্কটের মতো একটা জানোয়ার। গ্র্যানাইটের একটা চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে একদিকে ছিটকে পড়ল জানোয়ারটা, পরমুহূর্তেই উঠে পড়ে মিলিয়ে গেল পাশের ভাঙা পাথরের স্তূপের অন্ধকারে।

জানোয়ারটাকে অবশ্য খুব খুঁটিয়ে দেখার সময় পাইনি, কিন্তু যতদূর দেখেছি গায়ের রং তার ম্যাড়মেড়ে সাদা, ধূসর-লালাভ বড় বড় অদ্ভুত আকারের দুটো চোখ, আর মাথায়-পিঠে শণের মতো চুলের রাশি। এত দ্রুতবেগে অন্ধকারের মাঝে সে সেঁধিয়ে গেল যে এর বেশি কিছু দেখার সুযোগ পেলাম না। আদতে সে চার হাত-

পায়ে ভর দিয়ে দৌড়োচ্ছিল, কি সামনে দু'হাতে ভর দিয়ে নিচু হয়েছিল, তা-ও দেখিনি। মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভাঙা স্তূপটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমি। প্রথমে কিছুই দেখলাম না। বেশ কিছুক্ষণ হাতড়াবার পর দেখি হুবহু সেই রকম কুয়োর মতো একটা গর্ত, আড়াআড়িভাবে ওপরটা ঢেকে রেখেছে একটা ভাঙা থাম। চকিতে ভাবলাম বিদঘুটে জানোয়ারটা কি তাহলে এর মধ্যেই লুকিয়েছে? ফস করে জ্বাললাম একটা কাঠি—নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার ওপর বড় বড় জ্বলন্ত চোখের অপলক দৃষ্টি রেখে দ্রুতবেগে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে ছোটখাট সাদা একটা প্রাণী। ঠিক যেন একটা মানুষ মাকড়শা! কি বেয়ে জন্তুটা অত তাড়াতাড়ি নামছে দেখতে গিয়ে সেই প্রথম দেখলাম ধাতুর তৈরি হাত-পা রাখার একসারি খোঁটা মইয়ের মতো সিধে নেমে গেছে নিচে। তারপরেই কাঠিটা আঙুল পর্যন্ত পুড়ে নিবে গেল, তাড়াতাড়ি জ্বালালাম আর একটি কাঠি। কিন্তু খুদে দানোটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে নিচের অন্ধকারে।

কুয়োর অন্ধকারে তাকিয়ে কতক্ষণ যে সেখানে বসেছিলাম জানি না; যাকে এইমাত্র দেখলাম, সে যে একজাতীয় মানুষ, এ ধারণায় কিছুতেই আমার মন সায় দিতে চাইল না। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর সত্যের মুখ দেখলাম। বুঝলাম, মানুষ আর একটিমাত্র প্রজাতি (species) নয়—দু' শ্রেণীর প্রাণীতে ভাগ হয়ে গেছে তারা। ঊর্ধ্ব জগতের ফুটফুটে মানুষরাই আমাদের একমাত্র বংশধর নয়; চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মতো এই যে ম্যাটমেটে সাদা কুৎসিত নিশাচর জানোয়ারটা পালিয়ে গেল এরাও আমাদের রক্ত বহন করছে তাদের শিরায়।

গোলগম্বুজের গায়ে চারকোণা থামের ওপর বাতাসের থির থির কাঁপন, কুয়ো আর সুষ্ঠু বাতাস চলাচলের পদ্ধতির চিন্তা মনে এল আমার। এই বিরাট আয়োজনের উদ্ভব কোথায়, তা যেন একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠতে লাগল আমার মনে। সামঞ্জস্যময় এই অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে লিমারগুলোর[4] কী সম্পর্ক তারও কিছুটা আঁচ পেলাম, কিন্তু বুঝলাম না, কুয়োর নিচে কী লুকানো

আছে। বুঝলাম না, কেন অহরহ যন্ত্রপাতি চলার শব্দ ভেসে আসে ওপরে। ভাবছি একবার নিচে নেমে নিজের চোখে দেখে আসতে হবে সেখানকার রহস্য, এমন সময়ে দুজন খুদে মানুষকে দেখলাম বাইরের আলোয়। ওরা কিন্তু কুয়োর পাড়ে ওই ভাবে আমাকে বসে থাকতে দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। ওদের ডেকে এনে কুয়োর নিচে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু উত্তর দেওয়া দূরে থাক, কী রকম ভয় ভয় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দুজনেই ছুট লাগালে অন্য দিকে। বাধ্য হয়ে উঠতে হল আমাকে। ঠিক করলাম উইনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কুয়োর রহস্য।

হাঁটতে হাঁটতে এই সব কথাই ভাবছিলাম। এদের অর্থনৈতিক সমস্যার যে প্রশ্নটি আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল, তার সমাধানও পেলাম তখন।

মানুষের এই প্রজাতি যে পাতালবাসী সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। তিনটি বিশেষ অবস্থা দেখে বুঝলাম কদাচিৎ জমির ওপর আসার কারণ ওদের বহুকাল ধরে মাটির নিচে বসবাসের অভ্যাস। প্রথমেই দেখুন না কেন, যে সব জন্তু বেশিরভাগ সময় অন্ধকারে থাকে, তাদের গায়ের রং ফ্যাকাশে সাদা। কেন্‌টাকি গুহার সাদা মাছের কথা তো জানেনই। তারপর ওদের বড় বড় চোখে আলোর প্রতিফলন যা শুধু নিশাচর প্রাণীদের চোখেই দেখা যায়। উদাহরণ—পেঁচা আর বেড়াল। সব শেষে দেখুন, সূর্যের আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া অবস্থাটা। আলো থাকা সত্ত্বেও মাথা নিচু করে ছুটে গিয়ে পাথরে ধাক্কা লাগা আর তার পরেই অন্ধকারের মাঝে আশ্রয় নেওয়ার প্রচেষ্টা—এ সব দেখলে শুধু একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়, তা হল ওদের রেটিনা অর্থাৎ চোখের পর্দা যেমন পাতলা, তেমনি দারুণ অনুভূতিশীল।

আমার পায়ের নিচে পৃথিবীর বুক অসংখ্য সুড়ঙ্গে ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে। নতুন জাতির নিবাস এই সুড়ঙ্গেই। বাতাস চলাচলের জন্য কুয়ো আর থামের আধিক্য থেকেই অনুমান করা যায় কী সুদূরব্যাপী তাদের বসতি। আর তাই যদি হয়, তাহলে দিনের আলোয় মাটির ওপর যে জাতি বাস করছে, সুখ-সুবিধা চাহিদার জন্যে নিচের জগতের বাসিন্দারা যে তৎপর নয় তাই বা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে? এই যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা থেকে মানব জাতির দু'ভাগ হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে যে থিয়োরী খাড়া ধরলাম, তা শুনুন।

আমাদের বর্তমান যুগের সমস্যা থেকেই এগনো যাক। মালিক এবং শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া সামাজিক ব্যবধানই রয়েছে সবকিছুর মূলে। ভাবছেন বুঝি আমার মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু আজকের যুগেই কি সে যুগের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না? লন্ডনে মাটির তলায় মেট্রোপলিটন রেলওয়ে, ইলেকট্রিক রেলওয়ে, সাবওয়ে, মাটির তলায় কারখানা, রেস্তোঁরা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় একদিন পৌঁচেছে, যেদিন মাটির ওপর সব অধিকার হারিয়ে মাটির নিচে আশ্রয় নিয়েছে সমস্ত শিল্প। বছরের পর বছর ফ্যাক্টরীর সংখ্যা বেড়ে গেছে মাটির নিচে, শ্রমিকরা দিনরাতের বেশিরভাগ সময় কাটাতে বাধ্য হয়েছে পাতালের অন্ধকারে। শেষে একদিন...! এমন কি আজও ইস্ট এণ্ডের শ্রমিকরা ইচ্ছেমতো পৃথিবীর ওপর আসার সুযোগ পায় কি?

গরীবদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা সবযুগের ধনীদের মধ্যেই আছে। অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—এই সবকিছুই ধনীদের ঠেলে দিয়েছে পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আলো-হাওয়ার মধ্যে। আর তারাই গরীবদের বাধ্য করেছে মাটির নিচে

থেকে কলকব্জা চালাতে। হাজার হাজার বছর ওই অবস্থায় থাকতে থাকতে অন্ধকারেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা। যেমন অভ্যস্ত হয়েছে ঊর্ধ্বজগতের মালিকরা আলো-হাওয়ার মধ্যে।

প্রতিভার চরম শিখরে উঠে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করতে পেরেছিল মানবজাতি। শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, প্রতিভার সে সোনার যুগ কিন্তু একদিন ফুরলো। অত্যন্ত সুষ্ঠু নিরাপত্তার মধ্যে দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত অলস জীবনযাপন করার ফলে ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের ধীশক্তি, দৈহিক শক্তির সঙ্গে দেহের আকারও কমে আসতে লাগল আস্তে আস্তে। কিন্তু মর্লকরা (পাতালবাসীদের ওই নামেই ডাকত সবাই) মানুষদের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু তখনও বজায় রেখে দিলে নিজেদের মধ্যে।

কিন্তু একটা প্রশ্নের সদুত্তর পেলাম না কিছুতেই। টাইম মেশিন কি মর্লকরা নিয়েছে? তাই যদি নেয়, আর ইলয়রা (ফুটফুটে মানুষদের নাম যে ইলয়, তা উইনার কাছে জেনেছিলাম পরে) যদি ওদের প্রভু হয়, তবে মেশিনটা কেন ওরা ফিরিয়ে আনছে না মর্লকদের কাছ থেকে? অন্ধকারকেই বা এত ভয় করে কেন ওরা? এ প্রশ্নের উত্তর তখন না পেলেও পরে পেয়েছিলাম।

৯। মর্লক

দু'দিন পর আমার নতুন-পাওয়া সূত্র ধরে কাজ শুরু করলাম। স্যাঁতসেঁতে জীবগুলো দেখলেই কেমন জানি গা শির শির করে উঠত আমার। মিউজিয়ামের স্পিরিটে-ডোবানো ম্যাটমেটে সাদা রঙের পোকামাকড়ের মতো দেখতে ওগুলোকে। ছুঁলেও গা ঘিন ঘিন করে। আমার এই গা ঘিন্‌ঘিনে ভাবটা খুব সম্ভব ইলয়দের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। ফুটফুটে জাতটার ওপর আমার বেশ সহানুভূতি এসে গিয়েছিল। তা ছাড়া ওরা যে মর্লকদের মোটেই পছন্দ করে না, তা একটু একটু করে পরে বুঝেছিলাম।

পরের রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। শরীরটাও ভালো যাচ্ছিল না। উদ্বেগ আর সংশয়ে বেশ দমে গিয়েছিলাম। বেজায় ভয় পেয়ে বার দুয়েক শিউরে উঠলাম, কী কারণে তা অবশ্য বুঝিনি। রাত হয়ে যেতে নিঃশব্দে হলঘরে এসে ঢুকলাম আমি। খুদে মানুষরা দল বেঁধে ঘুমাচ্ছিল টুকরো টুকরো চাঁদের আলোয় গা এলিয়ে দিয়ে। বুঝলাম, আর দিনকয়েকের মধ্যে অমাবস্যার পথে আরও গড়িয়ে যাবে চাঁদ, আঁধারও একটু একটু করে বাড়তে থাকবে। আর নিচের জগতের কৃমিকীটের মতো জঘন্য সাদা লিমারগুলো পালে পালে উঠে আসবে ওপরে। টাইম মেশিন উদ্ধার করতে হলে যে আগে নিচুতলার রহস্য সমাধান করা দরকার, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। কিন্তু একলা এগবার মতো দুঃসাহস আমার ছিল না।

একজন সঙ্গীও যদি পেতাম, কাউকে ডরাতাম না। কুয়োর অন্ধকারে তাকালেই গা ছমছম করে উঠত আমার।

মনের এই অশান্তির হাত থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পাওয়ার জন্যে এদিকে-সেদিকে অভিযান শুরু করলাম আমি। সেদিন দক্ষিণ-পশ্চিমে এখনকার কম্বেউডের দিকে গিয়েছিলাম। দেখলাম, অনেক দূরে ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যানস্টিডের দিকে সবুজ রঙের বিরাট একটা ইমারত—এ জাতীয় ইমারত এর আগে আর কোথাও দেখিনি আমি। ও যুগে যত ভেঙে-পড়া প্রাসাদ দেখেছিলাম, সেসবের চাইতে অনেক বড় সে ইমারত। গঠনভঙ্গি অনেকটা প্রাচ্য রীতির অনুকরণে। সামনের দিকটা ফিকে সবুজ কি নীলাভ সবুজ রঙের জ্বলজ্বলে চীনে পোর্সেলিনের মতো জিনিস দিয়ে তৈরি। তখুনি ইমারতটার দিকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সন্ধে হয়ে আসছিল, কাজেই পরের দিনের জন্যে মুলতুবি রাখলাম অ্যাডভেঞ্চারটা। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে ভাবলাম সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদে যাওয়ার ইচ্ছেটা আসলে মনকে ছলনা করা। কুয়োর ভেতরে নামার দুঃসাহস আমার নেই, তাই ও পথ না মাড়িয়ে যেতে চাই অন্য কোথাও। ঠিক করলাম, আর দেরি নয়, কুয়োতে এবার নামবই। তখুনি বেরিয়ে পড়লাম ভাঙা স্তূপের কুয়োটার দিকে।

ছোট্ট উইনা ছুটতে ছুটতে এল আমার সঙ্গে। কুয়োর ধারে মহাখুশিতে নাচ জুড়ে দিল সে। কিন্তু যেই দেখলে কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে রয়েছি আমি, অমনি ওর মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর যখন ভেতরের পা রাখার হুকগুলোর ওপর পা দিলাম, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল ও। বাধা পেতে আরও গোঁ চেপে গেল আমার। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নেমে চললাম নিচের দিকে, আর আতঙ্কে নীল মুখ নিয়ে ওপরে ঝুঁকে রইল উইনা।

প্রায় দু'শো গজ নিচে থামতে হয়েছিল আমাকে। কুয়োর দেওয়ালে গাঁথা ধাতুর শিকগুলো আমার চাইতে হালকা প্রাণীর উপযুক্ত, তাই সাবধানে নামতে নামতে হাতে-পায়ে খিল ধরার উপক্রম হল। তারপরেই হঠাৎ একটা হুক উপড়ে এল হাতে, পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে এক হাতে ঝুলতে লাগলাম শূন্যে। সে যাত্রা কোনওরকমে বেঁচে গিয়ে আরও সাবধানে নামতে লাগলাম আমি। ওপরে তাকিয়ে দেখি, বহু উঁচুতে গোলাকার নীল আকাশের পটে উইনার ছোট্ট মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে। মেশিনের ধুম ধুম শব্দ আরও তীব্র হয়ে উঠল। আবার যখন ওপরে তাকালাম, উইনাকে আর দেখলাম না।

আরও কিছুক্ষণ নামার পর ডানদিকে ফুটখানেকের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে সরু একটা ফাঁক দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি সংকীর্ণ একটা সুড়ঙ্গের মুখ সেটা—হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া যায়। শিরদাঁড়া আর হাত

দুটো তখন খসে পড়ার উপক্রম। ভয়ে-উত্তেজনায় ঘেমেও উঠেছিলাম বেশ। আশপাশের মিশমিশে কাজল অন্ধকারের মাঝে শুধু শুনলাম যন্ত্রপাতির ঘটাং ঘটাং শব্দ। আর অনুভব করলাম, পাম্পের টানে অবিরাম বাতাসের স্রোত বয়ে আসছে ওপর থেকে নিচে।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মুখের ওপর একট নরম হাত এসে পড়ায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। ঝটিতি দেশলাই বার করে ফস করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে ফেললাম। আর দেখলাম, আলোর সামনে তিনটে প্রাণী অন্ধের মতো পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে—যে প্রাণী ওপরে স্তূপের মধ্যে দেখেছিলাম, হুবহু তার মতোই দেখতে এদের। গভীর জলের মাছের চোখের তারা যেমন বিরাট আর খুব অনুভূতি-সচেতন হয়, আলো পড়লে ঠিকরে যায়—বহুদিন মাটির নিচে বাস করার ফলে এদের চোখও তেমনি অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠেছে। আলো ছাড়া আমাকে ওরা ভয় করে বলে মনেই হল না। আলো জ্বালামাত্র চটপট তিনজন সেঁধিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে, সুড়ঙ্গ আর গলিঘুঁজির ভেতর থেকে অদ্ভুতভাবে শুধু দপদপ করে জ্বলতে লাগল চোখগুলো।

ওদের ডাকলাম আমি। কিন্তু ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের ভাষা আর এদের ভাষা তো এক নয়। কাজেই সে চেষ্টা আর না করে সুড়ঙ্গের মধ্যেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। যন্ত্রপাতির শব্দ আরও জোর হয়ে উঠল। একটু পরেই সুড়ঙ্গের দু'পাশের দেওয়ালের আর নাগাল পেলাম না। আর-একটা কাঠি জ্বালাতেই দেখি, বিশাল খিলান-দেওয়া মস্ত এক গহ্বরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। আলোর সংকীর্ণ পরিধির ওপাশে নিঃসীম অন্ধকারের মাঝে কত দূর পর্যন্ত যে গহ্বরটা গেছে, তা আর দেখতে পেলাম না।
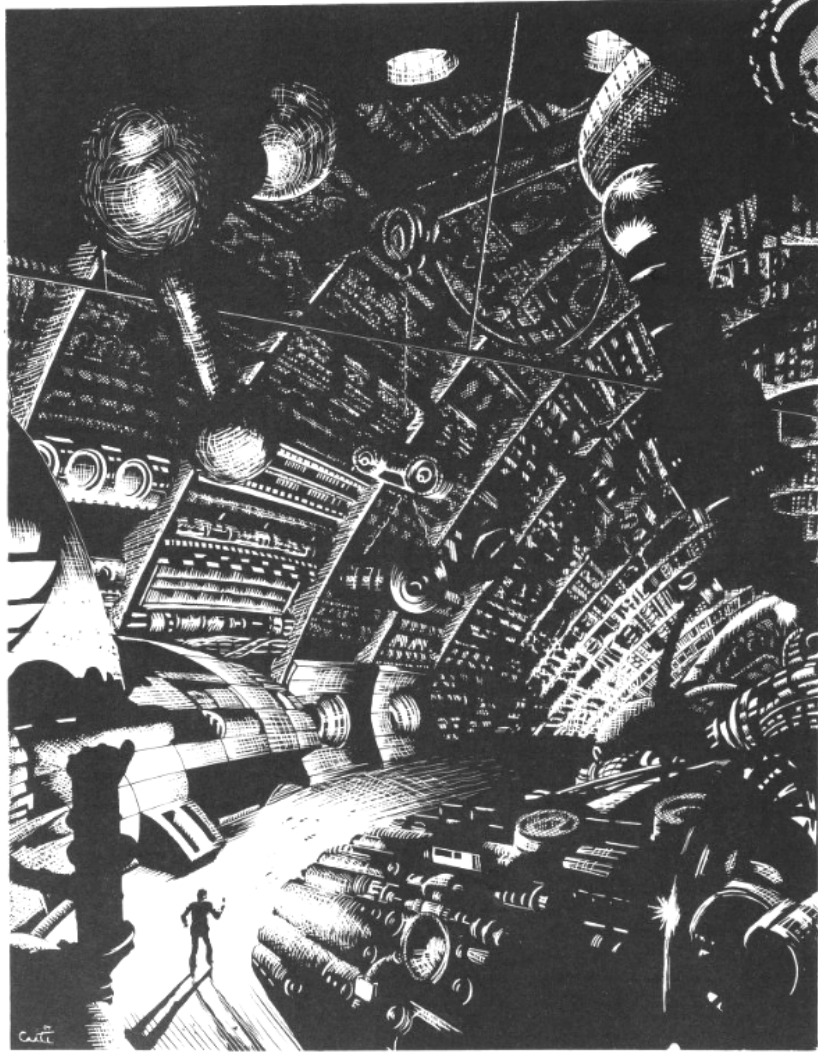
চিত্র ১.৬ মিশমিশে কাজল অন্ধকারের মাঝে শুধু শুনলাম যন্ত্রপাতির ঘটাং ঘটাং শব্দ।

কী যে দেখেছিলাম, ভালো মনে নেই। আলো-আঁধারির মাঝে বিপুলাকার মেশিনগুলোর দানবের মতো কিম্ভূতকিমাকার কালো ছায়া, আর সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিয়ে মর্লকদের অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়া আর জ্বলন্ত চোখ। গুমট বাতাসে যেন দম আটকে আসছিল আমার। তাজা রক্তের অদ্ভুত গন্ধে গা গুলিয়ে উঠতে একটু দূরে চোখ পড়ল। দেখলাম, সাদা ধাতুর তৈরি একটা টেবিলের ওপর মাংসের একটা স্তূপ। মর্লকরা তাহলে মাংসাশী। কিন্তু লাল হাড়টা যে কোন প্রাণীর তা ভেবে পেলাম না। অদ্ভুত গন্ধ, বড় বড় অর্থহীন ছায়া, ছায়ার মধ্যে ওত পেতে থাকা কুৎসিত প্রেতচ্ছায়া—এই সবকিছুর একটা ভাসা ভাসা স্মৃতি ছাড়া আর কিছু মনে নেই আমার। তারপরেই কাঠিটা শেষ অবধি পুড়ে আঙুল স্পর্শ করল। চকিতে রাশি রাশি অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

কোনওরকম হাতিয়ার না নিয়ে টাইম মেশিনে চড়াটা যে আহাম্মুকি হয়েছে, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম সেদিন। ওই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠলাম—অস্ত্রের মধ্যে শুধু আমার চার হাত-পা, দাঁত আর পকেটের শেষ সম্বল চারটি দেশলাইয়ের কাঠি।

দেশলাইয়ের কাঠি যে মাত্র চারটিতে এসে ঠেকেছে, তা শেষবার কাঠি জ্বালতে গিয়েই দেখেছিলাম। ইলয়দের নিয়ে মজা করার জন্যে দেদার কাঠি জ্বালাতাম আমি—তখন বুঝিনি, ওই সামান্য কাঠিই এত কাজে লাগতে পারে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আর কাঠি অপচয় করা উচিত হবে কি না, এমন সময়ে একটা হাত এসে পড়ল আমার হাতে, তারপরেই সরু আঙুলের ছোঁয়া লাগল আমার মুখে, আর কীরকম বোটকা একটা গন্ধ ভেসে এল নাকে। চারপাশে ভয়াবহ জীবগুলোর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনলাম, বহুজনে ঘিরে ধরেছে আমাকে। অনুভব করলাম, খুব সন্তর্পণে দেশলাইয়ের বাক্সটা আমার হাত থেকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকজন, আর কয়েকটা হাত টানাটানি করছে আমার পোশাক। সারা দেহে এদের ছোঁয়া অনুভব করে আমি এত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম যে বলার নয়। আচম্বিতে ভাবলাম, এরা কেন এভাবে পরীক্ষা করছে আমায়? কী চায় ওরা? কী ওদের মতলব? ভয়ে শিউরে উঠলাম। হঠাৎ বিকট হুংকার দিয়ে উঠলাম। চমকে পিছিয়ে গেল ওরা, তারপরেই শুনলাম, আবার এগিয়ে আসছে। এবার আরও জোরে চেপে ধরল আমায়, আর অদ্ভুত ফিসফিস স্বরে কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল আমার। আবার বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম। এবার কিন্তু ওরা আর ভয় পেল না, বরং রক্ত হিম করা হাসির শব্দ ভেসে এল আমার কানে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। কোনওরকমে একটা কাঠি বার করে জ্বালালাম। তারপর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দেশলাইয়ের শিখায় তা জ্বালিয়ে নিয়ে পিছু হটে যেতে লাগলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু একটু যেতে-না-যেতেই নিবে গেল আগুন, অন্ধকারের মধ্যে শুনলাম, খসখস শব্দে মর্লকরা দৌড়ে আসছে আমার দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো হাত আঁকড়ে ধরল আমায়। ওরা যে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। আর-একটা কাঠি জ্বালিয়ে ওদের মুখের ওপর নেড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিলাম। ওদের চেহারা যে কী কদাকার আর অমানুষিক, তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। রক্তহীন, চিবুকহীন মুখ আর বড় বড় গোলাকার লালাভ ধূসর দুই চোখ। চোখের পাতা না থাকায় আলোর জেল্লায় ওরা প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সুযোগে ওদের ভালো করে দেখে আমার গা বমি-বমি করে উঠল। বেশি দেরি করলাম না, ওই অবস্থাতেই

পিছু হটে চললাম। দ্বিতীয় কাঠি ফুরাতে জ্বাললাম তৃতীয় কাঠি। এটা ফুরাতে ফুরাতেই পৌঁছালাম সুড়ঙ্গের মুখে। কুয়োর নিচে বিরাট পাম্পের গুরুগম্ভীর শব্দে মাথা ঘুরে যাওয়ায় কিনারায় শুয়ে পড়লাম আমি। তারপরেই পাশে হাত বাড়ালাম হুকগুলোর দিকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা আমার দু'পা ধরে দারুণ হ্যাঁচকা টান মারলে পেছনে। শেষ কাঠিটা জ্বাললাম আমি... কিন্তু তখুনি নিবে গেল কাঠিটা। ততক্ষণে আমার হাত গিয়ে পড়েছে মইয়ের ওপর। কাজেই প্রচণ্ড কয়েকটা লাথিতে মর্লকদের ছিটকে ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠতে লাগলাম ওপরে। ওদের মধ্যে একজন অবশ্য কিছু দূর পর্যন্ত উঠে আমার বুটটা ধরেছিল, কিন্তু পদাঘাত ছাড়া তার বরাতে সেদিন আর কিছুই জোটেনি।

ওপরে ওঠা যেন আর ফুরাতেই চায় না। শেষ বিশ-তিরিশ ফুট ওঠার সময়ে দারুণ গা গুলিয়ে উঠল আমার। অতিকষ্টে আঁকড়ে রইলাম হুকগুলো। জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হল শেষ কয়েক গজ ওঠার সময়ে, প্রাণপণে নিজেকে সামলে রাখলাম। কয়েকবার তো মাথা ঘুরে গেল। একবার মনে হল, পড়ে যাচ্ছি। শেষকালে কোনওরকমে উঠে এলাম কুয়োর মুখের কাছে, টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম রোদ্দুরভরা ভাঙা স্তূপের মাঝে। উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। মাটির গন্ধ যে কত মিষ্টি, তা বুঝেছিলাম সেদিন। তারপর কানে ভেসে এল উইনা আর ক'জন ইলয়ের মিষ্টি স্বর। এরপরেই জ্ঞান হারালাম কিছুক্ষণের জন্যে।

১০। রাত্রে

আরও শোচনীয় হয়ে উঠল আমার অবস্থা। এতদিন শুধু ভেবেছি, কী করে ফিরে পাওয়া যায় টাইম মেশিন। কিন্তু মর্লকদের আস্তানা আবিষ্কার করার পর থেকে নতুন একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিল। সে দুশ্চিন্তা অমাবস্যার অন্ধকারকে নিয়ে।

অবাক হচ্ছেন আপনারা। ভাবছেন, অমাবস্যার অন্ধকারকে এত ডরানোর কী আছে। কিন্তু উইনাই এ দুশ্চিন্তা ঢোকালে আমার মাথায়। অবোধ্য শব্দ আর দুর্বোধ্য ভাবভঙ্গি দিয়ে সে বুঝিয়ে দিলে রাতের অন্ধকারের বিভীষিকা। প্রতিরাতে অন্ধকারের অন্তরকাল একটু একটু করে বেড়েই চলেছে, এগিয়ে আসছে অমাবস্যা। সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম, অন্ধকারকে কেন ইলয়রা এত ভয় পায়। না জানি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মর্লকরা কী নরকলীলা চালায় মাটির ওপর। আমার দ্বিতীয় অনুমান যে একেবারে ভুল, সে বিষয়ে আরও কোনও সন্দেহ ছিল না। বহুকাল আগে ইলয়রা ছিল মর্লকদের প্রভু। কিন্তু বহু বছর নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ফলে ইলয়রা কারলোভিগিনিয়ান রাজাদের মতো আরও সুন্দর হয়ে উঠলেও একেবারে অপদার্থ বনে গেছে। আর মর্লকরা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রভু। বহুকাল মাটির নিচে থাকার

ফলে ওপরের আলো-হাওয়া মোটেই সহ্য হয় না মর্লকদের, তাই ইলয়দের তারা ওপরেই থাকতে দিয়েছে। বহুদিনের মজ্জাগত অভ্যাসের ফলে ইলয়দের পোশাক ইত্যাদির জোগান দিলেও মনিব-চাকরের পুরানো সম্পর্ক আর নেই। বহুকাল আগে মানুষ তার যে ভাইকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল মাটির নিচে—সেই ভাই ফিরে এসেছে অন্য রূপ ধরে। ভয় কী বস্তু, তা ইলয়রা জেনেছিল অনেক আগেই। ধীরে ধীরে আবার নতুন করে এই ভয়ের আস্বাদ তারা পেতে শুরু করেছে। নিচের টেবিলের ওপর রাখা মাংসের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। হাড়ের আকারটা একটু চেনা মনে হলেও বুঝলাম না ঠিক কোন প্রাণীর।

ভয় পেয়ে খুদে মানুষরা অসহায় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তা শোভা পায় না। প্রতিজ্ঞা করলাম, সবার আগে একটা হাতিয়ার আর একটা নিরাপদ আশ্রয় জোগাড় না-করা পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনও কাজ আর নয়। ঘুমের সুযোগে ওরা যে ইতিমধ্যেই আমাকে পরীক্ষা করে গেছে, ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল আমার।

বিকেলের দিকে টেম্‌স উপত্যকায় অনেক খুঁজেপেতেও আশ্রয় কোথাও পেলাম না। কুয়োর গা বেয়ে মর্লকদের ওঠানামা করার ক্ষমতা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কাজেই গাছে চড়া বা বাড়িতে ঢোকা তাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। হঠাৎ সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদের বেজায় উঁচু ঝকঝকে চুড়োগুলো আমার মনে ভেসে উঠল। তখনই সেই ভরসন্ধের সময়ে ছোট উইনাকে কাঁধে চাপিয়ে চললাম দক্ষিণ-পশ্চিমে সবুজ প্রাসাদের দিকে। ভেবেছিলাম, সাত-আট মাইল দূরে হবে প্রাসাদটা, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম আমার ধারণা একেবারেই ভুল। তার ওপরে জুতোর একটা পেরেক বেরিয়ে পা ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে দেরি হল আরও। সূর্য তখন ডুবে গেছে পশ্চিমে, ফ্যাকাশে হলদেটে আকাশের পটে দেখলাম, ছবির মতো ফুটে রয়েছে প্রাসাদের কালো রেখা।

কাঁধে চড়ে যাওয়া আর পছন্দ হল না উইনার, আমার পাশে পাশে ছুটে চলল। প্রথম প্রথম আমার পকেটগুলো উইনাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল, শেষকালে চমৎকার ফুলদানি হিসেবে ওগুলোকে কাজে লাগায় সে। সে সন্ধ্যাতেও কতকগুলো ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিলে আমার দুই প্যান্টের পকেট। প্যান্ট পালটাবার সময়ে...

সময়-পর্যটক একটু থেমে প্যান্টের পকেট থেকে দুটো আশ্চর্য ধরনের শুকনো ফুল বার করে সামনের টেবিলে রাখলেন। তারপর আবার বলে চললেন।...

বহুক্ষণ হাঁটবার পর একটা গভীর বনের সামনে হাজির হলাম। ডাইনে-বামে যাওয়ার উপায় নেই, কিন্তু আঁধারে বনের মধ্যে ঢুকে নতুন বিপদ ডেকে আনার সাহসও আমার হল না। ইতিমধ্যে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় কোলে তুলে নিয়েছিলাম উইনাকে। এদিকে-ওদিকে তাকিয়েও যখন সবুজ পোর্সেলিন প্রাসাদের কোনও চিহ্ন

দেখলাম না, তখন সন্দেহ হল, বোধহয় পথ হারিয়েছি। উইনাকে ঘাসের ওপর সন্তর্পণে শুইয়ে আমি পাশে বসলাম, কখন চাঁদ উঠবে সেই প্রতীক্ষায়।

চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। কখনও সখনও অবশ্য বনের ভেতর জীবন্ত প্রাণীর নড়াচড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। পরিষ্কার রাত। মাথার ওপর তারার ঝিকিমিকি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পুরানো নক্ষত্রগুলোর একটাও দেখতে পেলাম না। একশো জনমেও (generation) যে তারার দলের ধীরগতি ধরা সম্ভব হয় না, তারাই লক্ষ বছরের মধ্যে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছে নিজেদের, কিন্তু ছায়াপথটা আগের মতোই ধূলিকণার মতো রাশি রাশি তারায় বোঝাই। দক্ষিণদিকে আমাদের এখানকার SIRIUS-এর চাইতেও ঢের বেশি জ্বলজ্বলে

একটা লাল তারা দেখলাম। আর এইসব মিটমিটে আলোর মালার মধ্যে পুরানো বন্ধুর মতো জেগে ছিল একটা জ্বলজ্বলে গ্রহ।

সমস্ত রাত মর্লকদের চিন্তা মন থেকে সরিয়ে রাখলাম জ্যোতিষচর্চা দিয়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য ঢুলছিলাম। কতক্ষণ বাদে পুবের আকাশে বর্ণহীন আগুনের আভা ছড়িয়ে দেখা দিল চাঁদের মরা মুখ। আর তারপরেই আস্তে আস্তে তা ঢাকা পড়ে গেল ভোরের আলোয়। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠতে লাগল পুবের আকাশ। সারারাত কোনও মর্লক হানা দেয়নি আমাদের ওপর। বোধহয় জানতে পারেনি তখনও।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি, জুতো আর পায়ের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোড়ালি ফুলেছে, পায়ের তলাও অক্ষত নেই। কাজেই জুতোজোড়া খুলে নিয়ে ফেলে দিলাম বনের মধ্যে। তারপর উইনাকে ঘুম থেকে তুলে আবার হাঁটা দিলাম। ভোরের আলোয় নির্ভয়ে এদিকে-ওদিকে খেলে বেড়াচ্ছিল কয়েকজন ফুটফুটে ইলয়। আনমনাভাবে তাকিয়ে ছিলাম ওদের দিকে। এমন সময়ে আচমকা পুরানো দৃশ্যটা ভেসে উঠল আমার মনের চোখে। না, কোনও সন্দেহই আর নেই। মাটির নিচে টেবিলে যে মাংস দেখেছি, তার সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। ভাবতেও শিউরে উঠলাম আমি। কোনও সুদূর অতীতে মর্লকদের খাবারের ভাঁড়ার নিশ্চয় ফুরিয়েছিল। খুব সম্ভব ইঁদুর-টিদুর খেয়ে বেঁচে থাকত ওরা। এ যুগেও খাওয়ার বাছবিচার মানুষের মধ্যে বিশেষ আর দেখা যায় না। হাজার তিন-চার বছর আগে নরমাংসেও অরুচি ছিল না আমাদের পূর্বপুরুষদের। তারপর কত লক্ষ বছর গেছে কেটে, দারুণ খাদ্যসংকটে পড়ে পাতালবাসী মর্লকদের মধ্যে সে অভ্যাস ফিরে আসা মোটেই বিচিত্র নয়। আমরা যেমন গোরু-ভেড়া-মুরগি পুষি, ওরাও তেমনি পুষছে ইলয়দের শুধু নিজেদের উদরসেবার জন্যে! একশ্রেণির সুবিধাবাদীদের চরম স্বার্থপরতার কী শোচনীয় শাস্তি।

১১। সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদ

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই বনের পথ ফুরিয়ে এসেছিল। দূর থেকে সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদ দেখতে পেলাম। তারপর আরও কিছুটা হাঁটার পর বেলা প্রায় বারোটার সময়ে এসে পৌঁছালাম ভাঙাচোরা প্রাসাদের সামনে। জানলায় দেখলাম ধূলিমলিন ভাঙা কাচের টুকরো, মরচে-ধরা ধাতুর ফ্রেম থেকে বড় বড় সবুজ পাতাগুলো খসে পড়ে গেছে নিচে। খুব উঁচু একটা ঘাসজমির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল প্রাসাদটা। উত্তর-পূর্বদিকে মস্ত চওড়া একটা বাড়ি দেখে কিন্তু বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আন্দাজে মনে হল, একসময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর ব্যাটার সি ছিল ওই জায়গায়। সাগরের প্রাণীগুলো যে কোথায়, তা অবশ্য ভেবে পেলাম না।

প্রাসাদ পরীক্ষা করে দেখলাম বাস্তবিকই তা আগাগোড়া পোর্সেলিনে তৈরি। সামনের দিকে বিচিত্র হরফে এককালে কিছু লেখা ছিল, কিন্তু তা পড়া সম্ভব হল না আমার পক্ষে। দরজার পেল্লায় পাল্লাগুলো অনেক আগেই খসে পড়েছিল কবজা থেকে। কাজেই ভেতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধা হল না। সামনেই দেখলাম মস্ত লম্বা একটা গ্যালারি, দু'পাশের সারি সারি জানলা দিয়ে আলো আসছে ভেতরে। দেখেই মনে হল, এ মিউজিয়াম না হয়ে যায় না। টালি দিয়ে বাঁধানো মেঝেতে পুরু হয়ে জমেছে ধুলো, ওপরে ধুলোর চাদরে ঢাকা-পড়া এদিকে-সেদিকে ছড়ানো কত আশ্চর্য আর অদ্ভুত জিনিস। হলের ঠিক মাঝখানে অতিকায় একটা কঙ্কালের নিচের অংশ পড়ে থাকতে দেখলাম। বাঁকা পা দেখে বুঝলাম কঙ্কালটা মেগাথিরিয়াম জাতীয় কোনও অধুনালুপ্ত প্রাণীর। পুরু ধুলোর মাঝে মাথার খুলি আর ওপরের হাড়গুলো পড়ে ছিল। পাশের খানিকটা অংশ ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়ে অনেকদিন আগেই ক্ষয়ে ধুলোয় মিশে গেছে। গ্যালারিতে ব্রন্টোসরাসের একটা বিপুল কঙ্কালও দেখলাম। আমার অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়, এটা মিউজিয়ামই বটে। পাশের ঢালু তাকগুলোর ধুলো ঝেড়ে পেলাম আমাদের যুগের পরিচিত কাচের আলমারি। ভেতরের জিনিসগুলোর অম্লান অবস্থা দেখে বুঝলাম প্রত্যেকটি আলমারি নিশ্চয় এয়ার-টাইট করা।

চিত্র ১.৭ দূর থেকে সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদ দেখতে পেলাম।

বুঝতেই পারছেন, আগামীকালের সাউথ কেন্সিংটনের এক ভাঙা স্তূপের মাঝে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, নিশ্চয় এককালে পৃথিবীর জীববিজ্ঞান বিভাগ ছিল সেখানে। কত রকমারি জীবাণু যে দেখলাম, তার ইয়ত্তা নেই। জীবাণু আর ছত্রাক লোপ পাওয়ার ফলে যদিও ক্ষয়ের প্রকোপ শতকরা নিরানব্বই ভাগ কমে গিয়েছিল; তবুও মূল্যবান বহু জীবাণু ধংসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এখানে-সেখানে খুদে মানুষের প্রায়-নষ্ট বহু জীবাণু দেখলাম ধুলোয় মলিন হয়ে উঠেছে। কোথাও টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলছে তাকের ওপর। কতকগুলো আলমারির তো কোনও চিহ্নই পেলাম না, বোধহয় মর্লকরা সরিয়েছে সেগুলো। ছুঁচ পড়ার শব্দ শোনা যায় এমনি গভীর নৈঃশব্দ্য চেপে বসেছে চারদিকে। পুরু ধুলোয় পা বসে যাচ্ছিল আমাদের। উইনা একটা সামুদ্রিক শজারু নিয়ে খেলা করছিল, আমায় চুপ করে দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে এসে হাত ধরে দাঁড়াল পাশে।

এই একটা হলের আকার দেখে মনে হল, সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদে শুধু আদিম জীববিজ্ঞানের গ্যালারিই নেই, ঐতিহাসিক গ্যালারি, এমনকী গ্রন্থাগার থাকাও অস্বাভাবিক নয়। গত যুগের মানুষদের বিপুল প্রতিভার এই বিরাট নিদর্শন দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। আর-একটু এগতে প্রথম গ্যালারির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে আর-একটা ছোট গ্যালারি দেখলাম। এখানে দেখলাম রাশি রাশি খনিজ পদার্থ। হঠাৎ এক টুকরো গন্ধক দেখে ভাবলাম, গান-পাউডার তৈরি করলে কেমন হয়? তা-ই দিয়ে সাদা স্ফিংক্স-এর ব্রোঞ্জের দরজা উড়িয়ে টাইম মেশিন উদ্ধার করা তো নিতান্ত ছেলেখেলা। কিন্তু শোরা পেলাম না কোথাও। নাইট্রেট জাতীয় কোনও কেমিক্যালসই পেলাম না। বলা বাহুল্য, অনেক বছর আগে সেসব উবে মিলিয়ে গেছে বাতাসে। গন্ধকটা কিন্তু তবুও হাতছাড়া করতে মন চাইল না। গ্যালারির মধ্যে আর বিশেষ কিছু দেখার ছিল না। বিশেষ করে খনিজ পদার্থের মাথামুন্ডু যখন আমি বুঝি না, তখন এ হল থেকে বেরিয়ে আর-একটা ভাঙাচোরা হলে প্রবেশ করলাম। এককালে বোধহয় জীববিদ্যার বিভাগ ছিল এখানে—যদিও কিছু আর চেনার উপায় ছিল না তখন। জীবজন্তুর কতকগুলো ধুলো-পড়া টুকরো টুকরো মূর্তি, জারে রাখা শুকনো মমি—জারের স্পিরিট অবশ্য অনেক আগেই উবে গিয়েছিল; দুষ্প্রাপ্য গাছপালার বাদামি একটু ধুলো; বাস, আর কিছু নেই। মানুষ জাতটা কীভাবে দু'ভাগ হয়ে মর্লক আর ইলয়ে এসে ঠেকেছে, তা দেখতে পেলাম না বলে খুব হতাশ হলাম। এরপর ঢুকলাম একটা মস্ত বড় গ্যালারিতে। একে তো হলটা বড়, তার ওপর আলো কমে আসায় দু'পাশের দেওয়ালও দেখা যাচ্ছিল না ভালো করে। ঘরের মেঝে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। দূরে দূরে অবশ্য ছাদ থেকে বড় বড় সাদা কাচের গ্লোব ঝুলছিল, যদিও বেশির ভাগই আর আস্ত ছিল না। কাচের ফানুস দেখেই বুঝলাম, একসময়ে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা ছিল জায়গাটায়। দু'পাশে মস্ত উঁচু উঁচু মেশিনের সারি চলেছে, এক-একটা মেশিন যে কত বড় তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। সব মেশিনেই মরচে ধরেছে, কতকগুলো ভেঙেচুরে গেছে। জানেন তো, যন্ত্রপাতির ওপরে আমার একটু দুর্বলতা আছে, তাই তন্ময় হয়ে গেলাম মেশিনগুলোর মধ্যে। কিন্তু বুঝলাম না কী কাজে লাগত এত মেশিন।

হঠাৎ গা ঘেঁষে দাঁড়াল উইনা। চমকে উঠেছিলাম আমি। আর তখনই লক্ষ করলাম, গ্যালারির মেঝে তখনও ঢালু হয়ে নেমে চলেছে নিচের দিকে। যেদিক দিয়ে এসেছি, সেদিকটা দেখলাম বেশ খানিকটা উঁচুতে। সরু সরু জানলা দিয়ে আলো ঝরে পড়ছে সেখানে। কিন্তু পথটা যতই ঢালু হয়ে নেমেছে নিচের দিকে, ততই কমেছে জানলার সংখ্যা আর আলোর পরিমাণ। মেশিনগুলোর জটিলতা

তখনও আমার মাথায় ঘুরছে, আনমনা হয়ে চলতে চলতে আলো যে আস্তে আস্তে কমে এসেছে তা লক্ষ করিনি। কিন্তু উইনার ভয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে দেখে মেশিনের চিন্তা ছেড়ে ভালো করে তাকালাম সামনের দিকে। দেখলাম, গ্যালারি আরও খানিকটা নেমে নিঃসীম অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেছে। থমকে গিয়ে চারপাশে তাকাতেই দেখি, আগের চাইতে ধুলো অনেক কমে এসেছে, মেঝেও আর ততটা মসৃণ নয়। আরও সামনে অন্ধকারের দিকে ছোট ছোট কতকগুলো পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম।

তৎক্ষণাৎ বুঝলাম, এ ছাপ মর্লকদের পায়ের ছাপ না হয়ে যায় না। বুঝলাম, যন্ত্রপাতি নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে এতটা সময় নষ্ট করা কোনওমতেই উচিত হয়নি আমার। বিকেল গড়িয়ে এল। অথচ তখনও পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্যে কোনও হাতিয়ার, কোনও আশ্রয়, এমনকী আগুন জ্বালাবার কোনও বন্দোবস্তও করে উঠতে পারিনি। তারপরেই গ্যালারির নিচে দূর অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল অদ্ভুত রকমের খসখস শব্দ—যে শব্দ আমি শুনেছি কুয়োর নিচে।

হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এল। পাশের মেশিনটা থেকে লিভারের মতো একটা লোহার ডান্ডা বেরিয়ে ছিল। মেশিনটার ওপর উঠে দু'হাতে লিভারটা আঁকড়ে ধরে সব শক্তি দিয়ে চাপ মারলাম পাশের দিকে। মিনিটখানেক জোর দেওয়ার পর খসে এল লিভারটা। দেখলাম মর্লকদের পাতলা খুলি ফাটানোর পক্ষে ওই ডান্ডাই যথেষ্ট। সেই মুহূর্তে দারুণ ইচ্ছে হল, নিচে নেমে গিয়ে কতকগুলো খুলি চুরমার করে আসি। কিন্তু পাছে শেষ পর্যন্ত টাইম মেশিনটা হারাতে হয়, এই ভয়ে এগলাম না। ভাবছেন নিজের বংশধরদের খুন করার এত পাশব ইচ্ছে কেন? আরে মশাই, সে কদর্য জীবগুলোকে দেখলে আপনারও ওই একই ইচ্ছে হত।

এক হাতে উইনা আর এক হাতে লোহার ডান্ডা নিয়ে উঠে এলাম ওপরে, ঢুকলাম পাশের আরও বড় একটা হলে। দেখে মনে হল যেন সামরিক গির্জায় ঢুকে পড়েছি। ফালি ফালি ছেঁড়া জীর্ণ নিশান ঝুলছে এদিকে-সেদিকে। বইয়ের মতো কতকগুলো জিনিস দেখলাম, যদিও বই বলে আর চেনা যায় না তাদের। বোর্ড আর চিড়-খাওয়া ধাতুর মলাট দেখেই বুঝলাম, একসময়ে প্রচুর বই স্থান পেয়েছিল এই ঘরে।

তারপর একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে এলাম যে ঘরে, একসময়ে বোধহয় শিল্প বিষয়ক বিভাগ ছিল সেখানে। ঘরের একদিকের ছাদ ধসে পড়লেও বাকি অংশে প্রতিটি জিনিস সাজানো ছিল পরিষ্কারভাবে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ইতিউতি দেখতে দেখতে যা চাইছিলাম, তা পেলাম। এক কোণে বায়ুনিরোধক একটা দেশলাইয়ের বাক্স। দুরুদুরু বুকে ঘষলাম একটা কাঠি, ফস করে জ্বলে উঠল কাঠিটা। যাক, তাহলে ভিজে ওঠেনি কাঠিগুলো। মহানন্দে ইচ্ছে হল, দু'হাত তুলে নাচি। কিন্তু এ বয়সে

নাচা শোভা পায় না, তাই গলা ছেয়ে 'The Land of the Leal' গাইলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বীভৎস প্রাণীগুলোকে জব্দ করার একটা জুতসই হাতিয়ার পেয়ে আমার আনন্দ যেন আর বাধা মানতে চাইল না।

স্মরণাতীত বছরের পরও একেবারে তাজা অবস্থায় দেশলাই পাওয়া যে কতটা সৌভাগ্যের ফলে সম্ভব, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে আর-একটা জিনিস দেখে মনটা আবার নেচে উঠল। ভেবেছিলাম জিনিসটা কয়েক টুকরো মোম। ইচ্ছে ছিল বাতি বানানো যাবে, তাই মুখবন্ধ কাচের জারটা ভেঙে ফেললাম। কিন্তু যা পেলাম, তা মোম নয়। গন্ধ থেকে বুঝলাম কর্পূরের টুকরো। হতাশ হয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল কর্পূর তো দাহ্য পদার্থ। জ্বালিয়ে দিলে বাতির মতো চমৎকার আলো দেবে। সুতরাং পকেটে চালান করে দিলাম টুকরোগুলো। কিন্তু স্ফিংক্স-এর দরজা ওড়ানোর জন্যে কোনও বিস্ফোরক পেলাম না। লোহার ডান্ডা দিয়ে সে কাজ সারব, এই মতলব আঁটতে আঁটতে মহানন্দে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে।

সে দীর্ঘ অপরাহ্নের খুঁটিনাটি বর্ণনা শোনানোর মতো জোরালো স্মৃতিশক্তি আমার নেই। পরপর সাজিয়ে সব বলাও সম্ভব নয়। মনে আছে, মরচে-পড়া অস্ত্রের একটা লম্বা গ্যালারিতে ঢুকেছিলাম। লোহার ডান্ডা ফেলে দিয়ে কুড়ুল নিই কি তলোয়ার নিই, এই দোটানায় পড়লাম সেখানে। দুটোই তো আর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শেষকালে ভেবে দেখলাম ব্রোঞ্জের দরজার পক্ষে লোহার ডান্ডাই আদর্শ হাতিয়ার, তা-ই মনস্থির করে তলোয়ার ফেলে রেখে গেলাম অন্যদিকে। দেখলাম প্রচুর বন্দুক, পিস্তল আর রাইফেল। বেশির ভাগ অস্ত্রেই মরচে ছাড়া আর কোনও পদার্থ নেই। কতকগুলো এক ধরনের নতুনরকম ধাতুতে তৈরি মনে হল। সেগুলো অবশ্য মোটামুটি চলনসই অবস্থায় ছিল। কিন্তু কার্ট্রিজ আর গান-পাউডার যা ছিল, তা অনেকদিন আগেই নষ্ট হয়ে মিশে গেছে ধুলোয়। আর একদিকে দেখি সারি সারি দেবমূর্তি সাজানো—পলিনেশিয়ান, মেক্সিকান, গ্রিসিয়ান, ফোনিশিয়ান—কোনও দেশই বাদ যায়নি। কী খেয়াল হল, দক্ষিণ আমেরিকার একটা বিদঘুটে দানোর নাকের ওপর লিখে রাখলাম আমার নাম।

যতই বিকেল গড়িয়ে আসতে লাগল, ততই কমতে লাগল আমার আগ্রহ। ধূলিধূসর নিথর পুরীর একটার পর একটা গ্যালারি পেরিয়ে চললাম আমি। কোনওটায় শুধু ভাঙা পাথর আর মরচে-পড়া ধাতুর রাশি, কোনওটায় ছড়ানো দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী। আচমকা চোখে পড়ল টিন-খনির একটা মডেল, তারপরেই হঠাৎ দেখলাম এয়ার-টাইট কৌটোয় পাশাপাশি সাজানো দুটো ডিনামাইট কার্টিজ! 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম সোল্লাসে। দারুণ আনন্দে তখুনি চুরমার করে ফেললাম কৌটোটা। কিন্তু তার পরেই কীরকম সন্দেহ হল। একটু ইতস্তত করে

গ্যালারির কোণে কার্ট্রিজ রেখে আগুন দিলাম সলতেতে। এমন নিরাশ আর কখনও হইনি আমি। পাঁচ-দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলাম, কিন্তু বিস্ফোরণ আর হল না। বুঝলাম ও দুটো নিছক 'ডামি' ছাড়া আর কিছু না।

তারপরেই প্রাসাদের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রাঙ্গণে এসে পড়লাম আমরা। বেশ পরিষ্কার ঘাসজমির ওপর দেখলাম তিনটে ফলের গাছ। খিদে পেয়েছিল খুব। কাজেই ফলাহারের পর ঘাসের ওপর একটু জিরিয়ে নিলাম। নিরাপদ আশ্রয়স্থান তখনও মেলেনি অথচ রাত এল ঘনিয়ে। মনে মনে ভাবলাম, আর দরকারও হবে না। মর্লকদের দূরে ঠেকিয়ে রাখার পক্ষে এক বাক্স দেশলাই যথেষ্ট। ঠিক করলাম, বাইরে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই লোহার ডান্ডা দিয়ে ভাঙব ব্রোঞ্জের দরজা।

১২। অন্ধকারে

প্রাসাদ থেকে যখন বেরলাম, তখনও দিক্রেখার ওপরে সূর্যের কিনারা দেখা যাচ্ছে। পরের দিন সকালে যেমন করেই হোক সাদা স্ফিংক্স-এর কাছে আমাদের পৌঁছাতে হবে। কাজেই ঠিক করলাম, সামনের বনটাও পেরতে হবে চারদিকে অন্ধকার চেপে বসার আগেই। ইচ্ছে ছিল, রাতে যতটা পারি এগব, তারপর আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিরাপদে ঘুমাব বাকি রাতটা। সেইমতো শুকনো কাঠ আর ঘাস জোগাড় করছিলাম। শেষে দু'হাত বোঝাই হয়ে যাওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি হাঁটা আর সম্ভব হল না। এর ওপর উইনাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই বনের সামনে যখন পৌঁছালাম, বেশ আঁধার নেমেছে চারদিকে। বনের ভেতর মিশমিশে অন্ধকার দেখে উইনা আঁকড়ে ধরলে আমায়। কেমন জানি অজানা ভয়ে আমারও গা ছমছম করে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কীরকম গোঁ চেপে গেল। ঘুমের অভাবে পরিশ্রমের ফলে ঠিক সুস্থও ছিলাম না আমি। বিপদ আসন্ন জেনেও হটে আসতে মন সায় দিল না।

যাব কি যাব না ভাবছি, এমন সময়ে ঠিক পেছনে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট তিনটে মূর্তিকে দেখলাম কালো ঝোপের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসতে। চারপাশে লম্বা ঘাস ছাড়া আত্মরক্ষা করার মতো আর কিছু চোখে পড়ল না, তা ছাড়া মূর্তি তিনটের এগবার ধরনধারণও বিশেষ সুবিধের মনে হল না। প্রায় মাইলখানেক লম্বা বনটা, বনের ওদিকে কোনওরকমে পৌঁছাতে পারলে পাহাড়ের পাশে নিরাপদে রাত কাটানোর মতো অনেক আস্তানা পাওয়া যাবে। ভেবে দেখলাম, কর্পূর আর দেশলাই যখন সঙ্গে আছে, পথে আলোর অভাব হবে না। তবে কাঠকুটোগুলো ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজে কাজেই ফেলে দিতে হল বোঝাটা। তখনই একটা মতলব

এল মাথায়। নিশাচর মর্লকদের ভড়কে দেওয়ার জন্যে কুটোগুলোর ওপর দেশলাইয়ের একটা জ্বলন্ত কাঠি ফেলে দিলাম।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দাবানল বড় একটা দেখা যায় না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে মাঝে মাঝে শিশিরকণার মধ্যে দিয়ে সূর্যকিরণ ফোকাস বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে শুকনো ঘাসপাতা জ্বালিয়ে দাবাগ্নি সৃষ্টি করে। কিন্তু এ অঞ্চলে সূর্যের সে তেজ নেই। বাজ পড়লেও বিশেষ জায়গাটি পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে যায়, দাবানল জ্বলে না। তা ছাড়া সে যুগে আগুন জ্বালানোর কায়দাকানুনও ভুলে গিয়েছিল সবাই। কাঠকুটোর ওপরে লকলকে লাল আগুনের শিখার নাচ দেখে উইনা তো মহাখুশি। চারপাশে নেচে নেচে ঘুরতে শুরু করে দিলে, ধরে না রাখলে হয়তো আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেও ছাড়ত না।

আগুনের আভায় সামনের পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, উইনাকে কোলে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললাম সেদিকে। উইনা কিন্তু কিছুতেই যাবে না অন্ধকারের মধ্যে, কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। কিছু দূর গিয়ে দেখলাম, আগুন আশপাশের ঝোপেও ছড়িয়ে পড়েছে, বাঁকা একটা আগুনের রেখা শুকনো ঘাস বয়ে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে। মাথার ওপর ঘন অন্ধকারের মধ্যে শুধু দু'-একটা তারা ঝিকিমিকি দেখতে পাচ্ছিলাম। আশপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। দেশলাই জ্বালানোও আর সম্ভব ছিল না, কেননা এক হাতে উইনা আর এক হাতে লোহার ডান্ডা নিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল আমাকে।

কিছু দূর পর্যন্ত পায়ের তলায় শুকনো কুটো ভাঙার মটমট শব্দ, গাছের পাতার সরসরানি আর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনলাম না। তারপরেই মনে হল, তরু-পল্লবের মর্মরধ্বনি ছাড়াও চারপাশে আবার জেগেছে সেই অদ্ভুত খসখস শব্দ, কারা যেন বাতাসের সরে ফিসফিস করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। আরও জোরে এগিয়ে চললাম। ফিসফিস আর খসখস শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল, তারপরেই শুনলাম পাতালপুরীতে শোনা মর্লকদের অদ্ভুত গলার স্বর। আশপাশেও নিশ্চয় এসে পড়েছিল কয়েকটা মর্লক। সত্যি সত্যিই হঠাৎ কোটের পেছনে একটা টান পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত টেনে ধরল একজন। দারুণভাবে থরথর করে কেঁপে উঠল উইনা, তারপরেই একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

দেশলাই না জ্বালিয়ে আর উপায় নেই। উইনাকে তাহলে মাটিতে শোয়ানো দরকার। তা-ই করলাম। পকেট হাতড়ে দেশলাই বার করছি—কয়েকজন আমার হাঁটু ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার মতো বিদঘুটে শব্দও ভেসে এল মর্লকদের দিক থেকে। কতকগুলো নরম হাত আমার কোট আর পিঠ চেপে ধরেছিল, কয়েকটা হাত আমার ঘাড়েও এসে পড়ল। তারপরেই জ্বলে উঠল আমার

কাঠিটা। মর্লকদের শুধু সাদা পিঠগুলোই দেখতে পেলাম। তিরবেগে পালাচ্ছে গাছের আড়ালে। এরপর তাকালাম উইনার পানে। আমার পা আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে মাটির ওপর নিথর দেহে পড়েছিল বেচারা। ভয় হয়ে গেল খুব, নিঃশ্বাস পড়ছিল কি না তা-ও ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি একটা কর্পূরের ডেলা পকেট থেকে বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে একপাশে ছড়ে দিয়ে উইনাকে কোলে তুলে নিলাম। কর্পূরের জোরালো আলোয় মর্লকগুলো আরও দূরে সরে গেলেও মনে হল, পেছনের বন থেকে ভেসে এল বহুজনের নড়াচড়ার শব্দ আর গুঞ্জনধনি। যেন বিরাট একটা দলের সমাবেশ ঘটেছে বনের অন্ধকারে।

উইনা বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল। কাঁধের ওপর ওকে তুলে নিয়ে এগতে গিয়ে দারুণ ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। দেশলাই আর উইনাকে সামলাতে গিয়ে কয়েকবার এদিকে-ওদিকে ফিরেছিলাম, ফলে দিক হারিয়েছি আমি। কোনদিকে যে সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদ আর কোনদিকেই বা পাহাড়, সব গুলিয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় এগনো মানে মরণকে ডেকে আনা। কাজেই ঠিক করলাম, আগুন জেলে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব। কর্পূরটা জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসার আগেই তাড়াতাড়ি কাঠকুটো জড়ো করতে লাগলাম। ভয়ে-উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছিলাম আমি। আর এখানে সেখানে আমার চারদিকে কুচকুচে অন্ধকারের মাঝে কার্বাঙ্কলের মতো দপদপ করে জ্বলতে লাগল মর্লকদের চোখগুলো।

চিত্র ১.৮ জন দুই সাদা মূর্তি এগিয়ে এসেছিল উইনার দিকে।

হঠাৎ নিবে গেল কর্পূরটা। তাড়াতাড়ি জ্বালালাম একটা কাঠি, এর মধ্যেই কিন্তু জন দুই সাদা মূর্তি এগিয়ে এসেছিল উইনার দিকে। আচমকা দেশলাই জ্বলে ওঠায় একজন ঘুরেই ছুট দিলে, আর-একজনের চোখ এমন ধাঁধিয়ে গেল যে, সিধে এগিয়ে এল আমার দিকেই। কোনওরকম দ্বিধা না করে মোক্ষম এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম তার থুতনির ওপর—কোঁক করে একটা শব্দ করে একটু টলমল করেই সটান আছড়ে পড়ল সে মাটির ওপর। পকেট থেকে এক টুকরো কর্পূর বার করে জ্বালিয়ে দিয়ে কাঠকুটো জড়ো করে চললাম দু'হাতে। লক্ষ করলাম, মাথার ওপর গাছপালাগুলো বেজায় শুকনো। মনে পড়ল, টাইম মেশিন নিয়ে আসার পর প্রায় হপ্তাখানেক আর বৃষ্টি হয়নি এ অঞ্চলে। সুতরাং কুটো কুড়ানো ছেড়ে লাফ মেরে গাছের শাখাগুলোই টেনে টেনে নামিয়ে আনতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সবুজ

গাছপালা আর শুকনো কাঠকুটোয় লকলক করে উঠল আগুন। যেমন জোরালো, তেমনি প্রচুর ধোঁয়া সে আগুনে।

কর্পূরের খরচ এইভাবে কমিয়ে উইনার কাছে গেলাম এবার। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু মড়ার মতো নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল বেচারা। সত্যিই ওর নিঃশ্বাস পড়ছে কি না তা-ও বুঝতে পারলাম না।

ধোঁয়ায়, কর্পূরের ভারী গন্ধে, রাত জাগায় আর পথের ক্লান্তিতে হঠাৎ যেন বড় শ্রান্ত মনে হল নিজেকে। ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। আগুন বেশ জোরেই জ্বলছিল, ঘণ্টাখানেকের মতো নিশ্চিন্ত। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। তার ওপর সারা বন জুড়ে জেগে ছিল আশ্চর্য এক ঘুমপাড়ানি গুঞ্জন। বসে বসেই ঢুলছিলাম—তারপরেই চোখ খুলে দেখি চারদিক অন্ধকার। আর মর্লকদের হাত আবার পেঁচিয়ে ধরেছে আমাকে। সরু সরু আঙুলগুলোয় এক ঝটকান দিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলাম—কিন্তু নেই, উধাও হয়ে গেছে দেশলাইয়ের বাক্স। ওরা আরও জোরে চেপে ধরল আমাকে। বুঝলাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি, সেই সময়ে আগুন নিবে যাওয়ার ফলেই এই বিপত্তি। আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল। সমস্ত বনটা মনে হল পোড়া কাঠের গন্ধে ভরে উঠেছে। ওরা আমার ঘাড়, চুল, হাত শক্ত করে চেপে ধরে শুইয়ে দিচ্ছিল মাটিতে, বুকের ওপরেও চড়ে বসেছিল কুৎসিত, নরম প্রাণীগুলো। সে যে কী ভয়ংকর অনুভূতি, তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মনে হল যেন অতিকায় একটা মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছি আমি। আমাকে সম্পূর্ণভাবে পেড়ে ফেলেছিল ওরা, নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিল না। ঘাড়ের কাছে হঠাৎ দাঁত বসার জ্বালা অনুভব করলাম, তাইতেই একটু গড়িয়ে যেতে হাতটা গিয়ে পড়ল লোহার ডান্ডাটার ওপর। নতুন শক্তি পেলাম যেন। প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম, মানুষ-ইঁদুরগুলো ছিটকে পড়ল মাটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে ডান্ডাটা চেপে ধরে আন্দাজমতো মুখ লক্ষ্য করে সজোরে ঘোরাতে লাগলাম। শুনতে পেলাম, মড়মড় করে গুঁড়াচ্ছে হাড়। অনুভব করলাম, মাংস থেঁতলে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে এক-এক আঘাতে—মুহূর্তের মধ্যে আবার মুক্ত হলাম আমি।

নির্মম এক জিঘাংসায় যেন আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভাবলাম, উইনা আর আমি দু'জনেই যখন পথ হারিয়ে পড়েছি এদের হাতে, তখন এই কুৎসিত পিশাচগুলোর নরমাংস খাওয়ার সাধ আজকে ভালো করেই মিটিয়ে দেব। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ডাইনে-বামে বেপরোয়া ডান্ডা ঘোরাতে লাগলাম। সমস্ত জঙ্গলটা ওদের ছুটোছুটি আর চিৎকারে ভরে উঠল। কেটে গেল একটা মিনিট। ওদের স্বর যেন দারুণ উত্তেজনায় আরও কয়েক পরদা উঁচুতে উঠে গেল, ছুটোছুটি আগের চাইতে বেড়ে গেল অনেক। তবুও কিন্তু কাউকে আর নাগালের

মধ্যে আসতে দেখলাম না। অন্ধকারের মধ্যে এদিকে-ওদিকে তাকালাম, কেউই আর এল না। মর্লকরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল তাহলে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত একটা জিনিস দেখলাম। মনে হল, অন্ধকার যেন আলোর আভায় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। আবছাভাবে দেখলাম, আশপাশে ছুটোছুটি করছে সাদা প্রাণীগুলো। পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে তিনটে রক্তাক্ত দেহ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না যখন দেখলাম, পালে পালে পেছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তিরবেগে দৌড়াতে দৌড়াতে সামনের জঙ্গলে মিলিয়ে যাচ্ছে ওরা। স্রোতের মতো অগুনতি মর্লক দু'পাশ দিয়ে ছুটে সামনের গাছপালার মাঝে গা-ঢাকা দিচ্ছে। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। লক্ষ করলাম ওদের পেছনগুলো কীরকম লালচে, সাদা নয় মোটেই। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছি এমন সময়ে শাখাপ্রশাখার ফাঁকে তারার মালায় ভরা কালো আকাশে ছোট্ট একটা লাল স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। দেখেই পোড়া কাঠের গন্ধটা কীসের তা বুঝলাম, বুঝলাম ঘুমপাড়ানি গানের মতো সে গুঞ্জনধ্বনি কীসের। অবশ্য সে গুনগুনানি এখন সোঁ সোঁ গর্জনে এসে ঠেকেছে। বুঝলাম লাল আভা কীসের আর কেনই বা মর্লকরা প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে।

গাছের আড়াল থেকে এসে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। সামনের গাছগুলোর বড় বড় গুঁড়ির পাশ দিয়ে দেখলাম, লকলকে শিখায় দাউদাউ করে জ্বলছে সমস্ত জঙ্গল। প্রথম যে আগুন জ্বেলেছিলাম আমি, এখন আমারই পেছন ছুটে আসছে সে। দেখেই উইনার কথা মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, সে-ও উধাও হয়ে গেছে কখন। ভাববার আর সময় ছিল না, হিসহিস পটপট শব্দে ক্রমেই এগিয়ে আসে আগুন। বোমা ফাটার শব্দ করে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে পড়ছে লেলিহান আগুনের শিখা। লোহার ডান্ডাটা নিয়ে তিরবেগে মর্লকদের পথেই দৌড়ালাম। আগুনের সঙ্গে আমার সে দৌড় প্রতিযোগিতা ভোলবার নয়। একবার তো আগুন ডানদিক দিক দিয়ে এত তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গেল যে, আগুনের বেড়াজালে পড়ে গেলাম আমি। শেষ পর্যন্ত এক টুকরো খোলা জমিতে বেরিয়ে আসতে পারলাম। এসেই দেখি, একটা মর্লক আগুনের আভায় অন্ধ হয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে, তারপর আমাকে পেরিয়ে সটান ঢুকে গেল আগুনের মধ্যে!

এরপরেই দেখলাম সে যুগের সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্য। আগুনের আভায় খোলা জমিটা দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ঠিক মাঝখানে ছোটখাটো একটা পাহাড়। চারপাশে শুকনো কাঁটাগাছ গজিয়েছে প্রচুর। ওদিক থেকে আগুনের আর-একটা শাখা এগিয়ে আসছে এদিকে, মধ্যে মধ্যে হলুদ জিব লিকলিক করে লাফিয়ে পড়ছে আমার পানে। অর্থাৎ আগুনের বেড়াজালে আটকা পড়েছিল খোলা জমিটুকু। পাহাড়ের গায়ে তিরিশ-চল্লিশ জন মর্লক জোর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায়

হতভম্বের মতো এলোমেলোভাবে দৌড়াদৌড়ি করছিল। প্রথমে ওদের অন্ধ অবস্থা আমি বুঝিনি, তাই যতবারই ছুটে এসেছে আমার দিকে, ততবার বেধড়ক পিটিয়েছি ডান্ডা দিয়ে। একজন তো মারের চোটে মরেই গেল, জনা তিনেক হাত-পা-মাথা ভেঙে রইল পড়ে। কিছুক্ষণ পরে একজনকে হাতড়াতে হাতড়াতে আগুনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বুঝলাম ওদের অসহায় অবস্থা। তাই রেহাই দিলাম সে যাত্রা।

তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দু'-একজন সটান এগিয়ে এল আমার দিকে, প্রতিবারই শিউরে উঠে কাটিয়ে যেতে হল আমায়। মাঝখানে আগুনের তেজ একটু কমে আসতে ভাবলাম, আবার বুঝি মর্লকগুলো দেখে ফেলেছে আমায়। আরও কয়েকটাকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে ডান্ডা তুললাম ওপরে, কিন্তু আবার লকলকে হয়ে উঠল লাল শিখা। ডান্ডা নামিয়ে এদিকে-সেদিকে পায়চারি করতে লাগলাম উইনার খোঁজে, কিন্তু ওর কোনও চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

শেষে হতাশ হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বসে বসে আগুনের আভায় অন্ধ পিশাচগুলোর এলোমেলো নড়াচড়া দেখতে লাগলাম। আগুনের ছোঁয়া লাগামাত্র অপার্থিব শব্দে ককিয়ে চিৎকার করে উঠছিল ওরা। দু'-একজন অবশ্য ওপরেও উঠে এসেছিল হাতড়াতে হাতড়াতে, কঠিন কয়েকটা ঘুসি মেরে তাদের ধরাশায়ী করার লোভ আর সামলাতে পারিনি।

সমস্ত রাত দারুণ ঘুমে জুড়ে আসতে লাগল আমার চোখের পাতা। চেঁচিয়ে ছুটে ঘুমকে তাড়াতে হয়েছিল চোখ থেকে। উঠেছি, বসেছি, বেড়িয়েছি এদিকে-ওদিকে, আর ভগবানকে ডেকেছি যেন আজকের রাতের মতো ঘুম না আসে চোখে। তিনবার দেখলাম, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে কতকগুলো মর্লক ছুটে গেল আগুনের ভেতরে। অনেকক্ষণ পর একসময়ে আগুনের লাল আভা আর রাশি রাশি কালো ধোঁয়াকে ফিকে করে দিয়ে এল ভোরের শুভ্র সুন্দর আলো।

আবার খুঁজে দেখলাম উইনাকে, কিন্তু কোথাও কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মর্লকরা যে বেচারিকে জ্বলন্ত জঙ্গলের মধ্যে ফেলে পালিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না আমার। দারুণ ইচ্ছে হল, আরও কয়েকটা মর্লকের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু তা করে তো আর উইনাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না ইলয়দের মধ্যে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিকে তাকাতেই সবুজ পোর্সেলিনের প্রাসাদ দেখতে পেলাম। সাদা স্ফিংক্স কোনদিকে আছে, ঠিক করে নিয়ে হাঁটা দিলাম সেইদিকে। আগুন তখনও রয়েছে এখানে-সেখানে। পায়ের তলায় রাশি রাশি ছাই থেকে গুমে গুমে উঠছে ধোঁয়া, গাছগুলোও ভেতরে ভেতরে পুড়ে চলেছে—তাই ধোঁয়া ওঠার বিরাম নেই। ধোঁয়ায় চারদিক কুয়াশার মতো আবছা হয়ে উঠেছিল। অস্পষ্টভাবে দেখলাম, কয়েকটা কদাকার মর্লক গোঙাতে গোঙাতে ঘুরছে এলোমেলোভাবে। এরই

মাঝ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললাম আমি। পায়ে অবশ্য পুরু করে ঘাস বেঁধে নিয়েছিলাম, তবুও অনাহারে, অনিদ্রায়, অবসাদে আমার তখন এক পা-ও যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চোখ জ্বালা করছিল নিষ্পাপ উইনার শোচনীয় পরিণতির কথা ভেবে। আমিই তাকে এনেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারলাম না তার পরিজনদের মাঝে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পকেটে হাতড়াতে আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। চারটে দেশলাইয়ের কাঠি পেলাম পকেটে। মর্লকরা বাক্সটা বার করে নিলেও কোনওরকমে এ চারটে কাঠি থেকে গেছে পকেটের কোণে।...

১৩। সাদা স্ফিংক্সে-এর ফাঁদ

সকাল আটটা-ন'টা নাগাদ হলদে ধাতুর আসনের কাছে পৌঁছালাম আমি। চারদিক রোদ্দুরে ভরে উঠেছিল। গভীর প্রশান্তিতে ছেয়ে ছিল দিগ্‌দিগন্ত। সে প্রশান্তি আমার মনের জ্বালাযন্ত্রণাও স্নিগ্ধ হাতে জুড়িয়ে দিলে। গত রাতের দুঃস্বপ্নের মতো বিভীষিকা মিলিয়ে গেল মন থেকে, নিদারুণ শ্রান্তিতে সেই কবোষ্ণ সকালে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি ঘাসজমির ওপর।

ঘুম যখন ভাঙল, সূর্য ডুবতে তখন আর বেশি দেরি নেই। আড়মোড়া ভেঙে তাড়াতাড়ি নেমে এলাম নিচে সাদা স্ফিংক্স-এর দিকে। এক হাতে পকেটে দেশলাই কাঠি নাড়াচাড়া করতে করতে অপর হাতে লোহার ডান্ডা বাগিয়ে ধরে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম বেদির সামনে।

আর তারপরেই যা দেখলাম, তা আশা করিনি মোটেই। স্ফিংক্স-এর বেদির সামনে গিয়ে দেখি ব্রোঞ্জের দরজা খোলা, মজবুত পাতগুলো সরে গেছে পাশের খাঁজে।

দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—ঢোকা কি উচিত হবে?

চিত্র ১.৯ স্ফিংক্স-এর বেদির সামনে গিয়ে দেখি ব্রোঞ্জের দরজা খোলা

ছোট্ট একটা কামরা দেখলাম ভেতরে, এক কোণে উঁচু জায়গার ওপর রয়েছে টাইম মেশিনটা। ছোট লিভারটা পকেটেই ছিল। ভাবলাম সাদা স্ফিংক্স আক্রমণের এত তোড়জোড় তাহলে সবই বৃথা, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল ওরা! লোহার ডান্ডা ছুড়ে ফেলে দিলাম। কাজে লাগল না বলে দুঃখ যে হল না তা নয়।

ভেতরে ঢোকার মুখে আবার থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোনও বদ মতলব নেই তো হতভাগাদের? কিন্তু পরক্ষণেই দমকা হাসি চেপে ব্রোঞ্জ ফ্রেম পেরিয়ে সিধে এগিয়ে গেলাম টাইম মেশিনের কাছে। অবাক হয়ে দেখলাম, তেল-টেল দিয়ে বেশ পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে মেশিনটা। ওরা হয়তো যন্ত্রটার রহস্য বোঝার জন্যে কতকগুলো অংশ খুলেও ফেলেছিল, না পেরে আগের মতোই স্ক্রু এঁটে রেখে দিয়েছিল এক কোণে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ খুশি-খুশি মনে মেশিনটার গায়ে হাত বোলাচ্ছি এমন সময়ে যে ভয় করেছিলাম তা-ই হল। হঠাৎ ব্রোঞ্জের পাত দুটো সড়াত করে বেরিয়ে এসে ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে বেদির প্রবেশপথ। নিকষকালো অন্ধকারে কিছুই আর দেখতে পেলাম না, ফাঁদে পড়লাম আমি। মর্লকদের তাহলে এই মতলবই ছিল। আমার কিন্তু বেজায় হাসি পেয়ে গেল ওই অন্ধকারেও।

ইতিমধ্যে গুনগুন ধ্বনির মতো হাসির শব্দ এগিয়ে আসছিল আমার দিকে। খুব শান্তভাবে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ঘষলাম মেশিনের গায়ে। লিভারটা যথাস্থানে বসানোর সময়টুকু শুধু আমার দরকার, তারপরেই ভূতের মতো যাব মিলিয়ে। কিন্তু একটি ছোট্ট জিনিস আমি একেবারেই ভেবে দেখিনি। যে দেশলাইয়ের কাঠি বারবার বারুদে না ঘষলে জ্বলে না, এ হল সেই জাতীয় কাঠি।

বুঝতেই পারছেন, কীভাবে মুখের হাসি মিলাল আমার। ততক্ষণে আমার ওপর এসে পড়েছে পুঁচকে জানোয়ারগুলো। একজন আমাকে ছুঁতেই হাতের লিভার দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে কোনওমতে উঠে বসলাম মেশিনের আসনে। আর-একটা হাত এসে পড়ল আমার ওপর, তারপরেই আবার একটা। কিলবিলে সাপের মতো হাতগুলো চেপে বসতে না বসতেই সরু সরু আঙুল দিয়ে লিভারটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল ওরা—আর সমানে ঘুসি-লাথি চালিয়ে কোনওরকমে ওদের ঠেকিয়ে রেখে মেশিনের গায়ে লিভারের খাঁজটা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে খুঁজতে লাগলাম। একজন তো আচমকা হাত থেকে কেড়েই নিল লিভারটা, তৎক্ষণাৎ মাথা দিয়ে এক দারুণ ঢুঁ মেরে উদ্ধার করলাম সেটা।

বেশ কিছুক্ষণ ঝটাপটি করার পর শেষে লিভারটা আটকে গেল খাঁজে, ঠেলেও দিলাম সামনের দিকে। স্যাঁতসেঁতে হাতগুলো পিছলে গেল আমার দেহ থেকে। নিকষ অন্ধকার গেল মিলিয়ে। আগে যেরকম বলেছি, ঠিক সেইরকম ধূসর আলো আর মৃদু গুনগুনানির মধ্যে এসে পড়লাম আবার।

১৪। আরও ভবিষ্যতে

সময়-পর্যটন যে কী অস্বস্তিকর, তা আপনাদের আগেও বলেছি আমি। তার ওপরে এবার আমি ভালো করে আসনে বসতেও পারিনি। পাশের দিকে হেলে পড়ে কোনওরকমে ঠেকেছিলাম আসনে। কতক্ষণ যে এভাবে আঁকড়েছিলাম মেশিনটা, সে খেয়াল ছিল না। দুলুনি আর ঝাঁকুনির মধ্যে কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছি, সেসবও দেখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। অনেকক্ষণ বাদে একটু সামলে উঠে ডায়ালগুলোর দিকে তাকাতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। একটা ডায়ালে দেখা যায় শুধু একদিনের হিসেব, আর একটায় হাজার দিনের, তার পাশেরটায় লক্ষ লক্ষ দিনের, আর সব

শেষেরটায় কোটি কোটি দিনের। বিপরীত দিকে যাওয়ার লিভারটা না টেনে আমি মেশিনটা শুধু চালিয়ে দিয়েছিলাম, এখন ডায়ালের দিকে তাকাতে দেখি, হাজারের কাঁটাটা ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার মতো বেগে ঘরে চলেছে—আর আমি এগিয়ে চলেছি আরও ভবিষ্যতের গর্ভে।

যতই এগতে লাগলাম, চারপাশে দেখলাম এক আশ্চর্য পরিবর্তন। দপদপে ধোঁয়াটে কুয়াশা আরও গাঢ় হয়ে উঠল। তারপরে, প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলা সত্ত্বেও মিটমিটে তারার মতো আবার দেখা গেল দিনরাতের দ্রুত পরিবর্তন। ধীরগতিতে গেলে এ পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এত নিদারুণ বেগে যাওয়া সত্ত্বেও দিনরাতের আসা-যাওয়া স্পষ্টতর হয়ে উঠল। দারুণ ঘাবড়ে গেলাম। দিবানিশার পরিবর্তন-গতি আরও কমে আসতে লাগল, সেই সঙ্গে কমে এল আকাশে সূর্যের আনাগোনা। শেষকালে মনে হল, পরিবর্তন আসছে কেবল একশো বছর অন্তর অন্তর। প্রথমে পৃথিবীর ওপর দেখা গেল পরিবর্তনহীন স্থির এক গোধূলি, মাঝে মাঝে শুধু কালো আকাশকে চমকে দিয়ে আর গোধূলিকে ঝলসে দিয়ে তিরবেগে উধাও হয়ে গেল কয়েকটা ধূমকেতু।

আলোর যে চওড়া ফালিটা অবস্থান নির্দেশ করছিল, অনেক আগেই তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কেননা, আর অস্ত যাচ্ছিল না সূর্য, শুধু পশ্চিমদিক থেকে উঠে আবার নেমে যাচ্ছিল পশ্চিমেই। আর ক্রমশ লাল, আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠছিল তার আকৃতি। চাঁদের সব চিহ্ন মিলিয়ে গেল। তারাগুলোর ঘুরপাকও ক্রমশ কমতে কমতে এসে ঠেকল মৃদু সঞ্চরমাণ কয়েকটা আলোর বিন্দুতে। অবশেষে দিক্রেখার ওপর মস্ত বড় গাঢ় লাল সূর্য নিথর হয়ে রইল দাঁড়িয়ে, দীপ্তিহীন উত্তাপে জ্বলতে লাগল আর বিশাল থালার মতো গোল আকৃতি, মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্যে নিবেও যেতে লাগল। একবার কিছুক্ষণের জন্যে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু দেখতে দেখতে আবার ফিরে এল সেই ম্যাড়মেড়ে লাল আভা। উদয় আর অস্তর ধীরগতি দেখে বুঝলাম, চাঁদ যেমন এ যুগে পৃথিবীর দিকে সমানে একদিক ফিরিয়ে আছে, ঠিক তেমনি পৃথিবীও সূর্যের দিকে একদিক ফিরিয়ে স্থির হয়ে গেল। গতবারের মতো মেশিন সমেত উলটে পড়াটা যাতে আর না হয়, তাই খুব আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে আনতে লাগলাম। ঘুরন্ত কাঁটাগুলোর ঘুরপাক ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল, শেষে হাজারের কাঁটাটা নিশ্চল হয়ে গেল দাঁড়িয়ে। স্কেলের ওপর কুয়াশার মতো দিনের কাঁটাটা ঘুরছিল, তাকেও বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। আরও আস্তে—জনশূন্য বালুকাবেলার আবছা রেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

খুব সাবধানে মেশিন থামিয়ে চারদিকে ভালো করে তাকালাম। আকাশ আর নীল নেই। উত্তর-পূর্বদিক কালির মতো কুচকুচে কালো; আঁধারের মধ্যে থেকে স্থির

দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করছিল ফ্যাকাশে সাদা তারাগুলো। মাথার ওপর ঘোর রক্তবর্ণ। তারা নেই একটিও। দক্ষিণ-পূর্বদিক টুকটুকে লাল আভায় জ্বলছে, সেদিকেই দিক্রেখায় অর্ধেক ঢাকা পড়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে সূর্যের বিশাল লাল দেহ। চারপাশে পাহাড়গুলো রুক্ষ লালচে রঙের। প্রাণের চিহ্নের মধ্যে দেখলাম, শুধু দক্ষিণ-পূর্বদিক ছেয়ে রয়েছে ঘন সবুজ উদ্ভিদে। একটানা গোধূলির মধ্যে বৃদ্ধি-পাওয়া গাছপালার ওপর যেমন উজ্জ্বল সবুজ রং দেখা যায়, এ রংও যেন সেইরকম। এ যুগে গুহার গাছ-শেওলা আর জঙ্গলের শৈবালের রঙের সঙ্গে সে রঙের মিল আছে অনেকটা।

ঢালু সমুদ্রতীরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল মেশিনটা। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পানসে আকাশের পটে দিক্রেখায় গিয়ে মিশেছে সমুদ্র। অদ্ভুত শান্ত তার জল। না আছে ঢেউ, না আছে আলোড়ন, কেননা বাতাসে চাঞ্চল্য নেই এতটুকুও। খুব মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্পন্দিত হচ্ছিল তার জল, খুব ধীরভাবে একটু উঠে আবার নেমে যাচ্ছিল মসৃণভাবে, তাই দেখেই বোঝা গেল, চিরন্তন সমুদ্র এখনও বেঁচে আছে, এখনও হারায়নি সে তার গতি। তীরের কাছে পুরু নুনের মতো একটা স্তর দেখলাম, পাণ্ডুর আকাশের নিচে লালচে হয়ে উঠেছে তার রং। মাথার মধ্যে একটু যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। লক্ষ করলাম, খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে আমায়। পাহাড়ে ওঠার সময়ে যেরকম হয়, সেইরকম। তাইতেই বুঝলাম, এখনকার চাইতে অনেক লঘু হয়ে গেছে তখনকার বাতাস।

অনেক দূরে জনশূন্য বেলাভূমির ওপর কর্কশ, আর্ত-চিৎকার শুনে দেখি, অতিকায় প্রজাপতির মতো সাদা একটা প্রাণী কাত হয়ে ডানা পতপত করে আকাশে উঠল, তারপর কয়েকটা পাক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশের পাহাড়ের আড়ালে। সে চিৎকার এমনই রক্ত জমানো যে, আঁতকে উঠে আরও ভালো করে চেপে বসলাম আসনে। চারপাশে আর-একবার তাকাতে দেখি, কাছের যে জিনিসটাকে লালচে পাথরের চাঙড় বলে ভেবেছিলাম, আস্তে আস্তে সেটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তখনই দেখলাম, পাথর নয়, দানব-কাঁকড়ার মতো একটা প্রাণী গুঁড়ি মেরে এগচ্ছে আমার পানেই। কল্পনা করুন তো, দূরের ওই টেবিলটার মতো মস্ত বড় একটা কাঁকড়াকে, টলমল করছে তার অনেকগুলো পা, ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে আপনার দিকে, বড় বড় দাঁড়া দুটো দুলছে, শংকর মাছের সুদীর্ঘ চাবুকের মতো লম্বা শুঁড়গুলো এদিকে-ওদিকে নড়ে নড়ে খুঁজছে শিকার, আর ধাতুর মতো কঠিন আর চকচকে আচ্ছাদনের দু'পাশ থেকে বোঁটার ডগায় বড় বড় দুটো আগুন-চোখ দপদপ জ্বলছে আপনার দিকে। পেছনদিকটা ঢেউতোলা অসমান, পাথরের গায়ে খোদাই করা কারুকাজের মতো হরেকরকম খাঁজকাটা। এখানে-সেখানে জমে রয়েছে সবুজ

শেওলার স্তর। কিম্ভূতকিমাকার মুখের গর্তে যেন বিশ্বের খিদে নিয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো সে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসতে লাগল আমার পানে।

স্থাণুর মতো এই ভয়ংকর দানবটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি, এমন সময়ে মাছি বসার মতো একটা সুড়সুড়ি লাগল আমার গালে। হাত দিয়ে ঝেড়ে দিলাম জায়গাটা, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সুড়সুড় করে উঠল গালটা, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কানের ওপরেও পেলাম সেই অনুভূতি। ঠাস করে চাপড় মারতেই সুতোর মতো কীসে হাত ঠেকল। তখুনি কিন্তু হাতের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল জিনিসটা। দারুণ চমকে পেছন ফিরে দেখি, আর-একটা অতিকায় কাঁকড়ার শুঁড়ের ডগা চেপে ধরেছিলাম আমি। আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল দানবটা। বোঁটার প্রান্তে নরকের আগুন জ্বলছিল লাল চোখে, ক্ষুধায় লোলুপ হয়ে উঠেছিল মুখের হাঁ, আর আঠালো কাদা-মাখা বড় বড় দাঁড়া বিরাট সাঁড়াশির মতো আস্তে আস্তে নেমে আসছিল আমার ওপর। চোখের পলক ফেলার আগেই লিভারের ওপর হাত দিয়ে এক মাসের ব্যবধান এনে ফেললাম আমার আর ওই দানোগুলের মধ্যে। মেশিন তখনও সেই একই বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, কাজেই মূর্তিমান বিভীষিকাগুলোকে দেখতে পেলাম তখনও। প্রায় এক ডজন কাঁকড়া পানসে আলোয় সবুজ শেওলার মধ্যে এদিকে-সেদিকে নড়াচড়া করছে।

সে যে কী ধু ধু শূন্যতা ছড়িয়ে ছিল পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে, তা আপনাদের কিছুতেই বোঝাতে পারব না। পুবের লাল আকাশ, পশ্চিমের অন্ধকার, নোনা-ধরা সাগর, পাথরে সাগরতীরে ধীরগতি কুৎসিত দানবগুলো, গাছ-শেওলার একই রকম বিষ-সবুজ রং, ফুসফুস ফাটানো লঘু বাতাস, সবকিছুই নিঃসীম আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে দেয় সমস্ত চেতনা। আরও একটা বছর এগিয়ে গেলাম আমি। কিন্তু সেখানেও সেই লাল সূর্য, আরও ম্যাড়মেড়ে। সেই মরা সাগর। সেই ঠান্ডা বাতাস। আর একই রকম কঠিন বর্ম-পরা প্রাণীদের সবুজ শেওলা আর লাল পাহাড়ের মধ্যে নড়াচড়া। আর দেখলাম, পশ্চিম আকাশে মস্ত বড় একাদশীর চাঁদের মতো বাঁকানো একটা পাণ্ডুর রেখা। কিন্তু পরিবর্তন নেই মৃত্যুকঠিন অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতার।
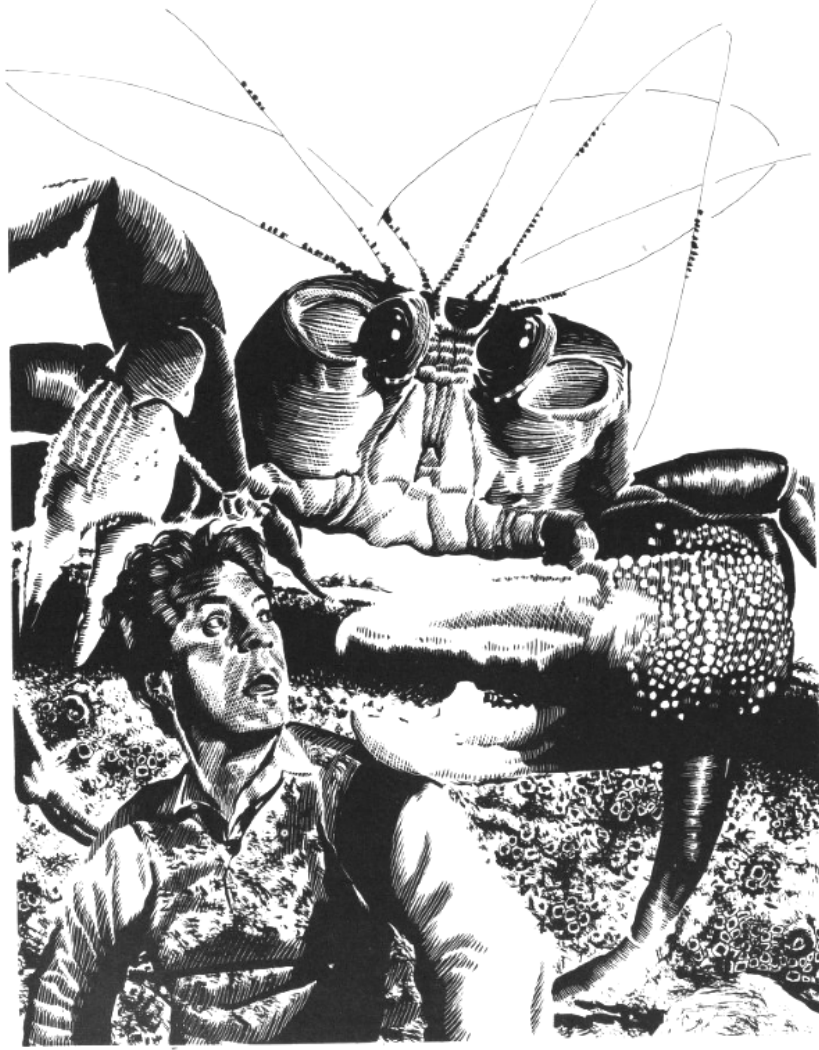
চিত্র ১.১০ আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল দানবটা।

এইভাবে থেমে থেমে এক-এক লাফে হাজার বছর কি তারও বেশি পেরিয়ে এগিয়ে চললাম আমি। পৃথিবীর অন্তিম অবস্থা দেখতে লাগলাম নিজের চোখে। সভয়ে দেখলাম, পশ্চিম আকাশে ক্রমশ আরও বড়, আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে সূর্য। বুঝলাম, পৃথিবীর আয় ফুরিয়ে আসছে। অবশেষে, আজ থেকে তিন কোটি বছর পরে লাল গোলার মতো বিপুল সূর্য প্রায়-অন্ধকার আকাশের দশ ভাগের প্রায় এক ভাগ আবছা করে তুলল। আবার থামলাম আমি। কেননা অগণিত কাঁকড়ার দল দেখলাম অদৃশ্য হয়ে গেছে, গাছ-শেওলা জাতের সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া লাল বেলাভূমিতে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। তারপরেই এল সাদা আস্তরণ। ঠান্ডায় হি-হি করে কেঁপে উঠলাম আমি। সাদা তুষার তার চাদর বিছিয়ে দিতে লাগল হেথায়-সেথায়। কালো আকাশের তারার আলোয় ঝিকমিক করে উঠল তুষারখচিত উত্তর-পূর্বদিক। দেখলাম, ঢেউখেলানো বিস্তর পাহাড়ের লালচে সাদা চুড়ো। সমুদ্রের ধারে

জমেছে বরফ, জলে ভেসে যাচ্ছে বরফের চাঁই। তখনও চিরকালের মতো অস্ত-যাওয়া সূর্যের আলোয় রক্তিম লবণ-সমুদ্র জমে যায়নি।

কোনওরকম জীবিত প্রাণীর আশায় চারপাশে তাকালাম। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। আকাশে, পৃথিবীতে, সাগরে—কিছুই নড়তে দেখলাম না। প্রাণের চিহ্ন শুধু ছিল পাহাড়ের ওপর সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে। সমুদ্রে নিচু একটা বালির চড়া উঠে এসেছে দেখলাম, তীরভূমি থেকেও জল সরে গেছে অনেক দূরে। মনে হল, দূরে বালির চড়ায় কালোমতো একটা জিনিস যেন ঝটপট করে উঠল, কিন্তু সেদিকে তাকাতেই থেমে গেল নড়াচড়া। আমারই চোখের ভুল, পাথর ছাড়া কিছুই দেখিনি। আকাশের তারাগুলো অবশ্য খুব জ্বলজ্বলে মনে হল, অনেকদিনের চেনা পুরানো বন্ধুর মতো মিটমিট করে ওরা তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

আচমকা লক্ষ করলাম, পশ্চিমে সূর্যের বাইরের গোল রেখা পালটে যাচ্ছে, বাঁকা রেখার একটা জায়গায় যেন বড় রকমের একটা টোল পড়েছে। চোখের সামনে দেখলাম, বড় হয়ে যাচ্ছে টোলটা। পুরো এক মিনিট ক্রমশ এগিয়ে আসা রাশি রাশি অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, তারপর বুঝলাম, গ্রহণ শুরু হল। হয় চাঁদ আর না-হয় বুধ গ্রহ আড়াআড়িভাবে যাচ্ছে সূর্যের ওপর দিয়ে। প্রথমে চাঁদ বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে অনেক ভেবে দেখলাম, পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যেকার একটি গ্রহকেই সেদিন পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে লাগল। পূর্বদিক থেকে নতুন তেজে বয়ে এল ঠান্ডা বাতাস। আকাশ থেকে সাদা বরফ-বৃষ্টি আরও বেড়ে উঠল। সমুদ্রের কিনারা থেকে ভেসে এল অদ্ভুত ছলছল শব্দের সঙ্গে কীসের ফিসফিসানি। এইসব প্রাণহীন শব্দ ছাড়া পৃথিবী একেবারে নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ? সে নৈঃশব্দ্য যে কী তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাখির যে কূজন, মানুষের সাড়া, ভেড়ার ডাক, পোকামাকড়ের গুনগুনানি আর স্পন্দন সূচনা করে জীবন, সেসবই থেমে গেছে। অন্ধকার যত ঘন হতে লাগল, ততই বাড়তে লাগল বরফ পড়া, ততই কনকনে হয়ে উঠতে লাগল বাতাস। শেষে, একে একে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি দূরের পাহাড়ের চুড়োগুলো হারিয়ে গেল অন্ধকারের আড়ালে। গোঙিয়ে কেঁদে উঠল বাতাস। দেখলাম, গ্রহণের ঠিক কেন্দ্রের কালো ছায়াটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পরের মুহূর্তেই শুধু ফ্যাকাশে তারাগুলো দেখা গেল, আর সবকিছুই গেল অস্পষ্ট হয়ে। আকাশ ঢেকে গেল নিবিড় তিমিরে।

এই মহাতিমিরের আতঙ্ক চেপে বসল আমার ওপর। দারুণ শীতে হাড়সুদ্ধ কনকনিয়ে উঠছিল, নিঃশ্বাস নিতেও যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। থরথরিয়ে কেঁপে উঠলাম, দারুণ গা-বমি-বমি ভাব পাক দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গে। তারপরেই লাল মুগুর

পড়ার মতো সূর্যের কিনারা বেরিয়ে এল আকাশে। নিজেকে সামলাতে মেশিন থেকে নেমে দাঁড়ালাম আমি। মাথা ঘুরতে লাগল আমার, মনে হল ফিরে যাওয়ার মতো ক্ষমতাও আর নেই। অর্ধ-অচেতন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সেই জিনিসটা আবার নড়ে উঠল লাল জলের মাঝে—এবার তার নড়ে ওঠা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইল না আমার। ফুটবল কি তার চাইতেও বড় গোলাকার একটা বস্তু, গা থেকে কতকগুলো শুঁড় বেরিয়ে এসেছে। ছলছলে রক্তের মতো লাল জলের বুকে জিনিসটা মনে হল ঘোর কালো রঙের, এদিকে-ওদিকে দিব্যি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছিল জিনিসটা। তারপরেই মনে হল, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু দূর ভবিষ্যতের ওই ভয়াবহ গোধূলিতে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকার আতঙ্কই আমাকে কোনওরকমে টেনে এনে বসিয়ে দিলে টাইম মেশিনের আসনে।

১৫। সময়-পর্যটকের প্রত্যাবর্তন

আর তাই ফিরে এলাম আমি। নিশ্চয় বহুক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিলাম মেশিনের ওপর। দিনরাতের মিটমিটে জ্বলা-নেবা আবার শুরু হল, আবার সোনালি হয়ে উঠল সূর্য, আকাশ নীল। আরও সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম আমি। জমির ওঠানামার রেখা-তরঙ্গ কমে এল—মসৃণ হয়ে উঠল তার গতি। ডায়ালের ওপর পেছনদিকে ঘুরে চলল কাঁটাগুলো। আবার দেখতে পেলাম ক্ষয়িষ্ণু মানবজাতির নিদর্শন বড় বড় বাড়ির আবছা ছায়া। তা-ও গেল মিলিয়ে, এল অন্য দৃশ্য। দেখতে দেখতে লক্ষের কাঁটা শূন্যের ঘরে এসে দাঁড়াতে গতি কমিয়ে দিলাম। অনেকদিনের চেনা আমাদের সুন্দর বাড়িঘরদোর আবার দেখতে পেলাম, হাজারের কাঁটা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেখানে এসে থেমে গেল। দিনরাতের আনাগোনা আরও কমে এল। তারপরেই ল্যাবরেটরির পুরানো দেওয়াল ফিরে এল আমার চারপাশে। খুব সাবধানে আরও কমিয়ে দিলাম মেশিনের গতি।

ছোট্ট কিন্তু বেশ মজার একটা জিনিস লক্ষ করলাম। আগেই বলেছি আপনাদের, যাত্রা শুরু করার মিনিটকয়েকের মধ্যে খুব অল্প গতিবেগের সময়ে মিসেস ওয়াচেটকে ঘরের মধ্যে দিয়ে রকেটের মতো হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। ফেরবার সময়ে ঠিক সেই মিনিটটাও পেরিয়ে আসতে হল আমাকে। কিন্তু এখন দেখলাম, সমস্ত জিনিসটা ঘটল উলটোদিক থেকে। উলটোদিক থেকে ফিল্ম চালালে যেরকম দেখা যায়, ঠিক সেইরকমভাবে আগে নিচের দরজাটা খুলে গেল, পিঠটা সামনের দিকে রেখে যেন পিছলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন মিসেস ওয়াচেট। আর ওইভাবেই পিছু হেঁটে পেছনের যে দরজা দিয়ে আগে তিনি ঢুকেছিলেন, সেই দরজা দিয়েই

বেরিয়ে গেলেন! ঠিক তার আগেই মনে হল, হিলিয়ারকেও মুহূর্তের জন্য দেখলাম, কিন্তু সে-ও বিদ্যুৎ-চমকের মতো চকিতে উধাও হয়ে গেল।

তারপরেই থামালাম মেশিনটা। চারদিকে তাকিয়ে আবার দেখতে পেলাম আমার পরিচিত ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি আর টুকটাক সরঞ্জাম—ঠিক যেভাবে ফেলে গিয়েছিলাম, সেইভাবেই পড়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। টলতে টলতে মেশিন থেকে নেমে পাশের বেঞ্চে বসলাম। বেশ কয়েক মিনিট কেঁপে জ্বর আসার মতো দারুণভাবে কাঁপতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর অনেকটা সামলে নিলাম। চারপাশে আগের মতোই রয়েছে আমার পুরানো কারখানা, কিছুই পালটায়নি। ভাবলাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিনি আমি।

কিন্তু তা তো নয়! ল্যাবরেটরির দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল টাইম মেশিন, কিন্তু শেষ হয়েছে উত্তর-পশ্চিমের দেওয়ালের ধারে—সেখানেই এখনও দেখতে পাবেন মেশিনটা। আর এই দূরত্বটুকুই ছিল ছোট লন আর সাদা স্ফিংক্স-এর বেদির মধ্যে—মর্লকরা এই পথটুকুই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল টাইম মেশিনটা।

বেশ কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে রইল আমার মগজ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্যাসেজ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলাম এদিকে। দরজার পাশেই টেবিলের ওপর পলমল গেজেটটা দেখলাম। আপনাদের টুকরো টুকরো কথা আর ছুরি-কাঁটার শব্দ শুনতে পেলাম। বড় দুর্বল লাগছিল নিজেকে, তাই একটু ইতস্তত করলাম। কিন্তু মাংসের লোভনীয় সুবাস নাকে আসতেই দরজা খুলে দেখলাম আপনাদের। তারপর কী হল তা তো জানেনই। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে এই আশ্চর্য কাহিনি শোনাতে বসেছি আপনাদের।

১৬। কাহিনির পর

একটু থেমে আবার বললেন তিনি, 'ভাবছেন, মস্ত বড় একটা আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে দিলাম। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের গল্পটা আপনাদের বলার জন্যে যে ফিরে এসেছি তা-ও তো ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না আমি।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, এতটা আশা করা সত্যিই উচিত হয়নি আমার। ধরে নিন, সবটাই ডাহা মিথ্যে, নিছক একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী। ধরে নিন, কারখানায় বসে একটা আজগুবী স্বপ্ন দেখেছি। না-হয় ভাবতে পারেন, মানুষজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এই গাঁজাখুরি উপন্যাসটাই ফেঁদে বসেছি। নিছক গল্প হিসাবে ধরেই বলুন তো কেমন লাগল আপনাদের?'

পাইপটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগলেন তিনি। ক্ষণকালের জন্য গভীর নৈঃশব্দ্য নেমে এল ঘরে। তারপরেই শুরু হল চেয়ার টানার জুতোর মসমস শব্দ।

অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে দেখি, পলকহীন চোখে ডাক্তার লক্ষ করছেন সময়-পর্যটককে। সম্পাদক তাঁর ছ'নম্বর সিগারেটটার ডগায় চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছেন। সাংবাদিক ঘড়ি হাতড়াচ্ছেন। বাকি সবাই একেবারে নিশ্চল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সম্পাদক। 'কী দুর্ভাগ্য আমাদের, আপনি গল্প-লেখক হতে পারলেন না!'

'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেননি?'

'আরে মশাই—।'

'তাহলে করেননি।' আমার দিকে ফিরলেন সময়-পর্যটক। 'দেশলাইটা দিন তো... বিশ্বাস কি আমিও করেছি... কিন্তু...'

হঠাৎ ওঁর চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা শুকনো সাদা ফুল দুটোর ওপর। তারপরেই আঙুলের গাঁটের প্রায় শুকনো কাটাছেঁড়াগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ল্যাম্পের কাছে এসে ফল দুটো নেড়েচেড়ে দেখলেন ডাক্তার। বিড়বিড় করে ওঠেন তিনি।

সাংবাদিক বলেন, 'একটা বাজতে চলল, এবার তাহলে বাড়ি যাওয়া যাক, কী বলেন?'

মনোবিজ্ঞানী বললেন, 'অনেক ট্যাক্সি মিলবে এখন।'

ডাক্তার বললেন, 'ফুলগুলো দেখতে কিন্তু অদ্ভুত। এগুলো নিয়ে যেতে পারি কি?'

ইতস্তত করেন সময়-পর্যটক, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে স্পষ্ট বলেন, 'নিশ্চয় না।'

'সত্যি করে বলুন তো কোত্থেকে জোগাড় করলেন ওগুলো?' শুধালেন ডাক্তার। দু'হাতে মাথা চেপে ধরেন সময়-পর্যটক। একটু চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'উইনা রেখেছিল আমার পকেটে। কিন্তু... কিন্তু এসব কি সত্যি না কল্পনা? সত্যিই কি আমি কোনওদিন টাইম মেশিন বা তার মডেল তৈরি করেছিলাম? স্বপ্ন, না পাগল হলাম আমি? নাঃ, মেশিনটা দেখতেই হবে আমাকে!'

চট করে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে করিডরের দিকে এগিয়ে গেলেন উনি, পিছুপিছু আমরাও গেলাম। ল্যাম্পের কাঁপা আলোয় দেখলাম দেওয়ালের গায়ে খাড়া মেশিনটা, বিদঘুটে স্থূল তার গড়ন, তামা আবলুশ, হাতির দাঁত আর স্বচ্ছ কোয়ার্টজে চিকমিকে তার শ্রীহীন অঙ্গ। স্বপ্ন যে নয়, তা কঠিন ধাতুর রেলিং স্পর্শ করেই বুঝলাম, হাতির দাঁতের ওপর লেগেছে বাদামি ছোপ, এখানে-সেখানে কাদার দাগ, নিচের অংশে ঘাস আর শেওলার কুচি, একটা রেলিং বেঁকে গেছে। ল্যাম্পটা বেঞ্চির ওপর রেখে বেঁকা রেলিং-এ হাত বুলিয়ে বললেন সময়-পর্যটক, 'স্বপ্ন নয় তাহলে। যে কাহিনি আপনাদের বললাম, তার প্রতিটি অক্ষর সত্য।' বলে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে নিঃশব্দে ফিরে এলেন স্মোকিং রুমে।

বিদায় নেওয়ার সময় একটু ইতস্তত করে ডাক্তার বললেন, 'আপনি দিনকতক বিশ্রাম নিন, অতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন আজকাল।' উত্তরে হা হা করে হেসে উঠলেন সময়-পর্যটক।

সম্পাদকের সঙ্গে একই ট্যাক্সিতে ফিরলাম আমি। ভদ্রলোক তো 'ডাহা মিথ্যে' বলে সবকিছু উড়িয়ে দিলেন। আমার পক্ষে কিন্তু অত চট করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল না। গল্পটা যেমন আজগুবি আর অবিশ্বাস্য, বলার ভঙ্গিও তেমনি বিশ্বাস্য যুক্তিসংগত। ঠিক করলাম, আবার দেখা করতে হবে সময়-পর্যটকের সঙ্গে। এইসব কথা ভেবে সারারাত ভালো করে ঘুমাতেই পারলাম না আমি।

পরের দিন সকালে গিয়ে শুনলাম, ল্যাবরেটরিতে রয়েছেন উনি। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। টাইম মেশিনটা একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে, হাত দিয়ে আলতো করে ছুঁলাম লিভারটা। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে দুলে ওঠার মতো সামান্য দুলে উঠল বিদঘুটে মেশিনটা। চমকে হাত সরিয়ে নিলাম আমি। করিডর দিয়ে স্মোকিং রুমে আসতে আসতে সময়-পর্যটকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ভেতর বাড়ি থেকে আসছিলেন উনি। এক কাঁধে ছোট্ট একটা ক্যামেরা, অপর কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। আমাকে দেখে হেসে উঠলেন, 'মেশিনটা নিয়ে খুব ব্যস্ত এখন, কী খবর আপনার?'

শুধালাম, 'কাল রাতে বিলকুল ধাপ্পা মারলেন কি সত্যি বললেন, তা-ই জানতে এলাম। সত্যিই কি আপনি সময়ের পথে বেড়াতে পারেন?'

'পারি।' আমার চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার বললেন উনি। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আধ ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। ম্যাগাজিনগুলো রইল, পড়ুন। লাঞ্চ পর্যন্ত যদি সবুর করতে পারেন, সময়পথে সত্যিই ভ্রমণ করতে পারি কি না, তার প্রমাণ আপনাকে আমি দেব। এখন তাহলে আসি।'

বলে চলে গেলেন উনি। ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম। যে কথাগুলো বলে গেলেন, তার অর্থ তখন অত খেয়াল করিনি। দৈনিক কাগজটা কিছুক্ষণ পড়ার পর হঠাৎ মনে পড়ল, একটু পরেই একজন প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। ঘড়ি দেখলাম, সময় আর বেশি নেই। ভাবলাম, সময়-পর্যটককে বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।

ল্যাবরেটরির দরজার হাতলটা ধরামাত্র একটা বিস্ময়-চকিত চিৎকার শুনলাম, শেষের দিকে অদ্ভুতভাবে ক্ষীণ হয়ে এল শব্দটা আর শুনলাম, ক্লিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘটাং করে একটা আওয়াজ। দরজা খুলতেই এক ঝলক হাওয়া আমার পাশ দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল বাইরে, আর ভেতরে মেঝের ওপর ভাঙা কাচ পড়ার ঝনঝন শব্দ ভেসে এল। সময়-পর্যটককে ভেতরে দেখলাম না। মুহূর্তের জন্যে বেগে

ঘুরপাক খাওয়া তামা আর আবলুশের মাঝে যেন খুব আবছা প্রেতচ্ছায়ার মতো একটা মূর্তিকে বসে থাকতে দেখলাম, সে মূর্তি এত স্বচ্ছ যে, তার মধ্যে দিয়ে পাশে বেঞ্চের ওপর রাখা ড্রয়িং-এর সরঞ্জামগুলোও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু চোখ রগড়েই দেখি, ভৌতিক ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেছে। টাইম মেশিনও উধাও হয়ে গেছে। দেওয়ালের পাশে ছোট্ট একটা ধুলোর ঘূর্ণিপাক ছাড়া ল্যাবরেটরি একেবারে শূন্য। জানলার একটা কাচও দেখলাম ভেঙে এসে পড়েছে ঘরের ভেতর।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটল চোখের সামনেই, তবুও কিন্তু নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করে উঠতে পারলাম না। এমন সময়ে বাগানের দিকের দরজা খুলে মালি ঢুকল ভেতরে।

শুধালাম, 'উনি কি এদিক দিয়ে বাইরে গেলেন?'

'না স্যার, এদিকে কেউ আসেনি।'

বুঝলাম সব। প্রকাশকের কথা ভুলে গিয়ে সময়-পর্যটকের জন্য বসে রইলাম আমি। প্রতীক্ষায় রইলাম আরও বিচিত্র কাহিনি শোনার, বিচিত্রতর নিদর্শন আর ফোটোগ্রাফ দেখার আশায়। কিন্তু মনে হচ্ছে, সারাজীবনেও আমার এ প্রতীক্ষা আর ফুরাবে না। সময়-পর্যটক উধাও হয়েছেন তিন বছর আগে—আর সবাই জানেন, আজও তিনি ফেরেননি।

উপসংহার

সন্দেহ জাগে, সত্যিই কি আর ফিরবেন উনি? হয়তো অতীতে ফিরে গিয়ে আদিম প্রস্তরযুগের রক্তপিপাসু বুনো বর্বরদের হাতে পড়েছেন; না-হয় তলিয়ে গেছেন খড়িগোলা ক্রিটেশাশ সমুদ্রের পাতালগুহায়; নয়তো জুরাসিক আমলের অতিকায় সরীসৃপ আর কিম্ভূতকিমাকার সরিয়ানদের রাক্ষুসে খিদে মিটিয়েছেন নিজেকে দিয়ে। এমনও হতে পারে, উনি এখন প্লিসিওসরাসে ভরা কোনও ওসাইটিক প্রবাল দ্বীপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথবা ট্রায়াসিক যুগের নির্জন লবণ সমুদ্রের ধারে পথ ভুলেছেন। কিংবা আরও সামনের দিকে এগিয়ে এমন এক কাছাকাছি যুগে পৌঁছেছেন, যেখানে মানুষ এখনও মানুষ, কিন্তু আমাদের যুগের সব সমস্যা, সব প্রশ্নের সমাধান করে রামরাজ্য সৃষ্টি করেছে তারা। মানুষ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে যে সমাজের উন্নতি করতে, হয়তো একদিন সেই সমাজই হবে তার কবরস্থান। কিন্তু আমার কাছে ভবিষ্যৎ এখনও অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে ভরা—তাঁর কাহিনিই শুধু সামান্য আলো ফেলেছে এখানে-সেখানে। হয়তো সে কাহিনি নিছক অলীক, কিন্তু তবুও আমার কাছে এখনও রয়েছে দু'টি শুকনো ফুল—যে ফুল পৃথিবীতে এর আগে বা এখনও কোথাও জন্মায়নি।...

[১] অধুনালুপ্ত দানবাকার সামুদ্রিক সর্পবিশেষকে ইকথিওসরাস বলে।

[২] গ্রিফিন একটা কাল্পনিক জন্তুর নাম। এর দেহ সিংহের মতো, চঞ্চু আর ডানা শকুনির মতো।

[৩] কল্পনার রামরাজ্যকে বলে ইউটোপিয়া। এ-রাজ্যে অঢেল সুখ ছাড়া দুঃখের বালাই নেই।

[৪] ম্যাডাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জের নিশাচর বানরদের লিমার বলে।

'The War of the Worlds' ওয়েলেসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক আকারে ১৮৯৭ সালে ব্রিটেনে 'Pearson's Magazine' এবং মার্কিন দেশে 'Cosmopolitan' পত্রিকায়। ১৮৯৮ সালে এটি বই আকারে ছেপে বেরয় লন্ডনের 'William Heinemann' প্রকাশনী থেকে। মনুষ্য জাতি এবং এলিয়েন দ্বন্দ্বের সাহিত্য ধারার প্রথম দিককার নিদর্শন হিসেবে এই উপন্যাস এখনও উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাস অনুপ্রাণিত করেছিল এই ধারার আর অনেক গল্প, নাটক, উপন্যাস এবং চলচিত্র। ১৯৩৮ সালে উপন্যাসটি অনুসরণে অরসন ওয়েলেস কৃত রেডিয়ো নাটিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অগাস্ট ১৯২৭ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories' পত্রিকায়। অদ্রীশের অনুবাদে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কিশোর মন' পত্রিকায় ১-১৫ নভেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যায়।

দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস
(The War of the Worlds)

১৮০০-র শেষের ক'বছরে কাউকে যদি বলা হত, মানুষের চাইতে অনেক বেশি চৌকস প্রাণী পৃথিবীর ওপর নজর রেখে চলেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে—হেসেই উড়িয়ে দিত কথাটা। সত্যি সত্যিই কিন্তু মহাশূন্যে বহু দূরে বসে এই ধরনের প্রাণীরা খর-নজরে দেখে যাচ্ছিল পৃথিবীকে। সেই সঙ্গে ফন্দি এঁটে চলেছিল, কীভাবে আক্রমণ করা যায় আমাদের।

১৮০০-র শেষের দিকে বিশ্বের বেশ ক'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেজায় উত্তেজিত হলেন চাঞ্চল্যকর একটা খবর শুনে। মঙ্গল গ্রহের বুকে নাকি একটা বিস্ফোরণ দেখা গেছে। বিশালকায় একটা আগুনের গোলক নাকি বিষম বেগে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। নানান খবরের কাগজে বেরল এই খবর। সাধারণ মানুষ কিন্তু বিচলিত হল না মোটেই। আসন্ন বিপদ উদ্‌বিগ্ন করল না কাউকেই।

খবরটা আমার কানে এসেছিল হঠাৎ। ওগিলভি নামে আমার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধু আছে। মানমন্দিরে বসে টেলিস্কোপ দিয়ে সে দেখেছিল ধাবমান অগ্নিগোলককে। রাস্তায় ওগিলভির সঙ্গে মুখোমুখি হতেই ব্যাপারটা বললে আমাকে।

সবশেষে বললে, স্বচক্ষে দেখতে যদি চাও, চলে এসো আজ রাতে। টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে ধাত ছেড়ে যাওয়ার মতো কাণ্ডকারখানা।

শুনেই রীতিমতো উত্তেজিত হয়েছিলাম। বললাম, বেশ তো, আসছি আজ রাত্রে।

সেই রাতেই টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল আর-একটা বিস্ফোরণ। গ্যাসের বিস্ফোরণ। তখন রাত ঠিক বারোটা।
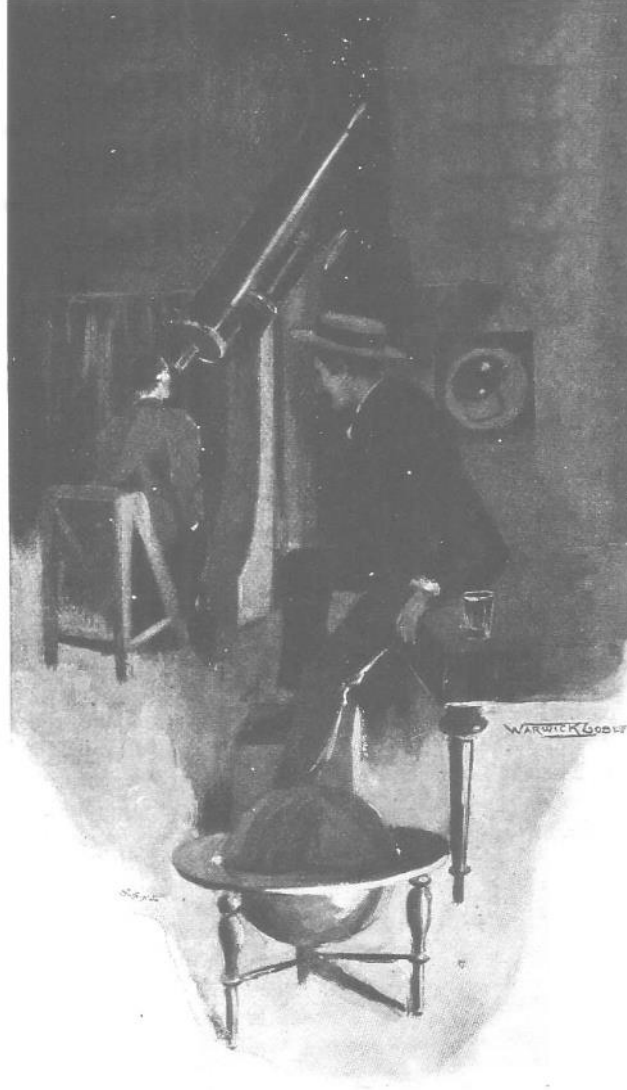
চিত্র ২.১ টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে ধাত ছেড়ে যাওয়ার মতো কাণ্ডকারখানা।

টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ওগিলভিই প্রথমে দেখেছিল সেই বিস্ফোরণ। মঙ্গলের বুকে। চিৎকার করে উঠেছিল বিষম উত্তেজনায়, লালচে ঝলক! কী যেন একটা ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে!

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টেলিস্কোপে চোখ রেখেছিলাম আমি।

এবার দেখেছিলাম সেই আশ্চর্য দৃশ্য!

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঠিকরে যাচ্ছে রক্তরাঙা গ্রহ মঙ্গলের বুক থেকে!

হতভম্ব গলায় বলেছিলাম, ওগিলভি! ওগিলভি! এ কাদের সংকেত? মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের নাকি? সত্যিই কি মঙ্গলে জীব আছে?

ননসেন্স!—বলেছিল ওগিলভি, মঙ্গলের বুকে মানুষের মতো প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা লাখে একটাও নয়। যা দেখছ, তা বোধহয় উল্কাবৃষ্টি অথবা আগ্নেয়গিরির

বিস্ফোরণ।

মোটের ওপর, ওগিলভির মতো প্রত্যক্ষদর্শী বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না। মঙ্গলগ্রহীরাও বিপুলবেগে ধেয়ে আসতে লাগল পৃথিবীর দিকে—দিনে দিনে এগিয়ে আসতে লাগল কাছে... কাছে... আরও কাছে!

মঙ্গল গ্রহ যে রক্তরাঙা লাল গ্রহ, তা আমরা জানি অনেকদিন থেকেই। যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েছি এই গ্রহকে। কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি, সে যুদ্ধ হবে আমাদের সঙ্গেই। সূর্য থেকে চোদ্দো কোটি মাইল দূরে বসেও তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের হালচাল দেখেছে, নিজেদের গ্রহে বসবাস যখনই একটু একটু করে কষ্টকর হতে আরম্ভ করেছে—ফন্দি এঁটেছে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরের পৃথিবী গ্রহটাকে কবজায় আনার।

মঙ্গল আর পৃথিবী কাছাকাছি এসেছিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। ২ আগস্টের খবরের কাগজে বেরল, একটা দারুণ আলোর ঝলকানি নাকি দেখা গেছে মঙ্গলের বুকে, পরপর কয়েক রাত ধরে চলল এই একই ব্যাপার। রাত ঠিক বারোটায় ঝলসিত হয় একটা বিপুল আলোকপিণ্ড—অন্তর্হিত হয় মিনিট পনেরো পরে। স্পেকট্রোস্কোকোপের বর্ণালি দেখে একজন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, মনে হচ্ছে যেন একটা গ্যাসের পিণ্ড জ্বলতে জ্বলতে নক্ষত্রবেগে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে।

ওগিলভির সঙ্গে দেখা হয় ঠিক এই সময়ে। নিস্তব্ধ মানমন্দিরে বসে এক কোণে রাখা ম্যাড়মেড়ে আলোয় রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম দুই বন্ধু। দেখেছিলাম মঙ্গলের বুকে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ঠিক যেন আর-একটা আলোর ডেলা ধেয়ে আসছে এই পৃথিবীর দিকে।

পরপর দশ রাত একই কাণ্ড দেখা গেল রহস্যময় গ্রহ মঙ্গলের বুকে। রাত ঠিক বারোটার সময়ে! তারপর থেকেই কিন্তু রক্তরাঙা গ্রহ শুধু লাল গ্রহই হয়ে রইল—লালের ঝলক দেখিয়ে আর বিড়ম্বিত করেনি পৃথিবীবাসীদের।

কিন্তু আক্কেল গুড়ুম করে দেবার পরিকল্পনা যে চালু হয়ে গেছে, তখনও যদি তা কেউ ভাবতে পারত।

আমি কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভেবেছিলাম। ওগিলভির কথায় মন মানতে রাজি হয়নি। ওই যে অগ্নিঝলক, তা কখনওই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা খসে পড়ার ফলে হচ্ছে না। প্রকাণ্ড কামান দাগলে এমনি ঝলক দেখা যায়। এমনি ধূম্রবলয় ঠিকরে যায়। তবে কি পরপর দশ রাত ধরে গোলার মধ্যে মহাকাশযান পাঠাল মঙ্গলগ্রহীরা পৃথিবীকে টিপ করে?

তারপর এল সেই রাত। পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকরতম রাত। একটা তারা খসে পড়ল আকাশ থেকে। শেষ রাতের দিকে। সবুজ আলোর একটা রেখা দেখা গেছে

নাকি খসে-পড়া তারার পেছনে। বেশ কয়েক সেকেন্ড সবুজ আলোটা ভেসেছিল আকাশে। একটা হিসহিস শব্দও শোনা গিয়েছিল খসে-পড়া তারা পৃথিবীর দিকে বেগে ধেয়ে আসার সময়ে।

উল্কাপাত নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। কিন্তু টনক নড়েছিল ওগিলভির। ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়েছিল। দেখেছিল, বিশাল একটা সিলিন্ডার বালির মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে আকাশ থেকে বেগে নেমে আসার পর। জমি গর্ত হয়ে গেছে ধাক্কার চোটে। বালি আর পাথর ঠিকরে গিয়ে গোলাকার টিলা বানিয়ে ফেলেছে চারধারে।

উল্কা তো সচরাচর গোলমতো হয়। সিলিন্ডার আকারের তো হয় না। ব্যাস প্রায় নব্বই ফুট। ভেতরে গুড়গুড় করে কী যেন আওয়াজ হচ্ছে। এত গরম যে কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়।

চোঙাটা যে ফাঁপা হতে পারে, এ ধারণা তখনও মাথায় আসেনি ওগিলভির।

স্তম্ভিতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ওগিলভি। দেখেছিল, প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে ফার গাছগুলোকে প্যাঁকাটির মতো ভাঙতে ভাঙতে নেমে এসেছে সিলিন্ডারটা। জঙ্গলেও আগুন লেগেছে। ধোঁয়া উঠছে।

হঠাৎ চমক ভেঙেছিল ওপর থেকে ঝুরঝুর করে কী পড়ছে দেখে। সিলিন্ডারের ওপরের দিকে ছাইয়ের মতো খোসা খসে খসে পড়ছে গর্তের মধ্যে। কেন পড়ছে? একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেই রক্ত জল হয়ে গেল ওগিলভির।

সিলিন্ডারের ওপরের দিকে ঠিক যেন একটা ঢাকনা আঁটা রয়েছে। পেঁচিয়ে আঁটা। আস্তে আস্তে ঘুরছে সেই ঢাকনা। অর্থাৎ প্যাঁচ খুলে যাচ্ছে।

ভেতরে তাহলে কেউ রয়েছে। এখনও মরেনি! চোঙাটাও নিরেট নয়—ফাঁপা!

হয়তো ভেতরে মানুষ আছে, আধমরা মানুষটাকে সাহায্য করা দরকার—এই ভেবেই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে টিলার গা বেয়ে গরম চোঙার দিকে এগিয়েছিল ওগিলভি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকের মতো সম্ভাবনাটা খেলে গিয়ে- ছিল মাথার মধ্যে!

চিত্র ২.২ গুটিগুটি কাছে গিয়েছিল ওগিলভি।

মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেনি তো এই সিলিন্ডার? ভেতরে যে বা যারা রয়েছে, মঙ্গল গ্রহের জীব নয় তো তারা?

তবুও গুটিগুটি কাছে গিয়েছিল ওগিলভি। কিন্তু চোঙার গায়ে হাত দিতেই ছ্যাঁকা লেগে গিয়েছিল হাতে। দারুণ গরম। উন্মাদের মতো বেরিয়ে এসেছিল তৎক্ষণাৎ গর্তের বাইরে। সিলিন্ডার পড়ে ছিল শহরের বাইরে ফাঁকা জায়গায়। এখন ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটল দূরের শহরের দিকে। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল হেন্ডারসনের সঙ্গে।

হেন্ডারসন পেশায় সাংবাদিক। লন্ডনের একটা খবরের কাগজের রিপোর্টার। বাড়ির সামনে বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল কোদাল দিয়ে।

হন্তদন্ত হয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিল ওগিলভি। বলেছিল চিৎকার করে, হেন্ডারসন, কাল রাতে তারা খসে পড়া দেখেছিলে?

ওগিলভির মতো বৈজ্ঞানিকের এহেন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল হেন্ডারসন। বলেছিল সাগ্রহে, দেখেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—দেখে এলাম জিনিসটাকে।

—কোথায় দেখলে?

—হর্সেল কমনে পড়ে আছে।

চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে হেন্ডারসনের। কোদাল ফেলে দিয়ে বলেছিল রুদ্ধশ্বাসে, উল্কাপিণ্ড! বল কী? চল, চল, দেখে আসা যাক। দৌড়াল দু'জনে কমন প্রান্তরের দিকে। যেতে যেতে ওগিলভি হেন্ডারসনকে বললে যা যা দেখেছে এবং শুনেছে।

কথা বলতে বলতেই পৌঁছে গেল উঁচু টিলার ওপর। ওই তো পড়ে রয়েছে মহাকায় চোঙা। একইভাবে হেলে বেশ খানিকটা গেঁথে গেছে জমির মধ্যে। ধোঁয়ার ফিকে রেশ দেখা যাচ্ছে এখনও। কিন্তু...

ডালাটা প্রায় খুলে এসেছে। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা সোঁ সোঁ শব্দ। যেন হাওয়া ঢুকছে ভেতরে... অথবা বেরিয়ে আসছে বাইরে।

কাছে এগিয়ে গিয়েছিল দুই মূর্তিমান। চোঙার ধাতব দেহে লাঠি ঠুকেছিল ঠনঠন শব্দে। কিন্তু কোনও সাড়াই আসেনি ভেতর থেকে।

গুম হয়ে গিয়েছিল ওগিলভি। বলেছিল চিৎকার করে, ভেতরে যারা আছ, চুপটি করে বসে থাক। আরও লোকজন নিয়ে আসছি।

হেন্ডারসন বলেছিল, বেচারা! ঠান্ডায় জমে গেছে, এমনও হতে পারে।

ঠান্ডায় জমুক আর গরমেই মরুক, নিজেদের দ্বারা আর কিছু সম্ভব নয় দেখে হেন্ডারসন আর ওগিলভি ফিরে এসেছিল শহরে—আরও লোকজন জোটানর আশায়। কোদাল-শাবল নিয়ে আসতে হবে প্রত্যেককে।

হেন্ডারসন তখন ভাবছে। এমন জবর খবরটা আগে পাঠানো দরকার নিজের খবরের কাগজে। তাই আগে টেলিগ্রামে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে দিল সম্পাদককে।

খবরটা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল। খবরের কাগজ কিনতে হকারের কাছে গিয়েছিলাম আমি—চোঙা-সংবাদ শুনলাম তখনই।

কাগজের হকারই বললে, শুনেছেন? তাজা খবর! মঙ্গল গ্রহ থেকে মানুষ এসেছে। বেশি দূরে নয়—ওই কমনে?

অসম্ভব!—বলেছিলাম আমি।

বলা বাহুল্য, বিলক্ষণ চমকে গিয়েছিলাম খবরটা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছিলাম নিজের চোখে দেখবার জন্যে। চোঙার চারধারের উঁচু টিলায় ততক্ষণে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। মজা দেখছে। কিছু লোক নেমে পড়েছে গর্তে। গাঁইতি-শাবল দিয়ে চাড় মারছে চোঙার তলায়। অদ্ভুত ধূসর রঙের অজানা ধাতু দিয়ে তৈরি বিশাল সিলিন্ডারটার দিকে চেয়ে ছিলাম আমি ভয়বিহ্বল চোখে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল একজন শাবলধারী, হুঁশিয়ার! চোঙার ঢাকনা খুলে যাচ্ছে... পেঁচিয়ে খোলা হচ্ছে ভেতর থেকে।

খুলে গেল ঢাকনা। দড়াম করে পড়ল চোঙার গায়ে। ঝুলতে লাগল চকচকে চাকার মতো।

সভয়ে সরে এসেছিল কৌতূহলী মানুষগুলো। হেঁকে সরিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। কী আছে ভেতরে, তা যখন জানা নেই—তখন তফাত যাওয়াই ভালো।

হতভম্ব চোখে আমি চেয়ে ছিলাম খোলা গর্তটার দিকে। হেলে-পড়া অদ্ভুত কারুকাজ-করা বিশাল সিলিন্ডারের ওপরদিককার ছোট হ্যাচের মতো একটা ফোকর হঠাৎ উন্মুক্ত হয়েছে। না জানি এবার কী বিস্ময় আবির্ভূত হবে ফোকর দিয়ে।

মানুষই উঁকি মারবে, আশা করেছিল সবাই। আমি নিজেও তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু ছায়ার মধ্যে দিয়ে যা দেখলাম, তা আর যা-ই হোক—মানুষের চোখ নয়।

গনগনে দুটো বস্তু, গোল চাকার মতো বস্তু, চেয়ে আছে আমাদের দিকে। তারপরেই ধূসর সর্পের মতো কী যেন একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল ফোকরের মধ্যে থেকে—লকলকিয়ে শূন্যপথে এগিয়ে এল আমার দিকে।

হট্টগোলটা শুরু হল তৎক্ষণাৎ। বীভৎস ওই শুঁড়ের লকলকানি দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল যাদের, তাদের মধ্যে সবার আগে গলার শির তুলে চিৎকার করে উঠল একটি মেয়ে। দুদ্দাড় করে পালাতে লাগল যে যেদিকে পারে।

আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলাম থ হয়ে। দাঁড়িয়ে ছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, অক্টোপাসের বাহুর মতো কদর্য শুঁড় বেরিয়ে আসছে একটার পর একটা। কিলবিল করছে ছোট্ট ফোকরের চারপাশে। শুঁড় দিয়ে চোঙার গা চেপে ধরে পরক্ষণেই বেরিয়ে এল একটা মূর্তিমান আতঙ্ক!

বীভৎস! কোনও প্রাণী যে এত কদাকার হয়, জানতাম না। ধূসর বর্ণের বৃহৎ বপুটাকে একটু একটু করে এবং বেশ কষ্টের সঙ্গে নিয়ে এল চোঙার বাইরে অমানবিক দুটো বিশাল চক্ষু। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। বিকটাকার চোখ দুটোর দিকে আমিও চেয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে। চোখ প্রত্যঙ্গ দুটো তো মুন্ডুতে থাকে জানি। কিন্তু এর মুন্ডু কোথায়? সবটাই তো ধড়। অথবা ধড়টাই ওর পুরো মগজ। নারকীয় জিঘাংসা-ধকধকে চোখ দুটো বসানো রয়েছে কুৎসিত এই ধড়ের ঠিক মাঝখানে।

পুরো অবয়বটাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে এনে ফেলেছিল পৈশাচিক এই প্রাণী। এবার আচমকা চোঙার গা বেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল নিচের গর্তে। ধুপ করে আছাড় খেতেই কাতরে উঠল অদ্ভুত গলায়। সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা অবিকল বিকট প্রাণী আবির্ভূত হল ফোকরের বাইরে।

দু’-দুটো কালান্তক প্রাণীকে কটমট করে চেয়ে থাকতে দেখে প্রাণ হাতে নিয়ে জনতা তখন দৌড়াচ্ছে। দৌড়েছিলাম আমিও। উন্মাদের মতো ধেয়ে গিয়েছিলাম একটা গাছের জটলার দিকে। তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেবার অভিপ্রায় আমার ছিল না মোটেই। লোমহর্ষক ওই চাউনির আড়ালে থেকে দুঃস্বপ্নসম জীবগুলোকে খুঁটিয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি মোটেই।

গাছপালার আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ধুকপুকে বুকে। ভয়ে-বিস্ময়ে দু’চোখ যে প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, তা না বললেও চলে। দূর থেকেই দেখেছিলাম, অক্টোপাসের কিলবিলে বাহুর মতো সরু কালো চাবুক যেন আছড়ে পড়ছে সূর্যাস্তের দিকে। তারপর ঠেলে উঠে এল একটা সরু রড। একটার পেছনে আর-একটা জোড়া লাগিয়ে বেশ লম্বা করে তোলা হল অনেক উঁচুতে। রডের ডগায় বনবন করে ঘুরতে লাগল গোলাকার একটা প্লেট।

হইচই শুনে ফিরে তাকালাম। একদল লোক সাহসে বুক বেঁধে ফিরে এসেছে। গুটিগুটি এগচ্ছে গর্তের দিকে। পুরোধা ব্যক্তির হাতে রয়েছে সাদা নিশান—লাঠির ডগায় বাঁধা। হাওয়ায় উড়ছে পতপত করে।

টিলার ওপর এসে দাঁড়াল ছোট্ট দলটা। ডাইনে-বাঁয়ে পতাকা নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করল মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে।

রডের ডগায় বনবনে ঘুরন্ত চাকাটা আস্তে আস্তে ঘুরে গেল তাদের দিকে...

তারপরেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোর ঝলকে। ভক ভক ভক করে তিনবার সবুজ ধোঁয়া গর্তের ভেতর থেকে ঠিকরে গেল আকাশের দিকে।

খুব ধীরে ধীরে কিম্ভূতকিমাকার একটা আকৃতি উঠে এল গর্তের বাইরে। নিক্ষেপ করল একটা আলোকরশ্মি...

অদ্ভুত আকৃতিটার দিক থেকে বিচ্ছুরিত সেই আলোকরশ্মি এমনই জোরাল যে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। শুধু রশ্মি না বলে তাকে রশ্মিপ্রবাহ বললেই ঠিক হয়। তীব্রবেগে আছড়ে পড়ল বন্ধুত্বের বার্তাবাহী মানুষ ক’জনের ওপর। নিমেষের মধ্যে শূন্যপথে ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল প্রত্যেকেই—আর নড়ল না। রশ্মিশক্তি এত প্রচণ্ড হয়? এমন সর্বনাশা হয়? এতখানি মারাত্মক হয়? দাউদাউ করে জ্বলে উঠল পেছনকার পাইনবন—আগুন লকলকিয়ে উঠল শুকনো ঘাসেও।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম আমি। তখন অন্ধকার নেমেছে। অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি নির্মমভাবে তাণ্ডবনৃত্য চালিয়ে যাচ্ছে। কী ভাগ্যিস, আর-একটু এগিয়ে আসেনি। এলে, আমার দফারফাও হয়ে যেত। গাছপালা সমেত পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।
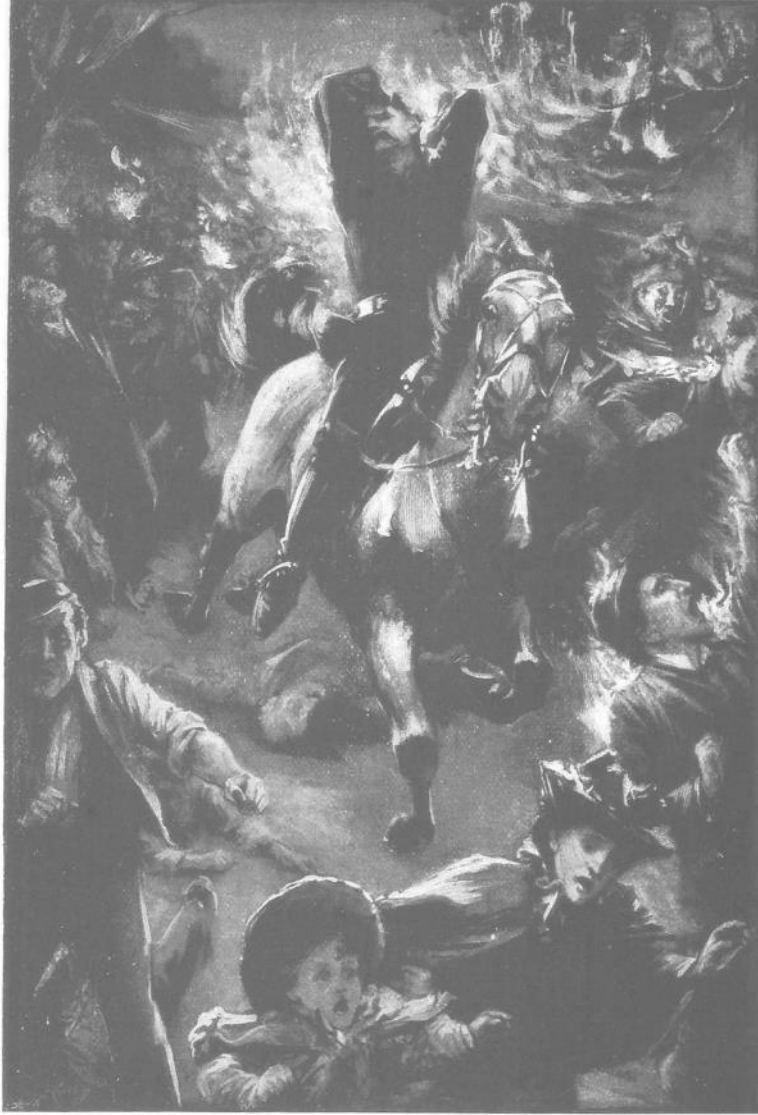
চিত্র ২.৩ রশ্মিশক্তি এত প্রচণ্ড হয়? এমন সর্বনাশা হয়? এতখানি মারাত্মক হয়?

অর্ধচন্দ্রাকারে আমার লুকানোর জায়গার ঠিক সামনে দিয়ে সবকিছুতে আগুন লাগাতে ঘুরে গেল অকল্পনীয় সেই আলোকরশ্মি। গাঢ় তমিস্রা শিউরে উঠল যেন অপার্থিব সেই রশ্মি অন্ধকারের বুকে আছড়ে পড়তেই।

আচমকা বিষম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম আমি। দৌড়! দৌড়! দৌড়! অন্ধকারের মধ্যে মাঠের ওপর হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়েও ফের ঠিকরে গিয়ে দৌড়েছিলাম পাগলের মতো।

আমি একাই জীবন নিয়ে শুধু ফিরে এসেছিলাম মৃত্যু-যজ্ঞ থেকে। আমার পেছনে তারার আলোয় গর্তের চারধারে দেখা যাচ্ছিল প্রায় চল্লিশটা মৃতদেহ।

ওগিলভি আর হেন্ডারসনও ছিল ওদের মধ্যে। পাশাপাশি দু'জনে পড়ে ছিল নিথর চাহনি আকাশের পানে মেলে ধরে—শান্তির বাণী নিয়ে গিয়ে জীবন আহুতি দিয়েছিল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

তখন, সেই পলায়নের মুহূর্তে, কোনও চিন্তাই আমার মাথায় ছিল না... কারও কথাই ভাবিনি... ভাবতে পারিনি... সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজ করছিল অবর্ণনীয় এক আতঙ্ক... সে আতঙ্কবোধকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু মনে আছে, আমি দৌড়াচ্ছি... দৌড়াচ্ছি... দৌড়াচ্ছি! হোঁচট খাচ্ছি, আছড়ে পড়ছি, তেড়েমেড়ে উঠে আবার ছুটছি। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আতঙ্ক-অঞ্চল থেকে নিমেষে দূরে সরে এসেছি। তারপর পুলের এপাশে রাস্তায় পৌঁছেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। নাক-মুখ কেটে রক্তারক্তি হয়েছিল। বোধহয় বেহুঁশ হয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

অবশেষে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। টলতে টলতে এবং কাঁপতে কাঁপতে পুল পেরিয়ে গিয়েছিলাম এক হাতে কপাল খামচে ধরে। পেছনে পড়ে ছিল নিস্তব্ধ প্রান্তর। মনে হয়েছিল যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছুটে এলাম এতটা পথ।

কিছু দূর এসে দেখলাম, মেবেরি ব্রিজের ওপর দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটছে একটা রেলগাড়ি—যাচ্ছে দক্ষিণদিকে। পাশের উঠোন থেকে বেশ কয়েকজনের কথাবার্তাও কানে এল। সবই চেনা, জানা এবং রোজকার দেখা—কিন্তু এইমাত্র যে লেলিহান মৃত্যুকে ফেলে এলাম পেছনে, তার সঙ্গে মিল নেই কোথাও!

ঢুকলাম শহরে। গ্যাসবাতির তলায় জনাকয়েকের জটলা দেখলাম। এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, কমনের নতুন কোনও খবর আছে কি না। আমার রক্ত-মাখা ধূলিধূসরিত উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখেই ওরা বুঝেছিল, কোত্থেকে আসছি আমি। তাই পালটা প্রশ্ন করেছিল আমাকে, আপনিই তো আসছেন ওখান থেকে? বলুন তো কী খবর?

চিত্র ২.৪ অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি নির্মমভাবে তাণ্ডবনৃত্য চালিয়ে যাচ্ছে।

খবর খুব খারাপ! মঙ্গল গ্রহের মানুষ এসে নেমেছে প্রান্তরে—বলেছিলাম শুষ্ককণ্ঠে।

তাচ্ছিল্যের আর অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল রাস্তার লোকেরা। ধন্যবাদ জানিয়ে সরে পড়েছিল তক্ষুনি। বোধহয় পাগলই ভেবেছিল আমাকে—আমার চেহারা দেখে।

মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল আমার। বোকার মতো অত কথা না বললেই হত। টিটকিরি সহ্য করতে হত না। কয়েকজনের পেছন পেছন ধাওয়া করেছিলাম রাগের মাথায়। স্বচক্ষে যা দেখেছি, তার বর্ণনা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেনি।

ভীষণ রেগে তখন বলেছিলাম, টের পাবেন শিগগিরই!

বাড়ি ফিরে এসে বউকে বলেছিলাম, এইমাত্র কী ভয়ানক কাণ্ড দেখে এলাম। টেবিলে রাতের খাবার সাজানো রয়েছে দেখে এক গেলাস সুরাপান করেছিলাম স্নায়ু চাঙ্গা করার জন্যে।

সব শেষে বলেছিলাম, একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল।

কী?—জিজ্ঞেস করেছিল স্ত্রী।

—গর্ত ছেড়ে নড়বে না মঙ্গলগ্রহীরা। ধারেকাছে কেউ গেলেই খতম করে দেবে।

—আসতেও তো পারে এখানে।

—না, না, আসবে না।

—কেন বল তো?

—নড়তেই পারে না। ওই গতর নিয়ে কোনওমতে বেরিয়েছে চোঙার বাইরে—সে যে কী কষ্টে, না দেখলে বুঝবে না। কেন জান? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে তিনগুণ বেশি। তার মানে, একজন মঙ্গলগ্রহীর মঙ্গল গ্রহে যা ওজন, পৃথিবীতে তার তিনগুণ বেশি ওজন। ওজন বাড়ছে, কিন্তু গায়ের জোর তো বাড়ছে না। কাজেই চলতে-ফিরতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

খেয়েদেয়ে ধাতস্থ হলাম।

বউ বললে, এতই যদি অসহায় তো এত লোক মারতে গেল কেন?

—আমার তো মনে হয় স্রেফ ভয়ে। ভীষণ ভয় পেলে মাথার কি ঠিক থাকে? হতভাগারা জানে না, বেশি বাড়াবাড়ি করলে গর্তে একটা বোমা ফেলে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ঝাড়েবংশে মারা যাবে প্রত্যেকে।

অনেক কথা হল খেতে খেতে। পরম শান্তিতে ডিনার-পর্ব শেষ করেছিলাম সেই রাতে। তারপর কেটেছে অনেক ভয়ংকর রাত অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। শেষ ডিনারের সেই সুখস্মৃতি ভুলতে পারিনি দুঃসহ উৎকণ্ঠা আর অবসাদের মধ্যে।

উত্তেজনার চোটে কিন্তু সেই রাতে একটা ব্যাপার একেবারেই খেয়াল করিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম—যন্ত্রবিদ্যায় মঙ্গলগ্রহীরা এতই উন্নত যে, নিজেদের শরীর হঠাৎ গুরুভার হয়ে যাওয়ার বাধা কাটিয়ে নেওয়ার মতো যান্ত্রিক কৌশল নিশ্চয় ভেবে বার করবে। করেওছিল তা-ই। সমস্ত রাত ধরে ধু ধু কমন-প্রান্তরে চলেছিল সেই প্রস্তুতি। বানিয়েছিল একটার পর একটা মেশিন। যে মেশিনে চেপে অথর্ব দেহ নিয়েও তারা নরক সৃষ্টি করবে সবুজ এই পৃথিবীতে। চোঙার বাইরে এসে গুরুভার দেহ নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে তারা খাড়া করেছিল একশো ফুট উঁচু অদ্ভুত আকৃতির ভয়াল যন্ত্র!

রাত এগারোটা নাগাদ দু'দল সৈন্যবাহিনী পৌঁছেছিল কমন প্রান্তরে। প্রান্তর ঘিরে সৈন্য সাজানো হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। অন্ধকারে শুধু ঠাহর করা গিয়েছিল, সারি সারি কামান নলচে ফিরিয়ে রয়েছে গর্তের দিকে। ঘোড়ায় চেপে তদারক করছে সেনাধ্যক্ষরা। সারি সারি সৈনিক বন্দুক হাতে তৈরি। শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

রাত ঠিক বারোটার কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার খসে পড়েছিল একটা তারা। আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় সিলিন্ডার!

পরের দিনটা কেটেছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে। রোজকার মতো সকালে দুধ দিতে এসেছিল গয়লা। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, নতুন কোনও খবর আছে?

—সারারাত ধরে মঙ্গলগ্রহীদের ঘিরে রেখেছে আমাদের সৈন্যবাহিনী। খতম করার ইচ্ছে নেই আপাতত। বাড়াবাড়ি করলে অবশ্য মরবে।

দুধের ডোল গয়লার হাত থেকে নিতে নিতে বলেছিলাম, শুনলাম, কাল রাতে আর-একটা সিলিন্ডার এসে পড়েছে। একটাতেই রক্ষে নেই, আরও একটা জুটল দেখছি!

যেতে যেতে বলে গিয়েছিল গয়লা, লোকসান তো ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির। ঝুটঝামেলা মেটবার পর ক্ষয়ক্ষতি মেটাতে ফতুর হয়ে যাবে।

প্রাতরাশ খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম কমন প্রান্তরের দিকে। পুলটার কাছেই মুখোমুখি হলাম দু'জন সৈনিক পুরুষের সঙ্গে। ব্রিজ আগলে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে।

রুখে দিল আমাকেও, দুঃখিত স্যার, আর এগনোর হুকুম নেই।

গল্প জুড়ে দিলাম ওইখানেই দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, মঙ্গলগ্রহীদের স্বচক্ষে দেখেনি দু'জনের কেউই। পাহারাই দিয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বললাম, কী দেখেছি গত রাতে। তাপরশ্মির প্রলয়লীলা বর্ণনা করতে করতে ফের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল নিজেরই।

শুনেটুনে একজন সৈনিক বললে, মাটি ঘেঁষে গুঁড়ি মেরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বুঝবে বাছাধনরা।

অপরজন কাষ্ঠ হেসে বললে, তা না-হয় হল, কিন্তু তাপরশ্মি থেকে গা বাঁচাবে কী করে? ওভাবে হবে না হে—দূর থেকেই কামান দেগে শেষ করে দিতে হবে শয়তানের বাচ্চাদের।

বাড়ি ফিরে এলাম। নতুন খবর আর পেলাম না এত হাঁটাহাঁটি করেও। গরম পড়েছিল বেশ। সস্ত্রীক খেতে বসলাম ঘরের বাইরে—বাগানে।

দিব্যি শান্ত চারদিক। মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। খাচ্ছি নিশ্চিন্ত মনে। আচমকা শোনা গেল গুলিবর্ষণের শব্দ। একই সঙ্গে ভীষণ শব্দে হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে

পড়ল। এত জোরে, যে মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। জ্বলন্ত মোমবাতি তিনটে ছিটকে গেল টেবিল থেকে। আঁতকে উঠল আমার স্ত্রী।

ভয়বিহ্বল চোখে দেখলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য! কাছের গাছগুলোর চুড়োয় আগুন লাগছে একে একে—নিমেষে নিমেষে জ্বলে উঠছে দাউদাউ করে, আর...

ছোট গির্জের চুড়োটা ভেঙে আছড়ে পড়ছে মাটিতে।

তাপরশ্মি! প্রলয়ংকর তাপরশ্মি ঝলকিত হচ্ছে সবকিছুর ওপর! রাতের অন্ধকার চিরে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে করাল রশ্মির কোপে।

আমার বাড়ি একটা টিলার ওপর। উঁচু থেকে দেখলাম এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য। চকিতে বুঝলাম, যে উচ্চতায় ধেয়ে আসছে ওই রশ্মি, রেহাই দেবে না হয়তো পাহাড়চুড়োর এই বাড়িকেও। নাগালের মধ্যেই রয়েছে যে!

হলও তা-ই। বাগান থেকেই দেখতে পেলাম, বাড়ির মাথায় দুটো লম্বা চিমনির একটা আচমকা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—ঠিক যেন কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে গেল প্রস্তর চিমনি।

তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলাম রুদ্ধশ্বাসে, অসম্ভব! এখানে থাকা আর যাবে না!

আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে তারস্বরে বলেছিল স্ত্রী, কিন্তু যাবেটা কোথায়?

লেদারহেডে তোমার ভায়েদের বাড়িতে—বউকে ঠেলে বাড়ি থেকে বার করতে করতে বলেছিলাম গলার শির তুলে।

পাহাড় থেকে বেগে নামতে নামতেই দেখলাম, টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একদল সৈন্য। দু'জন তড়াক করে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হেঁকে বলতে লাগল, পালান! পালান! মঙ্গল গ্রহের আতঙ্করা এদিকেই আসছে!

ঝটপট চলে গেলাম গাঁয়ের সরাইখানায়। মালিকের একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি আছে জানতাম। আস্তাবলেই দেখলাম ভয়ার্ত ঘোড়াটাকে পা ঠুকতে। মালিকও বেরিয়ে এসেছিল আমাকে দেখে।

দ্রুতকণ্ঠে বলেছিলাম, দু'পাউন্ড ভাড়া দেব—আজ রাতেই ফিরে পাবেন আপনার গাড়ি ঘোড়া সমেত।

ভাড়াটা খুব বেশি। কাজেই এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল সরাইখানার মালিক। ঝটিতি বাড়ি এসে দরকারি জিনিসপত্র প্যাক করে নিলাম। গাড়িতে এনে রাখলাম। বউকে নিয়ে পাশাপাশি বসলাম চালকের আসনে। চাবুক হাঁকড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম তক্ষুনি।

দেখতে দেখতে এসে পড়লাম পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। ধোঁয়া আর আওয়াজ পড়ে রইল পেছনে। রোদ ওঠার পর দেখলাম, দু'পাশের ঝোপে অগুনতি

গোলাপ ফুল। মিষ্টি রোদ্দুরে যেন হাসছে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে তাকিয়ে দেখেছিলাম পেছনে। রাশি রাশি কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। ধোঁয়ার মধ্যে থেকে ঝলসে উঠছে লাল আগুন। পূর্ব আর পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তাল তাল ধোঁয়া। তার মানে, মঙ্গলগ্রহীরা নারকীয় উল্লাসে অগ্নিসংযোগ করছে সবকিছুতেই। তাপরশ্মির পাল্লায় যা পড়ছে, ছারখার করে দিচ্ছে বিকট বিধ্বংসী লালসায়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! চোখে জল এসে গেল আমার।

নির্বিঘ্নে পৌঁছালাম লেদারহেডে। সংবর্ধনা জানাল স্ত্রী-র ভায়েরা। ব্যাপার কী জানতে চাইল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই।

সব বললাম। ঘণ্টাখানেক জিরেন দিলাম ঘোড়াটাকে। তারপরে স্ত্রী-কে ওদের হেপাজতে রেখে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির দিকে।

তখন রাত হয়েছে। আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার বেশ গাঢ়। মেঘপুঞ্জও যেন ভারী হয়ে ঝুলে পড়ছে। দরজার আলোর সামনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম স্ত্রী-কে। মুখ সাদা। দূর হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল সেই মূর্তি।

ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেলাম একটার পর একটা বাড়ি। সব বাড়িই কালচে মেরে গেছে। সাড়াশব্দও নেই। চলেছি যেন গোরস্থানের মধ্যে দিয়ে। থমথম করছে চারদিক। ঠিক পেছনেই মধ্যরাতের ঘণ্টা বেজে উঠল একটা গির্জাতে।

আচম্বিতে সবুজ আলোয় সবুজ হয়ে গেল সমস্ত পথ। মাথার ওপরকার মেঘের রাশি চিরে সবুজ আগুন বর্শাফলকের মতো এসে পড়েছে সবুজ পৃথিবীর ওপর। আশ্চর্য সেই আগুন আর আলো দেখেই পলকের মধ্যে বুঝলাম, কী ঘটে গেল।

তৃতীয় সিলিন্ডার এসে পড়ল আমার ঠিক বাঁদিকের মাঠে।

একই সঙ্গে যেন রকেট বিস্ফোরিত হল মাথার ওপর। যুগপৎ বজ্রনাদ আর বিদ্যুতের ঝলকানিতে খেপে গেল আমার ঘোড়া। নক্ষত্রের বেগে ছুটল গাড়ি নিয়ে। বৃথাই রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করলাম আমি।

তুফান মাথায় নিয়ে ধেয়ে গেলাম এইভাবে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আশপাশে, বাজ পড়ছে কড় কড় কড়াৎ শব্দে, ছুঁচের মতো বৃষ্টি বিঁধছে মুখে। পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। চাবুক মেরেও শায়েস্তা করতে পারছি না। নজর রেখেছি কেবল রাস্তার ওপর। মাঠেঘাটে না নেমে পড়ে।

হঠাৎ দেখলাম, কী যেন একটা সড়াত করে নেমে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে উলটোদিকে।

যা দেখলাম, তা আমার রক্ত জমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট! বর্ণনা করবার ভাষা কি আমার আছে? লম্বা লম্বা পাইন গাছের মাথা টপকে হনহন করে দৌড়াচ্ছে একটা

তেপায়া দানব! মড়মড় করে গাছ ভেঙে যাচ্ছে ঠ্যাঙের ধাক্কায়। চকচকে ধাতু দিয়ে গড়া দেহ! দানব নিঃসন্দেহে—তবে রক্তমাংসের নয়—ধাতুর। বিশাল ইঞ্জিন হেঁটে চলেছে... ছুটে চলেছে... গাছপালা ভেঙে পথ করে নিচ্ছে... কখনও সখনও লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে টপকে যাচ্ছে!

চিত্র ২.৫ লম্বা লম্বা পাইন গাছের মাথা টপকে দৌড়াচ্ছে একটা তেপায়া দানব।

পরক্ষণেই আমার ঠিক সামনের গাছগুলো দু'দিকে সরে গেল—ফাঁকে আবির্ভূত হল আর-একটা ধাতুময় তেপায়া দানব। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি চলেছি ঠিক তার দিকেই!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাগাম টেনে ধরেছিলাম। শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বেচারি অশ্ব। নিমেষমধ্যে তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম ডানদিকে।

আচমকা ওইভাবে বাঁক নিলে দুর্ঘটনা ঘটবে, এ আর আশ্চর্য কী! গাড়ি উলটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওপরের আসন থেকে আমি ঠিকরে পড়লাম রাস্তার পাশে একটা খানায়।

জলে পড়েছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম সে যাত্রা। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে লুকিয়ে রইলাম একটা ঝোপের মধ্যে। আমার পাশ দিয়েই একশো ফুট উঁচু চলন্ত আতঙ্কটা দমাস দুম শব্দে হাঁটতে হাঁটতে উঠে গেল পাহাড় বেয়ে ওপরদিকে।

ঝোপের মধ্যে থেকেই শুনতে পেলাম, হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত চিৎকার করছে তেপায়া দানব, আলু-উ-উ! আলু-উ-উ!

ডাক শুনেই বোধহয় ছুটে এল অন্য দানবটা। মুখোমুখি হল দু'জনে। আবার অপার্থিব সেই গর্জনে কেঁপে উঠল দিগ্‌দিগন্ত!

পাশাপাশি হেঁটে গেল দু'জনে মাঠের মধ্যে। হেঁট হয়ে কী যেন খুঁজছে। নিশ্চয় তৃতীয় চোঙার সন্ধানে বেরিয়েছে। দূর থেকে মিনিটকয়েক ধরে দেখে গেলাম তাদের অন্বেষণপর্ব।

তারপরেই গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম খানার মধ্যে থেকে। অন্ধকারে গা ঢেকে পাঁইপাঁই করে দৌড়ালাম পাইন অরণ্যের দিকে।

উদ্দেশ্য আমার একটাই—বাড়ি পৌঁছাতে হবে যেভাবেই হোক। অনেক ছুটে, অনেক কষ্ট করে, অনেক বিপদ পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছালামও।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম বটে, কিন্তু একটু পরেই বাইরে একটা আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

বাগানের অন্ধকারে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তিকে। আমার দিকেই আসছে। একটু এগতেই দেখলাম তার ছন্নছাড়া বেশ। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। মঙ্গলগ্রহীদের কবলে পড়েছিল মনে হচ্ছে।

হেঁকে বললাম, ভেতরে আসুন—যদি লুকিয়ে বাঁচতে চান।

যা।—বলে দৌড়ে এল পুরুষমূর্তিটি।

যা।—বলে দৌড়ে এল পুরুষমূর্তিটি।

ঘরের আলোয় তাকে দেখলাম ভালো করে। বললাম সবিস্ময়ে, আপনি সোলজার? ব্যাপার কী বলুন তো?

যেন ককিয়ে উঠল জোয়ান সৈনিক পুরুষ, ব্যাপার অতি ভয়ানক! টিপে মেরেছে বলতে পারেন। মৃত্যু আর ধ্বংসের স্রোত বইয়ে দিয়েছে! কেউ আর বেঁচে নেই!

—বলছেন কী!
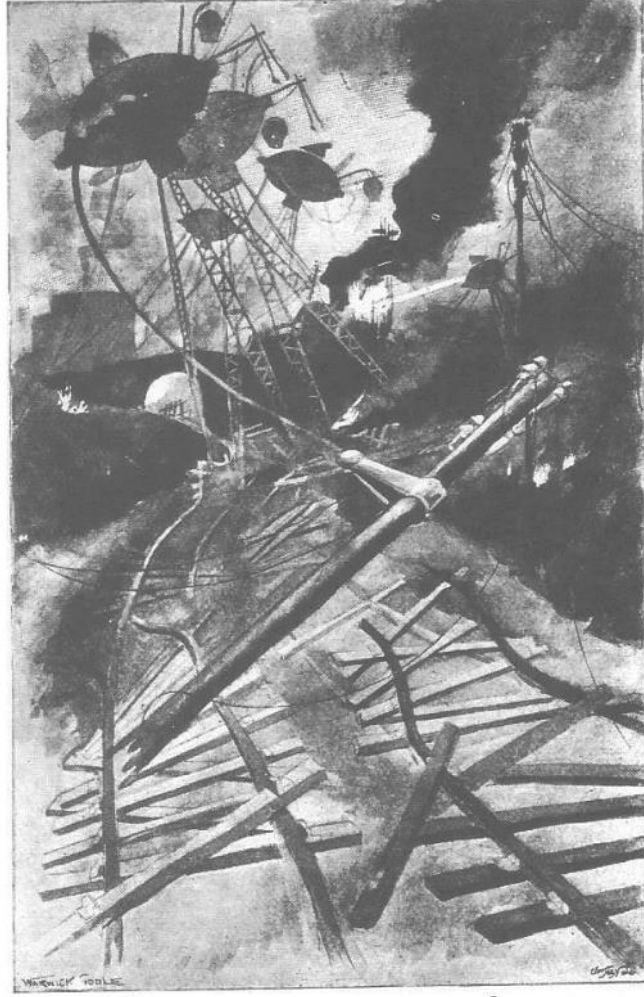
চিত্র ২.৬ তেপায়া দানবের ধ্বংসলীলা

কামান গাড়ি চালাই আমি। কামান নিয়ে যাচ্ছিলাম বালির গর্তটার দিকে... একটা গর্তে পা পড়েছিল আমার ঘোড়ার... ছিটকে পড়েছিলাম খানায়—নিষ্প্রভ চোখে ক্লান্ত কণ্ঠে বলে চলে ছন্নছাড়া সৈনিক, আচমকা কামান গর্জন শুনলাম পেছনে—মাথার ওপর দিয়ে শনশন করে চলে গেল গোলার পর গোলা... বিস্ফোরণের আওয়াজে কান যখন ভোঁ ভোঁ করছে, ঠিক তখনই আগুন আর মৃত্যু দেখলাম চারপাশে। তেপায়া দানব!... তেপায়া দানব! মারণ রশ্মি ছুড়ে চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে ধ্বংস করে দিল সবকিছু! ও ভগবান! কামান ঠিকরে গেল! মানুষ ছিটকে গেল! ঝলকে ঝলকে রশ্মি এসে আগুন জ্বালিয়ে দিলে চারধারে। মড়ার পাহাড় জমে উঠল আমার ওপর—বেঁচে গেলাম শুধু সেই জন্যেই।

তারপর? তারপর?—রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম আমি।

কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম তারপরেও—অনেকক্ষণ। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছিল ভয়ংকর দানবদের—কী বিরাট! কী বিকট! বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল কিম্ভূতকিমাকার

ওই চেহারা দেখেই।

—শেষ পর্যন্ত হল কী?

—কী আর হবে? গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম মড়ার গাদা ঠেলে... অতি কষ্টে এসেছি এদ্দূর।

সৈনিক পুরুষের ক্লান্ত, অবসন্ন মুখচ্ছবি দেখে মনটা মুচড়ে উঠল আমার। হতাশায় ভেঙে পড়েছে একেবারেই। পরাজয় যে এত নিষ্করুণ হতে পারে, ভাবতে পারেনি কামানচালক। কামানের গোলাও যাদের কিছু করতে পারে না, তারা যে কী বিভীষিকা, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পর।

ওপরতলায় গেলাম দু'জনে। জানলা দিয়ে তাকালাম মৃত্যু উপত্যকার দিকে। উষার আলোয় দেখা যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপ। মড়া ছড়িয়ে সর্বত্র। কামানগাড়িগুলো উলটে ভেঙেচুরে পড়ে আছে উপত্যকাময়। যেন খেলনার গাড়ি। ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মানুষ আর ঘোড়া, পোড়া গাছ আর ঘাস, ধোঁয়া আর আগুন—যেন শ্মশানভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো উপত্যকাটা। করাল আকৃতি নিয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকটা যন্ত্রদানব।

প্রান্তরব্যাপী মৃত্যুর হাহাকার। চোখে জল এসে গেল দু'জনেরই। বেশ বুঝলাম, এ বাড়িও আর নিরাপদ নয়। চম্পট দেওয়া দরকার এখুনি।

সৈনিক পুরুষ বললে, আমি বরং ফিরে যাই আমার বাহিনীতে।

আর আমার কাজ হবে স্ত্রী-কে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া।—বললাম আমি।

পকেট ভরতি খাবারদাবার নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। গাছের পাতা নড়লেও চমকে উঠছি দু'জনেই। ঘন ঘন দেখছি আশপাশে—বিশ্বাস নেই যন্ত্রদানবদের—রশ্মি নিক্ষেপ করতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

ভয়ে কাঠ হয়ে পা টিপে টিপে পেরিয়ে এলাম একটা জঙ্গল। পৌঁছালাম একটা রাস্তায়। দেখলাম, ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একজন সেনাধ্যক্ষ। দূরে সার বেঁধে যাচ্ছে একদল সেনানী।

ছুটে গেল আমার সঙ্গী, স্যার, ফিরে যাচ্ছি আমার বাহিনীতে। মঙ্গলগ্রহীরা কিন্তু এই রাস্তা বরাবর রয়েছে।

দেখতে কীরকম বেটাদের?—ভুরু কুঁচকে শুধায় অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষ।

—ধাতু দিয়ে তৈরি দানব। একশো ফুট উঁচু। আগুন ছুড়ে মারে মাথার ওপরকার বাক্স থেকে।

—ননসেন্স!

মোটেই না। সব সত্যি!—পাশ থেকে বললাম আমি।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হল সেনাধ্যক্ষ। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না আমাদের হুঁশিয়ারি। ঠেলা বুঝবে'খন রশ্মিবর্ষণ শুরু হলে।

একটু এগতেই দেখলাম, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সৈন্যরা প্রত্যেককে বলছে জিনিসপত্র ফেলে রেখে এখনই চলে যেতে। কিন্তু শুনছে না কেউ। চরমে উঠেছে কথা কাটাকাটি। একজনের বড় মায়া ফুলের টবগুলোর ওপর। ব্যাগ ভরতি করে নিয়েছে। কড়া গলায় বারণ করছে একজন সোলজার। কিন্তু কে কার কথা শোনে। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু নিয়ে যেতে চায় বাড়ি থেকে, অথচ খালি হাতে এখুনি তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেওয়ার হুকুম দিয়ে যাচ্ছে সোলজাররা। হট্টগোলে কান পাতা দায়।

ফুলের টব না নিয়ে যে যাবে না, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ধমক দিয়ে বললাম, রাস্তার ওদিকে, জঙ্গলের ওপারে কী আছে জানেন?

না তো? টবগুলো আঁকড়ে ধরে অসহায়ভাবে বললে ফুল-পাগল লোকটা।

মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু! তেড়ে আসছে এদিকে। তীব্রস্বরে ফেটে পড়েছিলাম মৃত্যু-উপত্যকার মাঝে টহলদার যন্ত্রদানবগুলোর কথা মনে পড়তেই।

রাত হল। আকাশে তারা ফুটল। একটা মাঠের ওপর ছ'টা বিরাট কামানের পাশে গোলন্দাজদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মাঠের শেষ প্রান্তেও সারি সারি কামান আর সৈন্য দেখা যাচ্ছে তারার ম্লান আলোয়।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম গোলন্দাজবাহিনীর কথাবার্তা।

—একটা-না-একটা গোলা খেতেই হবে বাছাধনদের।

—বিদ্যুতের চেয়েও জোরে ছোটে এই কামানের গোলা—ঠেলাটা বুঝবে এবার।

থমকে দাঁড়ালাম সেনাধ্যক্ষের পাশে। বয়স্ক পুরুষ। এক মুখ দাড়ি। চোখ কঠোর। চাহনি দূরে নিবদ্ধ। কথা বলছে আপন মনে। আত্মবিশ্বাস ক্ষরিত হচ্ছে প্রতিটি শব্দ থেকে। থামাবই—এই মাঠ পেরিয়ে আর এগতে হচ্ছে না লন্ডনের দিকে। কামানে কামানে ছেয়ে রাখা হয়েছে এখান থেকে লন্ডন পর্যন্ত। সব ক'টাকেই শেষ করব এখানেই।

আত্মশ্লাঘার অবসান ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে। আচম্বিতে মাটি কাঁপিয়ে অন্ধকার প্রান্তরে আবির্ভূত হল তিনটে প্রকাণ্ড যন্ত্রদানব। রুখে দাঁড়াল গোলন্দাজবাহিনী।

চিত্র ২.৭ ভাঙা পায়ের ওপর বিরাট দেহটা টলমল করে উঠেই আছড়ে পড়ল।

আমরা কিন্তু দৌড়াচ্ছিলাম। প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়ালাম। নিরস্ত্র কোনও নাগরিকই দাঁড়িয়ে রইল না ভয়াবহ লড়াইয়ের পরিণতিটা দেখবার জন্যে।

পেছন ফিরে আমি কিন্তু দেখেছিলাম, একসঙ্গে গর্জে উঠেছে ছ'টা কামান। শূন্যপথে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাচ্ছে কয়েকটা বোমা। শনশন করে যন্ত্রদানবদের আশপাশ দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে কামান-নিক্ষিপ্ত ধ্বংসদূতেরা। তারপরেই একটা গোলা আছড়ে পড়ল একটা ধাতুময় তেপায়া দানবের ওপর—নির্ভুল লক্ষ্যে!

অগ্নিঝলকে ক্ষণেকের জন্যে দেখেছিলাম, কালো কালো ছায়ামূর্তির মতো গোলন্দাজবাহিনী ক্ষিপ্তের মতো কামানের নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেল দেগে যাচ্ছে। অনেক উঁচুতে রক্ত-জমানো আকৃতি নিয়ে মহাকায় একটা তেপায়া দানব তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বলে। দূরে, পেছনে দেখা যাচ্ছে, নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে আরও দুটো বিদঘুটে দানব। ঠিক সেই সময়ে একদম সামনের কিম্ভূত আকৃতিটার

একটা পা খানখান হয়ে গেল শেল বিস্ফোরিত হতেই। দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হল অগ্নিঝলক—টুকরো টুকরো যন্ত্রাংশ ঠিকরে গেল আশপাশে।

জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল সেনাবাহিনী। এই প্রথম ঘায়েল করা গেছে একটা দানবকে! সত্যিই ঘায়েল হয়েছে অজেয় যন্ত্রদানব। মারাত্মক চোট পেয়েছে। ভাঙা পায়ের ওপর বিরাট দেহটা টলমল করে উঠেই আছড়ে পড়ল দড়াম করে।

মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু বিপর্যয় ঘটিয়ে ছাড়ল জখম যন্ত্রদানবের সঙ্গী দু'জন। তাপরশ্মি বর্ষিত হল ঝলকে ঝলকে সেনাবাহিনীর ওপর। কামান-বন্দুক-গোলাবারুদে আগুন ধরে গেল চক্ষের নিমেষে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল সঙ্গে সঙ্গে। ভয়াবহ সেই বিস্ফোরণের তুলনীয় বিস্ফোরণ জীবনে কখনও শুনিনি বা দেখিনি। সৈন্যসামন্ত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল ওই একটা বিস্ফোরণেই। অগ্নিঝলকের মধ্যে দিয়ে শুধু দেখলাম, বহু উঁচুতে ঠিকরে যাচ্ছে সৈন্যদের লাশ!

সব শেষ! নিমেষমধ্যে যুদ্ধ খতম। খুব যে বড়াই করেছিল সেনাধ্যক্ষ—মৃত্যু যে এমন অতর্কিতে আসতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি। জানি না, এই মুহূর্তে তার পিঞ্জরশূন্য নশ্বর দেহটা আস্ত অবস্থায় আছে, না টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের নানা দিকে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মৃত্যু নেই কি তেপায়া দানরের? ভূপাতিত যন্ত্রদানবের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল বিকটাকার একজন মঙ্গলগ্রহী। কদাকার সেই দেহ—কমন প্রান্তরে যা দেখে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। সেই বীভৎস চোখ। সেই কিলবিলে শুঁড়। গুটিগুটি বেরিয়ে এসে যন্ত্রপাতি মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত হল মাঠের মধ্যেই। আমরা পৃথিবীর মানুষরা ছেঁড়া কাপড় যেভাবে সেলাই করে নিই ছুঁচ দিয়ে অনায়াসে, খণ্ডবিখণ্ড যান্ত্রিক পা-খানাকেও সেইরকম অতি সহজে ঠিক করে নিল বিদঘুটে মঙ্গলগ্রহী। তুখড় কারিগর বটে। যন্ত্রশিল্পে কতখানি দক্ষতা থাকলে এত সহজে এত কম সময়ে মেশিন মেরামত করা সম্ভব হয়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ভগ্নপদ ঠিক হয়ে যেতেই এক ঝটকান দিয়ে ফের সিধে হয়ে দাঁড়াল যন্ত্রদানব!

গুলি-বারুদ-কামান-বন্দুক ফেটে উড়ে যেতেই এবং একই সঙ্গে আশপাশের বনভূমিতে আর ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যেতেই লোকজন পালিয়েছিল যে যেদিকে পারে। পালিয়েছিলাম আমিও। তারপর একটা ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ক্লান্ত দেহে। প্রান্তর জুড়ে তখন বিরাজ করছে ধোঁয়া আর আগুন। উৎকট গন্ধেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি আমার—এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম সেই রাতে।

ঘুম ভাঙার পর দেখলাম, আমার পাশে বসে একজন পাদরি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল আমার। শুষ্ক কণ্ঠে জল চেয়েছিলাম তার কাছে। বিষণ্ণমুখে ঘাড় নাড়তে

নাড়তে পাদরি জানিয়েছিল, জল-টল কিছুই নেই তার কাছে। পরক্ষণেই ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুড়ে সে কী চিৎকার—মাথাটা সাফ করবার জন্যে পায়চারি করছিলাম মশায়—হঠাৎ এ কী কাণ্ড! আগুন, ভূমিকম্প, মৃত্যু!

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম আমি। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি পাদরি সাহেবের? দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে আপন মনে—শেষ... শেষ... পৃথিবীর শেষ! পাপে ভরে উঠেছিল এই পৃথিবী। তাই শেষ হয়ে গেল মানুষ জাতটা।

বেশ বুঝলাম, নারকীয় কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখে মাথাটাকে বিগড়ে বসে আছে পাদরিসাহেব। পাগল হয়ে গেছে একেবারেই—বদ্ধ উন্মাদ!

অন্ধকারের মধ্যে পাগলের প্রলাপ আরও কতক্ষণ শুনতে হত জানি না, আচমকা টনক নড়ল দূরে দুটো চলমান তেপায় দানবকে দেখে।

মনে পড়ল সেই সেনাধ্যক্ষের স্বগতোক্তি। লন্ডন পর্যন্ত সর্বত্র কামান সাজানো আছে যন্ত্রদানবদের রুখে দেওয়ার জন্যে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে অনেকটা পথ এসেছি ঠিকই, কিন্তু ঝোপেঝাড়ে নিশ্চয় ওত পেতে আছে কামান আর গোলন্দাজবাহিনী। এখনই শুরু হবে গোলাবর্ষণ। প্রচণ্ড নির্ঘোষে এখনই খানখান হয়ে যাবে রাতের নৈঃশব্দ্য। যন্ত্রদানবরা যতই শক্তিধর হোক-না কেন, অপরাজের যে নয়, তার প্রমাণ তো দেখেই এসেছি। তাক করে আঘাত হানতে পারলে ওদের ধরাশায়ী করতে বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু এ কী হাল! রশ্মিবর্ষণের ধার দিয়েও যে গেল না বিকট দানবরা। ভেবেছিলাম, মারণরশ্মি ঝলকে ঝলকে নিক্ষিপ্ত হবে কামানবর্ষণ শুরু হলেই। কিন্তু তার আগেই আর-একটা সাংঘা- তিক অস্ত্র প্রয়োগ করল মঙ্গলগ্রহীরা।
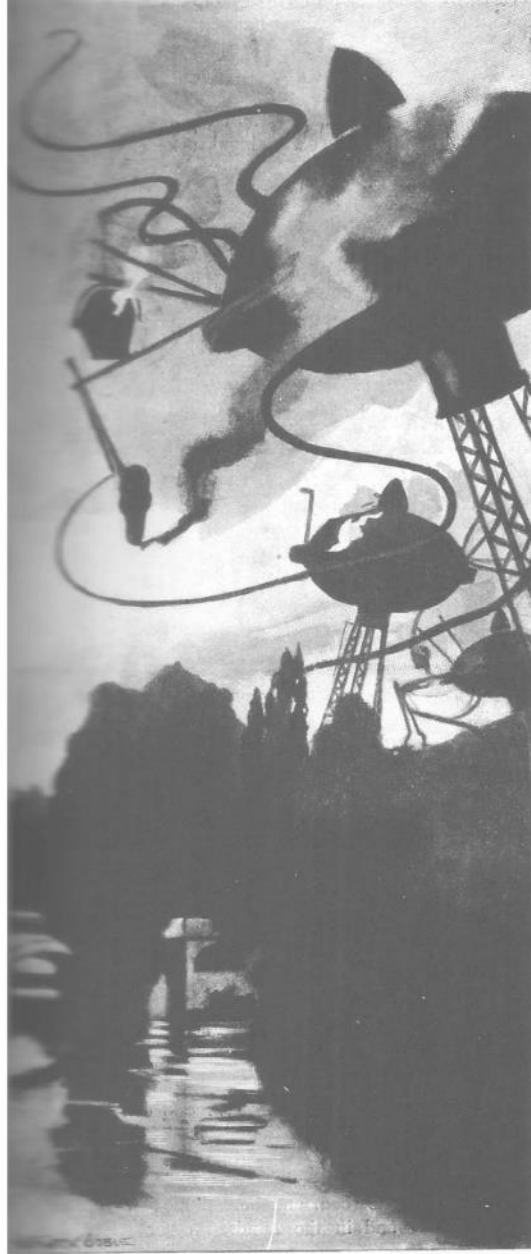
কালো ধোঁয়া!

চিত্র ২.৮ সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করল মঙ্গলগ্রহীরা - কালো ধোঁয়া!

দৃশ্যটা অবর্ণনীয়। লম্বা লম্বা পাইন গাছকে অবলীলাক্রমে টপকে বেরিয়ে এল তেপায়া দানবরা। পরক্ষণেই প্রত্যে-কের মাথার বাক্স থেকে তীব্রবেগে ঠিকরে এল কালো ধোঁয়া। দু'-চারটে কামান গর্জে উঠেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে। মানুষ-পোকাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকা- নো রয়েছে ঠিক কোন জায়গাগুলোতে, মঙ্গলগ্রহী- রা জেনে গিয়েছিল সেই কারণেই। ধোঁয়া নিক্ষেপ করলে ঠিক সেই সেই- দিকে।

মারাত্মক সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল জমি ঘেঁষে। উপত্যকায় দিকে দিকে গড়িয়ে গিয়ে ঢুকে গেল প্রতিটা খাঁজে খাঁজে, ফাঁকে, ফোকরে। নিঃশ্বা-সের সঙ্গে বিষ-ধোঁয়া ফুস- ফুসে প্রবেশ করতেই মরণের কোলে ঢলে পড়ল আমাদের সেনানীরা। নিস্তব্ধ

হয়ে গেল কামানগুলো। নিস্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত প্রান্তর। ঘন কালো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল চারদিক। বাড়িঘরদোর পর্যন্ত ঢেকে গেল কালো ধোঁয়ায়। ঘরের মধ্যে থেকেও রেহাই পেল না আবালবৃদ্ধবনিতা। চকিত মৃত্যু সবাইকেই নিয়ে গেল পরলোকে।

নিষ্ঠুর মৃত্যুদূতেরা দাঁড়িয়ে রইল কেবল প্রান্তরের মাঝে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যেতেই, প্রাণের সমস্ত স্পন্দন চারদিকে থেমে যেতেই স্তব্ধ করল কালো ধোঁয়াবর্ষণ। পিচকিরির মতো এতক্ষণ যে ধূম্রপুঞ্জ তীব্রবেগে ধেয়ে যাচ্ছিল দিকে দিকে, অকস্মাৎ তা বন্ধ করে দিয়ে ধোঁয়ার ওপর ছিটিয়ে দিলে বাষ্পধারা। গরম বাষ্প মুহূর্তের মধ্যে সাফ করে দিল মাটি ঘেঁষে গড়িয়ে-যাওয়া তাল তাল বিষধোঁয়াকে। পরিষ্কার হয়ে গেল মৃত্যু উপত্যকা!

চলল এইভাবেই। পোকামাকড়ের বাসায় ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ যেভাবে বাসা পরিষ্কার করে নেয়, মঙ্গলগ্রহীরা ঠিক সেইভাবে বিষ-গ্যাস ছড়িয়ে দিতে লাগল লন্ডনের দিকে এগনোর সময়ে। একশো ফুট উঁচু বাক্সে বসে হারামজাদারা ঠিক আঁচ করে নিয়েছে, কোথায় কোথায় লুকানো আছে কামান আর সৈন্য—কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়েছে ঠিক সেইখানে। ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ রচনা করে বীরদর্পে এগিয়ে গেছে জনবহুল লন্ডন শহরের দিকে। বাধা পায়নি কোত্থাও। বাধা দেওয়ার মতো বেঁচে ছিল না কেউ। মৃত্যুর হাহাকার পর্যন্ত শোনা যায়নি কোনওখানে। তেপায়া দানবরা এসেছে চকিতে, প্রাণের প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছে নিমেষে। গণহত্যা চালিয়ে গেছে নির্মমভাবে।

অচিরেই নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল লন্ডনবাসীরাও। খবর পৌঁছেছে সেখানেও। পোকামাকড়দের মতো মানুষ মারতে মারতে বিকটদর্শন যন্ত্রদানবদের চালিয়ে নিয়ে আসছে মঙ্গলগ্রহীরা—এ খবর সেখানে পৌঁছাতেই শিউরে উঠল প্রতিটি মানুষ। এখন উপায়?

লন্ডনের গণ-আতঙ্ক কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল, পরে তা শুনেছিলাম আমার ভাইয়ের মুখে। ও তখন লন্ডনেই ছিল। সকালের দিকে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল, খবরের কাগজ ফিরি করছে কাগজওয়ালা। আর চেঁচিয়ে যাচ্ছে তারস্বরে—বিপদ! বিপদ! দম আটকে মৃত্যু! কালো ধোঁয়া!

কাগজ নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই থ হয়ে গিয়েছিল আমার ভাই। প্রধান সেনাপতির হুঁশিয়ারি ছাপা হয়েছে বড় বড় করে—তলায় মঙ্গলগ্রহীদের ধ্বংসযজ্ঞের লোমহর্ষক ফোটোগ্রাফ।

কমান্ডার-ইন-চিফ বলেছেন, বিষ-ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে দিচ্ছে মঙ্গলগ্রহীরা। নিশ্চিহ্ন করেছে সৈন্যবাহিনীকে। এগচ্ছে লন্ডনের দিকে। পালানো ছাড়া বাঁচার পথ আর

নেই!

ফলে, প্যানিক ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা লন্ডন শহরে। ষাট লক্ষ নগরবাসী একই সঙ্গে লন্ডন ছেড়ে ছুটল উত্তরদিকে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। যত দূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে প্রাণপ্রিয় শহর ছেড়ে—অন্য গ্রহ থেকে মাত্র জনাকয়েক আগন্তুক আততায়ীর ভয়ে। তাদের চোখে দেখেনি কেউই—শুধু শুনেছে বর্ণনা। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে অসামান্য কাণ্ডকারখানা শুনেই। সুতরাং দে চম্পট! দে চম্পট! দে চম্পট!

চিত্র ২.৯ শুঁড়গুলি যেন জীবন্ত হাতের মতো।

চিত্র ২.১০ আচমকা কাত হয়ে পড়েছিল জাহাজ।

খালি হয়ে গেল লন্ডন শহর। আমার ভাই কোনওমতে পৌঁছাল নদীর ধারে। জাহাজে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। এত লোক উঠেছে এবং তখনও উঠছে যে, জাহাজটাই না ডুবে যায়। যারা উঠতে পারেনি, তাদের চেঁচামেচি-হট্টগোলে কানের পোকা বেরিয়ে যায় আর কী! ভায়া আমার এদিকে খুব চৌকস। অত ভিড়ের মধ্যেও নিজের জায়গা করে নিয়ে- ছিল জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গে চিমনি দিয়ে গলগলিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে জাহাজ সরে এসেছিল তীর থেকে তফাতে। আর ঠিক তখনই বহু দূরে দেখা গিয়েছিল দীর্ঘ- দেহী এক যন্ত্রদানব-কে। বহু দূরে থাকায় তখনও কালো বিন্দুর মতো মনে হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু যেভাবে বাড়িঘরদোর, কার- খানা টপকে এগিয়ে আসছিল, তাতেই বোঝা গিয়েছিল তেপায়া দানব লম্বায় কতখানি।

জাহাজ থেকে বহু দূরের সেই চলমান বিভীষিকাকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল আমার ভায়ের। শোনা কথা যে এতখানি বুক-কাঁপানো সত্যি হতে পারে,

হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছিল। সেই প্রথম স্বচক্ষে মঙ্গলগ্রহীদের যন্ত্রদানব দেখেই নাকি ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল জাহাজসুদ্ধ প্রত্যেকেরই।
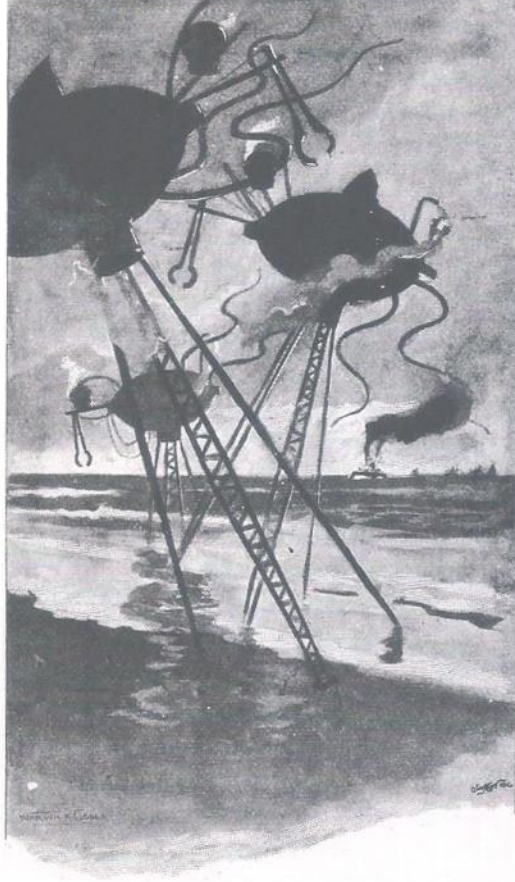
চিত্র ২.১১ তেপায়া দানবের দল পৌঁছেছিল জলের ধারে

তেপায়া দানবের দল দেখতে দেখতে এসে পৌঁছেছিল জলের ধারে। জাহাজ ভরতি মানুষ পালাচ্ছে দেখে লম্বা লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে জলেও নেমে পড়েছিল। তাড়া করেছিল পেছনে। ফুল স্পিডে জাহাজ চালাতে হুকুম দিয়েছিলেন ক্যাপটেন। থরথর করে কাঁপছিল চিমনি আর গোটা জাহাজটা পুরোদমে ইঞ্জিন চলায়। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছিল যেন শামুকের গতিতে যাচ্ছে জাহাজটা—অবিশ্বাস্য বেগে পেছনে তাড়া করে আসছে করাল যন্ত্রদানব!

আচমকা কাত হয়ে পড়েছিল জাহাজ। তাল সামলাতে না পেরে ঠিকরে পড়েছিল আমার ভাই। পরক্ষণেই দেখেছিল, প্রায় একশো গজ দূর দিয়ে একটা লোহার জাহাজ জল তোলপাড় করে ছুটে যাচ্ছে আগুয়ান বিভীষিকা-র দিকে।

দেখেই উল্লসিত হয়ে-ছিল আমার ভাই। চিনতে পেরেছিল জাহাজটাকে। টর্পেডোবাহী যুদ্ধজাহাজ। সোজা তেড়ে যাচ্ছে তেপায়া দানবের দিকে।

তারপয়েই শোনা গিয়ে -ছিল যেন বজ্রনির্ঘোষ। গর্জে উঠেছিল টর্পেডো কামান। তাল তাল ধোঁয়া ঠিকরে গিয়েছিল কালো জলের ওপর দিয়ে—অন্ধকারের বুক চিরে নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গিয়েছিল সাক্ষাৎ যমদূত—বিস্ফোরকে ঠাসা টর্পেডো!

আচমকা উৎপাতকে সটান ধেয়ে আসতে দেখে যন্ত্রদানবও সজাগ হয়ে গিয়েছিল এবং রশ্মিবর্ষণ করেছিল পলকের মধ্যে।

ফলটা হল ভয়ানক। পিলে চমকে গিয়েছিল আমার ভায়ার!

লৌহনির্মিত অমন মজবুত গোটা যুদ্ধজাহাজটা ফেটে চৌচির হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে ছিটকে পড়ল চক্ষের নিমেষে। রশ্মিঝলকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড ঝলসানিতে। সে কী ফ্ল্যাশ! যেন লক্ষ বিদ্যুৎ একযোগে আছড়ে পড়েছিল লোহার জাহাজটার ওপর!
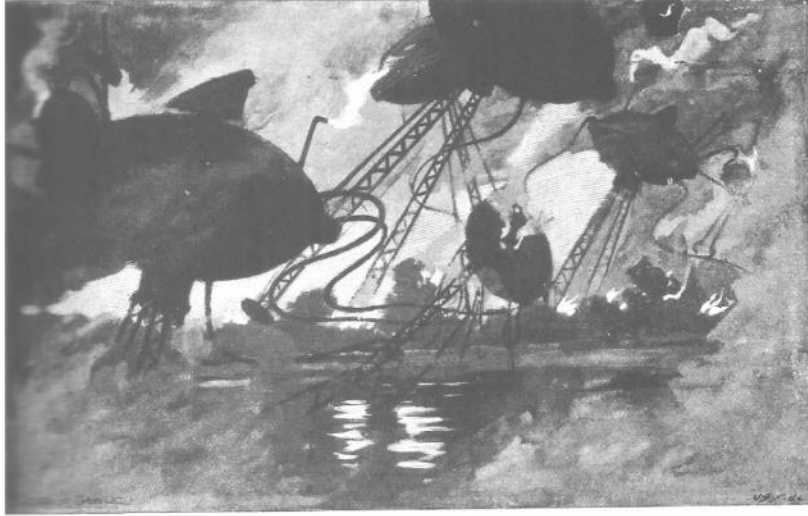
চিত্র ২.১২ মূর্তিমান মেশিন দানব লৌহ রণতরিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ছাড়ছে

পরের মুহূর্তেই দেখা গেল জাহাজ নিশ্চিহ্ন। পেছনে দাঁড়িয়ে কুটিল যন্ত্রদানব। যেন কিছুই হয়নি, ছেলেখেলা করে গেল এইমাত্র!

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছিল ছোট্ট জাহাজের ক্যাপটেন। ফুল ফোর্সে ইঞ্জিন চালিয়ে মানুষ-ঠাসা জলযানকে নিয়ে গিয়েছিল বার-সমুদ্রের দিকে।

অন্ধকার যখন বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল, চিৎকার শোনা গিয়েছিল ক্যাপটেনের কণ্ঠে। আঙুল তুলে কী যেন দেখাচ্ছেন বহু দূরে।

জাহাজসুদ্ধ লোক তাকিয়েছিল সেদিকে। দেখেছিল, তারাভরা আকাশকে সবুজ আলোয় ঝলসে দিয়ে চতুর্থ সিলিন্ডার নেমে যাচ্ছে ধরিত্রীর বুক লক্ষ্য করে—পেছনে রেখে যাচ্ছে সবুজ আলোর রেখা—প্রোজ্জ্বল এবং অশুভ।

লন্ডনে যখন এই কাণ্ড চলছে, পলায়নের হিড়িক উঠেছে, মূর্তিমান মেশিন দানব আবির্ভূত হয়ে লৌহ রণতরিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ছাড়ছে—ঠিক সেই সময়ে ক্ষিপ্তমস্তিষ্ক পাদরি সাহেবের সঙ্গে প্রাণের ভয়ে আমি লুকিয়ে আছি একটা খালি বাড়িতে। বাড়ির মালিক সবকিছু ফেলে-ছড়িয়ে পালিয়েছে প্রাণের মায়ায়—আমরা ঠাঁই নিয়েছি পরিত্যক্ত সেই গৃহে প্রাণপাখিকে পিঞ্জরে ধরে রাখার প্রয়াসে।

পাদরি সাহেব দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে এক কোণে। বকবক করেছে অনেকক্ষণ। কাঁহাতক আর মুখের গ্যাঁজলা উঠিয়ে চেঁচাবে? ঝিমিয়ে পড়েছে সেই কারণেই। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্ত চরণে ঘুরঘুর করছি। পরিত্যক্ত বাড়িটাকেই দুর্গ বানিয়ে বাঁচবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তখনও নিশার অবসান ঘটেনি। রাতের তারা বিদায় নেয়নি। জানলা থেকে উঁকি মেরে কিন্তু দেখলাম, কালো ধোঁয়ার ছিটেফোঁটাও আর নেই কোথাও। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষদের নিকৃষ্ট কীটের মতোই যারা নিঃশেষে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, মৃত্যুরূপী কালো ধোঁয়ার অপসারণ ঘটিয়েছে তারাই—গরম বাষ্পের পিচকিরি দিয়ে। তাজ্জব প্রাণী বটে! বিষ-ধোঁয়া ছাড়বারই বা কী দরকার ছিল—আবার তাকে ধুয়ে দিয়ে মেদিনীকে নির্মল করারই বা কী প্রয়োজন ছিল!

ওই সময়ে অবশ্য এত কথা আমি ভাবিনি। ভাববার মতো অবসর বা মনের অবস্থা ছিল না। যেই দেখলাম বিষ ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, অমনি বললাম পাদরিকে, এই সুযোগ! এবার বেরিয়ে পড়া যাক!

আঁৎকে উঠল বৃদ্ধ পাদরি; না! না! এখানেই বেশ আছি।

কিন্তু আমি তো জানি, যেতে আমাকে হবেই। এ জায়গা এই মুহূর্তে যত নিরাপদই হোক-না কেন, অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানি না। তা ছাড়া, আমাকে যেতে হবে স্ত্রী-র খোঁজে। সে বেচারার কী হাল হল, না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমার।

সুতরাং পাদরিকে আমার অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এলাম ভাঙাচোরা বাড়ির বাইরে। পেছন পেছন দৌড়ে এল পাদরি সাহেব। একা একা এই নরকপুরীতে থাকতে সে রাজি নয়।

কিছু দূর গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম বিষম ভয়ে!

রাস্তা বেয়ে লোকজন পালাচ্ছে ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছি ঠিকই—কিন্তু পলায়মান জনতার মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একশো ফুট উঁচু একটা যন্ত্রদানবকে। নির্বিকারভাবে চলেছে হনহন করে। যেন এ পৃথিবীটা তাদেরই। মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছে। এখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

খটকা লাগল একটু পরেই।

তাপরশ্মি বর্ষণ করছে না কেন ভীমাকার যন্ত্রদানব? লোকজন প্রাণভয়ে ছুটছে তো তার সামনে দিয়েই। লম্বা লম্বা পাইন গাছের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকেই নজর রেখেছে করাল আকৃতিটা—অথচ তাপরশ্মি ছুড়ে নিকেশ করে দিচ্ছে না কাউকেই!

ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা যে কী ভয়ানক, তা অচিরেই দেখতে পেলাম স্বচক্ষে এবং শিউরে উঠলাম যন্ত্রদানবদের এহেন আচরণের মূল উদ্দেশ্যটা অনুধাবন করতে না পেরে!
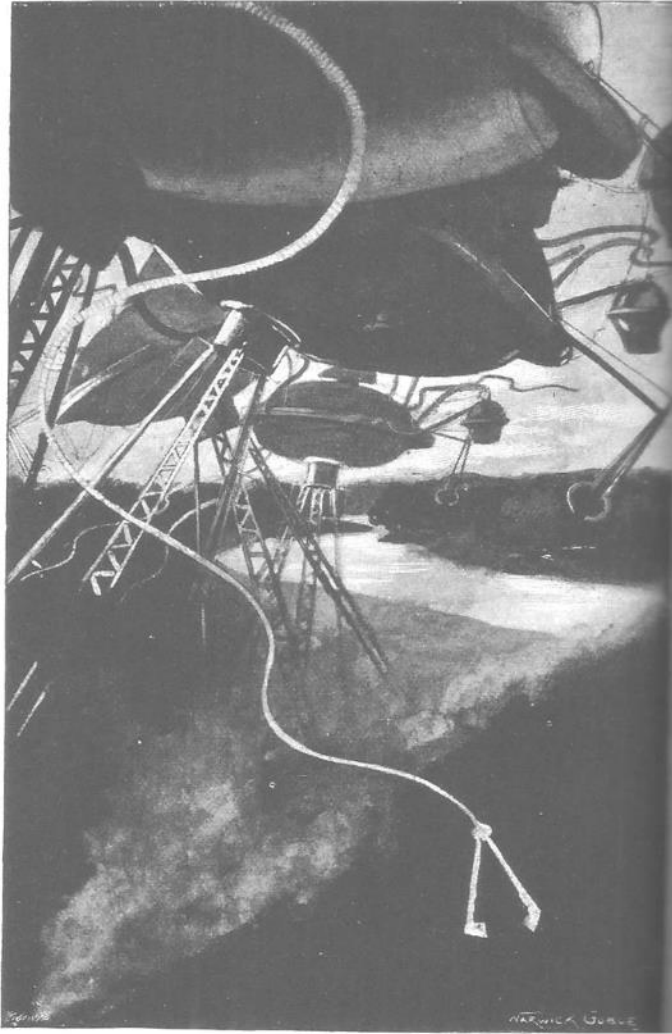
২.১৩ একটা একটা করে লোককে খপ করে শুঁড়ের ডগায় তুলে নিচ্ছে যন্ত্রদানব এবং নিক্ষেপ করছে পিঠের ধাতু-খাঁচায়!

পলায়মান জনতাদের মধ্যে থেকে একটা একটা করে লোককে খপ করে শুঁড়ের ডগায় তুলে নিচ্ছে যন্ত্রদানব এবং নিক্ষেপ করছে পিঠের ধাতু-খাঁচায়!

কেন? না মেরে জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? জবাবটা জেনেছিলাম পরে এবং তা এমনই নারকীয় ব্যাপার যে, লিখতে আমার কলম সরছে না। মানুষ জাতটা খাবার খেতে যে সময়টা নষ্ট করে, মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা তা-ও করে না। তারা জ্যান্ত মানুষের রক্ত টেনে নিয়ে নিজেদের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। বাকি সময়টা শুধু কাজ করে যায়।

টপাটপ করে লোক তুলে পরিত্রাহি চিৎকার সত্ত্বেও খাঁচার মধ্যে ফেলছে দেখেই কিন্তু বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল আমার হাতে-পায়ে। পাঁইপাঁই করে দৌড় দিয়েছিলাম পেছন ফিরেই। কোথায় যাচ্ছি, পথে কী আছে—অত দেখিনি। অন্ধকারে দেখা সম্ভবও ছিল না। ফলে, ঝপাত করে দু'জনেই ঠিকরে পড়লাম একটা খানার মধ্যে।

তখন শেষ রাত। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে খানার জলেই ঘাপটি মেরে থাকা সমীচীন বোধ করলাম—এর চাইতে নিরাপদ জায়গা আপাতত বাইরে আর কোথাও নেই। গাঢ় তমিস্রায় কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই—কিন্তু সেইটাই তো আমাদের পরম নিরাপত্তা। হতচ্ছাড়া যন্ত্রদানবরাও তো দেখতে পাবে না জলজ্যান্ত এই দুটো মানুষকে।

অনেকক্ষণ পরে হট্টগোল থেমে যাবার পর গুটিগুটি বেরিয়ে এলাম খানার মধ্যে থেকে। রাস্তা এড়িয়ে গেলাম। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পা টিপে টিপে এগলাম। বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল প্রতি পদক্ষেপে।

খিদে পেয়েছিল খুবই। সামনে একটা খালি বাড়ি দেখে ঢুকে পড়লাম তার মধ্যে। তেষ্টাও পেয়েছে বিলক্ষণ। হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় পেলাম রুটি আর শূকর মাংস। পাদরি পেয়ে গেল তৃষ্ণানিবারণের জল।

পরমানন্দে খাওয়াদাওয়া করছি দুই পলাতক পৃথিবীবাসী, আচম্বিতে এ কী কাণ্ড! চোখ ধাঁধিয়ে গেল অতি তীব্র সবুজ দ্যুতিতে—আলোর ঝলক নেমে এল আকাশ থেকে—নিমেষে দূরীভূত করল ভাঙা ঘরের প্রতিটি কোণের তমিস্রাপুঞ্জ। পরক্ষণেই শুনলাম পিলে-চমকানো একটা বিস্ফোরণের শব্দ। সে কী ভয়াবহ আওয়াজ। কানের পরদা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো অনেক ভয়ংকর বিকট আওয়াজ শুনেছি এই জীবনে, কিন্তু এরকম হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করা নিনাদ তো কখনও শুনিনি! গায়ের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে গেল রক্ত ছলকে দেওয়া সেই বিপুল সংঘাত-শব্দে। ছিটকে গেলাম শূন্যে —ছিটকে গেল সবকিছুই।

বলা বাহুল্য, সংবিৎ হারিয়েছিলাম আচমকা সেই প্রলয়কাণ্ডে। জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলাম কতক্ষণ পরে, তা বলতে পারব না। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। তমালকালো আঁধারে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে আছি আমি। পাশের দিকে কাতরানি শুনে বুঝলাম, ঘোর কাটিয়ে উঠেছে পাদরিসাহেবও।
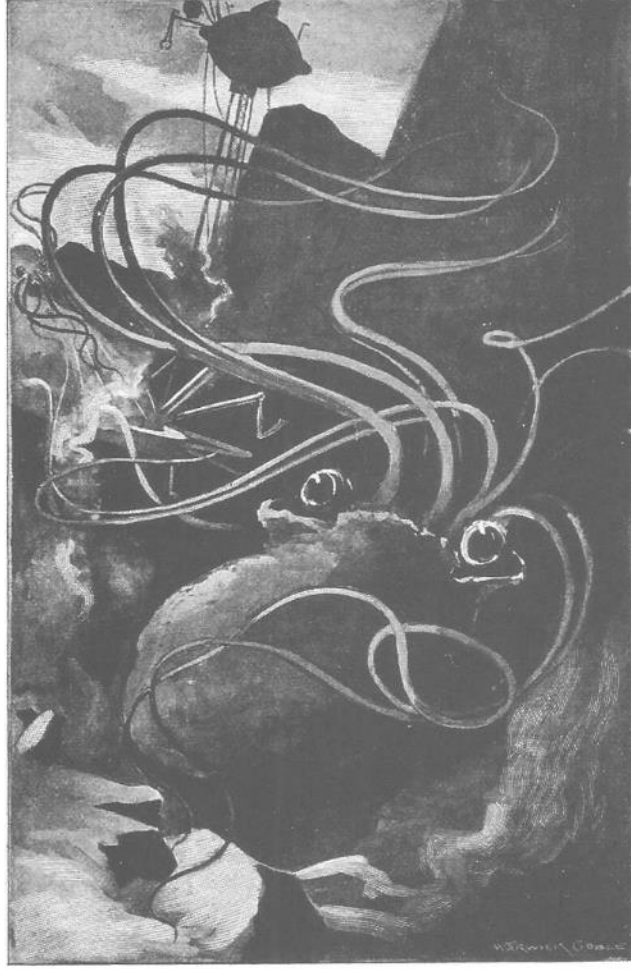
চিত্র ২.১৪ বিকটদেহী কদাকার একটা মঙ্গলগ্রহী পাহারা দিচ্ছে

ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে কথা বলতেও পারিনি। চাপা গলায় ধমক দিয়েছিলাম, চুপ! একদম নড়বেন না! বাইরেই রয়েছে ওরা—টের পাচ্ছেন?...

পাদরি টের পাক আর না-পাক, হাড়ে হাড়ে আমি টের পেয়েছিলাম, মঙ্গলগ্রহীদের কদাকার অস্তিত্ব রয়েছে অতি সন্নিকটে। ব্যাপারটা কী ঘটে গেল, তা-ও আঁচ করে নিয়েছিলাম। আর-একটা চোঙা মঙ্গল গ্রহ থেকে উড়ে এসে আছড়ে পড়ল বাড়ির খুব কাছেই। সাঁই সাঁই করে উড়ে যাওয়ার সময়ে এ বাড়িরও দফারফা করে দিয়ে গেছে, জিনিসপত্র আস্ত নেই কিছুই। কড়িকাঠ হেলে পড়েছে। দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। প্রাণে যে বেঁচে আছি এখনও— এইটাই আশ্চর্য।

সকাল না-হওয়া পর্যন্ত আঙুল নাড়বার সাহসও পেলাম না। তারপর অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে গেলাম ভাঙা দেওয়ালের একটা ফুটোর কাছে। ফুটো দিয়ে বাইরে তাকাতেই ছলাত করে উঠল বুকের রক্ত।

বিকটদেহী অতিশয় কদাকার একটা মঙ্গলগ্রহী জ্বলন্ত চোখে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে সদ্য অবতীর্ণ বিশাল সিলিন্ডারটাকে।

পঞ্চম সিলিন্ডার। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই। পঞ্চম চোঙা উল্কাবেগে ধেয়ে এসে তেরচাভাবে এই বাড়ির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেঁথে গেছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ভগ্নগৃহের নিচে কবরস্থ হতে চলেছি আমরাও!

অস্ফুট কাতরানি শুনলাম কানের কাছে পাদরির ভাঙা গলায়—হা ঈশ্বর! রক্ষে কর!

আর ঈশ্বর! ঈশ্বর আছেন কি নেই—এই সন্দেহটাই সেই মুহূর্তে দেখা দিয়েছিল মনের মধ্যে। এ কী অনাচার! অকারণে ভিনগ্রহীদের এ কী অত্যাচার! একটার পর একটা চোঙা নামিয়ে চলেছে শ্যামল সবুজ পৃথিবীর বুকে—তারপরেই তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। ঈশ্বর! তুমি কি সত্যিই আছ?

ঈশ্বর যে আছেন, সব দেখছেন এবং দণ্ড দেওয়ার আয়োজন করে চলেছেন—তা বুঝেছিলাম পরে।

তখন কিন্তু আতঙ্কে বিবশ হয়ে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারিনি। সে যে কী কষ্ট, তা আমি কোনওদিনই লিখে বোঝাতে পারব না... পারব না... পারব না!

অনেক... অনেকক্ষণ পরে খিদের জ্বালা অনুভব করেছিলাম নাড়িতে... বত্রিশ নাড়ি মোচড় দিয়ে উঠতেই আতঙ্কের নাগপাশ খসিয়ে গুটিগুটি খুঁজে বার করেছিলাম রান্নাঘর। সে ঘরের ভগ্নদশাও চোখে জল এনে দেয়। প্রকাণ্ড চোঙার এক ধাক্কাতেই পুরো বাড়িটাই বসে গেছে মাটির মধ্যে। খুঁজেপেতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খাবার খেতে খেতে ফাটল দিয়ে দেখে গেলাম, শয়তানের চেলার মতো কুৎসিতদর্শন মঙ্গল গ্রহের প্রাণীগুলো কীভাবে বানিয়ে চলেছে নারকীয় মেশিনের পর মেশিন। ওইরকম জড়ভরত শরীর নিয়ে এত দ্রুতও কাজ করতে পারে শয়তানগুলো! সারাদিন ধরে কাজই করছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—একনাগাড়ে খেটে দেখতে দেখতে খাড়া করে ফেলছে একশো ফুট উঁচু যন্ত্রদানবদের।

পাতালঘরে এইভাবে অসীম উৎকণ্ঠা আর যন্ত্রণা সহ্য করে দীর্ঘ আট দিন আট রাত কাটানোর পর নবম দিনে আচমকা একটা শব্দ শুনে দিবানিদ্রা ছুটে গেল আমার। ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখলাম, পাদরি মড়ার মতো পড়ে আছে ভূমিশয্যায়—আর একটা কিলবিলে শুঁড়-ভাঙা কড়িবরগার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে!

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অনুসরণ করেছিলেন তৎক্ষণাৎ। সুট করে সরে গিয়েছিলাম শুঁড়ের নাগালের বাইরে—ঘাপটি মেরে ছিলাম কয়লা রাখার ঘরে—নিবিড় তমিস্রার মধ্যে। ধড়াস ধড়াস করছিল উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে যাওয়া হৎপিণ্ডখানা—জানি না হতচ্ছাড়া মঙ্গলগ্রহী আমাকেও দেখে ফেলেছে কি না। যদি দেখে থাকে...
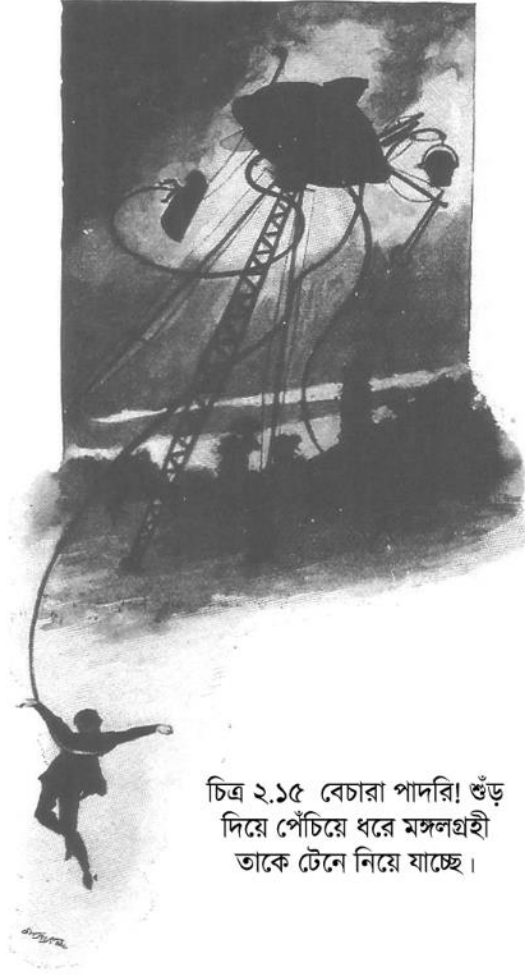
চিত্র ২.১৫ বেচারা পাদরি! শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে মঙ্গলগ্রহী তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আর ভাবতে পারিনি! সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট নিদারুণ আতঙ্ক আমার প্রাণপ্রদীপ সেই মুহূর্তে কেন যে নিবিয়ে দেয়নি—আজও তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

অন্ধকায়ে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি। কানে ভেসে এসেছিল শুধু ঠুক ঠুক ঠুক করে টোকা মারার শব্দ... তারপর শুনলাম, হিড়হিড় করে ভাঙা জিনিসপত্রের ওপর দিয়ে কী যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাহসে বুক বেঁধে উঠে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে। ফাটল দিয়ে উঁকি মারতেই শিউরে উঠেছিলাম।

বেচারা পাদরি! শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে মঙ্গল- গ্রহী তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে থেকে।

আঁতকে উঠে পিছু হটে এসেছিলাম কয়লা ঘরের মধ্যে। কয়লা তুলে নিজের গায়ে রেখে আত্মগোপন করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম প্রাণপণে।

ওই অবস্থাতেই শুনলাম নতুন একটা শব্দ। কয়লাঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলাম নিজের হাতে। মঙ্গল গ্রহের প্রাণী দরজার হাতল ধরে মোচড় দিচ্ছে।

উঃ! সে কী মনের অবস্থা আমার। অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছিল বলেই দেখতে পেলাম, হাতলটা ঘুরে যাচ্ছে একটু একটু করে। তারপরেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শুঁড়ের ঠেলায় খুলে গেল পাল্লা। ফাঁক দিয়ে কিলবিলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কুটিল সর্পের মতো শুঁড়খানা!

এবং এগিয়ে এল আমার দিকেই! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে ছিটকে সরে গিয়েছিলাম আমি—যতখানি তফাতে সরা যায়। কিন্তু ছোট ঘরে এমনিতেই জায়গা নেই—দেওয়ালে পিঠ দিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইলাম আধমরার মতো নিস্পন্দ দেহে।

কিলবিলে শুঁড়টা এগিয়ে এল মেঝের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে, ছুঁয়ে রইল আমার বুটের ডগা। পাছে আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে যায় গলা চিরে, তাই প্রাণপণে আঙুল কামড়ে ধরলাম। হিমেল জঘন্য ওই শুঁড় যদি আর-একটু এগোয়... অথবা পা সমেত বুটটাকে পাকিয়ে ধরে!

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। এক টুকরো কয়লা তুলে নিয়ে ছুড়ে দিলাম একদিকে। ঠকাস করে কয়লা গিয়ে পড়ল যেখানে, বিদ্যুৎবেগে শুঁড়টা ধেয়ে গেল সেদিকে। চক্ষের নিমেষে কয়লাটাকে সাপটে ধরেই সাঁত করে বেরিয়ে গেল বাইরে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা! অখণ্ড নৈঃশব্দ্য নেমে এল কয়লাঘরে!

না, শয়তানসদৃশ সেই শুঁড় আর হানা দেয়নি কয়লাঘরে। কিন্তু মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে পারিনি আমি পুরো একটা দিন। নিঃসাড়ে পড়ে ছিলাম অন্ধকারে কয়লার গাদায়—তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও নড়বার সাহস হয়নি।

তারপর অবশ্য আর পারিনি। তৃষ্ণা সইতে না পেরে পা টিপে টিপে বেরিয়েছিলাম জলের খোঁজে। গুটিগুটি এসেছিলাম ফাটলটার কাছে...

বাইরে কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। যে গর্তের মধ্যে গেঁথে রয়েছে চোঙাটা, যেখানে গত আট দিন ধরে ব্যস্তসমস্ত থেকেছে মঙ্গল গ্রহের আততায়ীরা—আজ সে গর্ত বেবাক শূন্য। কেউ নেই! কেউ নেই!

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেরিয়ে এসেছিলাম গর্তের মধ্যে। গুটিগুটি উঠে এসেছিলাম গর্তের ওপরে।

দেখেছিলাম ভারী উজ্জ্বল দিনের আলো। আর নীল... ঘন নীল আকাশ। আঃ! কী স্বস্তি! মঙ্গলগ্রহী বিকটদের টিকিও দেখা যাচ্ছে না ধারেকাছে! দূরে দূরে খাড়া আধভাঙা বাড়ি আর গির্জা। প্রাণের সাড়া নেই কোত্থাও!

শ্মশান শহরের পথ বেয়ে চারদিকের ভগ্নস্তূপ দেখতে দেখতে ম্লানমুখে অবশ দেহে রওনা হয়েছিলাম লন্ডন শহরের দিকে। যেতে যেতে অন্বেষণ করে গেছি খাদ্য—পেট যে জ্বলে যাচ্ছে। অনাহারে যে আধমরা হয়ে গেছি। বলতে লজ্জা নেই,

যেখানে যেটুকু খাবার পেয়েছি, তা-ই খেয়েছি। শরীরে বল পেয়েছি। আবার হেঁটেছি—চোরের মতো—ভয়ে ভয়ে!

আচমকা একটা বেড়ালকে দরজা টপকে পালাতে দেখেছিলাম। বেচারা! মানুষ দেখে আঁতকে উঠছে।

তারপরেই একইভাবে উধাও হতে দেখলাম একটা ধেড়ে ইঁদুরকে।

সন্ত্রস্ত ভীত উৎকণ্ঠিত পৃথিবীর ইতর প্রাণীরাও। আমিও তো ঠিক এইভাবেই দিন কাটিয়েছি কয়লাঘরের অন্ধকারে। কয়লা চাপা দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেছি হাস্যকরভাবে। বেড়াল আর ইঁদুরটার চকিত পলায়ন দেখে এই শিক্ষাই নিলাম আমি। ঠিক ওদের মতোই, বেড়াল আর ইঁদুরের মতো আনাচকানাচে লুকিয়ে এখন থেকে প্রাণ বাঁচাতে হবে আমাকে। আওয়াজ শুনলেই সটকান দিতে হবে—আড়ালে লুকিয়ে শত্রুর চোখ এড়িয়ে যেতে হবে। শত্রু এখানে মঙ্গল গ্রহের বিদঘুটে প্রাণীরা, প্রথম দর্শনে যাদের একান্ত অসহায় মনে করেছিলাম, তারাই এখন বীরদর্পে বিচরণ করছে পৃথিবীর বুকে—পৃথিবীর মালিক তো এখন থেকে ওরাই। আমরা হেরে গেছি—পালিয়ে আর লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনও গতি নেই আমাদের।

ভাঙা শহর, গ্রাম, কারখানা দেখতে দেখতে আর টলতে টলতে এইভাবেই হাঁটলাম পুরো দুটো দিন, খাবার যা পেয়েছিলাম—তা পর্যাপ্ত নয়। পেট ভরেনি—অবসাদও কাটেনি। তবুও হেঁটেছি মনের জোরে। স্রেফ মনের জোরে—আর দু'চোখ দিয়ে দেখে গেছি বর্ণনার অতীত ধ্বংসদৃশ্য। শ্মশান! শ্মশান! শ্মশান হয়ে গেছে এই পৃথিবী।

লন্ডনে পৌঁছেও দেখলাম মহাশ্মশান। সদাচঞ্চল কর্মব্যস্ত প্রাণস্পন্দনে ভরপুর লন্ডন শহর একেবারে মরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। নির্জন পথঘাটে একা একা হেঁটেছি আর নিঃশব্দে কেঁদেছি। মানুষ নেই... মানুষ নেই—এ পৃথিবীতে আর বুঝি জীবিত মানুষ নেই—একা আমি শুধু বেঁচে আছি হৃদয়বিদারক এই দৃশ্য দেখবার জন্যে!

সাউথ কেনসিংটনের কাছাকাছি আসতেই সেই প্রথম শুনতে পেলাম একটা অপার্থিব হাহাকার—উহ্-লা! উহ্-লা উহ্-লা!

এ আবার কীসের আর্তনাদ? এরকম বিকট অথচ করুণ আর্ত-চিৎকার তো কখনও শুনিনি। অমানবিক কণ্ঠে কে এমনভাবে চেঁচিয়ে চলেছে মরা নগরীর বুকে? প্রেতপুরীর বিকটোল্লাসও বুঝি এমন গা হিম-করা নয়।

চিত্র ২.১৬ যন্ত্রদানবের চিৎকার - উহ্-লা! উহ্-লা! উহ্-লা!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম আমি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে ছিলাম এদিকে-সেদিকে কাছে-দূরে—কিন্তু কাউকে দেখিনি—একাকী অমন কে অমানুষিক আর্তনাদ করে চলেছে, বুঝতেও পারিনি।

ফলে আবার সীমাহীন আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। দৌড়ালাম উন্মাদের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কোথায় যাচ্ছি, কীভাবে যাচ্ছি—কোনও খেয়াল আর রইল না।

আচমকা দেখতে পেলাম একটা যন্ত্রদানবকে! আতীক্ষ্ণ আর্তনাদটা বেরচ্ছে তারই মাথার বাক্স থেকে—উহ্-লা! উহ্-লা! উহ্-লা!

সহসা স্তব্ধ হল আর্ত-চিৎকার। থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল মৃত্যুপুরীতে। সে যে কী বিপুল শব্দহীনতা তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। অকস্মাৎ বজ্রপাত চেতনার ঝুঁটি পর্যন্ত যেভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়—অকস্মাৎ এই শব্দহীনতাকে শুধু তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

আমি স্তম্ভিত। অবশ। বিমূঢ়।

বিশালদেহী যন্ত্রদানব টলমল করে উঠেই প্রচণ্ড শব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভাঙা ঘরবাড়ির ওপর। নিস্তব্ধ শহর শিউরে উঠল সেই শব্দে।

শিহরিত হলাম আমিও। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তারপরেই পাগলের মতো দৌড়েছিলাম ভূলুণ্ঠিত নিস্পন্দ তেপায়া দানবের দিকে।

কাছে গিয়ে দেখেছিলাম, বাক্সের ঢাকনা খুলে গেছে—বিকটাকার মঙ্গলগ্রহীদের অবর্ণনীয় কুৎসিত দেহগুলো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কেউ নড়ছে না। এক্কেবারে নিষ্প্রাণ!

পাশের ছোট টিলাটায় উঠে গিয়েছিলাম হুড়মুড়িয়ে। সেখান থেকে দেখেছিলাম শুধু মড়া আর মড়া! সবই মঙ্গলগ্রহীদের! হেথায়-সেথায় প্রায় গোটা পঞ্চাশেক যন্ত্রদানব হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। প্রতিটার মাথার বাক্সের ঢাকনি খুলে গেছে। কিলবিলিয়ে মঙ্গলগ্রহীরা বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু নড়ছে না কেউই।
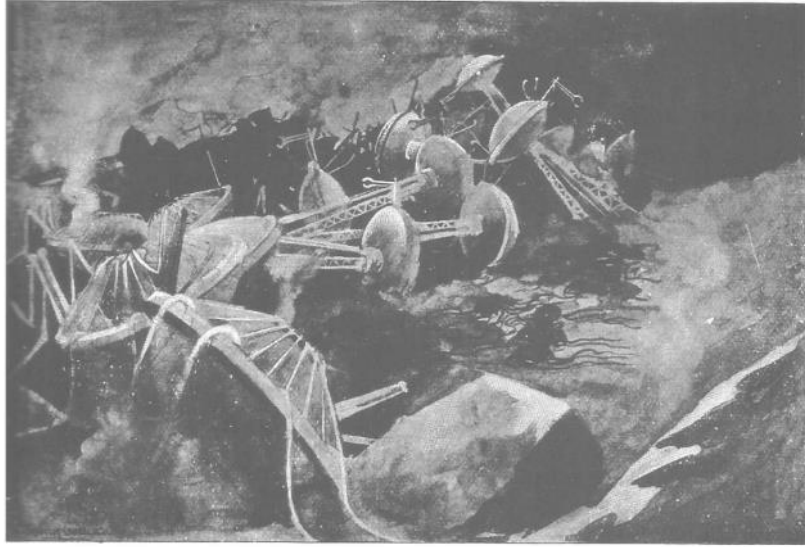
চিত্র ২.১৭ গোটা পঞ্চাশেক যন্ত্রদানব হুমড়ি খেয়ে পড়ে

মরেছে প্রত্যেকেই—কীভাবে তা জানি না। কিন্তু প্রাণ নেই কোনও মঙ্গলগ্রহীর দেহেই!

ভেবেচিন্তে কারণ অবশ্য পরে বার করেছিলাম। ঈশ্বর আছেন কি নেই, সে প্রমাণও পেয়েছিলাম। ঈশ্বরই ক্ষুদ্রতম প্রাণীদের বাসস্থান বানিয়েছেন এই পৃথিবীকে। ক্ষুদ্রতম এই প্রাণীদের নাম জীবাণু! তাদের কেউ কেউ মানুষের বন্ধু—কিন্তু রোগজীবাণুরা মানুষের পরম শত্রু। মানুষ তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে—মানুষের

শরীর রোগজীবাণুদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখবার প্রতিরোধব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনে আপনা থেকেই গড়ে নিয়েছে।

কিন্তু মঙ্গল গ্রহে তো জীবাণু নেই! শুধু চোখে যাদের দেখা যায় না, অথচ যারা শরীরের ওপর চড়াও হলে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়তে হয়—তাদের জন্যে প্রস্তুত ছিল না মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা। মঙ্গল গ্রহে যদি জীবাণু থাকত, জীবাণুর আক্রমণ সয়ে টিকে থাকবার প্রতিরোধব্যবস্থাও তাদের শরীরে থাকত।

ফলে, পৃথিবীতে পা দিতে-না-দিতে অদৃশ্য জীবাণুরা চড়াও হয়েছে তাদের দেহে—দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে গেছে। মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করেছে এবং খতম করে দিয়েছে মঙ্গলগ্রহীদের। জীবাণু আক্রমণ ঠেকানোর কৌশল মানুষ রপ্ত করার আগে মানুষকেও এইভাবে মরতে হয়েছে অদৃশ্য শত্রুদের আক্রমণে। এবার প্রাণবলি দিল আগন্তুক ভিনগ্রহী হানাদাররা!

অদৃশ্য শত্রুর প্রতাপ বুঝে গেল হাড়ে হাড়ে! মাইক্রোস্কোপ ছাড়া যাদের দেখা যায় না—যাদের কামান-গোলাবারুদ কিছুই নেই—তাদেরই নীরব অমোঘ আক্রমণ ঠেকাতে পারল না দুর্ধর্ষ দুর্জয় মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা।

ঈশ্বর! তুমি আছ! অবশ্যই আছ!

টেলিগ্রাফ মারফত চকিতে সুসংবাদটা ছড়িয়ে গেল সারা দুনিয়ায়। গির্জায় গির্জায় নিনাদিত হল ঘণ্টা। সারা ইংল্যান্ড নেচে উঠল খুশির আনন্দে।

আমি তখন কী করছিলাম? ট্রেন ধরে যারা বাড়ি ফিরে আসছিল, তাদের সঙ্গে একটা ট্রেনে উঠে বসেছিলাম। কু-ঝিকঝিক শব্দে বিপুল উল্লাসে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন ছুটে গিয়েছিল মাঠ-বন-প্রান্তর পেরিয়ে, পাইন আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে।

ফিরে এসেছিলাম আমার সুখের কুঞ্জ—নিভৃত গৃহে।

দূর থেকে পাহাড়ে উঠতে উঠতে সজলনয়নে চেয়ে ছিলাম অটুট বাড়িটার দিকে। নির্মম মঙ্গলগ্রহীরা যে কারণেই হোক তাণ্ডবনৃত্য করে যায়নি এদিকে। চিমনিটাই শুধু ভেঙেছে—তার বেশি কিছু নয়।

বাড়ির কাছে এসে দেখেছিলাম, পড়বার ঘরের জানলা যেভাবে খুলে রেখে পলায়ন করেছিলাম—সেইভাবেই খোলা রয়েছে। কাদা-মাখা পায়ে সদর দরজা পেরিয়ে ওপরতলায় উঠেছিলাম—এখনও সেই পায়ের ছাপ হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ির ওপর দিয়ে চাতালে উঠে গেছে। শুকনো পায়ের ছাপের পেছন পেছন ভারী মন নিয়ে উঠে এসেছিলাম ওপরতলায়। টেবিলের ওপর দেখেছিলাম, খাতাবই যেভাবে খুলে রেখে গিয়েছিলাম, সেইভাবেই খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বিষণ্ণ মনে নেমে এসেছিলাম নিচের তলায়। না, কেউ নেই সেখানেও। স্ত্রী হয়তো আমার অবর্তমানে ফিরে এসেছে বাড়িতে—অতি ক্ষীণ এই আশাটাও উধাও হয়ে গেল মন থেকে শূন্য গৃহ স্বচক্ষে দেখবার পর।

তারপরেই ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা।

অস্পষ্ট খেদোক্তি ভেসে এল কানে—বৃথা চেষ্টা। কেউ নেই। কেউ ফেরেনি!

চমকে উঠেছিলাম। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছিল ললাটে। এ কার কণ্ঠ? অতলান্ত দুঃখ কি মুখ দিয়ে প্রকাশ করে ফেলেছি? বিষাদের পাহাড় সরব হয়েছে নিজেরই কণ্ঠস্বরে?

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম, খোলা রয়েছে পেছনের গরাদবিহীন জানলা। কথাগুলো ভেসে এসেছে ওই জানলা দিয়েই!

পরমুহূর্তেই চৌকাঠে আবির্ভূত হল আমার স্ত্রী আর ভায়েরা।

স্তম্ভিত আমরা সকলেই। নির্বাক! নিশ্চুপ! চেয়ে আছি পরস্পরের মুখের দিকে!

তারপরেই বিষম আবেগে দৌড়ে এসেছিল আমার স্ত্রী—ভেঙে পড়েছিল কান্নায়, আমি জানতাম। আমি জানতাম!

এ কাহিনির সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ঘটনা এইটাই। আমরা দু'জনেই ভেবেছিলাম, কেউ আর বেঁচে নেই। স্ত্রী হারিয়েছে আমাকে—আমি হারিয়েছি স্ত্রী-কে—জন্মের মতো!

তাই বুঝি দয়ালু ঈশ্বর শেষ চমকটা দিয়ে গেলেন এইভাবে।

তারপর বহু সন্ধ্যা আমরা দু'জনে পড়বার ঘরে বসে গল্পগুজব করেছি, কখনও আমি লেখা নিয়ে আর আমার স্ত্রী বোনা নিয়ে তন্ময় থেকেছে—কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনি। আমার মনের মধ্যে মাঝেমধ্যেই কিন্তু গুঞ্জরিত হয়েছে একটা মহা আশঙ্কা—

মঙ্গলগ্রহীরা সুদূর মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে হানা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেছে, অন্য গ্রহ থেকে এমনি হানাদাররা পৃথিবীতে এলেও আসতে পারে ভবিষ্যতে।

আমরা কি তার জন্যে তৈরি?

অনুবাদক:

অরসন ওয়েলস মারা গেলেন

গল্পটা প্রথমে শুনেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের কাছে আকাশবাণীতে সাহিত্যবাসরে বারোয়ারি গল্পপাঠের আসরে।

গোটা যুক্তরাষ্ট্রে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গণ-আতঙ্ক! বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ পালাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের ঠেলেঠুলে তুলে দিচ্ছে গাড়িতে, মঙ্গলগ্রহীদের খপ্পর থেকে প্রাণ বাঁচাতে পাগলের মতো হাঁকাচ্ছে গাড়ি। রাস্তাঘাটে বেগে ধেয়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স। বিষ-গ্যাস থেকে বাঁচবার জন্যে নাকে-মুখে ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছে প্রত্যেকেই।

সত্যিই কি মঙ্গল গ্রহের বিভীষিকারা হানা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে?

না। জর্জ অরসন ওয়েলস **১৯৩৮**-এর নভেম্বরে রেডিয়োতে শুনিয়েছিলেন 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-এর রক্ত-জমানো গল্প। মূল বইতে ছিল ইংল্যান্ডের শহরের নাম—উনি তার বদলে বসিয়েছিলেন আমেরিকার শহরের নাম।

তাই এই গণ-আতঙ্ক। আতঙ্ক তাঁদেরই পেয়ে বসেছিল, যাঁরা ব্রডকাস্ট শুরু হয়ে যাওয়ার পর রেডিয়ো খুলেছিলেন। ইন্টারভ্যালে চারবার ঘোষণাও হয়েছিল—অনুষ্ঠানটা নিছক উপন্যাসভিত্তিক। পরে সরকারি তদন্তও হয়েছিল এই ব্যাপারে।

এমনই ছিল অরসন ওয়েলসের জাদুকরি কণ্ঠস্বরের মাহাত্ম্য। অলীক কাহিনিকে সত্য ঘটনার মতো শুনিয়ে গেছেন।

পৃথিবী থেকে এহেন প্রতিভা বিদায় নিলেন **১০** অক্টোবর **১৯৮৫**।
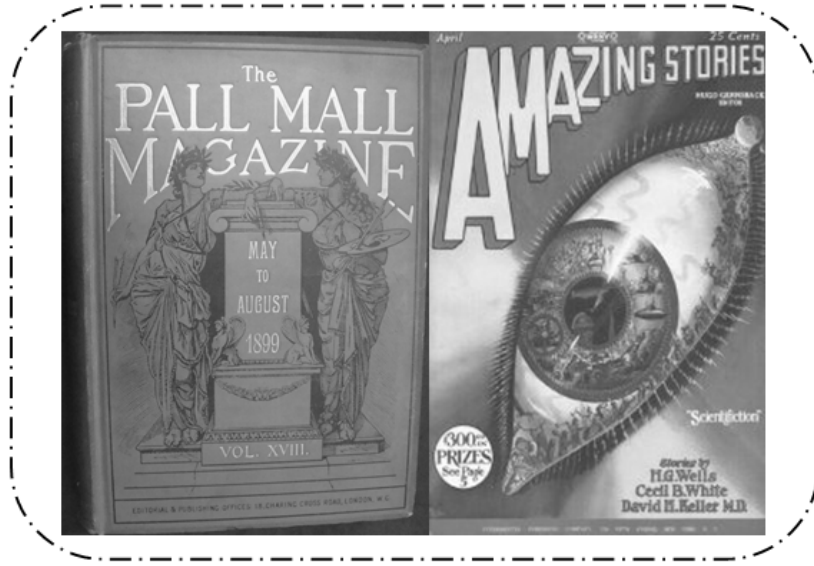
‘A Story of the Days to Come’ ধারাবাহিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালের জুন থেকে অক্টোবর মাসে ‘Pall Mall Budget’ পত্রিকায়। ১৮৯৯ সালে লন্ডনের ‘Doubleday & McClure Co’ থেকে প্রকাশিত ‘Tales of Space and Time’ সংকলনে উপন্যাসটি স্থান পায়। এপ্রিল ১৯২৮ সালে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ‘Amazing Stories’ পত্রিকায়।

ভাবীকালের একটি গল্প
(A Story of the Days to Come)

১। প্রেমরোগ সারানোর দাওয়াই

মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলের খাঁটি ইংরেজ মি. মরিস অতিশয় সজ্জন পুরুষ। সচ্ছল অবস্থা। 'টাইমস' দৈনিক পড়েন রোজ। ফি-হপ্তায় গির্জায় যান। দু'পায়ে যারা দাঁড়াতে পারেনি, তাদেরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। নিয়মমতো চুল কাটেন। দানধ্যান করেন। জামাকাপড়ও পরিচ্ছন্ন। স্মার্ট। তৃপ্ত। সুখী। আদর্শ পুরুষ।

একটি বউ-ছেলেমেয়েও আছে। বেশি নয়, কমও নয়। সুশিক্ষা দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের—যার যা দরকার, সবই দিয়েছেন। যা সংগত, যা ন্যায্য, মি. মরিসের জীবনে তার কোনওটিরই ঘাটতি নেই। মাঝবয়সে একদিন মারাও গেলেন ভদ্রলোক। কবরস্থ হলেন। মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত হল তাঁর জমকালো স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ বাড়াবাড়ি কিছু রইল না, অর্থহীনও কিছু রইল না।

এই গল্প শুরু হওয়ার অনেক আগেই ধুলো হয়ে গেল তাঁর দেহাস্থি—উড়িয়ে দেওয়া হল হাওয়ায়। শুধু তাঁর নয়, তাঁর নাতিপুতিদের হাড়ের ধুলোরও অবস্থাটা দাঁড়াল একই রকম। মি. মরিস কিন্তু কল্পনাও করতে পারেননি, এমন কাণ্ড ঘটতে পারে। জীবদ্দশায় কেউ তাঁকে এই ধরনের সম্ভাবনার কথা বললে দুঃখ পেতেন। মানুষ জাতটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁরা নির্বিকার, তিনি তাঁদেরই একজন। মি. মরিস অবশ্য আর-এক কাঠি সরেস এ ব্যাপারে। ওঁর মৃত্যুর পর মানবজাতির আদৌ কোনও ভবিষ্যৎ থাকবে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ ছিল তাঁর।

কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে মানুষ জাতটা টিকে রইল তাঁর এবং নাতিপুতিদের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার পরেও। ভদ্রলোকের নয়নসুন্দর

স্মৃতিসৌধের মার্বেল পুড়িয়ে বাড়ি তৈরির উপাদানও তৈরি হয়ে গেল। দুনিয়া এগিয়ে চলল আগের মতোই।

আর-একটা ঘটনার ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনলে রেগে যেতেন মি. মরিস। পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়া অগুনতি মানুষের রক্তে মিশে গিয়েছিল তাঁরও ধমনির রক্ত। হাজার হাজার পরদেশির রক্তে ঠাঁই নিয়েছিল তাঁর খাঁটি ইংরেজ রক্ত।

এই একই পরিণতি ঘটবে এ কাহিনি যাঁরা পড়ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও। যে জীবনে তাঁরা অভ্যস্ত, দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে সেই জীবন—হাজারখানেক পরদেশি ছাপ পড়বে সেই জীবনে—উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না—কল্পনাও করা যাবে না।

মি. মরিসের বংশধরদের মধ্যে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর পূর্বপুরুষের মতোই প্রায় সুস্থমস্তিষ্ক এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। সেইরকমই খর্বকায় বলিষ্ঠ আকৃতি। নামটিও তা-ই—তবে উচ্চারণটা অন্যরকম—মরিস হয়ে গিয়েছে ম্বরেস। মুখের ভাবেও সেই একই রকম ফিকে অবজ্ঞা। অবস্থা সচ্ছল। সমকালীন ‘তরুণ তুর্কি’দের দু’চক্ষে দেখতে পারেন না। মরিসের মতো ভবিষ্যৎ এবং নিম্নশ্রেণির ব্যক্তি সম্বন্ধে একই মনোভাব পোষণ করেন। ‘টাইমস’ বলে যে একটা দৈনিক পত্রিকা ছিল, সে খবরও রাখেন না। মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে ‘টাইমস’। ওঁকে খবর শুনিয়ে যায় ফোনোগ্রাফ মেশিন। প্রাতঃকর্ম সারবার সময়ে বকবক করে বিশ্বের খবর বলে যায় আশ্চর্য এই যন্ত্র। আকার-আয়তনে ডাচ ঘড়ির মতো। সামনের দিকে আছে বিদ্যুৎচালিত আবহাওয়া নির্দেশক ব্যারোমিটার, বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি আর একটা ক্যালেন্ডার। সারাদিনে কার কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তা মনে করিয়ে দেওয়ার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও আছে ফোনোগ্রাফের সামনে। ঘড়ির মুখটা তূরীর মতো ফাঁদালো। খবর শুরু হলেই গাঁকগাঁক আওয়াজ বেরিয়ে আসে তূরীর চোঙা দিয়ে। উড়ুক্কু বাস সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে বলেই দুর্ঘটনা ঘটে আকছার—রাতে কোথায় ক’টা অ্যাকসিডেন্ট ঘটেছে, সে খবর পরিবেশন করে ফোনোগ্রাফ; তিব্বতে নতুন কী ফ্যাশনের আমদানি ঘটল, তা-ও জানা হয়ে যায়। জামাকাপড় পরার সময়ে শুনতে পান একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোথায় কী মিটিং হয়ে গেল গতকাল। খবর ভালো না লাগলে, শুধু একটা বোতাম ছুঁয়ে দেন ম্বরেস। যেন দম আটকে আসে ফোনোগ্রাফের—খাবি খেতে খেতে শুরু করে অন্য খবর।
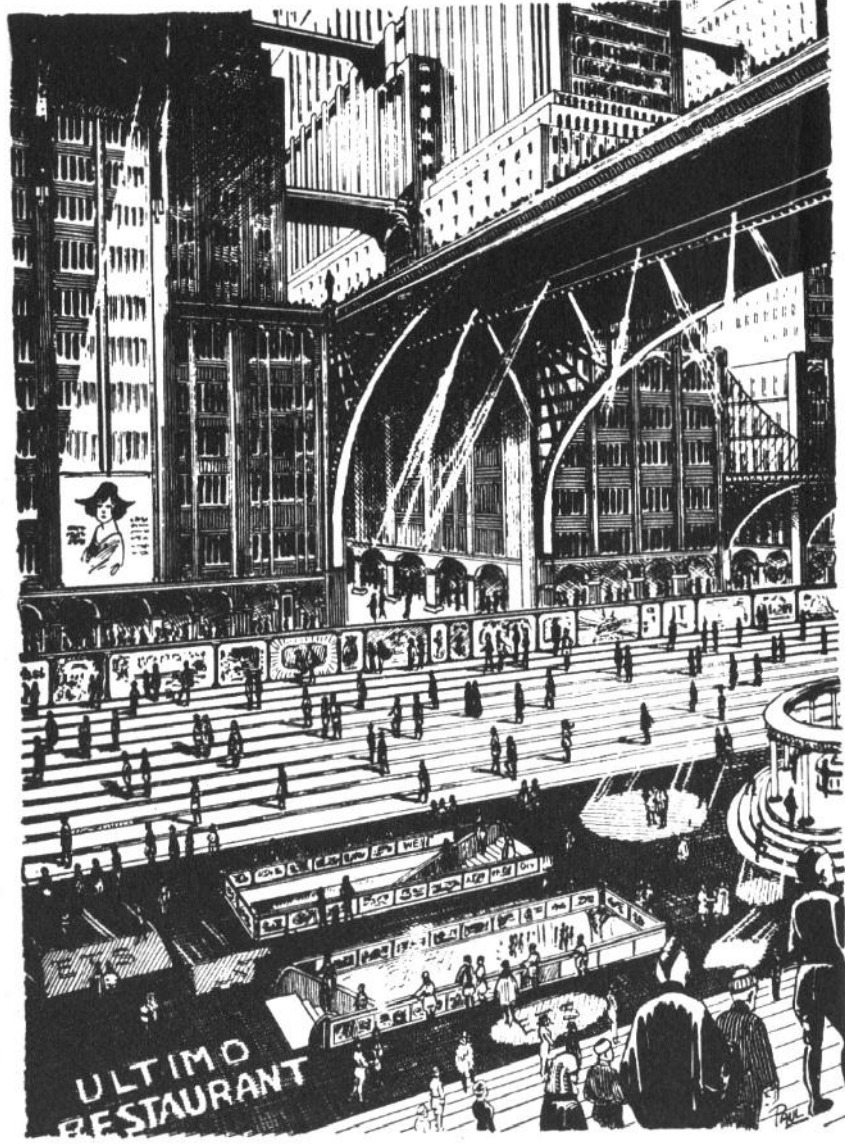
চিত্র ৩.১ ভাবীকালের একটি ব্যস্ততম দিনে

স্বরেস সাহেবের প্রাতঃকর্ম অবশ্য তাঁর পূর্বপুরুষের মতো নয় মোটেই। পুরাকালের মরিস দেখলে আহত হতেন। বুক চৌচির হয়ে যেত আদ্যিকালের মরিসের জামাকাপড়ের ছিরি দেখলে। ছি ছি ছি! স্বরেস সাহেব ন্যাংটা হয়ে দুনিয়া চরকি দিয়ে আসবেন তবুও ভালো, কিন্তু প্রাচীনকালের মরিস সাহেবের মতো সিল্কের টুপি, ফ্রককোট, ধূসর ট্রাউজারস আর ঘড়ির চেন গায়ে চাপিয়ে সং সাজতে রাজি নন কোনওমতেই। দাড়ি কামানোর হাঙ্গামার মধ্যেও মরতে মলেও যান না স্বরেস সাহেব। ও আদি অভ্যাস এ যুগে কি মানায়? নিপুণ কারিগর অনেকদিন আগেই গাল থেকে প্রতিটা চুলের গোড়া পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। দাড়ি এক্কেবারে নির্মূল —মৃত্যু পর্যন্ত। কামানোর ঝঞ্ঝাটও নেই। পদযুগলকে ঢেকে রাখবার জন্যে ট্রাউজারস নামক বিদঘুটে পোশাকই বা পরতে যাবেন কেন? পরেন গোলাপি আর

অম্বর রঙের এয়ার-টাইট বস্তুনির্মিত পোশাক—দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। পা দু'খানা যে লিকলিকে সরু নয়—রীতিমতো পেশিবহুল তা বোঝানোর কায়দাটা দারুণ অভিনব। পাম্প লাগানো আছে পোশাকের মধ্যে। বাতাস ঢুকিয়ে ট্রাউজারস ফুলিয়ে দেন। দেখলেই মনে হয় যেন থাকে থাকে মাস্‌ল সাজানো রয়েছে পুষ্ট পদযুগলে। কোথায় লাগে হারকিউলিসের পেশি! এর ওপর চাপানো বাতাস ভরতি ধরাচূড়া—সবার ওপর অবশ্য থাকে অম্বর সিল্কের টিউনিক—যা রোম দেশের মানুষরা পরত। ফলে, হঠাৎ প্রচণ্ড গরম বা নিদারুণ ঠান্ডায় কষ্ট পেতে হয় না। সবকিছুর ওপর পরেন টকটকে লাল রঙের একটা আলখাল্লা—কিনারাগুলো অত্যাশ্চর্যভাবে বাঁকানো। মাথার টুপিটা বাস্তবিকই অদ্ভুতদর্শন—মোরগের ঝুঁটির মতো। অদ্ভুত হলেও দেখতে ভারী সুন্দর। টকটকে লাল রং। মাথায় সেঁটে থাকে বাতাসের শোষণ-টানে। টুপি ফুলে থাকে হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরতি থাকায়। ও হ্যাঁ, স্বরেস সাহেবের মাথায় কিন্তু চুলের বালাই নেই। নাপিত নামক চুলের কারিগর প্রতিটা কেশ সমূলে উৎপাটন করেছে বহু বছর আগে। ফলে, টুপি ঠিকরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। রোজ সকালে এহেন পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে প্রশান্ত চোখে স্বরেস সাহেব বেরিয়ে পড়েন সমকালের মানুষদের সামনে।

স্বরেসকে মি. স্বরেস বলার কাষ্ঠ সৌজন্য লোপ পেয়েছে বহু বছর আগেই। স্বরেস এখন শুধুই স্বরেস—মিস্টার-ফিস্টারের বালাই নেই। ভদ্রলোক উইন্ডভেন অ্যান্ড ওয়াটারফল ট্রাস্ট কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কোম্পানিটা বিরাট। এই পৃথিবীতে যাঁর যত বিদ্যুৎশক্তি দরকার, সবই জোগান দিচ্ছে এই কোম্পানি। দুনিয়ার সমস্ত জলচক্র আর জলপ্রপাতের মালিক এই একটা কোম্পানি। ফলে, পৃথিবী গ্রহটার জল পাম্প করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করার অধিকার রয়েছে কেবল এই কোম্পানিরই। ভদ্রলোক থাকেন লন্ডনের সেভেন্থ ওয়ে অঞ্চলের একটা পেল্লায় হোটেলে—সতেরোতলার একটা অতীব আরামপ্রদ এবং সুবিশাল ফ্ল্যাটে। ভিক্টোরীয় আমলের বাবুগিরির ইতি হয়ে গেছে অনেককাল আগেই—ঝি-চাকর-খানসামা রেখে নবাবি চালে থাকার সাধ থাকলেও সাধ্য হয় না কারওই। বাড়ি ভাড়া আর জমির দাম যে হারে বেড়েছে এবং ঝি-চাকরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাবান্নার যান্ত্রিক ব্যবস্থার এমন উন্নতি ঘটেছে যে, আলাদা বাড়িতে পৃথক ঘরকন্না করার রেওয়াজও লোপ পেয়েছে। দলছাড়া হয়ে থাকা এ যুগে বর্বর বিলাসিতার শামিল। এহেন অ্যাপার্টমেন্টে সাজগোজ শেষ করে স্বরেস গিয়ে দাঁড়ালেন একটা দরজার সামনে। দুটো দরজা আছে অ্যাপার্টমেন্টে—এক-এক প্রান্তে একটা। প্রত্যেক দরজার ওপর বিশাল তির চিহ্ন—নিশানা করছে বিপরীত দরজার দিকে। বোতাম ছুঁতেই খুলে গেল দরজা। চওড়া গলিপথে এসে দাঁড়ালেন স্বরেস সাহেব। গলিপথের ঠিক মাঝখানে

সারি সারি চেয়ার পাতা রয়েছে—ধীরস্থির গতিবেগে চেয়ার সরে যাচ্ছে বাঁদিকে। ঝলমলে পোশাক-পরা নরনারী বসে কয়েকটি চেয়ারে। পরিচিত একজনকে অভিবাদন জানালেন বাতাসে মাথা ঠুকে। কথা বললেন না। এ যুগে প্রাতরাশ খাওয়ার আগে কথা বলাটা শিষ্টাচার নয় মোটেই। টুপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। চলন্ত চেয়ার গিয়ে দাঁড়াল লিফ্‌টের সামনে। লিফ্‌টে করে নেমে গেলেন বিশাল হলঘরে। বসে রইলেন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রাতরাশ পরিবেশনের প্রতীক্ষায়।

ভিক্টোরীয় যুগে যে ধরনের প্রাতরাশ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল—এ প্রাতরাশ কিন্তু সে প্রাতরাশ নয়। এক ধ্যাবড়া ময়দার তাল থেঁতলে চটকে বেঁকিয়ে সেঁকে পশুচর্বি মাখিয়ে সুস্বাদু করা হত তখন। সেই সঙ্গে থাকত সদ্যনিহত পশুমাংস—যা দেখলেই চেনা যেত কোন পশুর মাংস। কদাকারভাবে ঝলসিয়ে নির্মমভাবে কেটেও টুকরো টুকরো চেহারা পালটানো যেত না। নিষ্ঠুরভাবে ডিম কেড়ে আনা হত মুরগির বাসা থেকে, মুরগি বেচারির কোঁকর-কোঁ আপত্তিতে কর্ণপাতও করা হত না। ভিক্টোরীয় যুগে এসবই ছিল মামুলি ব্যাপার—কিন্তু পরবর্তী এই যুগের মানুষদের মার্জিত রুচি বরদাস্ত করতে পারে না এহেন জঘন্য আহার। বিভীষিকা এবং বিবমিষায় শিউরে ওঠে। কুৎসিত এইসব খাবারদাবারের বদলে আছে বিভিন্ন রঙের এবং আকারের নয়নসুন্দর কেক আর পেস্ট। রং দেখে বোঝাও যাবে না, রাঁধা হয়েছে কোন পশুর উপাদান আর রস থেকে। একধারে আছে ছোট্ট একটা বাক্স। বাক্সর ভেতর থেকে রেললাইনের ওপর দিয়ে হড়কে বেরিয়ে আসবে একটার পর একটা ডিশ ভরতি এইসব পেস্ট আর কেক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ টেবিলের ওপরে হাত বুলিয়ে অথবা এক ঝলক দেখেই মনে করতে পারে, খুব মিহি সাদা বুটিদার কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে টেবিল। কিন্তু মোটেই তা নয়। অক্সিডাইজ্‌ড ধাতু দিয়ে ঢাকা এই টেবিল খাওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকশো ছোট টেবিল রয়েছে হলঘরে। বেশির ভাগ টেবিল দখল করে বসে রয়েছে পরবর্তী এই যুগের মানুষরা—কোথাও একা, কোথাও দল বেঁধে। স্বরেস বসলেন এইরকমই একটা টেবিলে। অদৃশ্য অর্কেস্ট্রা নীরব ছিল বিরতির সময়ে। উনি বসতেই আরম্ভ হয়ে গেল শ্রুতিমধুর বাজনা।

প্রাতরাশ বা সংগীত নিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন না কিন্তু স্বরেস। চোখ ঘুরতে লাগল হলঘরে। যেন কারও আসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। একটু পরেই দেখা গেল তাকে। দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় এক পুরুষ। পরনে হলুদ এবং জলপাই-সবুজ পরিচ্ছদ। ঘরের শেষ প্রান্তে তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে হাত নেড়ে ডাকলেন স্বরেস। আগন্তুক এগিয়ে এল টেবিলের আশপাশ দিয়ে। অস্বাভাবিক তীব্রতা প্রকট হল দুই

চোখে—মূর্ত হল আত্যন্তিক ব্যগ্রতা মুখের পরতে পরতে। বসে পড়লেন স্বরেস—হাতের নির্দেশে বসতে বললেন পাশের চেয়ারে।

বললেন, 'দেরি দেখে ভাবলাম বুঝি আর আসবেন না।'

সময়ের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষাটা কিন্তু পালটায়নি—ভিক্টোরীয় আমলে যা ছিল, এখনও রয়েছে ঠিক তা-ই। ফোনোগ্রাফ মেশিনের এবং ওই জাতীয় বিবিধ রেকর্ডিং মেশিনের আবির্ভাবের ফলে এবং আস্তে আস্তে কেতাবজাতীয় পদ্ধতিগুলো অপসৃত হওয়ার দরুন মানুষের চোখই যে কেবল অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেয়েছে তা-ই নয়, মোটামুটি নিশ্চিন্ত একটা মান বজায় রাখতে পেরেছে ইংরেজি ভাষা—উচ্চারণ আর পালটায়নি—আগে যা ঘটতই, আটকানো যেত না।

সবুজ আর হলুদ পোশাক-পরা পুরুষ বললে, 'কৌতূহলোদ্দীপক একটা কেস নিয়ে আটকে পড়েছিলাম। নামকরা এক রাজনীতিবিদ অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাইনি এঁর জন্যে।'

'তা-ই নাকি? হিপনোটিস্টদেরও কাজ থাকে?'

প্রাতরাশ এসে গিয়েছিল টেবিলে। অম্বর রঙিন একটা জেলি প্লেটে তুলতে তুলতে হিপনোটিস্ট বললে, 'পসার তো বাড়ছে।'

'সর্বনাশ! আপনারা না থাকলে দেশ তাহলে অচল!'

জেলির আঘ্রাণ নিতে নিতে বললে হিপনোটিস্ট, 'অতটা অপরিহার্য অবশ্য নই। আমাদের ছাড়াও হাজার হাজার বছর দিব্যি চলেছে। দু'শো বছর আগে পর্যন্ত তো বটেই—ব্যাবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে তো মোটে একশো বছর আগে থেকে। হাজার হাজার ডাক্তার অন্ধের মতো হাতড়েছে তার আগে—ভেড়ার পালের মতো ছুটেছে একই পুরানো চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে। নরক গুলজার করে রেখেছিল বলা যায়—মনের ডাক্তাররা কিন্তু ভুল করেনি—দু'-চারজন হাতুড়ে ছাড়া।

জেলির দিকে মন দিল হিপনোটিস্ট।

স্বরিস বললেন, 'মানুষ জাতটার মস্তিষ্ক সে যুগে এতটা বিগড়ায়নি বলেই—'

'মনের ওপর এরকম চাপ তো পড়েনি। হেসে-খেলে জীবন কেটে যেত। রেষারেষির বালাই ছিল না। খুব একটা বাড়াবাড়ি না হলে মানুষের মন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। বেগতিক দেখলে পাঠিয়ে দিত পাগলাগারদ নামে একটা জায়গায়।'

'নামটা শুনেছি। ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনিগুলোয় হামেশাই তো মেয়েদের উদ্ধার করে আনা হয় পাগলাগারদ বা ওই জাতীয় জায়গা থেকে। জঘন্য কাহিনি। লোকে শোনে কী করে বুঝি না।'

'আমি তো শুনি। ভালো লাগে। আধা-সভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার মনকে ভরিয়ে তোলে। সে যুগের পুরুষরা ছিল বলিষ্ঠ, মেয়েরা সরল। এইসব নিয়েই

লেখা চাঞ্চল্যকর গল্পে ভেসে যাওয়ার মতো আনন্দ আর নেই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অদ্ভুত সেই যুগের কত আশ্চর্য ছবি... লোহার রেললাইন, ধোঁয়া-ওঠা সেকেলে লোহার ট্রেন, ঘিঞ্জি ছোট্ট বাড়ি, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। বই পড়ার নেশা আপনার নেই মনে হচ্ছে?'

'একেবারেই না। পড়েছি আধুনিক স্কুলে, ওসব সেকেলে বাজে ব্যাপারের মধ্যে মানুষ হইনি। ফোনোগ্রাফই যথেষ্ট আমার পক্ষে।'

'তা ঠিক, তা ঠিক,' বলতে বলতে পরবর্তী খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত হল হিপনোটিস্ট। টেনে নিল একটা ঘন নীল রঙের মিষ্টান্ন—হিপনোটিজ্‌ম নিয়ে সে যুগে অবশ্য কল্পনা-টল্পনারও বালাই ছিল না। দু'শো বছর পরে একশ্রেণির মানুষের পেশাই হবে স্মৃতিপটে ছাপ এঁকে দেওয়া, অন্যায্য ভাবাবেগকে দমন করা, অথবা অনেক কিছুই সম্মোহনের সাহায্যে ঘটিয়ে দেওয়া। অথচ এই ধরনের কথাবার্তা শুনলে আগে সবাই হেসেই উড়িয়ে দিত। খুব কম লোকই জানত, মেসমেরিজ্‌মের ঘোরে যে হুকুম দেওয়া যায়, তা ঘোর কেটে গেলেও মেনে চলতে বাধ্য হয়। হুকুম দিয়ে মেসমেরিজ্‌মের ঘোরে অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেওয়া যায়, ইচ্ছামতো কাজ করানো যায় ঘোর কেটে যাওয়ার পরেও—এত ব্যাপার ক'জন জানত বলুন? অথচ অনেক অসম্ভব ব্যাপারও যে ঘটতে পারে—এমন কথা বলার মতো লোকও তো ছিল। যেমন ধরুন শুক্র গ্রহে যাওয়া।'

'হিপনোটিজ্‌মের খবরও তাহলে রাখত?'

'নিশ্চয়! কাজেও লাগিয়েছে—যন্ত্রণা না দিয়ে দাঁত তোলার ব্যাপারে এবং ওই জাতীয় কাজে! এই নীল জিনিসটা তো খাসা। কী দিয়ে তৈরি জানেন?'

'মোটেই না! খেতে কিন্তু চমৎকার। আরও একটু নিন।'

আর-এক দফা প্রশস্তি নিয়ে নীরবে নীল বস্তুর রসাস্বাদন করে গেল হিপনোটিস্ট।

স্বরেস বললেন, 'ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনির আলোচনায় আবার আসা যাক। আপনার সঙ্গে দেখা করত চেয়েছিলাম কিন্তু এই ব্যাপারে।' বলে শ্বাস নিলেন গভীরভাবে।

চোখে চোখ রাখল হিপনোটিস্ট। বিরাম রইল না কিন্তু খাওয়ার।

স্বরেস বললেন, 'আমার একটি মেয়ে আছে। সুশিক্ষা যত রকমের হতে পারে—সবই দিয়েছি তাকে। মামুলি লেকচারার দিয়ে নয়—টেলিফোন লেকচারার মারফত! সহবত, নাচ, কথাবার্তা, দর্শন, শিল্পসমালোচনা—কিচ্ছু বাদ দিইনি। ইচ্ছে ছিল আমারই এক বন্ধুকে বিয়ে করুক। চেনেন নিশ্চয়—লাইটিং কমিশনের বিনডন, সাদাসিধে ছোট্ট মানুষ, কিন্তু খাসা মানুষ, তা-ই না?'

'তা ঠিক। বয়স কত আপনার মেয়ের?'

'আঠারো।'

'বিপজ্জনক বয়স। তারপর?'

'তারপর আর কী! ঐতিহাসিক রোমান্স নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করছে। বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। জীবনদর্শন শিকেয় উঠেছে। যতসব লড়াকু সৈনিকদের রাবিশ ব্যাপার মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছে। কী যেন নাম তাদের... ইট্রাসকান, তা-ই না?'

'ইজিপশিয়ান।'

'তা-ই হবে। তলোয়ার আর রিভলভার নিয়ে যাচ্ছেতাই সব ভয়ংকর মারদাঙ্গা ব্যাপার... রক্তারক্তি কাণ্ড... বীভৎস! বীভৎস! ফাঁদ পেতে টর্পেডো ধরা, বারুদ ফুটিয়ে স্প্যানিয়ার্ডদের উড়িয়ে দেওয়া, ননসেন্স অ্যাডভেঞ্চার! কোনও মানে হয়? এইসবের সঙ্গে আরও একটা বদ ব্যাপার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছে... বিয়ে করবে ভালোবেসে। এদিকে বিনডন বেচারি...'

বাধা দিয়ে বললে হিপনোটিস্ট, 'নতুন কিছু নয়। আগেও পেয়েছি এ জাতীয় কেস। অন্য ছোকরাটা কে বলুন তো?'

হাল ছেড়ে দেওয়ার মুখভঙ্গিমা করলেন স্বরেস। জবাব দিতে গিয়ে যেন মাথা কাটা যাওয়ার উপক্রম হল বিষম লজ্জায়—'প্যারিস থেকে উড়ুক্কু মেশিন এসে নামে যে মঞ্চে, সেইখানকার অতি সামান্য এক কর্মচারী। মেশিন থেকে নামতে সাহায্য করে, ফাইফরমাশ খাটে। রোমান্স গল্প-উপন্যাসে যেমনটি বলে, সেইরকমই দেখতে—মানে, মন্দ নয়—ভালোই। কাঁচা বয়স। মাথায় ছিট আছে। পুরাকালের বাতিল বিষয় মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছে। যেমন ধরুন, লিখতে জানে, পড়তে পারে! ভাবতে পারেন? আমার মেয়েটিও সেই একই দলের। লিখতে জানে, পড়তেও পারে! দু'জনে কথাবার্তা বলে টেলিফোনে নয়—আর পাঁচটা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হলে তা-ই করত—কিন্তু এরা মনের কথা লিখে ফেলে... কী যেন নাম জিনিসটার?'

'চিঠি?'

'না, না, চিঠি নয়... ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে... কবিতা।'

ভুরু তুলল হিপনোটিস্ট—'ছোকরার সঙ্গে আপনার মেয়ের দেখা হল কীভাবে?'

'প্যারিস থেকে ফ্লায়িং মেশিনে এসে নামতে গিয়ে মেয়ে আমার হোঁচট খেয়ে পড়বি তো পড় একেবারে ছোকরার দু'হাতের মধ্যে। বাস! শুরু হয়ে গেল সেই থেকে।'

'আচ্ছা?

'এবার বুঝেছেন, কেন ধড়ফড় করে মরছি? এ জিনিস বন্ধ করতেই হবে। হিপনোটিস্ট আমি নই—জানি না কী করতে হবে। কিন্তু আপনি—'

‘হিপনোটিজ্‌ম তো আর ম্যাজিক নয়।’

‘তা তো বটেই। কিন্তু তবুও—’

‘রাজি না থাকলে কাউকে হিপনোটাইজ করা যায় না। বিনডনকে বিয়ে করার যার ইচ্ছে নেই, সম্মোহিত হওয়ার ইচ্ছেও তার থাকবে না। কিন্তু একবার যদি সম্মোহিত হয়ে যায়—যেই করুক-না কেন—কাম ফতে হয়ে যাবে।’

‘আপনিই তো পারেন—’

‘পারিই তো! মনের জোর একবার ভেঙে দিতে পারলেই হল। তারপর হুকুম দেওয়া যাবে, যাও ভুলে ছোকরাকে। অথবা দেখলেই যেন মাথা ঘোরে... নয়তো, অজ্ঞান হয়ে যেয়ো। ঘটবেও ঠিক তা-ই। সম্মোহনটা জবরদস্ত হওয়া চাই—’

‘তা তো বটেই! ভুলে মেরে দেওয়াটাই সবচাইতে ভালো—’

‘কিন্তু সমস্যা তো হিপনোটাইজ করানোটা। আপনি বললে তো রাজিই হবে না।’

বলে, হাতে মাথা রেখে কিছুক্ষণ ভেবে নিল হিপনোটিস্ট।

খাপছাড়া স্বরে বললেন স্বরেস, ‘নিজের মেয়েকে সিধে করতে পারার মতো দুঃখ আর হয় না।’

হিপনোটিস্ট বললে, ‘আপনার মেয়ের নাম-ঠিকানা দিন। বিষয়টা সম্বন্ধে আরও কিছু খবর জানিয়ে রাখুন। ভালো কথা, এর মধ্যে টাকাকড়ির ব্যাপার আছে নাকি?’

দ্বিধায় পড়লেন স্বরেস।

‘তা... ইয়ে... একটু আছে বইকী। ওর মায়ের টাকা। মোটা টাকা। পেটেন্ট রোড কোম্পানিতে খাটছে। এই টাকাটার জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছি।’

‘বুঝেছি,’ বলে স্বরেসকে জেরা শুরু করল হিপনোটিস্ট।

চলল অনেকক্ষণ।

ইতিমধ্যে এলিজাবেথিটা স্বরেস নামের মেয়েটি বসে আছে প্যারিস থেকে ফ্লায়িং মেশিন এসে নামে যে মঞ্চে, তার পাশের ওয়েটিং রুমে। ‘এলিজাবেথিটা’ নামটা অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চারণে দাঁড়ায় ‘এলিজাবেথ’। ‘থ’ হয়ে গেছে ‘থিটা’। সে যাক গে। এলিজাবেথিটার পাশে বসে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে তার ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন প্রেমিক—কবিতাটা লিখেছে সেইদিনই সকালে মঞ্চে ডিউটি দেওয়ায় সময়ে। শেষ হল কবিতা। দু’জনে মুখোমুখি যেন গভীর দুঃখী হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই হু হু করে আকাশ থেকে নেমে এল আমেরিকা থেকে আসা বিশাল উড়ুক্কু যন্ত্রটা।

প্রথমে ছোট্ট, লম্বাটে, নীলচে একখণ্ড বস্তুর মতো দেখা গেল ফ্লায়িং মেশিনটাকে সুদূর গগনে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ওপরে। বড় হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। সুস্পষ্ট হল রং, ঝকঝকে সাদা। আরও কাছে আসতে আরও সাদা হল উড়ুক্কু যান।

স্তরে স্তরে সাজানো পৃথক পালগুলো দেখা গেল স্পষ্ট। চওড়ায় প্রতিটা কয়েকশো ফুট। হিলহিলে বপুটা হল স্পষ্টতর। ফুটকি ফুটকি সারবন্দি প্যাসেঞ্জার চেয়ারগুলোও দেখা গেল সুস্পষ্ট। ভীমবেগে আকাশ থেকে খসে পড়া সত্ত্বেও নিচ থেকে মনে হল যেন ঠিকরে যাচ্ছে ঊর্ধ্বগগনের দিকে। শহরের ছাদের ওপর দিয়ে বিশাল ছায়া লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে মঞ্চের দিকে। যন্ত্রযানের আশপাশ দিয়ে শিস-দেওয়া শব্দে বাতাস ধেয়ে যাওয়ার আওয়াজ আছড়ে পড়ল কানের পরদায়। আর্তনাদ শোনা গেল সাইরেনের। মঞ্চে যারা রয়েছে, তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে হুঁশিয়ার করছে তাদের। আচম্বিতে ঝপ করে পড়ে গেল সাইরেনের বিকট আওয়াজ। পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। স্নিগ্ধ চোখে এলিজাবেথিটা তাকালে পাশে বসা ডেনটনের পানে।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল ডেনটনের ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। এ ভাষায় কথা বলা হত আদিম যুগে—বিশ্বসংসার যখন শৈশবাবস্থায়, তখন। নিরালায় ভাববিনিময়ের জন্যে এই ভাষাকেই বেছে নিয়েছে এলিজাবেথিটা আর ডেনটন। এ ভাষায় কথা বলে শুধু দু’জনে মুখোমুখি বসে, দু’জনের গণ্ডির বাইরে আর কেউ জানে না ভাষাটার শ্রুতিমাধুর্য। হোঁচট-খাওয়া আধো আধো ভাষায় ডেনটন ব্যক্ত করল তার মনোগত অভিপ্রায়। একদিন এলিজাবেথিটাকে নিয়ে সে-ও যাবে আকাশপথে সূর্যালোকিত আনন্দের দেশ জাপানে। চারদিকের বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠে ছিটকে ধেয়ে যাবে শূন্যপথে—আধখানা দুনিয়া পেরিয়ে দু’জনে পৌঁছাবে রোদ্দুর ঝলমলে নিপ্পনে।

এ স্বপ্ন ভালো লাগে এলিজাবেথিটারও। কিন্তু ভয় পায় শূন্যপথে লাফ দিতে। হবে’খন—পরে হবে বলে প্রবোধ দিয়ে গেল ডেনটনকে—সমানে উৎসাহ জুগিয়ে গেল ডেনটন—সেদিনের নাকি আর দেরি নেই। বলতে বলতে শোনা গেল তীব্র বাঁশির আওয়াজ—মঞ্চে ডিউটি দেওয়ার সংকেত। বিচ্ছিন্ন হল দু’জনে—যেভাবে প্রেমিকযুগল বিচ্ছিন্ন হয়েছে যুগে যুগে হাজার হাজার বছর ধরে। করিডর বেয়ে লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়াল এলিজাবেথিটা। লিফ্‌ট থেকে নেমে এল পরবর্তীকালের লন্ডন শহরের একটি রাস্তায়। কাচ দিয়ে বাঁধানো ঝলমলে চকমকে রাস্তা—রোদে-জলে যাতে রাস্তার দফারফা না হয়—তাই এই স্ফটিক আবরণ। কোথায় লাগে ইন্দ্রপুরীর রাজপথ। কেন-না, স্ফটিকাবৃত অপরূপ এহেন পথের ওপর দিয়ে বিরামবিহীনভাবে সঞ্চরমাণ রয়েছে চলমান মঞ্চ। গোটা শহর জুড়ে রয়েছে এই মঞ্চ—যেখানে খুশি যাওয়া যাবে শুধু টুপ করে মঞ্চে উঠে বসলেই। এইরকমই একটা মঞ্চে উঠে বসে নারী হোটেলের নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাল এলিজাবেথিটা। বিশ্বের যাবতীয় সেরা লেকচারারদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রয়েছে এখানকার প্রতিটা অ্যাপার্টমেন্টের। সেই মুহূর্তে কিন্তু এলিজাবেথিটার হৃদয় সূর্যালোকে মথিত

থাকায় বিশ্বের সেরা লেকচারারদের প্রজ্ঞাও অতি-তুচ্ছ মনে হল সেই আলোর পশ্চাৎপটে।

দিনের মধ্যভাগ কাটল জিমন্যাশিয়ামে। দুপুরের খাওয়া খেল অন্য দু'টি মেয়ে আর সেই বয়স্কা রমণীর সঙ্গে, যেসব মেয়েকে একাই দেখাশোনা করে—যুবতী মেয়েদের সহচরী রাখার রেওয়াজ ভিক্টোরীয় যুগের মতো এ যুগেও রয়ে গেছে। যে মেয়েদের মা নেই অথবা যে মেয়েরা বিত্তশালী শ্রেণিভুক্ত, তাদের সহচরী থাকে এখনও। এককথায় এদের বলা হয় শ্যাপেরোন।

শ্যাপেরোন সেদিন একলা নয়। সঙ্গে রয়েছে একজন দর্শনার্থী। সাদা মুখ। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। পরনে সবুজ আর হলদে রঙের পোশাক। কথার ধোকড়। বলার ভঙ্গিমাটাও চমৎকার। সাত-পাঁচ কথা বলতে বলতে শুরু করল ঐতিহাসিক রোমান্স। নতুন ধরনের প্রেমকাহিনি। এ যুগের একজন নামী গল্প-বলিয়ে সদ্য উপহার দিয়েছেন শ্রোতাদের। কাহিনিটা অবশ্য ভিক্টোরীয় আমলের। কিন্তু একটা অভিনব আঙ্গিক সংযোজন করেছেন এ যুগের যশস্বী এই কথাশিল্পী। ভিক্টোরীয় যুগে প্রতিটি পরিচ্ছেদের মাথায় একটা শিরোনামা থাকত। উনি শিরোনামার অনুকরণে ছোট্ট ছোট্ট রংচঙে ভূমিকা জুড়ে দিয়ে প্রতিটি কাহিনিখণ্ডের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন। সেকেলে কেতাব কাহিনির চাইতেও আঙ্গিকটি তাই চমকপ্রদ। হলুদ এবং সবুজ বর্ণের পোশাক-পরা পুরুষটিও মুখর হয়েছে আঙ্গিকের প্রশংসায়। ছোট্ট ছোট্ট এই বাক্যের নাকি তুলনা হয় না। এক ঝলকে মনের চোখে ভাসিয়ে তোলে বেপরোয়া দামাল যুগটাকে। মানুষ আর পশু তখন নোংরা রাস্তায় গায়ে গা দিয়ে চলত—তিলধারণের জায়গা থাকত না পথে। কোণে কোণে ওত পেতে থাকত মৃত্যু। জীবন তো একেই বলে! জীবনের মতো জীবন! অথচ পৃথিবীর বহু জায়গা তখনও ছিল অনাবিষ্কৃত। এ যুগে বিস্ময় জিনিসটা বলতে গেলে একেবারেই লোপ পেয়েছে। এ যুগের মানুষ বড় ছিমছাম কাটছাঁট ধরাবাঁধা জীবনযাপন করে। তাল কাটে না, সুর কাটে না। মানুষ জাতটার সাহস, সহিষ্ণুতা, আস্থা মিলিয়ে যেতে বসেছে একটু একটু করে—মহৎ কোনও গুণই আর থাকবে না দু'দিন পরে—এত ঘড়ি ধরে নিয়ম মেনে ওজন করে চলার ফলে।

কথার ফুলঝুরি শুনে মেয়েরা তো মন্ত্রমুগ্ধ। অবাক হয়ে শুনছে গৌরবময় অতীতের কাহিনি। এই লন্ডন শহরেই কী বিপুল উচ্ছ্বাস-আনন্দ-প্রাণস্ফূর্তির বন্যায় ভেসে গেছে সে যুগের মানুষ। লন্ডন এখন আরও বড় শহর, আরও জটিল—দ্বাবিংশ শতাব্দীর এই লন্ডনের সঙ্গে তুলনা চলে না ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ঘিঞ্জি নোংরা আধা-বর্বর লন্ডনের। এ যুগের লন্ডন থেকে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা এখন কোনও সমস্যাই নয়। তা সত্ত্বেও বক্তার বাচনভঙ্গিমার ফলে মনে হচ্ছে,

বড় একঘেয়ে কষ্টের জীবন এই লন্ডনের মানুষদের—এর চাইতে অনেক উচ্ছল, অনেক প্রাণবন্ত জীবন ছিল আদি লন্ডনের আদিম মানুষদের।

কথোপকথনে প্রথমে অংশ নেয়নি এলিজাবেথিটা। কিছুক্ষণ পরেই এমনই জমে উঠল বিষয়বস্তু যে, দু'-চারটে মন্তব্য না করে পারল না। যদিও বেশ লাজুকভাবে। কিন্তু বক্তার যেন নজরই নেই তার দিকে। কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল... আপন মনে। বলে যাচ্ছে আরও একটা চিত্তবিনোদনের পন্থা। সদ্য আবিষ্কৃত পন্থা। সম্মোহন করে নাকি শ্রোতাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গৌরবোজ্জ্বল অতীতে। সম্মোহিত অবস্থায় শ্রোতার কানে কানে বলে দেওয়া হয়, এখন তুমি এসেছ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হারিয়ে যাওয়া সেই যুগে। সম্মোহিত ব্যক্তি মনে করে, সে সত্যি সত্যিই রয়েছে পুরাকালের আনন্দ-অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে। বাস্তব জীবনের মতোই অতীতের রোমান্সে গা ভাসিয়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্যে, প্রেমক্রীড়ায় মত্ত থাকে মনের আনন্দে, ঘোর কেটে যাওয়ার পরেও কিন্তু মনে থাকে সবকিছুই... যেন সত্যি, সত্যি, সব সত্যি!

'বহু বছর ধরে এই আনন্দ দেওয়ার পথ খুঁজেছি,' বললে হিপনোটিস্ট, 'ব্যাপারটা আসলে স্বপ্ন, নকল স্বপ্ন। এতদিনে জেনেছি কীভাবে এই নকল স্বপ্ন মানুষের মনে অজস্র রং দিয়ে এঁকে দেওয়া যায়। ফলে, অভিজ্ঞতার বর্ণসুষমা, অ্যাডভেঞ্চারের পুনর্জাগরণ, ন্যক্কারজনক রেষারেষির মধ্যে থেকে পলায়ন... সবই এখন সম্ভব! অত্যাশ্চর্য এই আবিষ্কারের তুলনা হয় না!'

সাগ্রহে শুধায় শ্যাপেরোন, 'আপনি জানেন নাকি কায়দাটা?'

'নিশ্চয়। কী স্বপ্ন চান, হুকুম দিয়েই দেখুন-না!'

প্রথমে সম্মোহিত হল শ্যাপেরোন। আশ্চর্য স্বপ্ন নিয়ে আনন্দে আটখানা হল ঘোর কেটে যাবার পর।

উৎসাহ সঞ্চারিত হল অন্য মেয়েদের মধ্যেও। একে একে ধরা দিল হিপনোটিস্টের খপ্পরে। প্রেমমদির অতীতে ফিরে গিয়ে অবগাহন করে এল কৃত্রিম প্রেম-অভিজ্ঞতার ঝরনাধারায়। রোমান্স কে না চায়!

এলিজাবেথিটাকে কিন্তু কেউ সাধেনি। সে নিজেই এই আশ্চর্য মজার স্বাদ পেতে চেয়েছিল। তাই তাকে হিপনোটিস্ট নিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের জাদুপুরীতে—যেখানে গেলে আর নিজের কোনও স্বাধীনতা থাকে না, নিজের ইচ্ছেয় আর কিছু করা যায় না...

নষ্টামিটা সাঙ্গ হল এইভাবেই।

উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চের নিচে রাখা নিরিবিলি শান্তির চেয়ারটায় একদিন এসে বসল ডেনটন। কিন্তু এলিজাবেথিটাকে দেখতে পেল না। এল হতাশা, সেই সঙ্গে ক্রোধ। পরের দিনও এল না এলিজাবেথিটা, তার পরের দিনও নিপাত্তা। এবার ভয়

পেল ডেনটন। ভয় ভুলে থাকার জন্যে লিখতে বসল চতুর্দশপদী সনেট কবিতা—এলিজাবেথিটা এলেই গছিয়ে দেওয়া যাবে হাতে...

মনকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করে তিন-তিনটে দিন এইভাবে নিজের সঙ্গেই ভয়াবহ লড়াই করে গেল ডেনটন—নিষ্ঠুর সত্যটা প্রকট হল তারপর। কিন্তু এলিজাবেথিটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এ ধারণা মাথায় আনতে পারল না কিছুতেই—নিশ্চয় অসুস্থ, অথবা হয়তো ধরাধামেই আর নেই। বড় কষ্টে গেল একটা সপ্তাহ। সাত-সাতটা দিন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করল এলিজাবেথিটা তার কাছে কতখানি—ডেনটনের সমস্ত ভুবন জুড়ে রয়েছে যে মেয়েটি, তাকে খুঁজে বার করতে হবে যে করেই হোক—হয়তো নিষ্ফলে যাবে তল্লাশি—তবুও খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে—তাকে ছাড়া যে জীবন বৃথা।

পুঁজি কিছু ছিল। সেই ভরসাতেই চাকরি ছেড়ে দিল ডেনটন। এলিজাবেথিটা কোথায় থাকে, সে কোন স্তরের কী পরিবেশের মানুষ—কিছুই জানা নেই ডেনটনের। এলিজাবেথিটাই বলেনি মেয়েলি রোমান্সের পুলকে, সমাজের দু'জনের দুই স্তরে স্থান, ডেনটন না-ই বা জানল সে বৃত্তান্ত। তাই যেদিকে দু'চোখ যায়, বেরিয়ে পড়ল ডেনটন। লন্ডন শহরটা চিরকালই গোলকধাঁধার মতো। ছিল ভিক্টোরীয় আমলেও, রয়েছে এখনও। কিন্তু তখন লন্ডনে থাকত মোটে চল্লিশ লক্ষ মানুষ, দ্বাবিংশ শতাব্দীর লন্ডনে থাকে তিন কোটি মানুষ। বিষম উৎসাহে এই জনারণ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ডেনটন, খাওয়া ভুলে গিয়েছিল, ঘুমানোর কথা মনে থাকেনি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস খুঁজেছে প্রেয়সীকে, ক্লান্তি আর হতাশায় উবে গেছে প্রথমদিকের বিপুল উৎসাহ, দেহে-মনে নেমেছে অবসাদ, অধিক উত্তেজনা অপসৃত হওয়ার পর চিত্ত জুড়ে বসেছে অপরিসীম ক্রোধ। বহু মাস পর আশার ক্ষীণ প্রদীপটিও নিবে গেছে একসময়ে, তা সত্ত্বেও যন্ত্রবৎ খুঁজে গেছে এলিজাবেথিটাকে পথে পথে, গলিঘুঁজিতে। যাকে দেখেছে, তারই মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থেকেছে। লিফ্‌ট, প্যাসেজ, অন্তহীন পথে-বিপথে হন্যে হয়ে খুঁজেছে... খুঁজেছে... মানুষ-চাকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটিমাত্র মানুষকে...

দৈব সহায় হল একদিন। দেখা পেল এলিজাবেথিটার।

সেদিন ছিল উৎসবের দিন। ক্ষুধায় কাতর ছিল ডেনটন। ভেতরে ঢোকার দক্ষিণা গুনে দিয়ে ঢুকেছিল শহরের অন্যতম দানবাকার ভোজনকক্ষে। টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিছক অভ্যাসের বশে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছিল চেয়ারে আসীন প্রতিটি মুখ...

দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আচম্বিতে স্থাণুর মতো, নড়ার শক্তি তিরোহিত হয়েছিল পদযুগল থেকে, দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল কোটর থেকে, দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল

অধরোষ্ঠ। মাত্র বিশ গজ দূরে বসে রয়েছে এলিজাবেথিটা, সটান চেয়ে রয়েছে তার দিকেই। কিন্তু এ কী চাহনি! পাথরের মূর্তির চোখেই যে এমন কঠোর, নির্ভাষ, নিরাবেগ চাহনি দেখা যায়। ডেনটনকে চিনতে পারার কোনও চিহ্নই নেই কুলিশ-কঠিন অক্ষিতারকায়।

মুহূর্তেক ডেনটনের পানে এহেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল এলিজাবেথিটা, পরক্ষণেই চেয়েছিল অন্যদিকে।

শুধু চাহনি দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে এই এলিজাবেথিটা ডেনটনের সেই এলিজাবেথিটা নয়। কিন্তু ডেনটনের এলিজাবেথিটাকে যে ডেনটন চেনে হাত দিয়ে, কানের পাশে দোলানো চূর্ণ-কুন্তল দিয়ে। মাথা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে কী সুন্দরভাবেই না দুলে ওঠে অলকগুচ্ছ। পাশে বসা মানুষটার কথা শুনে সংযত হেসে তার দিকে মুখ ফেরাল এই এলিজাবেথিটা। মানুষটাকে কটমট করে দেখল ডেনটন। খর্বকায় নির্বোধ আকৃতি। পরিচ্ছদ বুড়োটে সরীসৃপের মতন। মাথায় বাতাস-ফোলানো জোড়া শিং। এরই নাম বিনডন, এলিজাবেথিটার পিতৃদেবের মনোনীত পাত্র।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে ছিল ডেনটন বিস্ফারিত চোখে—সমস্ত রক্ত নেমে গিয়েছিল মুখ থেকে। তারপরেই মনে হল, বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। বসে পড়েছিল পাশের ছোট্ট টেবিলের সামনে। বসে ছিল কিন্তু এলিজাবেথিটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, চোখাচোখি তাকানোর সাহসও ছিল না। সামলে নেওয়ার পর আবার তাকিয়ে দেখেছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এলিজাবেথিটা আর বিনডন। উঠে দাঁড়িয়েছে তার বাবা আর শ্যাপেরোনও। যাওয়ার সময় হয়েছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে ছিল ডেনটন—নিশ্চল, নিথর, নীরব। আস্তে আস্তে দূরে সরে গিয়েছিল চার মূর্তি। সংবিৎ ফিরে পেয়েছিল ডেনটন। উঠে দাঁড়িয়ে ধাওয়া করেছিল পেছনে। চলমান মঞ্চের মোড়ে এসে দেখেছিল এলিজাবেথিটা আর শ্যাপেরোনকে। উধাও হয়েছে বিনডন আর স্বরেস।

ধৈর্য আর বাধ মানল না। এলিজাবেথিটার সঙ্গে এখুনি দুটো কথা না বললে যেন মৃত্যু হবে মনে হল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল দু'জনের দিকে। ওরা বসে ছিল দুটো চেয়ারে। ডেনটন বসল পাশের চেয়ারে। বিষম উত্তেজনায় ক্ষিপ্তের মতো তখন থরথর করে কাঁপছে ডেনটনের সাদা মুখ।

হাত রেখেছিল এলিজাবেথিটার মণিবন্ধে—'এলিজাবেথ, তুমি?'

অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ ফিরিয়েছিল এলিজাবেথিটা। অজানা-অচেনা মানুষ গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলে যুগে যুগে তরুণীরা যেভাবে ভয় পেয়েছে—সেই ভয় ছাড়া আর কিছুই প্রকটিত হল না দুই নয়নতারকায়।

‘এলিজাবেথ!’ উত্তেজনা-বিকৃত নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারেনি ডেনটন—‘এলিজাবেথ! কী সর্বনাশ! চিনতে পারছ না?’

সভয়ে সরে বসেছিল এলিজাবেথিটা। উজ্জ্বল-চক্ষু ধূসর-কেশী শ্যাপেরোন ঝুঁকে বসে নিরীক্ষণ করেছিল ডেনটনকে—‘কী বললেন?’

‘ইনি আমাকে চেনেন।’

‘চেনো এঁকে?’

‘না,’ কপালে হাত রেখে ক্লিষ্ট কণ্ঠে যেন শেখানো বুলি আওড়ে গিয়েছিল এলিজাবেথিটা, ‘চিনি না... চিনি না... চিনি না।’

‘কি-কিন্তু আমি যে ডেনটন। যার সঙ্গে কত কথা বলতে তুমি ফ্লায়িং স্টেজের নিচে বসে? মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না কবিতাগুলো—’

‘না, না, না, চিনি না... চিনি না... আরও যেন কী আছে, কিন্তু মনে পড়ছে না... শুধু জানি... এঁকে আমি চিনি না—’ নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে কালো হয়ে ওঠে এলিজাবেথিটার মুখচ্ছবি।

এইভাবেই চলেছিল কিছুক্ষণ। এলিজাবেথিটা চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারেনি—তোতা পাখির মতো শুধু আওড়ে গেছে একটাই কথা—‘চিনি না... চিনি না... চিনি না ওঁকে।’ ক্ষিপ্তের মতো মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ডেনটন—কবিতার কথা, গানের কথা, প্রেমকাহিনির কথা।

কিন্তু বৃথাই। ক্লান্ত অবসন্ন এলিজাবেথিটাকে অবশেষে বাঁচিয়ে দিয়েছিল শ্যাপেরোন। ভাগিয়ে দিয়েছিল ডেনটনকে। পাগলের মতো চলমান মঞ্চ থেকে মঞ্চে লাফিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল ডেনটন। সেইদিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে এলিজাবেথিটা শুধু জানতে চেয়েছিল, ‘লোকটা কে?’ অনিমেষে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে শ্যাপেরোন বলেছিল, ‘বাজে লোক—মাথায় ছিট আছে। জীবনে দেখিনি। খামকা ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না।’

এই ঘটনার পরেই সবুজ-হলদে পোশাক-পরা হিপনোটিস্টের কনসাল্টিং চেম্বারে আবির্ভূত হল একজন নয়া মক্কেল। তরুণ বয়স। উশকোখুশকো চুল। বিধ্বস্ত আকৃতি। উন্মাদের মতো শুধু বললে, ‘ভুলতে চাই... ভুলিয়ে দিন... সব ভুলিয়ে দিন।’

প্রশান্ত চোখে যুবকের পোশাক, আচরণ এবং মুখাবয়ব অবলোকন করে বললে হিপনোটিস্ট—‘ভুলে যাওয়ায় যন্ত্রণা অনেক কম। কিন্তু আমার দক্ষিণা যে বেশ চড়া।’

‘ভুলতে যদি পারি...’

‘হয়ে যাবে। আপনার নিজের ইচ্ছে যখন আছে... অসুবিধে হবে না। এর চাইতেও কঠিন কেস করেছি আমি। এই তো সেদিন একটি মেয়েকে সব ভুলিয়ে দিলাম—

ভালোবাসার ব্যাপার ছিল।’

হিপনোটিস্টের পাশে বসল তরুণ যুবা। জোর করে সংযত রাখল ছটফটানি। বললে অবরুদ্ধ কণ্ঠে, ‘নাম তার এলিজাবেথটা স্বরেস।’

কথাটা বলেছিল হিপনোটিস্টের চোখে চোখে চেয়ে। তাই দেখেছিল, নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় উথলে উঠল তার চোখে। বুঝেওছিল তৎক্ষণাৎ। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে কাঁধ খামচে ধরেছিল হিপনোটিস্টের। মুখে কথা সরেনি কিছুক্ষণ।

তারপরেই ফেটে পড়েছিল বিষম ক্রোধে। ফিরে পেতে চেয়েছিল এলিজাবেথিটাকে। আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ধস্তাধস্তি। দু’জনের কেউই অ্যাথলিট নয়। কুস্তি করতে কেউই শেখেনি। এ যুগে ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয় কেবল বিশেষ উপলক্ষে। ব্যায়ামচর্চার রেওয়াজ আর নেই। কিন্তু দু’জনের মধ্যে গায়ে জোর বেশি তরুণ যুবার। তাই অচিরেই আছড়ে ফেলল হিপনোটিস্টকে। কপালে চোট লাগায় জ্ঞান হারাল সম্মোহনের জাদুকর কিছুক্ষণের জন্যে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল, তার-ছিঁড়ে-আনা একটা ল্যাম্প বাগিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডেনটন! খুনে চাহনি। খুনে কণ্ঠেই সে বললে, কথা না শুনলে প্রস্তর-যুগের অস্ত্রচালনা করবে এখুনি। পাথরের হাতিয়ারের বদলে এই ল্যাম্প ছাতু করবে খুলি। অজ্ঞান থাকার সময়ে কাগজপত্র হাঁটকে পেয়েছে এলিজাবেথিটার ঠিকানা। ফোন করে দিয়েছে। শ্যাপেরোনকে নিয়ে সে আসছে এখুনি। এলেই যেন তাকে সম্মোহন করা হয়। ভাঁওতা দিতে হবে শ্যাপেরোনকে—সম্মোহন করা হচ্ছে মর্কটের মতো কদাকার ছোকরাটাকে এখুনি বিয়ে করার জন্যে—বললেই সে চুপ করে থাকবে। সম্মোহনের ঘোর এসে গেলেই ফিরিয়ে দিতে হবে এলিজাবেথিটার পূর্বস্মৃতি।

ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিল সম্মোহক ভদ্রলোক। আধুনিক মানবজাতির আচরণবিধি গ্রন্থে এ জাতীয় প্রস্তর-যুগীয় হামলাবাজির কথা কোথাও লেখা নেই। অটল থেকেছে ডেনটন। বেচাল দেখলেই ছাতু করবে খুলি। নিজে মরতে তার দ্বিধা নেই।

কিন্তু খুলির মায়া যে বড় মায়া—নির্দ্বিধায় জানিয়েছিল সম্মোহক। চিকিৎসকের সততা এখন শিকেয় তোলা থাকুক—কাকপক্ষীও জানবে না, এলিজাবেথিটা পূর্বস্মৃতি ফিরে পেল কী করে। ডেনটনের প্রতিও আক্রোশ মিলিয়ে যাবে দু’দিনে। অনেকক্ষণ মেঝেতে বসে রয়েছে সম্মোহক, এখন উঠে বসলে হয় না? এলিজাবেথিটা যে এসে
যাবে এখুনি।

২। বিজন শহরতলি

দুনিয়াটা নাকি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যতটা পালটেছে, ততটা পালটায়নি বিগত পাঁচশো বছরের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দী মানব-ইতিহাসে উষালগ্ন—বিশাল নগরীর সূচনা ঘটে সেই শতাব্দী থেকেই—অবসান ঘটে সেকেলে গ্রামীণ জীবনের।

অগণন প্রজন্ম ধরে যেমনটি ঘটে এসেছে, ঠিক সেইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানবজাতির অধিকাংশ বসবাস করত শহরতলিতে—গ্রাম অঞ্চলে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ থাকত ছোট ছোট শহর আর গ্রামে। সরাসরি নিযুক্ত ছিল কৃষিকর্মে অথবা কৃষিবিদের সহায়ক কাজকর্মে। পর্যটনের সুযোগ ঘটত কদাচিৎ—নিবাস রচনা করত কর্মস্থানের সন্নিকটে। কারণ দ্রুত ভ্রমণের উপযোগী যানবাহনের আবির্ভাব তখনও ঘটেনি। পর্যটনে বেরত মুষ্টিমেয় যে ক'জন, পদব্রজ, পালতোলা জাহাজ অথবা ঘোড়ায় টানা গাড়ির শরণ নিত। শেষোক্ত শকটটির গতিবেগ ছিল দিনে বড়জোর ষাট মাইল। ভাবতে পারেন? সারাদিনে মাত্র ষাট মাইল! মন্থরগতি সেই যুগে ক্বচিৎ দু'-একটা শহর গজিয়ে উঠত লোকালয়ের ধারেকাছে বন্দর-শহর অথবা সরকারি দপ্তর-শহর হিসেবে। কিন্তু এক লাখ মানুষ থাকার মতো শহর আঙুলে গোনা যেত গোটা পৃথিবীতে! এই চিত্র ছিল ঊনবিংশ শতকের শুরুতে। শতাব্দীর শেষে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, বাষ্পীয় পোত এবং জটিল কৃষিযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর পালটে গেল চিত্র। আগেকার চিত্রে ফিরে যাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই রইল না। শহরের মজা আর অগণন সুখ-সুবিধে রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় গেড়ে বসে গেল মানুষ জাতটার। রাতারাতি গজিয়ে উঠতে লাগল পেল্লায় পেল্লায় নগরী—বিশাল দোকান—শতসহস্র আরাম এবং বিরামের ব্যবস্থা। শুরু হয়ে গেল গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। শহরের দিকেই আকৃষ্ট হল মানবজাতি। দলে দলে মানুষ ধেয়ে গেল শহরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সুখের সন্ধানে। চাহিদা পড়ে গেল শ্রমজীবীদের—যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে। পল্লিপ্রকৃতিকে জবাই দিয়ে দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল বৃহত্তর প্রমোদকেন্দ্র এবং শিল্পকেন্দ্র।

ভিক্টোরীয় যুগের লেখকরা দিবানিশি এই কাহিনিমালাই গেঁথে গেছেন তাঁদের গল্প-উপন্যাসে—মানুষ স্রোতের মতো ধেয়ে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে। একই উপাখ্যান রচিত হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনে, নিউ ইংল্যান্ডে, ইন্ডিয়ায় এবং চায়নায়—পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটছে স্ফীতোদর বড় বড় শহরে। অপরিহার্য এই পরিবর্তন যে আসলে দ্রুত পরিবহণব্যবস্থার আবির্ভাবে, এ তথ্য উপলব্ধি করেছেন মাত্র কয়েকজনই—বালসুলভ প্রচেষ্টা চলেছে পৃথিবীজোড়া শহরমুখী চৌম্বক আকর্ষণ ঠেকিয়ে রাখার।

নব-ব্যবস্থার নিছক উষালগ্ন কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দী। শুরু তখুনি। নবযুগের বড় বড় শহরে অসুবিধে ছিল বীভৎস মাত্রায়। ধোঁয়ায় ভরপুর, কুয়াশায় অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর এবং কোলাহলময়। ভবন নির্মাণের নতুন পদ্ধতি, ঘর উষ্ণ রাখার নতুন ব্যবস্থা পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তি দিল শহর সভ্যতাকে। ১৯০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে প্রগতি হল আরও দ্রুত; ২০০০ থেকে ২১০০-র মধ্যে মানবজাতির উন্নয়ন এমনই লাফ মেরে মেরে এগিয়ে গেল, এমনই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ঘটতে লাগল যে, ভিক্টোরীয় যুগের সুব্যবস্থাকেও অবশেষে মনে হল যেন অলস প্রশান্ত জীবনের একটা অবিশ্বাস্য দূরদর্শন।

মানবজীবনটাকে চূড়ান্তভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ রেলপথ প্রবর্তন। পরিবহণব্যবস্থার সন্ধিক্ষণ। ২০০০-এ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল রেলপথ আর সড়ক। রেললাইন বঞ্চিত রেলপথগুলো ঝোপে ভরতি নালা হয়ে পড়ে রইল ভূপৃষ্ঠ জুড়ে। সড়কগুলো একদা নির্মিত হয়েছিল হাত দিয়ে দুরমুশ পিটিয়ে, বদখত লোহার রোলার চালিয়ে; চকমকি পাথর আর মাটি দিয়ে পেটাই অদ্ভুত সুপ্রাচীন সেইসব পথে ছড়ানো থাকত হরেকরকম আবর্জনা; লোহার অশ্বক্ষুর আর শকটচক্রে বিচিত্র পথ কেটে ফালাফালা হয়ে যেত—কয়েক ইঞ্চি গভীর ক্ষত দগদগ করত রাস্তার সর্বত্র; ক্ষতবিক্ষত হতশ্রী এইসব পথ এখন লোপ পেয়েছে ধরাধাম থেকে—সে জায়গায় এসেছে এল্ডহ্যামাইট নামক একটি উপাদান দিয়ে নির্মিত পেটেন্ট করা পথ। পেটেন্ট যিনি নিয়েছিলেন—তাঁর নামই অমর হয়ে রয়েছে এল্ডহ্যামাইট নামটার মধ্যে। বিশ্ব ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করবার মতো যে ক'টা আবিষ্কার আজ পর্যন্ত হয়েছে, ছাপাখানা আর স্টিম তার মধ্যে পুরোধা। এল্ডহ্যামাইট পড়ে এই পর্যায়ে।

আবিষ্কারকের নাম এল্ডহ্যাম। প্রথম যখন আবিষ্কার করেন উপাদানটা, গুরুত্বটা বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন, ইন্ডিয়া-রবারের সস্তা বিকল্প উদ্ভাবিত হল বুঝি। সস্তা তো বটেই—টনপিছু দাম মোটে কয়েক শিলিং। কিন্তু একটা আবিষ্কার যে কত কাজে লাগতে পারে, তার ফিরিস্তি কি কেউ দিতে পারে? কাজেই স্বয়ং আবিষ্কারক এল্ডহ্যামাইটের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারলেও, পেরেছিলেন ওয়ামিং নামে এক ভদ্রলোক। শুধু গাড়ির টায়ারে নয়, রাস্তাঘাট বাঁধানোর কাজে বস্তুটাকে লাগানো গেলে যে পৃথিবীর খোলসটাকে মেজে-ঘষে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা যাবে—এ ধারণা মাথায় আনতে পেরেছিলেন। ফলে, তাঁরই প্রচেষ্টা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার সুফল হিসেবে ভূগোলকের সর্বত্র আবির্ভূত হল আধুনিক রাস্তার জটাজাল।

এক-একটা সড়ক লম্বালম্বিভাবে অনেক ভাগে ভাগ করা। দু'দিকের কিনারা সংরক্ষিত শুধু সাইকেল আর সেইসব গাড়ির জন্যে, যাদের গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র পঁচিশ মাইলের বেশি নয়। তার গা ঘেঁষে ভেতরের দিক দিয়ে ধেয়ে যায় মোটরগাড়ি —গতিবেগ যাদের ঘণ্টায় একশো মাইল তো বটেই। একদম মাঝের অংশটুকু সংরক্ষিত রয়েছে অত্যন্ত বেগবান যন্ত্রযানদের জন্যে—গতিবেগ যাদের ঘণ্টায় দেড়শো মাইল কি তারও বেশি। এই ভবিষ্যদৃষ্টির জন্যে অবশ্য প্রচুর টিটকিরি হজম করতে হয়েছে ওয়ামিং বেচারিকে।

ওয়ামিং কিন্তু টলেননি। প্ল্যান অনুযায়ী সড়ক তো বানালেন। কিন্তু দশ-দশটা বছর বেবাক ফরসা হয়ে যাওয়ার পরেও একদম মাঝের অতিশয় বেগবান যন্ত্রযানদের জন্যে সংরক্ষিত অংশে ধুলোই জমা হয়ে গেল—গাড়ি আর চলল না। ওয়ামিং মারা যাওয়ার আগেই অবশ্য সবচেয়ে ভিড় দেখা গিয়েছিল একদম মাঝের অংশটুকুতেই। ঝড়ের বেগে বিশাল ধাতব কাঠামোর গাড়ি হরবখত ধেয়ে যেত সড়কের মাঝখান দিয়ে—বিরাট চাকাগুলোর ব্যাস বিশ থেকে তিরিশ ফুট তো বটেই। গতিবেগও বেড়ে চলল বছরে বছরে খুঁটিনাটি উন্নতিসাধনের মধ্যে দিয়ে—শেষকালে পৌঁছাল ঘণ্টায় দু'শো মাইলে। গতিবেগের এই বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব ঘটে গেল ক্রমবর্ধমান শহরগুলোর ক্ষেত্রেও। বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের ফলে ধুলো, ধোঁয়া, কুয়াশা, আবর্জনা অদৃশ্য হয়ে গেল (ভিক্টোরীয় যুগে যা ছিল শহরের সৌন্দর্য)। আগুনের বদলে এল বৈদ্যুতিক চুল্লি। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে আইন প্রণয়ন হয়ে গেল—যে আগুন নিজের ধোঁয়া গিলে খেতে না পারবে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সদ্য-আবিষ্কৃত কাচজাতীয় একটা বস্তু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল শহরের সমস্ত পথঘাট, পাবলিক পার্ক আর বাজারহাট। লন্ডন শহরটার ওপর এই জাতীয় ছাদ নির্মাণ বলতে গেলে থেমে নেই আজও—চলছে তো চলছেই। আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণ করার ব্যাপারে বেশ কিছু অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মূর্খের-মতো-নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর থেকেই পালটে গেল লন্ডনের সুরতখানা—আগে যা ছিল চ্যাপটা, থ্যাবড়া থ্যাবড়া বাড়ি সমাকীর্ণ আদিম শহর—যে শহরের মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের দৈন্যদশা প্রকট ছিল বড় বেশিভাবে—এখন সেই শহরেই মেঘলোককে চুম্বন দেওয়ার প্রয়াসে ধাঁ ধাঁ করে উঠে গেল লম্বা লম্বা সৌধ। দায়িত্ব বাড়ল মিউনিসিপ্যালের। জল, আলো আর পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করলেই শুধু চলবে না —বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থায় যেন ত্রুটি না থাকে।

মানুষকে অনেক সুখ-সুবিধে এনে দিয়েছিল এই দু'শো বছর। এনেছিল অনেক পরিবর্তন। সব কাহিনি শোনাতে গেলে ডেনটন-এলিজাবেথিটার কাহিনি থেকে সরে যেতে হবে আমাদের। আকাশে ওড়া যে সম্ভবপর তা কি কেউ কল্পনাও করতে

পেরেছিল দু'শো বছর আগে? উপর্যুপরি আবিষ্কারের পর আবিষ্কারে সম্ভব হয়েছিল এহেন অসম্ভব কাণ্ডও। হেঁশেল নিয়ে আটকে থাকতে কেউ আর চায়নি, অসংখ্য হোটেল নিয়েছিল রান্নাবান্না এবং উদরপূর্তির দায়িত্ব। চাষবাস নিয়ে যারা চিরকাল মাঠেঘাটে, খেতখামারে কাটিয়েছে, আস্তে আস্তে তারা নিবাস রচনা করেছিল শহরে। গোটা ইংল্যান্ডে শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল চারটে শহর—বিরাট শহর! লক্ষ লক্ষ মানুষ আস্তানা নিয়েছিল এক-একটা শহরে। শহরতলির বাড়িঘরদোরগুলো ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে উঠেছিল এই দু'শো বছরে—মানুষজন কেউ থাকত না সেসব বাড়িতে।

বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বটে ডেনটন আর এলিজাবেথিটা—পুনর্মিলনও ঘটেছিল। বিয়েটা কিন্তু হয়নি। দোষটা ডেনটনেরই। ওই একটা দোষই কেবল ছিল বেচারির। পকেটে ছিল না পয়সা। একুশ বছরে পা না-দেওয়া পর্যন্ত এলিজাবেথিটার ভাঁড়েও মা ভবানী, ওর তখন বয়স মোটে আঠারো। ওই যুগের রীতি অনুযায়ী একুশ বছর হলেই পাবে মায়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি। ফলে, শিকেয় তোলা রয়েছে বিবাহ-পর্ব। দিবারাত্র ঘ্যানর ঘ্যানর করত এলিজাবেথিটা, তার মতো অসুখী আর কেউ নেই, কেউ বোঝে না, কেউ না, একমাত্র ডেনটন ছাড়া। ডেনটন কাছে না থাকলে দু'চোখে অন্ধকার দেখে। ডেনটনও ঘ্যানর ঘ্যানর করে যেত একইভাবে, চৌপর দিনরাত কাছে পেতে চাইছে এলিজাবেথিটাকে, কিন্তু পাচ্ছে কই? দু'জনের দুঃখ বিনিময় চলত দেখাসাক্ষাৎ হলেই।

উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চের ওপর রক্ষিত ছোট্ট আসনে বসে একদিন এইসব কথাই হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে। জায়গাটা লন্ডন শহরের পাঁচশো ফুট ওপরে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে আধুনিক লন্ডনকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লন্ডন বাসিন্দাদের কাছে সে চিত্র তুলে ধরা বিলক্ষণ মুশকিলের ব্যাপার। 'ম্যামথ' হোটেলশ্রেণি, স্ফটিক-প্রাসাদ, শহরজোড়া অতিকায় সৌধমালা কল্পনাতে আনাও কঠিন। অগুনতি ছাদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা বনবন করে ঘুরে চলেছে হাওয়াকলের চাকা।

ডেনটন-এলিজাবেথিটার কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বিশাল কারাগারে বন্দি রয়েছে দু'জনে। আরও তিনটে বছর থাকতে হবে এই খাঁচায়—তারপর পাবে মুক্তি—বহুবার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে, এখনও চলছে একই দুঃখের চর্বিতচর্বণ। এই তিন-তিনটে বছর ঠায় বসে থাকা যে অতীব কষ্টকর, একেবারেই অসম্ভব এবং মনের ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার, এ ব্যাপারে একমত হয়েছে দু'জনেই। ডেনটন জানিয়েছে, তিন বছর ফুরানোর আগেই অক্কা না পায় দু'জনে!

চোখে জল এসে গেল এলিজাবেথিটার। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

কিন্তু এহেন শহরে কপর্দকহীন অবস্থায় বিয়ে করাটাও তো একটা ভয়াবহ ব্যাপার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবশ্য পাতায় ছাওয়া মেটে কুঁড়েঘরে দাম্পত্য

জীবনযাপনের মতো সুখাবহ আর কিছুই ছিল না। পাখি নেচে বেড়াত গাছের ডালে ডালে, ফুলের সৌরভে মাতাল হয়ে থাকত বাতাস, অজস্র বর্ণ আচ্ছন্ন করত চিত্ত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সে দিন পালটাতে আরম্ভ করেছিল। গরিব মানুষরাও এখন শহরের নিচুতলার নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তবে হ্যাঁ, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও শহরের নিচুতলা ছিল আকাশ চন্দ্রাতপের ঠিক তলাতেই; মাটি, কাদা, বন্যার জল, ধোঁয়া, আবর্জনা, এই ছিল নিচুতলার চেহারা। পর্যাপ্ত জল পর্যন্ত পেত না। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলেই ইতর প্রাণীর মতো গাদাগাদি অবস্থায় কোনওমতে দিন গুজরান করত নিচুতলার মানুষ। রোগের ডিপো ছিল এদের অঞ্চলটুকুই, সংক্রমণের এমন অনুকূল পরিবেশ পাত্তা পেত না বড়লোকদের পাড়ায়। দ্বাবিংশ শতাব্দীতে পালটে গেছে চিত্র। লন্ডন শহর এখন বহুতল নগরী, চারপাশে না ছড়িয়ে মাথা তুলে গেছে ওপরদিকে। যাদের পয়সা আছে, তারা থাকে ওপরতলায় খানদানি হোটেলকক্ষে; মেহনতি মানুষরা থাকে নিচের তলায় এবং মাটির তলাতেও।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে লন্ডনেই ইস্ট এন্ড পাড়ার মেহনতি মানুষরা যেভাবে জীবনযাপন করে এসেছে, এখনও তার রদবদল ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু কথ্য ভাষায় পরিবর্তন এসেছে বেশ বড় রকমের। এই নিচের তলাতেই কেটে যায় তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু, ওপরতলায় ওঠে কদাচিৎ—কাজের সুযোগ পেলে। কষ্ট? অসুবিধে? দুর্ভোগ? গা-সওয়া হয়ে গেছে। কেন-না এই পরিবেশেই এদের অধিকাংশই যে মানুষ হয়েছে, কিন্তু ডেনটন আর এলিজাবেথিটার কাছে এই নারকীয় জীবনযাপন যে মৃত্যুর অধিক ভয়ংকর।

এলিজাবেথিটা কি ধারদেনা করতে পারে না? বিষয়সম্পত্তি হাতে এলে শোধ করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মুখ দিয়ে ডেনটন তা বার করতেও যে পারছে না। এলিজাবেথটা যদি তার অন্য অর্থ করে?

লন্ডন থেকে প্যারিসে যাওয়ার মতো গাড়ি ভাড়া নেই এলিজাবেথিটার হাতে। প্যারিস শহরটাও পৃথিবীর অন্যান্য শহরের মতো বড়লোকদের থাকার জায়গা। বড্ড খরচ। লন্ডন শহরের মতোই সেখানে নিবাস রচনা অসম্ভব।

আহা রে! এর চাইতে অতীতের সেই দিনগুলোতেই যে ফিরে যাওয়া ছিল অনেক ভালো। রোমান্টিক কল্পনারঙিন চোখে ঊনবিংশ শতাব্দীর হোয়াইট চ্যাপেলকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিল ডেনটন।

ডুকরে কেঁদে উঠেছিল এলিজাবেথিটা। তিন-তিনটে বছর—দীর্ঘ ছত্রিশটা মাস—এইভাবেই কি কষ্ট করে কাটাতে হবে?

আচম্বিতে একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল ডেনটনের মগজে। গ্রামে গেলে কেমন হয়?

দারুণ অ্যাডভেঞ্চার সন্দেহ নেই। কিন্তু সিরিয়াসলি তা-ই কি চায় ডেনটন? ডাগর চোখ তুলে চেয়েছিল এলিজাবেথিটা। থাকা হবে কোথায়?

কেন, ওই পাহাড়ের ওপারে বিস্তর বাড়িঘরদোর তো এখনও আছে। এককালে মানুষ থাকত সেখানে। এখনই বা অসম্ভব হবে কেন? ডেনটন বুঝিয়েছিল এলিজাবেথিটাকে।

বলেছিল, 'গ্রাম আর শহরের ধ্বংসাবশেষ তো ফ্লায়িং মেশিন থেকেই দেখা যায়। পড়েই আছে—মাটিতে মিশিয়ে দিতে গেলেও তো খরচ হবে—ফুড কোম্পানি সে খরচ করতে রাজি নয়। গোরু, মোষ, ভেড়া চরবার জায়গা এখন। রাখালদের কাউকে পয়সা দিলেই খাবার এনে দেবে। একখানা বাড়ি নিজেরাই মেরামত করে নিয়ে দিব্যি থাকা যাবে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল এলিজাবেথিটা। প্রদীপ্ত চোখ। দারুণ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে। কিন্তু পলাতক আসামিদের ডিপো যে ওখানে... যত চোর-ডাকাতদের আস্তানা...

ছেলেমানুষের মতো ডেনটন তখন বলেছিল, 'তাতে কী! একটা তলোয়ার জুটিয়ে নিলেই হল!'

বিষম উৎসাহে চোখ জ্বলে উঠেছিল এলিজাবেথিটার। তলোয়ার জিনিসটা সম্পর্কে আগেই অনেক কথা সে শুনেছে, মিউজিয়ামে দেখেওছে। রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চার সৃষ্টি করেছে ইস্পাতের এই হাতিয়ার অতীতকালে—সব বীরপুরুষই সঙ্গে রাখত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাই জানতে চায় আরও বৃত্তান্ত। যতই শোনে, ততই উৎসাহ আর উত্তেজনার মাদল-বাজনা বাজতে থাকে অণু-পরমাণুতে। খাবারদাবার? দিন দশ-বারোর খাবার সঙ্গে নিলেই হল। ওটা কোনও সমস্যাই নয়। কেন-না, এ যুগের খাবারমাত্রই কৃত্রিম পুষ্টি—জমিয়ে শক্ত করে এতটুকু সাইজে নিয়ে আসা। দশ-বারো দিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এমন কী ব্যাপার? বাড়ি মেরামত না-হওয়া পর্যন্ত ছাদহীন ঘরগুলোয় আকাশ চন্দ্রাতপের তলায় শুয়ে থাকলেই হল। এখন গরমকাল। লন্ডন বাসিন্দারা শিল্পীর হাতে ছবি আঁকা, বাহারি আলোয় ঝলমলে ছাদওয়ালা ঘরে থাকতে থাকতে ভুলেই গেছে, তার চাইতেও ভালো কড়িকাঠ নিয়ে বসে আছেন স্বয়ং প্রকৃতিদেবী তাঁর লীলানিকেতনে। ওই আকাশে লক্ষ-কোটি নক্ষত্রর ঝিকিমিকি... অমন কড়িকাঠের তলায় ঘুমানোর মতো মজা কি আর হয়?

ডেনটনের আবেগময় ভাষা পাগল করে দিয়েছিল এলিজাবেথিটাকে। প্রথমে একটু দ্বিধা ছিল ঠিকই। এক হপ্তা পরে তা ফিকে হয়ে এল, একেবারেই মিলিয়ে গেল আরও একটা সপ্তাহ পরে। শহরের বন্দিদশা থেকে পরিত্রাণের এমন মতলব আগে কেন মাথায় আসেনি, ভেবে আক্ষেপের অন্ত রইল না দু'জনেরই। মুক্তি। মুক্তি!

উদার আকাশের তলায় প্রাচীন ও পরিত্যক্ত পল্লি এবং নগরীর মধ্যে অনাবিল স্বাধীনতার আনন্দ-কল্পনায় মশগুল হয়ে রইল দু'জনে।

তারপর একদিন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একটি প্রত্যুষে দেখা গেল, উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চে ডেনটনের জায়গায় কর্তব্যনিরত রয়েছে আর-একজন সামান্য কর্মচারী।

গোপনে বিয়েটা সেরে নিয়েছে ডেনটন আর এলিজাবেথিটা। পূর্বপুরুষদের মতোই মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে রওনা হয়েছে পল্লি প্রকৃতির শ্যামলিমার সন্ধানে। এলিজাবেথিটার পরনে আগেকার আমলের সাদা বিয়ের পোশাক। ডেনটন পরেছে বেগুনি রঙের ঢোলা বেশ—পিঠে চামড়ার ফিতেয় বাঁধা খাবারদাবার—কোমরে আলখাল্লার তলায় স্টিলের তরবারি। শেষোক্ত বস্তুটা বহন করছে লাজরক্তিম মুখে।

কল্পনা করুন তো দেখি ওদের পাড়াগাঁ অভিমুখে যাওয়ার ছবিটা! ভিক্টোরীয় আমলের দিগন্তবিস্তৃত শহরতলি আর জঘন্য পথঘাট কোথায়? পুঁচকে বাড়ি, নির্বোধপ্রতিম খুদে বাগান, গোপনীয়তা রক্ষার নিষ্ফল প্রয়াস তিরোহিত হয়েছে কোনকালে। নবযুগের আকাশচুম্বী সৌধশ্রেণি, যান্ত্রিক পথঘাট, বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা—সবই আচম্বিতে শেষ হয়েছে চারশো ফুট উঁচু পর্বত প্রাচীরের মতো খাড়াই দেওয়ালের সামনে। শহর ঘিরে রয়েছে ফুড কোম্পানির গাজর, শালগম, ওলকপির খেত। হাজার রকমের বিচিত্র খাদ্যসম্ভার প্রস্তুত হচ্ছে তো এইসব সবজি থেকেই। ঝোপঝাড়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন কোথাও? নির্মূল হয়েছে সামান্য কাঁটাঝোপ আর বুনো ফুলের গাছও। প্রাচীনকালে যা ছিল পরম উৎপাত, ফুড কোম্পানি তার অবসান ঘটিয়েছে চিরতরে। বছরের পর বছর বর্বর প্রথায় ঝোপঝাড় গজিয়ে যেত খেতখামারে—এখন আর তা হয় না। ফলে, উৎপাদন বেড়েছে, বাজে খরচ কমেছে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছেন আপেল এবং অন্যান্য ফলভারে অনবত বৃক্ষ। এ ছাড়াও রয়েছে বিশালকায় কৃষিযন্ত্র, জলনিরোধক ছাউনির তলায়। আয়তাকার খালের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে খেতের জল। মাঝে মাঝে উঁচু জায়গাগুলোয় আবর্জনা পচিয়ে নির্গন্ধ সার সরবরাহ করা হচ্ছে আশপাশের খেতে।

প্রকাণ্ড শহর প্রাচীরের বিশাল ধনুকাকৃতি তোরণের সামনে থেকে বেরিয়েছে এন্ডহ্যামাইট সড়ক—গেছে পোর্টসমাউথ পর্যন্ত। ভোরের সোনা-রোদে দেখা যাচ্ছে নীল কোর্তা-পরা ফুড কোম্পানির পরিচারকদের—পিলপিল করে চলেছে পথ বেয়ে সূর্য না-ডোবা পর্যন্ত গতর খাটাতে। ধাবমান এই জনতার পাশে বিন্দুবৎ চলেছে ওরা দু'জনে, নজরই পড়ে না সেদিকে। সড়কের দু'পাশের কিনারা বরাবর গোঁ গোঁ গরগর ঘড়ঘড় শব্দে ধেয়ে যাচ্ছে মান্ধাতার আমলের বাতিল মোটরগাড়ি—শহর সীমানা থেকে বিশ মাইল চৌহদ্দি পর্যন্ত এদের ডিউটি। তার ভেতরদিককার পথ দিয়ে ছুটছে হরেকরকম যন্ত্রযান; দ্রুতগামী মনোসাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

অগুনতি আরোহী, পাশে পাশে ধেয়ে যাচ্ছে হিলহিলে চেহারার মাল্টি-সাইকেল আর বিস্তর বোঝা নিয়ে চার চাকার সাইকেল, চলেছে দানবাকৃতি মাল-বওয়া শকট—এখন শূন্য, কিন্তু সন্ধ্যা সমাগমে ফিরবে খেতের মালবোঝাই হয়ে। ইঞ্জিনের ধুকধুক শব্দ, হর্ন আর ভেঁপুর মিলিত ঐকতানে মুখরিত সড়কের ওপর দিয়ে বনবন করে ঘুরে চলেছে অগুনতি চক্র—নিঃশব্দে।

নিঃশব্দে চলেছে প্রেমিকযুগলও সড়কের কিনারা বরাবর। নতুন বর-বউ তো, তাই লজ্জা ঘিরে রয়েছে দু'জনকেই। শকটারোহীরা গগনবিদারী চিৎকার ছেড়ে যাচ্ছে দুই পথচারীকে উদ্দেশ্য করে—কেন-না ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ সড়কে মোটরগাড়ি যেমন একটা বিরল দৃশ্য, ২১০০ খ্রিস্টাব্দে পায়ে হেঁটে যাওয়াটাও সমান বিরল দৃশ্য। ওদের কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই কোনওদিকে। স্থির চাহনি নিবদ্ধ সামনের পল্লি প্রকৃতির দিকে—কানে তুলছে না কোনও চিৎকারই।

সামনেই ঢালু হয়ে উঠে গেছে জমি—প্রথমে নীলাভ, তারপর সবুজে সবুজ। দানবাকার হাওয়াকলের চাকার পর চাকা দেখা যাচ্ছে দূরের বাড়ির ছাদে ছাদে। ভোরের টানা লম্বা ছায়ায় গা মিলিয়ে ছুটে চলেছে ভ্যানগাড়িগুলো। দুপুর নাগাদ দেখা গেল, ধূসর বিন্দুর মতো চরে বেড়াচ্ছে ফুড কোম্পানির মাংস বিভাগের ভেড়ার পাল। আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর পেরিয়ে এল কাদামাটি, ফসল-কাটা শেকড়সর্বস্ব খেতের মাঠ এবং কাঁটাঝোপের একটিমাত্র বেড়া। বাস, বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ভয় আর রইল না। রাস্তা ছেড়ে সবুজ মাঠে নেমে এখন নির্বিঘ্নে রওনা হওয়া যাবে পাহাড়তলি অঞ্চলে।

পাণ্ডববর্জিত এহেন অঞ্চলে এই প্রথম ওদের আগমন।

খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে দু'জনেরই। ফোসকা পড়েছে পায়ে। হাঁটাটাও তো একটা ব্যায়াম—এ ব্যায়ামের সুযোগ তো ঘটে না যন্ত্রযুগের এই সভ্যতায়। ক্ষণকাল পরেই তাই দু'জনে বসে পড়ে ঝোপঝাড়হীন ছোট-করে-কাটা ঘাসজমির ওপর। এবং সেই প্রথম তাকায় পেছনে ফেলে-আসা শহরের দিকে। টেমস নদীর অববাহিকায় নীলাভ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় দূরবিস্তৃত লন্ডন। ভেড়াদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ কখনও ঘটেনি এলিজাবেথিটার। প্রথমে একটি সন্ত্রস্তই ছিল। ভয় কেটে গেল ডেনটনের আশ্বাস বচনে। মাথার ওপর সুনীল গগনে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে একটা সাদা-ডানা বিহঙ্গ। আহার-পর্ব সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত কথা সরল না কারওই মুখে। তারপর অর্গলমুক্ত হল জিহ্বা। কলকল করে কত কথাই না বলে গেল ডেনটন। এখন থেকে সুখের সাগরে নিমজ্জিত থাকবে দু'জনায়। আরও আগে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল সোনার খাঁচার সুখাবহ বন্দিদশা থেকে। অতীতের রোমান্স মধুর দিনগুলিতে দু'দিন আগে ফিরে এলে খামকা এত দুর্ভোগ তো পোহাতে

হত না। বলতে বলতে ঘাসজমির ওপর রাখা তরবারি তুলে নিয়েছিল ডেনটন। শানিত ফলার ওপর কম্পিত আঙুল বুলিয়ে নিয়ে এলিজাবেথিটা জানতে চেয়েছিল— বরবাদ এই হাতিয়ার হেনে শত্রু কুপোকাত করতে পারবে তো ডেনটন? প্রয়োজন হলে তা-ই করতে হবে বইকী—বলেছিল ডেনটন। কিন্তু রক্তপাত তো ঘটবে— শিউরে উঠেছিল এলিজাবেথিটা।
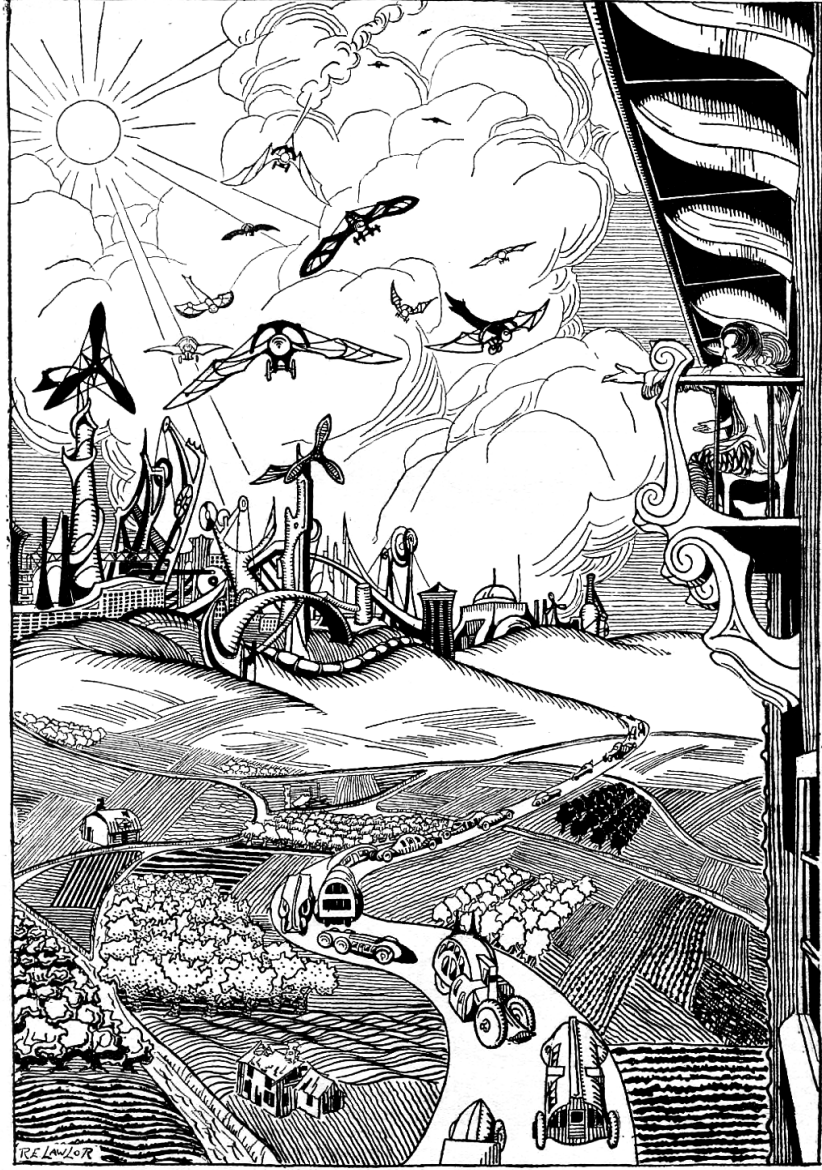
চিত্র ৩.২ সড়কের দু'পাশের কিনারা বরাবর গোঁ গোঁ গরগর ঘড়ঘড় শব্দে ধেয়ে যাচ্ছে মান্ধাতার আমলের বাতিল মোটরগাড়ি

একটু জিরিয়ে নিয়ে দু'জনে রওনা হয়েছিল পাহাড় অভিমুখে। পথে পড়ল একপাল ভেড়া। ভেড়া কখনও দেখেনি এলিজাবেথিটা। নিরীহ এই প্রাণীগুলিকে হত্যা করা হয় উদরপূর্তির জন্যে—ভাবতেই কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ে। দূরে শোনা যায়

ভেড়া-সামলানো কুকুরের ডাক। হাওয়াকলের খুঁটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে একজন মেষপালক। হেঁকে জানতে চায়, যাওয়া হচ্ছে কোথায়।

আমতা আমতা করে ডেনটন জানায়, যাওয়া হচ্ছে একটা নিরালা বাড়ির খোঁজে—দু'জনে থাকবে সেখানে। যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মেষপালক কিন্তু চেয়ে থাকে চোখ বড় বড় করে। বিশ্বাস হয়নি কথাটা।

'নিশ্চয় কোনও কুকর্ম করে এসেছ?'

'এক্কেবারেই না। শহরে থাকার আর ইচ্ছে নেই—তাই এসেছি,' ঝটিতি জবাব দেয় ডেনটন।

আরও অবিশ্বাস প্রকটিত হয় মেষপালকের দুই চোখে—'কিন্তু এখানে তো থাকতে পারবে না।'

'দেখাই যাক-না চেষ্টা করে।'

পর্যায়ক্রমে দু'জনের মুখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে মেষপালক, 'কালই ফিরে যেয়ো শহরে। দিব্যি গেলে বল তো বাপু, কী কুকর্মটি করে এসেছ? পুলিশ কিন্তু আমাদের ভালো চোখে দেখে না।'

চোখে চোখ রেখে বলে ডেনটন, 'শহরে থাকতে গেলে পয়সা দরকার—আমাদের তা নেই। নীল ক্যাম্বিস পরে কুলিগিরি করাও আমাদের ধাতে সইবে না। চাই সাদাসিধেভাবে থাকতে—সেকেলে মানুষদের মতো।'

মেষপালক যে চিন্তাশীল মানুষ, তা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। গাল ভরতি দাড়ি। এলিজাবেথিটার নরম ধাঁচের আকৃতির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে শুধু বললে, 'তাদের মনেও তো ঘোরপ্যাঁচ ছিল না।'

'আমাদেরও নেই।'

হাসল মেষপালক। বলে দিলে বহু দূরের এক পরিত্যক্ত গ্রামের নিশানা। আগে যে লোকালয়ের নাম ছিল এপসম, এখন সেখানে মাটির ঢিপি—ইটগুলো পর্যন্ত লোপাট করে নিয়ে গিয়ে ভেড়ার খোঁয়াড় তৈরি হয়েছে। এই ঢিপির পাশ দিয়ে গেলে পড়বে আর-একটা মাটির ঢিপি—অতীতে সেখানে ছিল লেদারহেড লোকালয়। পাহাড়ের পাশ দিয়ে, উপত্যকা পেরিয়ে, বিচবৃক্ষের জঙ্গলের কিনারা বরাবর গেলে পাওয়া যাবে বুনো ঝোপ ভরতি একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখানকার হাওয়াকলের তলা দিয়ে পাথর দিয়ে বাঁধানো দু'হাজার বছরের পুরানো একটা রোমান গলি গেছে নদীর পাড় বরাবর। সেইখানে মিলবে বেশ কিছু বাড়ি। কয়েকটার ছাদ এখনও ভেঙে পড়েনি। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু অন্তত পাওয়া যাবে। খুবই শান্ত, খুবই নিরিবিলি জায়গা। কিন্তু রাত ঘনিয়ে এলে জ্বলে না কোনও আলো—ডাকাতরাও নাকি টহল দেয়—অবশ্য

শোনা কথা। গল্পকথকদের ফোনোগ্রাফি, প্রমোদ ব্যবসায়ীদের কিনেমাটোগ্রাফ নেই এক্কেবারেই। খিদে পেলে পাওয়া যাবে না খাবার, অসুখ হলে ডাক্তার।

যাওয়ার আগে মেষপালকের ঠিকানা নিয়ে নিল ডেনটন। দরকারমতো খাবারদাবার, জিনিসপত্র কিনে এনে দিতে হবে শহর থেকে।

সন্ধে নাগাদ পরিত্যক্ত গ্রামটায় পৌঁছাল দু'জনে। অবাক হল খুদে খুদে অদ্ভুতদর্শন বাড়ি দেখে। সূর্য তখন পাটে বসেছে। সোনা-রোদে নিঝুম হয়ে রয়েছে পুরো তল্লাটটা। খুঁজেপেতে বার করল একটা দেওয়ালহীন বাড়ির এমন একখানা কামরা, যার একধারে ফুটে রয়েছে নীল রঙের একটা বুনো ফুল—চোখ এড়িয়ে গেছে ফুড কোম্পানির ঝোপ-সাফাই লোকজনদের।

মনের মতো এহেন আস্তানায় কিন্তু বেশিক্ষণ মন টেকেনি দু'জনের কারওই। এসেছে প্রকৃতির আলয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখবে বলে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা কি যায়? তাই কিছুক্ষণ পরেই রওনা হয়েছিল পাহাড়ের ওপর। অন্ধকার তখন জমিয়ে বসেছে। ঘরে থাকতেও অসুবিধে। পাহাড়ে উঠে দু'চোখ ভরে দেখেছিল আকাশের লক্ষ মানিক, হৃদয় ভরে পান করেছিল নিথর নৈঃশব্দ্য। সেকালের কবিরা কত কবিতাই না রচনা করেছে স্বর্গলোকের এই সুষমা নিয়ে। পাহাড় থেকে নামল সারারাত কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটার সময়ে। ঘুম হল স্বল্পক্ষণ। ছোট্ট একটা পাখির গানে চোখ রগড়ে উঠে বসল দু'জনে।

দিন তিনেক এইভাবেই কাটল যেন রোমান্টিক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। এত সুখ, এত স্বাধীনতা কখনও পায়নি দ্বাবিংশ শতাব্দীর এই দু'টি শহরে ছেলেমেয়ে। কিন্তু উত্তেজনা থিতিয়ে এল এক সপ্তাহ পরে—আরও একটা হপ্তা যাওয়ার পরে ঝিমিয়ে পড়ল একেবারেই। প্রথম প্রথম ঘরকন্নায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ বাড়ি-ও বাড়ি ঘুরে ভাঙা এবং বদখত চেহারার সেকেলে চেয়ার-টেবিল এনে সাজিয়েছিল নিজেদের ভাঙা ঘর। বিছানার গদির জন্যে ভেড়াদের একরাশ ঘাস দু'হাত ভরে নিয়ে এসেছিল ডেনটন। অখণ্ড অবসরে হাঁপিয়ে ওঠার পর একদিন কোত্থেকে একটা মরচে-পড়া কোদাল কুড়িয়ে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে মাটি কুপিয়ে ঘেমে-নেয়ে এসে এলিজাবেথিটাকে বলেছিল—সেকালের লোকগুলো অসুর ছিল নাকি? কিন্তু কাঁহাতক এইভাবে একঘেয়েমি কাটিয়ে নতুন নতুন বৈচিত্র আনা যায় এবং একই সুখের কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা এবং শোনা যায়? চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি করেনি ডেনটন। হপ্তা দুয়েক আবহাওয়া ভালো থাকায় তেমন দুর্ভোগও পোহাতে হয়নি। শহর থেকে এতটা পথ হেঁটে আসায় গা-গতরের ব্যথা মরেনি যদিও—বরং বেড়েছে ভাঙা ঘরের খোলা হাওয়ায় রাতের পর রাত কাটিয়ে। শহরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়ে ইস্তক মুক্ত জীবনের এহেন চেহারা তো কখনও তারা দেখেনি। তারপরেই একদিন

আকাশ কালো করে ঘনিয়ে এল বৃষ্টির মেঘ। লকলকিয়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। শিউরে উঠেছিল দু'জনেই। বিদ্যুতের এ ধরনের ভয়ংকর রূপ কখনও তারা দেখেনি। দৌড়াতে দৌড়াতে নেমে এসেছিল ভাঙা আস্তানায়। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে মুষলধারে বৃষ্টি। ফুটোফাটা ছাদ আর ভাঙা দেওয়াল দিয়ে স্রোতের মতো জলের ধারায় সারারাত ধরে ভিজেছে দু'জনে, শীতে কেঁপেছে ঠকঠক করে। ভোররাতে মেঘগর্জন যখন মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে, থেমে গেল বৃষ্টি—শোনা গিয়েছিল নতুন একটা শব্দ।

কুকুরের ডাক। একপাল কুকুর ধেয়ে আসছে এদিকেই। মেষপালকদের কুকুর। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঢুকে পড়েছিল ভাঙা ঘরে। কুকুর কখনও দেখেনি এলিজাবেথিটা। বিশেষ করে এই ধরনের ভয়ংকর সারমেয়। এতক্ষণ কাঁদছিল সারারাত দুর্ভোগ আর ধকলের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়। এখন শুরু হল প্রাণ নিয়ে টানাটানি। দাঁত খিঁচিয়ে একটা কুকুর তেড়ে আসতেই তরবারি নিয়ে তাড়া করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল ডেনটন। ছ'টা কুকুর ঘিরে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। টুঁটিটুকুতে তখনও কামড় বসেনি—কিন্তু আর দেরিও নেই। জানলা থেকে সেই দৃশ্য দেখে আঠারো বছরের মার্জিত শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত ভুলে গিয়ে এক লাফে দ্বাবিংশ শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর আদিম মানবী হয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথিটা। মরচে-পড়া কোদালটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁকিয়ে খুলি চুরমার করেছিল কয়েকটা কুকুরের—ডেনটনের ধারালো তলোয়ারের কোপে প্রাণ গিয়েছিল আরও কয়েকটার। বাকি ক'টা প্রাণ নিয়ে লেজ গুটিয়ে দৌড়েছিল মনিবদের কাছে।

কিন্তু এদের মনিব তো ফুড কোম্পানি। এবার তো তারা আসবে—অনধিকার প্রবেশের সাজাও পেতে হবে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল এলিজাবেথিটা। ঢের হয়েছে—রোমান্স গল্পেই মানায়—ধাতে সয় না। এ জীবন তাদের নয়—শহরের জীবনই ভালো।

ডেনটন নিজে থেকেই বলেছিল, শহরেই ফিরে যাওয়া যাক। ফুড কোম্পানির লোকজন এসে পড়ার আগেই। পয়সা? মুখ ফুটে এতদিন বলতে পারেনি—বুদ্ধিটা এলিজাবেথিটার মাথাতেই আসা উচিত ছিল। বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছে যে আর তিনটে বছর পরে, সে তো অনায়াসেই ধার করতে পারে এখন থেকেই।

আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল এলিজাবেথিটা। সত্যিই তো, এ বুদ্ধি তো তার মাথায় আগে আসেনি। শহরে থাকতে গেলে দেদার টাকা দরকার—ধার করলেই তো তা পাওয়া যায়! কে না জানে তার মায়ের কুবের সম্পদের কাহিনি!

ঝটপট কিছু খাবার ব্যাগে ভরে নিয়ে দু'জনে পালিয়েছিল রোমান্স-পর্বে ইতি ঘটিয়ে দিয়ে—নীল ফুলটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার হারিয়েছিল বলে পাপড়ির

গায়ে আলতো চুমু এঁকে দিয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথিটা। ত্রস্তে পলায়ন করেছিল বিশাল সেই শহরের দিকে, যে শহর গিলে বসে আছে মানুষ জাতটাকে।

৩। শহরের জীবন

যেসব আবিষ্কার পৃথিবীর চেহারা পালটে দিয়েছে, তাদের ফিরিস্তিতে সবার আগে রয়েছে পরিবহণব্যবস্থা। যেমন রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি এবং পেটেন্ট রাস্তা। তারপর পরিবর্তনের ঢেউ এল মেহনতি মানুষদের কাজের ধারায়। চাষবাস ছেড়ে কলকারখানায় যোগ দিয়ে ভিড় করল শহরে। সেই সঙ্গে এল নানা রকমের দুর্ভোগ —ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা কল্পনাও করা যায়নি। লোভী হয়ে উঠল মানুষ। গ্রামজীবনের উদারতা মিলিয়ে গিয়ে এল নিষ্ঠুর অর্থগৃধ্নুতা। জুয়ো খেলা, বিলাসিতা এবং অত্যাচারী মনোভাবে ছেয়ে গেল শহরের মানুষের মন। রোগের ডিপো হয়ে উঠল প্রতিটা শহর বেশি লোকের ভিড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

তিন শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল নতুন সমাজের মানুষ। সবার ওপরে ধনিক সম্প্রদায়। সবার নিচে শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এই দুইয়ের মাঝে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দু'টি মানুষের ভালোবাসা, বিয়ে এবং পল্লি অঞ্চলে সাদাসিধে জীবনযাপন করতে গিয়ে অশেষ দুর্ভোগের কাহিনি বলা হয়েছে আগের অধ্যায়ে। গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে এসে বাবার কাছে গচ্ছিত মায়ের শেয়ারের কাগজের ভিত্তিতে দেদার টাকা ধার করতে আরম্ভ করেছিল এলিজাবেথিটা। ডেনটন তখনও কপর্দকহীন।

চড়া সুদ দিতে হয়েছিল সে জন্যে। কিন্তু নতুন বিয়ের রঙিন মোহে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি দু'জনের কেউই। ঘরদোর সাজিয়েছিল নিজেদের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী। খুঁজেপেতে জোগাড় করেছিল সেকালের ছাপা বই, ভিক্টোরীয় আমলের অদ্ভুত আসবাবপত্র। মিতব্যয়ী থাকার চেষ্টা করেছে গোড়া থেকেই। একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সামাজিক রীতি অনুযায়ী শিশুপালন সংস্থায় না পাঠিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেদের কাছে—সে জন্যে বাড়ি ভাড়া একটু বেশি লাগলেও ভ্রুক্ষেপ করেনি।

এইভাবেই কেটে গেল তিনটে বছর। একুশ বছরে পা দিল এলিজাবেথিটা। শেয়ারের কাগজপত্র বউয়ের নামে হস্তান্তর করার কথা বলতে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মুখ চুন করে ফিরে এল ডেনটন।

দুঃসংবাদটা শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এলিজাবেথিটার। শেয়ারের দাম পড়ে গেছে। চড়া সুদে টাকা ধার করেও ফেঁসেছে দু'জনে। শ্বশুরমশায় আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে। হাতে রয়েছে আর মোটে এক হাজার সুবর্ণ 'লায়ন'।

সুতরাং কাজের খোঁজে বেরতে হবে ডেনটনকে। বিপদ তো সেখানেও। উড়ুক্কু যন্ত্রযানের মঞ্চে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। এলিজাবেথিটাকে বিয়ে করতে চেয়ে ব্যর্থমনোরথ বিনডন এখন সেখানকার হর্তাকর্তাবিধাতা। কিন্তু লন্ডনের তিন কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের কেউ-না-কেউ নিশ্চয় কাজ দেবে ডেনটনকে।

কিন্তু শহর চষে ফেলেও কাজ পেল না ডেনটন। শেষে এমন অবস্থা এল যে, ওপরতলার দামি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে নেমে আসতে হল দশ-বারোতলা নিচেকার সস্তা ফ্ল্যাটে। এতদিন ধরে জোগাড়-করা মান্ধাতার আমলের শখের জিনিসপত্রও বেচে দিতে হল বুক ফেটে যাওয়া সত্ত্বেও। শেয়ার মার্কেটে ভাগ্যপরীক্ষা করতে গিয়ে হাজার 'লায়ন' থেকে তিনশো লায়ন খুইয়ে একদিন বাড়ি ফিরল ডেনটন বিপর্যস্ত অবস্থায়। সাত-সাতটা দিন গুম হয়ে কাটাল ফ্ল্যাটের মধ্যে—কেঁদেকেটে একসা করল এলিজাবেথিটা। তারপর আবার চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ডেনটন। পেয়েও গেল একটা কাজ। সেলসম্যানের কাজ। চেহারাটা তো ভালো। মেয়েদের টুপি বিক্রি করার দোকানে তাই নামমাত্র মাইনের কাজখানা পেয়ে বর্তে গেল ডেনটন। এতদিন অবশ্য অনেক জায়গায় বড় কাজই খুঁজেছে—কিন্তু মাকাল ফলকে কে দেবে মোটা মাইনের বড় চাকরি?

কিন্তু চাকরি গেল দেড় মাস পরেই—অযোগ্যতার জন্যে। নতুন চাকরির খোঁজে বেরতে হল বেকার ডেনটনকে। কিন্তু তহবিল তদ্দিনে প্রায় শূন্য। মেয়েকে বাধ্য হয়ে দিয়ে আসতে হল শিশুপালন সংস্থায়, ইচ্ছা না থাকলেও। এ যুগের সবাই তা-ই করে। ধনী সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের ভার নেয় সস্তার সংস্থারা। লেবার কোম্পানি শ্রমিক-কর্মচারী জুটিয়ে নেয় এখান থেকেই—বাচ্চারা বড় হয়ে যাবে কোথায়? মানুষ হওয়ার দেনা শোধ করতে হয় বেগার খেটে—আমৃত্যু।

হপ্তা তিনেক পরে ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকি পড়তেই ঘাড়ধাক্কা খেতে হল দু'জনকে। জিনিসপত্র কেড়ে নিল হোটেলের মালিক। দারোয়ানের কাছে লেবার কোম্পানির ঠিকানা জেনে নিয়ে বদ্ধপরিকর ডেনটন রওনা হল কুলির কাজেরই খোঁজে এলিজাবেথিটার হাত ধরে।

কিন্তু শিউরে উঠল নারকীয় সেই দৃশ্য দেখে। লন্ডনের রিজেন্ট স্ট্রিটের নাম পালটে হয়েছে নাইনটিন্থ ওয়ে। আটশো ফুট চওড়া। ধাপে ধাপে চলমান মঞ্চ কিনারা থেকে নেমে গেছে মাঝের দিকে। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হারে গতিবেগ কমেছে প্রতিটি মঞ্চের। কাজেই ওপরতলার দ্রুতগামী মঞ্চ থেকে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া যায় নিচের তলায়, মানে একদম মাঝের স্থির পথে। সিঁড়ি বেয়ে নামলেই দু'পাশে সারি সারি নিচুতলার বাড়ি, কলকারখানা, বড় বড় আলোক-বিজ্ঞাপন, ফোনোগ্রাফে

বিজ্ঞাপনী চিৎকার, কিনেমাটোগ্রাফে বিজ্ঞাপনী বাহার, ক্লাউনের বেশে হতশ্রী নারী এবং পুরুষদের সাজিয়েও বিজ্ঞাপনের বীভৎস কারবার।

দেখেই গা হিম হয়ে গেল এলিজাবেথিটার। মুখ সাদা হয়ে গেল ডেনটনের। তার জন্যেই আজ এলিজাবেথিটার এই দুরবস্থা। এর চাইতে যে বিয়ে না-হওয়াই ছিল ভালো।

ডেনটনের হাত ধরে এলিজাবেথিটা নিয়ে এল উড়ুক্কু যন্ত্রযানের সেই মঞ্চাসনে—পাঁচ বছর আগে যেখানে বসে ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখেছিল দু'জনে। নিবিড় কণ্ঠে বললে ডেনটনকে, কেন এত মনস্তাপ? ডেনটনকে বিয়ে করে তো অসুখী নয় এলিজাবেথিটা? দুর্ভোগ এসেছে তো আসুক-না কেন—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ে যাবে দু'জনে।

হাত ধরাধরি করে নেমে এল দু'জনে—গেল লেবার কোম্পানির দরজায়।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবেই প্রথমদিকে কাজ করে গেছে লেবার কোম্পানি। যে এসেছে দরজায়, তাকেই দিয়েছে খাদ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর দিনভর কাজের সুযোগ। কোম্পানি গঠনের শর্তই ছিল তা-ই। খাটতে যারা অক্ষম, তাদেরকেও দিতে বাধ্য হয়েছে খাদ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর চিকিৎসা। বিনিময়ে শ্রম-চুক্তি সই করে দিত অক্ষম দুঃস্থরা—সেরে উঠলে গতরে খেটে শোধ করে যেত ঋণ। সই মানে টিপসই। ফোটো তুলে নেওয়া হত সেই সইয়ের। এমনভাবে নথিভুক্ত থাকত পৃথিবীব্যাপী লেবার কোম্পানির বিশ-তিরিশ লক্ষ টিপসই, যে ঘণ্টাখানেক খুঁজলেই বার করে নেওয়া যেত সইয়ের মালিককে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানায় খাটতে হত এক রোজ—তার জন্যে ছিল উপযুক্ত আইনকানুন। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য একটু বাড়তি দিত লেবার কোম্পানি। খাওয়া-থাকা ছাড়াও কয়েকটা পেনি। কাজে উৎসাহ পেত শ্রমিকরা। ফলে দোলনা থেকে কবরখানা পর্যন্ত ঋণী এবং গোলাম হয়ে থাকত লেবার কোম্পানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মক্কেল।

বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল এই ধরনের ভাবাবেগহীন কার্যকর পন্থায়। পথেঘাটে না খেয়ে কেউ আর মারা যেত না। ভিক্ষুক শ্রেণির বিলোপ ঘটেছিল। লেবার কোম্পানির স্বাস্থ্যকর নীল ক্যাম্বিসের কোর্তার মতো পোশাকও দুনিয়ায় আর কেউ দিতে পারেনি। দেখতে আহামরি না হলেও স্বাস্থ্য, খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসার প্রতীক হয়ে উঠেছিল এই নীল কোর্তা। ফোনোগ্রাফিক নিউজপেপারগুলোয় অষ্টপ্রহর ঢাক পেটানো হত তা-ই নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো পথেঘাটে এখন গাড়িচাপা পড়ে বা না খেয়ে কেউ মরে পড়ে থাকে না।

ওয়েটিং রুমে বসে রইল ডেনটন আর এলিজাবেথিটা ডাক আসার প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষারত বেশির ভাগ কর্মপ্রার্থীই গুম মেরে রয়েছে—দু'-চারজন তরুণ ছাড়া। এরা

জন্মেছে লেবার কোম্পানির ক্রেশ-এ, মারাও যাবে লেবার কোম্পানির হাসপাতালে, আমৃত্যু দাসখত-লেখা শ্রমিক। বাড়তি কয়েকটা শিলিং হাতে পেয়ে ওড়ায় ঝকমকে পোশাকের পেছনে। মুখে যেন খই ফুটছে। দেমাকে ফেটে মরছে।

ঝিমিয়ে রয়েছে যারা, তাদের ওপরেই এলিজাবেথিটার চোখ পড়ল সবার আগে। এদের মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধা। চোখের জলে ধুয়ে যেতে বসেছে মুখের রং। ছিন্ন মলিন পোশাক, চোখে খিদের জ্বালা। একজন পাদরিও এসেছে কাজের খোঁজে। ধর্ম নিয়ে ব্যাবসা এখন তুঙ্গে পৌঁছেছে বলেই কারবারে মন্দা যায় ভাগ্যহীনদের ক্ষেত্রে। বিশপমশায়েরও কপাল যে পুড়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে ঘোলাটে চোখ দেখে।

অচিরেই ডেনটন এলিজাবেথিটার ইন্টারভিউ-পর্ব সাঙ্গ হল মহিলা ম্যানেজারের সঙ্গে। দৃপ্তমুখ রুক্ষকণ্ঠ স্ত্রীলোকটির হাবভাবে কথাবার্তায় অপরিসীম তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা। টিপসই নিয়ে নীল কোর্তা পরে সাদামাটা কিন্তু বিশাল খাবার ঘরে পৌঁছাল দু'জনে। কদমছাঁট চুল কাটার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়ে গেল নেহাত কপালজোরেই। লেবার কোম্পানিতে বেগার খাটতে এলেই কী নারী, কী পুরুষ—লম্বা চুল কেটে ফেলতে হয় প্রত্যেককেই। জীবনের প্রথম মেহনতি খানা খেয়ে কটুভাষিণী এই ম্যানেজারনির কাছেই ফিরে আসতে হবে কাজের নির্দেশ নিতে।

নীল কোর্তা পরার সময়ে ডেনটনের দিকে ফিরে তাকাতে পারেনি ম্রিয়মাণ এলিজাবেথিটা। তাকিয়ে ছিল কিন্তু ডেনটন এবং অবাক হয়ে চেয়ে ছিল পলকহীন চোখে। নীল ক্যাম্বিসের পোশাকেও এত সুন্দরী এলিজাবেথিটা! তারপরেই রেললাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসে ঝোলের বাটি ঝাঁকুনি খেয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে যাওয়ায় চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল ডেনটন—স্রেফ খিদের জ্বালায়! তিন-তিনটে দিন পেটে দানাপানিও যে পড়েনি।

খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বিরসবদনে গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছিল ম্যানেজারনির সামনে। খাওয়ার সময়ে এবং জিরেন নেওয়ার সময়ে কেউ কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারেনি। কথার উৎস যেন শুকিয়ে গেছে।

দাবড়ানি দিয়ে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছিল দুর্মুখ ম্যানেজারনি। এলিজাবেথিটা একদিন ধাতু পেটাইয়ের কাজ শিখুক—চার পেন্স বোনাস পাবে। ডেনটনকে কাজ শিখতে হবে ফোটো কোম্পানিতে—বোনাস তিন পেন্স।

ডেনটনের ভাগ্যে জুটল কিন্তু অন্য কাজ। অত্যন্ত জটিল ধরনের জলের চাপে চলা মেশিন চালানোর কাজ। মাথা খাটানোর ব্যাপার আছে বলে ভালোই লাগল ডেনটনের। শহরের সমস্ত নোংরা জল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারশো ফুট উঁচু চৌবাচ্চায় চালান হয় এ যুগে। সারি সারি পাম্প জল ঠেলে তুলে দেয় ওপরে। তারপর নানান পাইপের মধ্যে দিয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়ে লন্ডন শহরের চারদিকের খেতখামারে

সার হিসেবে। নোংরা জল আর আবর্জনা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার যুগ আর নেই—জল-দূষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে বিশ্ববাসী। ডেনটন যে মেশিন চালাবে, তা এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডেরই অংশ। মেশিন অবশ্য চলবে নিজেই—মেশিনের দাস হয়ে থাকতে হবে তাকে—অন্যমনস্ক হবার জো নেই।

এলিজাবেথিটাকেও ধাতু পিটতে হল না শেষ পর্যন্ত। ধাতুর হরেকরকম প্যাটার্ন সৃষ্টির কাজ পেয়ে বর্তে গেল বেচারি। কারুকাজ-করা ধাতুর টালি দিয়ে ঘরদোর সাজানোর ফ্যাশন ছেয়ে ফেলেছে দ্বাবিংশ শতাব্দী। যান্ত্রিক হলে চলবে না—সে তো যন্ত্রেই হয়ে যায়। প্রাকৃতিক ছাঁদ থাকা চাই। দেখা গেছে এ কাজে মেয়েরা বেশ পোক্ত। মাথা খাটিয়ে বার করতে পারে হরেকরকম প্যাটার্ন।

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স কিন্তু এলিজাবেথিটার। অনেক তাজাও বটে। দলের দু'-তিনটে মেয়ে তো জন্মাবধি ক্রীতদাসী। বাকি ক'জনের বয়স হয়েছে। চোখ-মুখ নিষ্প্রভ। চুলে পাক ধরেছে। গায়ের রং ফ্যাকাশে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। এলিজাবেথিটাকে দেখে বিস্মিত প্রত্যেকেই।

নিচুতলার জীবনযাপন একটু একটু করে সয়ে গেল ডেনটন-এলিজাবেথিটার। অনেক নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, লাঞ্ছনা গেল মাথার ওপর দিয়ে। এমনকী একটা বড় রকমের শোকও খুব একটা নাড়া দিতে পারল না দু'জনের আস্তে আস্তে শীতল হয়ে-আসা অন্তঃকরণকে। মারা গেল দু'জনের নয়নের মণি—একমাত্র কন্যা!

পাতাল প্রদেশের বীভৎসতা, নির্যাতন, দুঃসহ দৈনন্দিন জীবনটাই যে সব নয়—একদিন... শুধু একদিনের জন্যে নতুন করে উপলব্ধি করেছিল দু'জনে। এলিজাবেথিটা চেয়েছিল আকাশের তলায় গিয়ে উড়ুক্কু যানের সেই মঞ্চের নিচে চেয়ারে বসে থাকতে। তারকাখচিত উদার গগনের পানে তাকিয়ে যান্ত্রিক জীবন থেকে ক্ষণেকের পরিত্রাণ পেতে...

এসেছিল দু'জনে। নীরবে বসে ছিল পুরানো সেই চেয়ারে। লক্ষ লক্ষ তারার ঝিকিমিকি দেখে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল—পাতাল দুনিয়াটাই সব নয়—স্বর্গ এখনও আছে... ওই ওপরে।

৪। পাতাল-জীবন

কিন্তু পরিবর্তন আসছিল ধীরে ধীরে—নিজেদেরই অগোচরে। একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল দু'জনে। যন্ত্র সভ্যতা গ্রাস করে নিচ্ছিল দু'জনকে—সইয়ে সইয়ে। অসাড় হৃদয় দিয়ে কেউই তা টের পায়নি। ভেবেছে, এই তো স্বাভাবিক। এরই নাম জীবন।

ডেনটনকে পাঠানো হয়েছিল কারখানায়। সেখানে তাকে কাজ করতে হয়েছে এমন সব সঙ্গীর সঙ্গে, যারা স্বভাবে চোয়াড়ে, আকৃতিতে নরপিশাচ, কথাবার্তায় দুর্বোধ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই নিচের তলার মানুষ আর ওপরের তলার মানুষের মধ্যে কথ্য ভাষায় যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল, তা প্রকটতম হয়েছে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে। মেহনতি মানুষের ভাষা তাই নিতান্তই দুর্বোধ্য ওপরমহলের মার্জিত শিক্ষিত মানুষের কাছে। এতদিন বুদ্ধদেবের মতো বিরাট মেশিনের দাসত্ব করে এসেছে ডেনটন—একাই। কারও সঙ্গে কথা বলতে হয়নি—অসুবিধেটাও টের পায়নি। নতুন কারখানায় এসে অমার্জিত ছোটলোকি ভাষা শুনে ঘৃণায় অবজ্ঞায় সঙ্গীদের বয়কট করে একা একা থাকার মতলব করতেই লাগল বিরোধ। খানদানি সঙ্গী ডেনটনকে কোণঠাসা করে ফেলল চোয়াড়ে বৃষস্কন্ধ শ্রমিকরা। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াও বাধিয়ে বসল। কদর্য রুটি গেলাবেই তাকে—ডেনটনের প্রবৃত্তি নেই খাওয়ার। মুখে ঠুসে দিতে আসতেই রুখে দাঁড়িয়েছিল ডেনটন। প্রথমজনকে প্রহার করতেই প্রহৃত হল নিজেই। ঠোঁট কেটে গেল, চোখে কালশিটে পড়ে গেল এবং জ্ঞান হারিয়ে ছাইয়ের গাদায় লুটিয়ে রইল অনেকক্ষণ। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আবার শুরু হয়ে যেত প্রহার-পর্ব এবং প্রাণটাও খতম হয়ে যেত তৎক্ষণাৎ, যদি না সদয়-হৃদয় এক শ্রমিক আড়াল করে দাঁড়াত তাকে। তারই কৃপায় একটু একটু করে শিখল হাতাহাতি লড়াইয়ের কৌশল। এ কৌশল সে জানে না বলেই তো বেধড়ক মার খেতে হয়েছে পাতাল কারখানায়। মার্জিত রুচিবান ডেনটন সাগ্রহে শিখেছিল নিচুতলার মানুষদের টিকে থাকার প্রক্রিয়া। মনে হয়েছে, এই তো জীবন! আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এসেছে ওপরতলার স্মৃতি। স্বরেস, বিনডন—সবাই ফিকে হয়ে গেছে স্মৃতিপট থেকে। তারপর একদিন লড়াইয়ে পোক্ত হয়ে এসে একাই লড়ে গিয়েছিল কারখানার কুলিদের সঙ্গে। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে রাত্রে শুয়ে এলিজাবেথিটার কাছে সোৎসাহে যখন বর্ণনা করছে তার নীচ জীবনের ইতর কাহিনি, তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল এলিজাবেথিটা। ইদানীং ওদের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথা বলার মতো উষ্ণতা ছিল না মনের মধ্যে। জড়, নিস্পৃহ যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল দু'টি প্রাণচঞ্চল মানুষ—যন্ত্রের ক্রীতদাস দু'টি যন্ত্র। কিন্তু ডেনটনের রূপান্তর দেখে এলিজাবেথিটা আর সামলাতে পারেনি নিজেকে। সে-ও তো পালটে যাচ্ছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে, অন্য মেয়ে-শ্রমিকদের মধ্যে নিজেকে আর দলছাড়া বলে মনে করতে পারছে না। এ জীবন তো সে চায়নি। এতদিন ডেনটন যা বলেছে, তা-ই বিশ্বাস করেছে—মেনে নিয়েছে। কিন্তু এখন এলিজাবেথিটা বুঝতে শিখেছে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নরক তাদের জন্যে

নয়—ওপরতলার জীবনটাই ফিরে পেতে চাইছে মনেপ্রাণে। আহ্বানও এসেছে ওপরতলা থেকে। ডেনটনকে ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ...

থ হয়ে বসে রইল ডেনটন!

৫। বিনডনের হস্তক্ষেপ

বিচিত্র পন্থায় ডেনটনের ওপর প্রতিশোধ নিল বিনডন।

বিচিত্র তার চরিত্র। আশ্চর্য এই কাহিনির মধ্যে প্রহেলিকা বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা বিনডেনের চরিত্র।

ছেলেবেলা থেকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে ধাপে ধাপে সে উঠেছে কর্তৃত্বের শিখরে। ফাটকাবাজি করে পয়সা কামিয়েছে দেদার। বাকি জীবনটা বুদ্ধি খরচ করে কেবল জুয়ো নিয়েই মেতে থেকেছে। নামযশের মোহে ব্যাবসায় নেমেছে। পৃথিবীর সমস্ত উড়ুক্কু যান এসে নামে লন্ডনের যে ফ্লায়িং স্টেজে, সেই কোম্পানির শেয়ার কিনে নিয়ে কোম্পানির সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে। দশজনের সামনে মান্যগণ্য হওয়ার পর নিমগ্ন থেকেছে নিজস্ব একান্ত গোপনীয় সাধ-আহ্লাদ নিয়ে।

চেহারাটা তার চিরকালই অ-সুন্দর। খর্বকায়, অস্থিসার এবং কৃষ্ণকায়। সূক্ষ্ম মুখাবয়বে কখনও প্রকট হয় ধীশক্তি, কখনও আত্মসন্তুষ্টি। যুগের ফ্যাশন অনুযায়ী পোশাকের রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে চুলের রং পালটে যায় যখন-তখন। কখনও পরে বাতাস ভরতি পোশাক, কখনও বিচিত্র টুপি, কখনও কালো সাটিনের টাইট ধরাচূড়া, কখনও চীনে রেশমের আলখাল্লা ঝুলতে থাকে বাতাস-চওড়া কাঁধের পোশাক থেকে। এলিজাবেথিটার মন জয় করার বাসনা নিয়ে পরেছিল গোলাপি রঙের আঁটসাঁট জামা, মাথায় এঁটেছিল জোড়া শিং, সারা গায়ে রকমারি আঁচিল। অপদার্থ ডেনটনের প্রেমে মজে না থাকলে এলিজাবেথিটা আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। ওর বাবাও তা-ই বলেছিল। এমন খাসা পোশাক দেখেই না মুন্ডু ঘুরে যায় দ্বাবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের! চলতে-ফিরতে রং পালটে যেত অপূর্ব জামাকাপড়ের, মেয়েদের চক্ষু চড়কগাছ না হয়ে পারে? কিন্তু হিপনোটিজ্‌মঘটিত অঘটনের পর দেখা গেল ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

বেপরোয়া জীবনযাপন করে যকৃৎ এবং স্নায়ুর দফারফা করে এনেছিল বিনডন। শরীর যখন বিধ্বস্ত, তখন খেয়াল হয়েছিল, বিয়ে-থা করে ঘরকন্নার মধ্যে ঢুকে পড়লে হয়তো স্বভাব পালটে সুস্থ শরীরে টিকে থাকা যাবে আরও কিছুদিন। কিন্তু মনের মতো পাত্রী পাওয়াই তো মুশকিল। ষোলো বছর বয়স থেকেই হরদম প্রেমে পড়েও সত্যিকারের প্রেমে কখনও পড়েনি বিনডন।

পড়ল, এলিজাবেথিটাকে যখন তার বাবা এনে হাজির করল তার সামনে—অবশ্যই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। প্রথম দর্শনেই প্রেমে হাবুডুবু খেল বিনডন—এ প্রেম নিখাদ প্রেম, নিকষিত হেম! এলিজাবেথিটার মনের মানুষ হওয়ার উৎসাহে শেলি আর গ্যেটের জগাখিচুড়ি মুখস্থ করে নিয়ে গেল দিনের পর দিন।

এলিজাবেথিটার মনের মানুষ যে আসলে আর-একজন, বিনডন তার কোনও খবরই রাখত না। এমনকী উচ্চাভিলাষী কুটিল-মস্তিষ্ক স্বরেস যে হিপনোটাইজ করে রেখেছে মেয়েকে—তা-ও জানত না। এলিজাবেথিটার শান্ত সুমিষ্ট ব্যবহারে ভেবেছে, সার্থক হয়েছে প্রচেষ্টা। দামি দামি গয়না আর প্রসাধনসামগ্রী উপহার দিয়ে গেছে দিনের পর দিন। তারপরেই একদিন উধাও হয়ে গেল এলিজাবেথিটা।

বিনডনের আকাশচুম্বী আত্মশ্লাঘা ধূলিসাৎ হল নিমেষে। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমেই একহাত নিল স্বরেসকে। যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমান করার পর শহরময় চরকিপাক দিয়ে বারোটা বাজিয়ে ছাড়ল স্বরেসের। মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের দিন কেনার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে পথে বসল উচ্চাভিলাষী স্বরেস।

নিখুঁতভাবে কাজটা সমাধান করে যৌবনকালের মদ্যশালায় খুশি খুশি মনে গিয়ে বসল বিনডন। পুরানো দোস্তও জুটে গেল জনা দুয়েক। না, সঙ্গিনী সে জোটায়নি। মেয়ে জাতটার ওপরেই যে হাড়পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল বিনডনের।

ফল যা হবার হল পরের দিন সকালে। যকৃতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিল ফোনোগ্রাফিক মেশিন, বরখাস্ত করল প্রধান পরিচারককে এবং ঠিক করল, প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিতে হবে এলিজাবেথিটা আর ডেনটনের ওপর। প্ল্যানটাও ছকে ফেলল মাথার মধ্যে।

গেল স্বরেসের কাছে। পথের ফকির হয়ে স্বরেস তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে। বিত্ত উদ্ধারের জন্য চিত্ত বিক্রয়ে প্রস্তুত যে কোনও দামে। মায়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হবে এলিজাবেথিটাকে? হাতে পয়সা না থাকলেই লেবার কোম্পানিতে চাকরি নেবে দু'জনে? তারপর? তারপর? তারপর আর কী! অনটনের সংসারে ঝগড়া লাগবে দু'জনে—বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে এলিজাবেথিটাকে ঘরে এনে তুলবে বিনডন।

কাজ হল প্ল্যাননমাফিক—অক্ষরে অক্ষরে—অন্তত প্ল্যানের প্রথম অংশটা।

লেবার কোম্পানির দরজার সামনেই উঁচুতলার ফ্ল্যাট থেকে বিনডন দেখল সেই দৃশ্য—নীল ক্যাম্বিস পরতে চলেছে অনাহারে শুষ্ক এলিজাবেথিটা আর ডেনটন।

তৎক্ষণাৎ তলব পড়ল স্বরেসের। এবার চলুক মানসিক নির্যাতন। এলিজাবেথিটা যেন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে—ডেনটন তার উপযুক্ত নয়।

ইতিমধ্যে ওদের একমাত্র মেয়ে অক্কা পাওয়ায় সে কী ফুর্তি বিনডনের। টাকায় কী না হয়। টাকার জোরেই অঘটন ঘটিয়ে চলেছে সে পরের পর। এবার শেষ পর্ব!

স্বরেস যাক এলিজাবেথিটার কাছে—অপদার্থ ডেনটনকে পরিত্যাগ করার প্রস্তাব নিয়ে।

সুড়সুড় করে হুকুম তামিল করল স্বরেস!

তারপর?

রিপোর্ট দিয়ে গেল স্বরেস। বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব শুনে নাকি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে এলিজাবেথিটা। হাউহাউ করে বলে গেছে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি।

'আহা! আহা!' বলতে বলতে অকস্মাৎ ককিয়ে উঠেছিল বিনডন। যকৃতের সেই যন্ত্রণাটা ছুরির মতো খুঁচিয়ে চলেছে। পরপর দু'বার কোনওমতে সইবার পর তৃতীয় খোঁচাটা খেয়েই দৌড়েছিল ডাক্তারের কাছে।

আগাপাশতলা পরীক্ষা করে ডাক্তার জানতে চেয়েছিল, ছেলেপুলে হয়েছে কি বিনডনের? হয়নি তো! তবে আর বাঁধন কীসের! ইউথ্যানাসিয়ার শরণ নেওয়া হোক —এখুনি।

ইউথ্যানাসিয়া! সেটা আবার কী?

স্বেচ্ছামৃত্যু! আর মাত্র তিন দিন আয়ু আছে বিনডনের। সারাজীবন ধরে আত্মহত্যাই করে এসেছে—এবার তা ত্বরান্বিত হোক তিন দিনের মধ্যে! দুনিয়ার কোনও ডাক্তারই পারবে না তার জীর্ণ দেহযন্ত্রগুলিকে নতুন করে তাজা করতে। আয়ু ফুরিয়েছে। অতএব—

ডাক্তারের পিণ্ডি চটকে বিনডন যন্ত্রণায় ককাতে ককাতে শহর চষে ফেলেছিল। বাঘা বাঘা ডাক্তারকে দেখিয়েছিল। কিন্তু সব শেয়ালেরই যে এক ডাক!

আয়ু ফুরিয়েছে বিনডনের। কুবের সম্পদ ঢেলেও আর তা টেনে লম্বা করা যাবে না।

গোল্লায় যাক বিজ্ঞান! নিজের নিভৃত ঘরে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতাটার মুন্ডুপাত করেছিল বিনডন। এলিজাবেথিটা তার মনে দাগা দিয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন মঠে-মন্দিরে ঘুরে শান্তি খুঁজতে গিয়ে যে কথাটা শুনেছিল, মনের মধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হল সেই কথা। এ দুনিয়ায় নশ্বর সবই—জরা এসে একদিন গ্রাস করবেই এই দেহকে। সবই পড়ে থাকবে—অবিনশ্বর শুধু আত্মা—শুদ্ধ রাখ সেই আত্মাকে।

আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল বিনডন। এলিজাবেথিটা তাকে ভুল বুঝেছে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, বিনডন কী চরিত্রের মানুষ। তার মন জয় করা না গেলেও, মনে ছাপ ফেলে দেওয়া তো যাবে। এমন ছাপ এঁকে যাবে বিনডন, যার পরে অনুতপ্ত

হবেই এলিজাবেথিটা—বিনডনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে। চরম উদারতা দেখিয়ে যাবে বিনডন—রিক্তা এলিজাবেথিটাকে এনে বসাবে বিত্তের সিংহাসনে—পাশে থাকবে ডেনটন।

সেই হবে বিনডনের ভয়ানক প্রতিশোধ!

টেলিফোন করল আইনবিদকে তৎক্ষণাৎ। দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল ইষ্টিপত্র—টিপসই চলে গেল তিন মাইল দূরে আইনজ্ঞের দপ্তরে—যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে।

কিছুক্ষণ এলিয়ে বসে থাকার পর রিসিভার তুলে নিয়ে ডাক দিল ইউথ্যানাসিয়া কোম্পানিকে—এত জরুরি তলব কখনও আসেনি এই কোম্পানিতে।...

দিনকয়েক পরে দেখা গেল, তার ফ্ল্যাটে, তার চেয়ারে পাশাপাশি বসে এলিজাবেথিটা আর ডেনটন—দৃষ্টি প্রসারিত সুদূরের আকাশপানে।...

গ ল্প
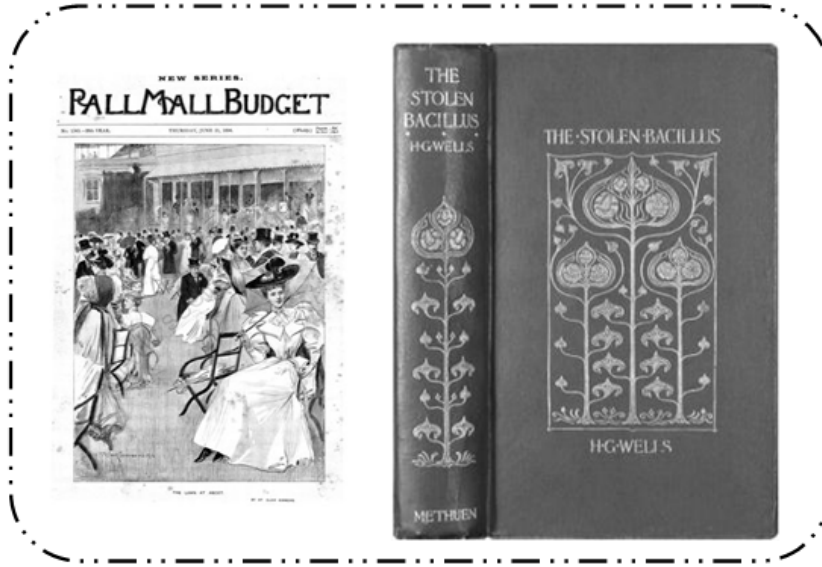
'The Stolen Bacillus' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালের জুন মাসে 'Pall Mall Budget' পত্রিকায়। ১৮৯৫ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের প্রথম ছোট গল্পের সংকলন 'The Stolen Bacillus and Other Incidents'-তে গল্পটি স্থান পায়। প্রথম বায়ো-টেররিজমের উল্লেখ এই গল্পেই পাওয়া যায়।

চোরাই জীবাণু
(The Stolen Bacillus)

মাইক্রোস্কোপের তলায় কাচের প্লেট ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন জীবাণুবিজ্ঞানী, 'এই হল গিয়ে স্বনামধন্য কলেরা-ব্যাসিলাস—-কলেরার জীবাণু।'

পাঙাসপানা মুখ নিয়ে অণুবীক্ষণে একটা চোখ রাখল লোকটা। মাইক্রোস্কোপ দেখতে অভ্যস্ত নয় নিশ্চয়, তাই শীর্ণ শিথিল একটা সাদা হাতে চাপা দিলে অন্য চোখটা।

বললে, 'কিস্‌সু দেখতে পাচ্ছি না।'

'স্ক্রু-টা ঘুরিয়ে আপনার চোখের উপযোগী করে মাইক্রোস্কোপ ফোকাস করে নিন। সবার চোখে সমান দৃষ্টি তো থাকে না। এইদিকে সামান্য একটু ঘোরান।'

'এই তো... দেখা যাচ্ছে। আহামরি অবশ্য কিছু নয়। গোলাপি রঙের পুঁচকে কতকগুলো ডোরা আর ফালি। অথচ দেখুন, এই খুদে পরমাণু খোকারাই গোটা শহরকে তছনছ করে দিতে পারে। ওয়ান্ডারফুল!'

বলে, কাচের স্লাইডটা নিয়ে মাইক্রোস্কোপের ধার থেকে সরে গেল জানলার পাশে। আলোর সামনে স্লাইড তুলে ধরে বললে, 'দেখাই যাচ্ছে না। বেঁচে আছে তো? এখনও কি বিপজ্জনক?'

'রং দিয়ে রাঙিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। যদি পারতাম, বিশ্বের সমস্ত ক'টা জীবাণুকে এইভাবে মারতাম।'

ক্ষীণ হাসি ভেসে ওঠে বিবর্ণমুখ লোকটার ঠোঁটে—'জীবন্ত জীবাণু, আপনার ঘরে রাখতে চান না—এই তো?'

'মোটেই তা নয়। জীবন্ত জীবাণুই তো রাখতে হয়। যেমন ধরুন এই জীবন্ত জীবাণুগুলো,' বলতে বলতে ঘরের আরেকদিকে গিয়ে মুখ-আঁটা একটা টিউব তুলে নিলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী—'রোগজীবাণুর চাষ করে পাওয়া এই দেখুন বেশ কিছু সজীব জীবাণু। বোতল-কলেরাও বলতে পারেন।'

ক্ষণেকের জন্যে যেন পরম খুশির হালকা হাসি ভেসে যায় সাক্ষাৎপ্রার্থীর পাতলা ঠোঁটের ওপর দিয়ে। দু'চোখ দিয়ে যেন গিলতে থাকে ছোট্ট টিউবটা।

নজর এড়ায় না জীবাণু-বিজ্ঞানীর। লোকটার চোখে-মুখে অস্বাস্থ্যকর রুগ্ণ আনন্দের দ্যুতি। প্রথম থেকেই খটকা লেগেছিল জীবাণু-বিজ্ঞানীর। হাবভাব কীরকম যেন খাপছাড়া। অথচ পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছে এক বন্ধুর কাছ থেকে। বিজ্ঞানসাধকরা হয় শান্তশিষ্ট, আত্মচিন্তায় সদানিমগ্ন। কালোচুলো এই লোকটার গভীর ধূসর চোখে কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি, হাবভাব ছটফটে—নার্ভাস। চঞ্চল কিন্তু তীক্ষ্ণ চাহনি নিবদ্ধ কাচের টিউবের ওপর, ঠিক এই ধরনের বিজ্ঞানসাধকের সংস্পর্শে কোনওদিন আসেননি জীবাণু-বিজ্ঞানী। হয়তো তাঁর আবিষ্কার লোকটাকে চঞ্চল করে তুলেছে, এমনটা হওয়াও বিচিত্র নয়।

টিউব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী চিন্তাকুটিল ললাটে। বললেন নিবিষ্ট স্বরে, 'মহামারীকে বন্দি করে রেখেছি এই টিউবের মধ্যে। খাবার জলের চালান যাচ্ছে যেখান থেকে, ছোট্ট এই টিউবটাকে যদি ভেঙে ফেলেন সেই জলের মধ্যে, তাহলেই দেখবেন এই খুদে অণুবীক্ষণে দৃশ্যমান প্রাণীগুলোর ক্ষমতা। অথচ এদের গায়ে গন্ধ নেই, খেতেও বিস্বাদ নয়—অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ না হলে দেখাও যায় না। কিন্তু তুচ্ছ প্রায়-অদৃশ্য এই এদেরকে জলে ঢেলে দিয়ে যদি হুকুম দেন—যাও হে মৃত্যুদূতেরা, বংশবৃদ্ধি করে ছেয়ে ফেল সব ক'টা সিসটার্ন আর চৌবাচ্চা—তাহলেই ভয়ানক মৃত্যু আসবে চক্ষের নিমেষে, রহস্যময় সেই মৃত্যুর কিনারা করাও যাবে না, যন্ত্রণাময় মৃত্যু অসীম লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে এক-একটা মানুষকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে মৃত্যুকূপে। সারা শহর জুড়ে তাথই তাথই নাচ নেচে চলবে মৃত্যু-যজ্ঞের সৈনিকরা—এই প্রায়-অদৃশ্য জীবাণুরা। নিজেরাই শিকার খুঁজে বার করবে—কাউকে দেখিয়েও দিতে হবে না। স্বামীকে ছিনিয়ে নেবে স্ত্রী-র কাছ থেকে, শিশুকে মায়ের কোল থেকে, রাজনীতিবিদকে কঠিন কর্তব্যের মধ্যে থেকে। শ্রমিককে আর উদয়াস্ত হাড়ভাঙা মেহনত নিয়ে কষ্ট পেতে হবে না। এগিয়ে যাবে জলের মেইন পাইপ দিয়ে, গুটিশুটি এগবে রাস্তা বরাবর, যেসব বাড়িতে জল ফুটিয়ে খাওয়ার হাঙ্গামা কেউ পোয়াতে চায় না—ঠিক সেইসব বাড়িতেই

হানা দিয়ে সাজা দেবে মৃত্যুর পরোয়ানা হাজির করে, খনিজ জল উৎপাদন করে যারা—সেঁধিয়ে বসবে তাদের কুয়োর জলে, মিশে যাবে স্যালাডে, ঘুমিয়ে থাকবে বরফের মধ্যে। ঘোড়াদের জল খাবার চৌবাচ্চায় ওত পেতে থাকবে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণের সুযোগ নিয়ে উদরে প্রবেশের অপেক্ষায়, রাস্তার কল থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন নিশ্চিন্ত মনে জল খাবে—তখন তাদেরও একে একে টেনে নিয়ে যাবে মৃত্যুর অজানা লোকে। মাটি শুষে নেবে মহাভয়ংকর এই সৈনিকদের, কিন্তু আবার বেরিয়ে আসবে হাজার হাজার অপ্রত্যাশিত পথে—ঝরনার জলে, কুয়োর জলে। জলাধারে একবার ছেড়ে দিলেই হল—ডেকে ফিরিয়ে এনে ফের বন্দি করার সুযোগ বা সময়ও আর দেবে না—মহাশ্মশান করে ছাড়বে বিশাল এই শহরকে।'

অকস্মাৎ স্তব্ধ হলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী। বাগ্মিতা তাঁর এক দুর্বলতা। সবাই বলে, নিজেও জানেন।

শেষ করলেন ছোট্ট কথায়, 'এই টিউবের মধ্যে মহামারীর মৃত্যুদূতরা কিন্তু সুরক্ষিত।'

ঘাড় নেড়ে নীরবে সায় দেয় বিবর্ণমুখ লোকটা। কিন্তু চকচক করছে দুই চোখ। কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললে, 'তাহলেই দেখুন, অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্যে যারা আদা-জল খেয়ে লেগেছে, সেই অ্যানার্কিস্টগুলোর মতো মহামূর্খ আর নেই। বোমা-টোমার দরকার কী? হাতের কাছেই রয়েছে যখন এমন নিঃশব্দ, মোক্ষম অস্ত্র। আমার তো মনে হয়—'

মৃদু টোকা শোনা গেল দরজায়। নখ দিয়ে কে যেন টোকা মারছে।

দরজা খুলে দিলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী।

সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী। বললেন, 'একটা কথা আছে, বাইরে আসবে?'

স্ত্রী-র সঙ্গে কথা শেষ করে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে জীবাণু-বিজ্ঞানী দেখলেন, ঘড়ি দেখছে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বললে, 'চারটে বাজতে বারো মিনিট। ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করলাম আপনার। যাওয়া উচিত ছিল সাড়ে তিনটেয়। কিন্তু এমন কৌতূহল জাগিয়ে ছেড়েছিলেন যে খেয়ালই ছিল না। এখন চলি—ঠিক চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

আর-এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ফিরে এলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী। সাক্ষাৎপ্রার্থীর মানবজাতিতত্ত্ব নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করছিলেন তিনি। লোকটা টিউটোনিক টাইপ নয়, মামুলি ল্যাটিন টাইপও নয়। রুগ্‌ণ মনুষ্য—দেহে এবং মনে। রোগ তৈরির ডিপো জীবাণুগুলোর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল!

ভাবতে ভাবতেই একটা অস্বস্তিকর চিন্তা ঢুকে গেল মাথায়। ভেপার বাথের পাশে রাখা বেঞ্চির দিকে গেলেন, সেখান থেকে ঝটিতি গেলেন লেখবার টেবিলে। পাগলের মতো পকেট হাতড়ালেন এবং পরক্ষণেই তিন লাফে হাজির হলেন দরজায়। হয়তো হলঘরের টেবিলে রেখেছেন—কিন্তু সেখানেও জিনিসটা না পেয়ে বিকট গলায় ডাকলেন স্ত্রী-র নাম ধরে।

দূর থেকে সাড়া এল স্ত্রী-র।

বললেন জীবাণু-বিজ্ঞানী গলার শির তুলে, 'যখন কথা বলছিলাম তোমার সঙ্গে, আমার হাতে কিছু দেখেছিলে?'

কিছুক্ষণ কোনও জবাব এল না।

'কই না তো!'

আর্তনাদ করে উঠলেন জীবাণু-বিজ্ঞানী, 'নীল সর্বনাশ!' ঝড়ের মতো দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন সদর দরজা পেরিয়ে এক্কেবারে রাস্তায়।

স্ত্রী-র নাম মিনি। দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠতেই সভয়ে দৌড়ে গেল জানলার সামনে। দেখল, পাঁইপাঁই করে রাস্তা দিয়ে ছুটছে একজন শীর্ণকায় পুরুষ—তারপরেই একটা ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড় করিয়ে উঠে বসছে ভেতরে। পেছনে দৌড়াচ্ছেন তাঁর স্বামী। মাথায় টুপি নেই। পায়ে কার্পেট-চটি। ক্ষিপ্তের মতো হাত নাড়ছেন সামনের ছ্যাকড়া গাড়িটার দিকে। ছুটতে ছুটতে পা থেকে ছিটকে গেল একখানা চটি—কিন্তু কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যেও দাঁড়ালেন না—এক পায়ে চটি পরেই দৌড়াচ্ছেন উন্মাদের মতো।

মিনি দেখলে, স্বামীদেবতার মাথাটি সত্যিই এদ্দিনে বিগড়ে গেল। ভয়ানক বিজ্ঞান নিয়ে দিনরাত অত ভাবলে মাথা খারাপ তো হবেই।

জানলা খুলে স্বামীকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছে মিনি, এমন সময়ে শীর্ণকায় লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই একই পাগলামিতে যেন পেয়ে বসল তাকেও। চকিতে হাত নেড়ে দেখাল জীবাণু-বিজ্ঞানীকে, কী যেন বললে গাড়োয়ানকে, লাফিয়ে উঠে বসল ভেতরে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সপাং সপাং করে চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে! রাস্তা কাঁপিয়ে টগবগিয়ে ছুটে গেল গাড়ি—

পেছনে পেছনে জীবাণু-বিজ্ঞানী ছুটলেন পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে এক পায়ে চটি পরে।

মিনিটখানেক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকার পর বিমূঢ়ভাবে জানলা বন্ধ করে দিলে মিনি। পতিদেবতা নির্ঘাত পাগল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হাঁ করে বসে থাকলে তো চলবে না। জীবাণু-বিজ্ঞানীর টুপি, জুতো আর ওভারকোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে বসে গাড়োয়ানকে বললে, 'মাথায় টুপি না

দিয়ে ভেলভেট কোট পরে একটা লোক দৌড়াচ্ছে—চল তো তার কাছে। হ্যাভলক কেসেন্টের দিকে গেলেই পাবে।’
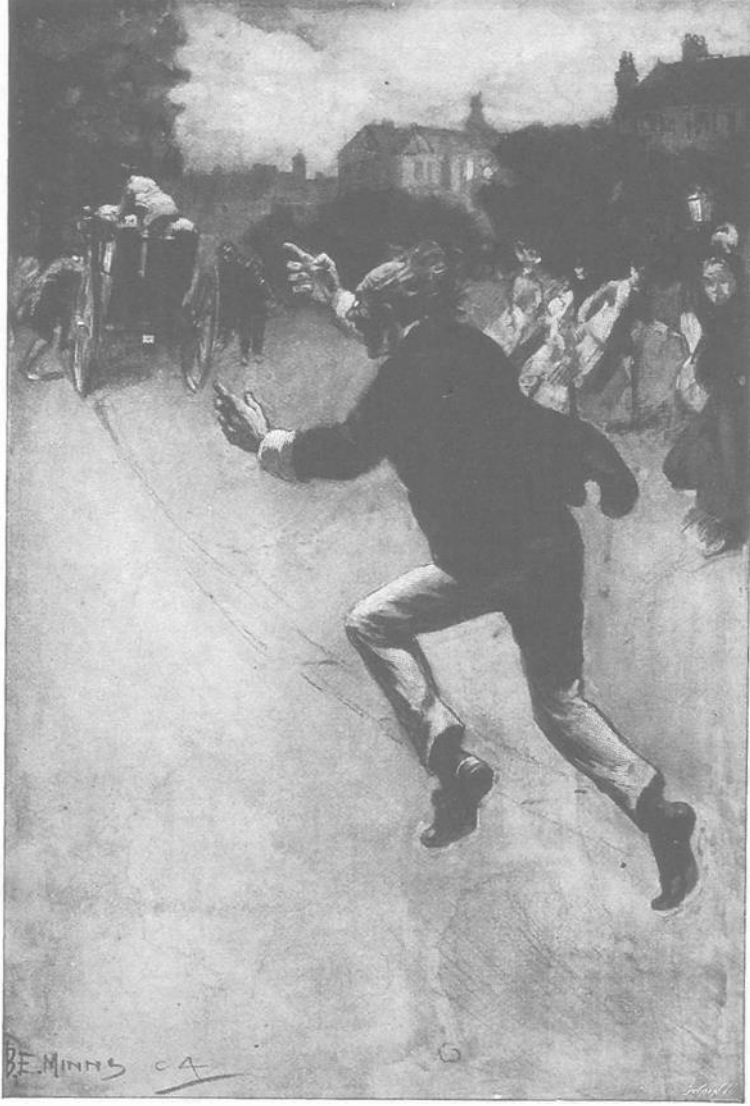
চিত্র ৪.১ পেছনে পেছনে জীবাণু-বিজ্ঞানী ছুটলেন পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে

চাবুকের ঘায়ে গাড়িখানাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল তেজিয়ান ঘোড়া। হইচই পড়ে গেল পথের দু'পাশে। পরপর দু'খানা গাড়ি পথ কাঁপিয়ে ছুটছে নক্ষত্রবেগে। পটাপট হাততালিতে মুখরিত হল আকাশ-বাতাস। ভদ্রমহিলা যে সামনের গাড়ির নাগাল ধরতে চাইছে, এটা বুঝেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

মিনি নিজেও বুঝল, এত উত্তেজনা তাকে নিয়েই। কিন্তু সে চলেছে তার কর্তব্য করতে। সামনের গাড়ির দিকে তার নজরই নেই—চোখ রেখেছে কেবল তার উন্মাদ স্বামীর পৃষ্ঠদেশে।

সামনের গাড়ির ভেতরে এক কোণে ঝুঁকে বসে রয়েছে সেই লোকটা। শক্ত মুঠোর মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের বীজ কলেরার জীবাণু ভরতি টিউবটা। ভয় আর উল্লাস—এই দুই ভাবের খেলা চলছে মাথার মধ্যে। ভয়টা আবার দু'রকমের। কর্তব্য সম্পাদনের আগেই না ধরা পড়তে হয়। দ্বিতীয় ভয়টা তার অপরাধজনিত। কিন্তু এই দু'-দুটো ভয়কে ছাপিয়ে গেছে উৎকট উল্লাস। মনেপ্রাণে সে একজন অ্যানার্কিস্ট—অরাজকতা সৃষ্টি করার বিকৃত বাসনা শেকড় গেড়ে রয়েছে তার অণুতে-পরমাণুতে। কিন্তু অন্য কোনও অ্যানার্কিস্ট যা কল্পনাও করতে পারেনি—সে তা কল্পনা তো করেইছে, কাজে রূপান্তরিত করতে চলেছে! অহো! অহো! র‍্যাভাচোল, ভ্যালিয়ান্ট এবং আরও কত অ্যানার্কিস্ট এখন বিস্মৃত—কিন্তু সে অমর হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। তাকে পাত্তা দেয়নি কেউ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে প্রত্যেকেই—মোক্ষম প্রতিশোধ নেবে এখুনি। খাসা মতলব এনেছিল মাথায়। পরিচয়পত্র জাল করে দেখা করেছিল উজবুক ওই জীবাণু-বিজ্ঞানীটার সঙ্গে, কথায় কথায় ভুলিয়ে রেখে সুযোগ বুঝেই পকেটে ঢুকিয়েছে বিশেষ টিউবটা। এখন শুধু জলাধারে উপুড় করে দিলেই হল। হাঃ হাঃ হাঃ! মৃত্যু নেচে নেচে বেড়াবে সারা শহরে। কিন্তু উজবুকটা এখনও পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে নাকি? মুখ বাড়িয়ে দেখল অ্যানার্কিস্ট। মাত্র পঞ্চাশ গজ পেছনে এসে গেছে আহাম্মকটা গাড়ি। উঁহু, এত কাছাকাছি আসতে দেওয়াটা ঠিক নয়। একটা আধ গিনি গাড়োয়ানের হাতে গছিয়ে গাড়িটাকে আরও জোরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিলে অ্যানার্কিস্ট।

আধ গিনি কম কথা নয়। সপাং করে চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে। আচমকা মার খেয়ে তিড়বিড়িয়ে ছিটকে ধেয়ে গেল ঘোড়া—সেই সঙ্গে গাড়ি। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল অ্যানার্কিস্ট—হাতের মুঠোয় মূল্যবান সেই ধ্বংসের বীজ। দুলন্ত গাড়িতে খাড়া থাকা যায়? ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে উলটে পড়তেই পিড়িং করে ভেঙে গেল পাতলা কাচের টিউব—ধ্বংসের বীজ গড়িয়ে গেল গাড়ির মেঝেতে!

ধপ করে বসে পড়ল অ্যানার্কিস্ট। মুখ চুন করে চেয়ে রইল হাতে ধরা ভাঙা টিউবটার দিকে! জীবাণু যখন গাড়ির মেঝেতে কিলবিল করছে, তখন মৃত্যুও ছড়িয়ে পড়বে অচিরেই। কিন্তু নাটকটা আর হল না।

ভাঙা টিউবে টলটল করছে একটা ফোঁটা। মৃত্যুদূত নিশ্চয়ই থুকথুক করছে তার মধ্যে। খেয়ে নেওয়া যাক—শহিদ হয়ে প্রশস্ত করে যাক মৃত্যুবাহিনীর বিজয়পথকে।

কলেরার জীবাণু এখন অ্যানার্কিস্টের পেটে। ভীষণ শক্তিশালী জীবাণু তো। মাথার মধ্যে কীরকম যেন করছে। কিন্তু খামকা আর আহাম্মক বৈজ্ঞানিকটাকে উদ্‌বেগের মধ্যে রাখা কেন? কাজ তো হাসিল!

ওয়েলিংটন স্ট্রিটে গাড়ি ছেড়ে দিল অ্যানার্কিস্ট। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে মৃত্যু-মহিমায় উন্নতশিরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জীবাণু-বিজ্ঞানীর প্রতীক্ষায়।

এসে গেছে আহাম্মকটা! উন্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অ্যানার্কিস্ট।

'বেঁচে থাক অ্যানার্কিস্ট! হে বন্ধু, বড় দেরি করে ফেললে। জিনিসটা এখন আমার পেটের মধ্যে। মুক্তি পেয়েছে কলেরা খাঁচার মধ্যে থেকে।'

জীবাণু-বিজ্ঞানী বুদ্ধি করে মাঝপথে একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে পড়েছিলেন বলেই নাগাল ধরতে পেরেছিলেন বিকৃতমস্তিষ্ক অ্যানার্কিস্টের। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে তার কথাটা শুনে সবিস্ময়ে কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু না শুনেই সাড়ম্বরে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে হেলেদুলে ওয়াটার ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল অ্যানার্কিস্ট—ভাঙা টিউবের জীবাণু পোশাকে পড়েছিল—ভেজা পোশাক ঘষটে গেল বহু পথচারীর গায়ে—যত তাড়াতাড়ি রোগটা ছড়িয়ে পড়ে, ততই ভালো!

গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখছেন জীবাণু-বিজ্ঞানী, এমন সময়ে মিনি এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে—হাতে জুতো, টুপি আর ওভারকোট।

দেখে সংবিৎ ফেরে জীবাণু-বিজ্ঞানীর, 'ভারী বুদ্ধি তো তোমার! মনে করে ঠিক এনেছে।'

বলেই আবার তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন বিলীয়মান অ্যানার্কিস্টের দিকে।

আচম্বিতে হেসে উঠলেন হো হো করে একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা মনে পড়ায়, বললেন হাসতে হাসতেই, 'মিনি, লোকটা নাম ভাঁড়িয়ে এসেছিল কলেরার জীবাণু চুরি করবে বলে—অ্যানার্কিস্ট তো—লন্ডনের জলে কলেরার জীবাণু ছেড়ে দেওয়ার মতলব, কিন্তু ভুল করে কী নিয়ে গেছে জান? প্রথম ভুলটা অবশ্য আমারই। এশিয়াটিক কলেরার জীবাণু ভরতি টিউবের বদলে দেখিয়েছিলাম সেই টিউবটা—যে টিউবের জীবাণু খেয়ে ছোপ ছোপ নীল দাগে ভরে উঠেছিল বাঁদরগুলো, তিন তিনটে ছানা সমেত বেড়াল-মা বিলকুল নীল হয়ে গিয়েছিল। ঘন নীলবর্ণ ধারণ করেছিল চড়ুই পাখিটা। সেই জীবাণুই ও খেয়েছে—জানি না কী হবে এখন—কিন্তু ওভারকোট পরতে যাব কেন? গরমে হাঁসফাঁস করছি দেখছ না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাও!'
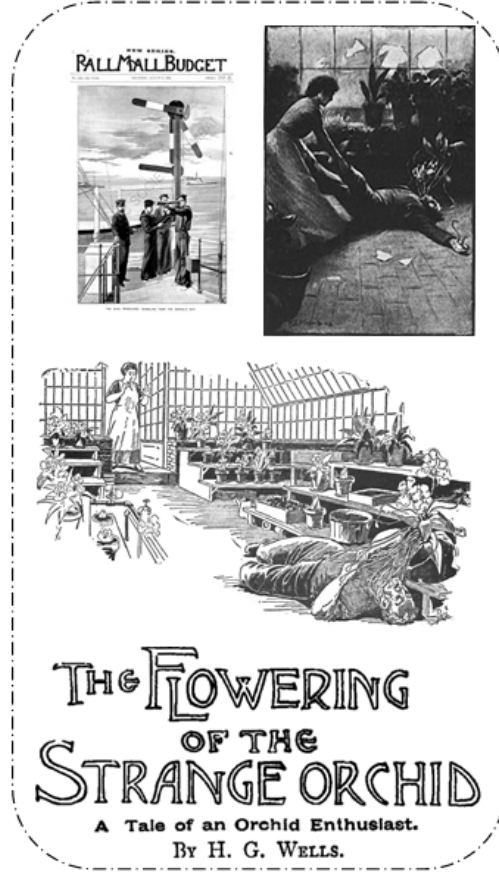
'The Flowering of the Strange Orchid' ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে 'Pall Mall Budget' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Pearson's Magazine' পত্রিকায়। ১৮৯৫ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের প্রথম ছোটগল্পের সংকলন 'The Stolen Bacillus and Other Incidents'-তে গল্পটি স্থান পায়।

অদ্ভুত অর্কিড
(The Flowering of the Strange Orchid)

অর্কিড এমনই একটা ফুল, যা কেনার জন্যে পাগল হতে হয়, কেনার পরেও পাগল হয়ে থাকতে হয়। একটু একটু করে পাপড়ি মেলে ধরে ফুল যতই ফুটতে থাকে, রং আর শোভা ততই মনকে মাতাল করে দেয়। নব নব আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে হয়।

এ নেশা পেয়ে বসেছিল ওয়েদারবার্নকেও। অর্কিড জমানোর বাতিক তাকে নিত্যনতুন উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে গেছে। সারাজীবনটাই তার উত্তেজনাবিহীন। চৌকস মানুষ মোটেই নয়। লাজুক। নিঃসঙ্গ। পয়সাকড়ি যা আছে, তাতে প্রয়োজন মিটে যায়, কিন্তু এমন উদ্যম নেই যে, চাকরিবাকরি জুটিয়ে নেয়। ডাকটিকিট জমানো, হোরেস অনুবাদ, বাঁধানো বই কেনা, ডায়াটমের নতুন প্রজাতি আবিষ্কার—এইসব করেই সময় কাটালে পারত। কিন্তু পেয়ে বসল অর্কিড জমানোর বাতিকে। ছোট্ট একটা হট-হাউস বানিয়ে নিয়েছে নিজেই। কাচের ছাদওয়ালা উষ্ণ গৃহ। গাছপালা পরিবর্ধন আর ফল পাকানোর মোক্ষম ব্যবস্থা।

সকালবেলা কফি খেতে খেতে গল্প হচ্ছে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে। মেয়েটি তার খুড়তুতো বোনও বটে। স্বভাবে ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। ঘরসংসার নিয়ে দিব্যি আছে। খামকা উত্তেজনার পেছনে দৌড়াতে চায় না।

কিন্তু গজগজ করে চলেছে ওয়েদারবার্ন। সারাজীবনটাই তার কেমন ভিজে-ভিজে। অন্য লোকদের জীবনে কত রকমের বৈচিত্র, কত অ্যাডভেঞ্চার, কত বিপদ ঘটে। কিন্তু তার জীবনটা ছেলেবেলা থেকেই বড় একঘেয়ে, শৈশবে পড়তে হয়নি প্রেমে—ফলে, বিয়ে-থা-ই হল না। অথচ ওই যে হার্ভে—সোমবারে কুড়িয়ে পেল ছ'পেনি মুদ্রা, বুধবারে টলতে লাগল সমস্ত মুরগিছানা, শুক্রবারে অস্ট্রেলিয়া থেকে

এল খুড়তুতো ভাই, শনিবারে ভাঙল গোড়ালি! অহো! অহো! উত্তেজনার এহেন ঘূর্ণিঝড়ে ওয়েদারবার্নকে কখনও পড়তে হয়নি। এর চাইতে পরিতাপের বিষয় আর হয় কি? তবে হ্যাঁ, কফির দ্বিতীয় কাপে ধীরেসুস্থে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল ওয়েদারবার্ন—আজ একটা নতুন কিছু ঘটবে মনে হচ্ছে। কেন-না, আজ সে যাচ্ছে আন্দামান আর ইন্ডিজ থেকে আনা কিছু উদ্ভিদ কিনতে।

'যার কথা সেদিন তুমি বলছিলে?' প্রশান্ত কণ্ঠে বলেছিল বোন।

'হ্যাঁ। তাই অর্কিড বেচে দিচ্ছে পিটার দোকানদার।'

'অর্কিড জমানোর বিষম বাতিক ছিল বুঝি?'

'সাংঘাতিক। অথচ বয়সে আমার চাইতে তেইশ বছরের ছোট। মোটে ছত্রিশ, এই বয়সের কতরকম উত্তেজনা যে পেয়েছে, তার হিসেব নেই। মারা গেল উত্তেজনা কুড়াতে কুড়াতেই। বিয়ে করেছিল দু'বার, বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল একবার। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়েছিল চারবার। ঊরুর হাড় ভেঙেছিল একবার। একবার একটা মালয়বাসীকে খুন করেছিল নিজের হাতে, নিজেই একবার জখম হয়েছিল বিষাক্ত তিরে। শেষকালে মারা গেল জঙ্গলের জোঁকের পাল্লায় পড়ে—শুধু এই জোঁকের ব্যাপারটা ছাড়া বাদবাকি সবই দারুণ ইন্টারেস্টিং, তা-ই না?'

'আমার কাছে নয়,' বলেছিল বোন।

'তা অবশ্য নয়। আটটা তেইশ বাজল। পৌনে বারোটায় ট্রেন। চললাম।'

বাড়ি ফিরল ওয়েদারবার্ন বিষম উত্তেজনা নিয়ে। না বুঝেই কিনে ফেলেছে কিছু অর্কিড, উত্তেজনা সেই কারণেই। অজ্ঞাত অর্কিডের রহস্য বেশ মাতিয়ে তুলেছে তাকে।

ডিনার খেতে খেতে বোনকে বলছিল সেই কথাই। নিশ্চয় আশ্চর্য কিছু এর পর থেকে ঘটবেই। আজ থেকেই যে তার শুরু, সকালেই তা টের পেয়েছিল। কয়েকটা অর্কিডের নাম সে জানে। কিন্তু এই যে এই অর্কিডটা, প্যালিনোফিস হতে পারে, না-ও পারে, এক্কেবারে নতুন প্রজাতি অথবা একটা মহাজাতি হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু সেই। ব্যাটেন বেচারা নাকি এই অর্কিডটাই সংগ্রহ করার পর মারা গিয়েছিল।

বোন বললে গম্ভীর মুখে, 'জঘন্য দেখতে—গা শিরশির করছে। মা গো। কী কদাকার চেহারা!'

ভাই বললে সঙ্গে সঙ্গে, 'দূর! আমার চোখে ওর কোনও চেহারাই ধরা পড়ছে না।'

'গা থেকে ওই যে কী সব বেরিয়ে রয়েছে—কী বিশ্রী! কী বিশ্রী!'

'কালকেই তো টবে পুঁতে দেব।'

'মড়ার মতো মটকা মেরে রয়েছে—ঠিক যেন একটা মাকড়সা।'

মুচকি হেসে ঘাড় কাত করে শেকড় পর্যবেক্ষণ করতে থাকে ওয়েদারবার্ন।

বলে, 'আহামরি দেখতে নয় মানছি। কিন্তু শুকনো চেহারা দেখে কিছুই আঁচ করা যায় না। দু'দিন পরে ওই থেকেই এমন অর্কিড গজিয়ে উঠবে—তাক লেগে যাবে। তখন তুমিই বলবে—আহা রে, কী সুন্দর! কী সুন্দর! ব্যাটেন বেচারা মরে পড়েছিল ঝোপের মধ্যে এই অর্কিডের ওপরেই—আন্দামান জায়গাটা অতি যাচ্ছেতাই। ঝোপঝাড়ের মধ্যে কতরকম মৃত্যু যে লুকিয়ে থাকে, কেউ জানে না। রক্তচোষা জোঁক শরীর থেকে নাকি সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছিল। এই অর্কিড খুঁজতে গিয়েই ঝোপে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল নিশ্চয়—তারপর পড়েছে জোঁকদের পাল্লায়। দিনকয়েক নাকি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিল।'

'শুনে আরও কুৎসিত লাগছে তোমার অর্কিডকে।'

বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে ওয়েদারবার্ন বললে, 'মেয়েরা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও পুরুষরা নিজেদের কাজ করে যাবেই—কেউ আটকাতে পারবে না।'

'ঝোপের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই। বিশেষ করে আন্দামানে—যেখানকার ভয়ানক জংলিরা সেবা করতেও জানে না। সময়মতো কুইনাইন আর ক্লোরোডাইনও জোটে না!'

'মানছি। কিন্তু ওইরকম কষ্টভোগই কিছু মানুষের খুব ভালো লাগে,' বলে ছিল ওয়েদারবার্ন নাছোড়বান্দার মতো। আন্দামানে ব্যাটেন কিন্তু যে জংলিদের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিল, তারা কিছুটা সভ্যভব্য ছিল। তাই ব্যাটেনের অতিকষ্টে সংগ্রহ-করা কোনও অর্কিডই ফেলে দেয়নি—যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। তারপর এসে পৌঁছাল ওর এক পক্ষীবিজ্ঞানী বন্ধু, আন্দামানের গভীর জঙ্গল থেকে। ততদিনে সব ক'টা অর্কিডই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। শুকনো বলেই কিন্তু আমার আরও ইন্টারেস্টিং লাগছে।'

'আমার লাগছে ডিজগাস্টিং, গা-পাক দিচ্ছে দেখলেই। গায়ে যেন ম্যালেরিয়া লেগে রয়েছে এখনও। পাশেই যেন একটা লাশ পড়ে রয়েছে—দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। খাওয়ার দফারফা হয়ে গেল আমার—এ জিনিসকে সামনে রেখে খাওয়া যায়?'

শুকনো অর্কিডগুলো টেবিলের ফরসা কাপড়ের ওপর রেখে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিল ওয়েদারবার্ন। বোনের বিতৃষ্ণা দেখে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখল জানলার গোবরাটে। ফিরে এসে বসল টেবিলে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল দূরের বিশুদ্ধ কদাকার আকারহীন পিণ্ডের মতো অর্কিডগুচ্ছের পানে।

পরের দিন বিষম ব্যস্ত হল অর্কিড পরিচর্যায়। কাঠকয়লা, শেওলা এবং আরও অনেক উপাদান নিয়ে বাষ্পাচ্ছন্ন হট-হাউসে তন্ময় হয়ে রইল অর্কিডের সেবায়। অর্কিডপ্রেমিকরা জানে, কতরকম রহস্যজনক পন্থায় তরতাজা করে তুলতে হয় বিচিত্র সৌন্দর্যের আকর অর্কিড চারাদের। ওয়েদারবার্নও শিখেছে অনেক কিছু।

সন্ধেবেলা বন্ধুদের ডেকে এনে সোৎসাহে দেখাল মৃতপ্রায় শুষ্ক অর্কিড সংগ্রহ। বারবার বলে গেল একই কথা—অচিরেই এই মড়াদের সে জাগাবে—তখন চিত্তচাঞ্চল্যকর অনেক ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে—প্রত্যাশা তার বিফলে যাবে না।

কিন্তু এত সেবাশুশ্রূষা সত্ত্বেও মরেই রইল বেশ কয়েকটা ভান্দাস আর দেনড্রোবিয়াম। তারপরেই অবশ্য প্রাণের সঞ্চার দেখা গেল অদ্ভুত অর্কিডের মধ্যে। জ্যাম তৈরি নিয়ে ব্যস্ত বোনকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল আশ্চর্য আবিষ্কারটা দেখানোর জন্য।

বললে, 'ওই দেখ কুঁড়ি। দু'দিন পরেই দেখবে কুঁড়ির জায়গায় গোছা গোছা পাতা। আর ওই যে খুদে খুদে কী সব বেরিয়ে রয়েছে, ওগুলো শেকড়, বাতাসের মধ্যে মেলে-ধরা শেকড়।'

বোন বললে, 'জঘন্য। ঠিক যেন সাদা সাদা আঙুল। আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না।'

'কেন লাগছে না?'

'তা তো বলতে পারব না। শুধু মনে হচ্ছে, আঙুলগুলো বেরিয়ে আসছে তোমাকে ক্যাঁক করে ধরবার জন্যে।'

'বলিহারি যাই তোমার মনে-হওয়াকে।'

'আমার পছন্দ-অপছন্দের ওপর খবরদারি করার কোনও ক্ষমতা আমার নেই, যা মনে হল তা-ই বললাম।'

'তবে হ্যাঁ, এরকম বাতাসে মেলে-ধরা শেকড়ওয়ালা অর্কিড জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না,' স্বীকার করে ওয়েদারবার্ন। 'ডগাগুলো কীরকম চ্যাপটা দেখেছ?'

শিউরে উঠে সরে যায় বোন, 'মোটেই ভালো লাগছে না আমার। কেন জানি না বারবার একটা মড়া মানুষের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।'

'কী আশ্চর্য! ঠিক এই অর্কিডটার ওপরেই ব্যাটনের লাশ পড়েছিল, তা জানছ কী করে? অন্য অর্কিডও তো হতে পারে?'

'তুমিই বলেছিলে।'

'আমি আন্দাজে বলেছিলাম।'

'যা-ই বল, ওই কদাকার চেহারা দেখলেই আমার গা শিরশির করছে।'

আহত হল ওয়েদারবার্ন। প্রাণপ্রিয় অর্কিডকে এত ঘেন্না করার কোনও মানে হয়? তা সত্ত্বেও কিন্তু ফুরসত পেলেই অর্কিড সমাচার শুনিয়ে গেল বোনকে, বিশেষ করে অতি কদাকার বিবমিষা-জাগানো অদ্ভুত অর্কিডটার কোনও খবরই বাদ দিলে না।

একদিন বললে, 'অনেক বিস্ময়, অনেক চমক, অনেক অদ্ভুত কাণ্ড জঠরে নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে এই অর্কিডরা। ডারউইন অর্কিড নিয়ে গবেষণা করে বলেছিলেন, মামুলি অর্কিড ফল এমনভাবে গড়া, যাতে এক চারা থেকে আরেক চারায় পরাগরেণু বয়ে নিয়ে যেতে পারে মথ। কিছু অর্কিডের ক্ষেত্রে অবশ্য তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। গর্ভাধান এভাবে সম্ভব হয় না। যেমন ধর, সাইপ্রিসোডিয়াম। গর্ভাধান ঘটানোর মতো কোনও পোকার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। কয়েকটার মধ্যে তো বীজের চিহ্নও দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও তারা বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে গেছে বহাল তবিয়তে।'

'কীভাবে?'

'সরু নল আর শুঁড় দিয়ে। কিন্তু ধাঁধাটা অন্য জায়গায়। ফুলগুলো তাহলে ফোটে কেন?'

'তোমার জানা নেই?

'উঁহু। কে জানে, আমার এই অর্কিডটাও হয়তো অসাধারণ ঠিক সেইভাবেই। ডারউইনের মতো আমারও সাধ যায় গবেষণা করার। এদ্দিন সময় পাইনি—একটা-না-একটা বাগড়া পড়েছে। পাতা মেলে ধরা কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেছে—এসো-না, দেখে যাও।'

বয়ে গেছে বোনের। ঘাড় বেঁকিয়ে সরাসরি জানিয়ে দিলে, অদ্ভুত অর্কিডকে নিয়ে খামকা সময় নষ্ট করতে সে রাজি নয়। কিলবিলে শুঁড়গুলো দেখে ইস্তক দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে তার। এর মধ্যেই প্রতিটা শুঁড় ফুটখানেক লম্বা হয়ে গেছে দেখে এসেছে। দেখেই লোমটোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। বীভৎস প্রাণীবিশেষের ভয়াবহ শুঁড়ের কথাই মনে হয়েছে বারবার। স্বপ্নে দেখেছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে প্রতিটা শুঁড় বেড়ে উঠে লকলক করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অতএব, ওই বিদঘুটে গাছকে ইহজীবনে আর দেখতে সে রাজি নয়।

কী আর করা যায়। বেচারি ওয়েদারবার্ন একা একাই তারিফ করে গেল অদ্ভুত অর্কিডের আশ্চর্য শোভার। চকচকে গাঢ় সবুজের ওপর ঘন লালের ছিটে আর ডোরা এমনভাবে নেমে এসেছে তলার দিকে যে, অবাক না হয়ে নাকি থাকা যায় না। এরকম বাহারে পাতা জীবনে সে দেখেনি। গাছটাকে রেখেছিল একটা নিচু বেঞ্চির ওপর। কাছেই রয়েছে একটা থার্মোমিটার। টবের গা ঘেঁষে একটা জলের কল। টপটপ করে সমানে জল পড়ছে গরম জলের পাইপে—বাষ্প ভরিয়ে রেখেছে বদ্ধ বাতাসকে। প্রতিটা অপরাহ্ণ এহেন পরিবেশে কাটায় ওয়েদারবার্ন—অদ্ভুত অর্কিডের আশ্চর্য ফুল ফোটা নিয়ে কত বিচিত্র সম্ভাবনার কথাই না ভাবে আপন মনে।

অবশেষে একদিন স্বপ্ন সফল হল তার—ফুল ধরল গাছে। কাচের ঘরে ঢুকেই টের পেয়েছিল, প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে এতদিনে। 'প্যালেনিফিস লোয়ি' অর্কিড কোণ

জুড়ে থাকায় প্রাণপ্রিয় অর্কিডকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আশ্চর্য একটা সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। অত্যন্ত কড়া অথচ মিষ্টি একটা সুবাস। ছোট্ট, বহু অর্কিড বোঝাই সবুজ ঘরের সব গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে সেই সুগন্ধ।

তৎক্ষণাৎ হনহন করে প্রায় ছুটে গিয়েছিল অদ্ভুত অর্কিডের দিকে। চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল তিন-তিনটে বিরাট ফুল দেখে। এত গন্ধ বেরচ্ছে এই তিনটে ফুল থেকেই। তনু-মন যেন অবশ করে আনছে মাতাল-করা সেই সুবাস। থ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল টবের সামনে দুই চোখে বিপুল প্রশংসা নিয়ে।

সত্যিই অপূর্ব। সাদা ফুল। পাপড়িগুলোয় সোনালি-কমলা ডোরা। তলার দিকে ছোট পাতা কুণ্ডলী পাকিয়ে সূক্ষ্ম জটিল খোঁচার মতো ঠেলে রয়েছে বাইরের দিকে। অত্যাশ্চর্য নীলচে-বেগুনি রঙে এসে মিশেছে সোনা-সোনা রং। দেখেই বোঝে ওয়েদারবার্ন বাস্তবিকই এ অর্কিড একেবারেই নতুন ধরনের একটা মহাজাতি। আর সে কী সুবাস! অসহ্য! গুমট বাতাসে আতীব্র সেই সুগন্ধ মাথা ঘুরিয়ে দেয় ওয়েদারবার্নের। তিন-তিনটে ফুল যেন দুলে দুলে ওঠে চোখের সামনে।

থার্মোমিটারটা আছে কি না দেখবার জন্যে এক পা এগতেই আচমকা যেন মাটি দুলে উঠেছিল পায়ের তলায়। পুরো সবুজ ঘরটাই যেন চরকিপাক দিতে শুরু করেছিল চোখের সামনে। ইট-বাঁধানো মেঝের প্রতিটা ইট যেন তাথই তাথই নাচ আরম্ভ করে দিয়েছিল আবিল দৃষ্টিকে আবিলতর করে দিয়ে। পরক্ষণেই সাদা ফুল, সবুজ পাতা, গোটা সবুজ ঘরটা বোঁ করে ডিগবাজি খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল শূন্যে—জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল অর্কিডপ্রেমিক ওয়েদারবার্ন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ চা তৈরি করে মিনিট দশেক হাপিত্যেশ করে বসে থাকার পরেও ভাইকে না আসতে দেখে গজগজ করতে করতে সবুজ ঘরে এসেছিল বোন।

দরজা খুলে ডেকেছিল ভাইকে, জবাব পায়নি। বাতাস ভারী হয়েছে, লক্ষ করেছিল। নাকে ভেসে এসেছিল কড়া সুগন্ধ। তারপরেই চোখে পড়েছিল, গরম জলের পাইপের ফাঁকে কী যেন একটা পড়ে রয়েছে ইটের ওপর। মিনিটখানেক নড়তে পারেনি বোন। অদ্ভুত অর্কিডের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ওয়েদারবার্ন। শুঁড়ের মতো বাতাসে মেলে-ধরা শেকড়গুলো এখন আর হাওয়ায় দুলছে না—দল বেঁধে একগোছা দড়ির মতো সেঁটে রয়েছে ভাইয়ের থুতনি, ঘাড় আর হাতের ওপর। প্রতিটা শুঁড়ের ডগা চেপে বসে রয়েছে চামড়ায়।
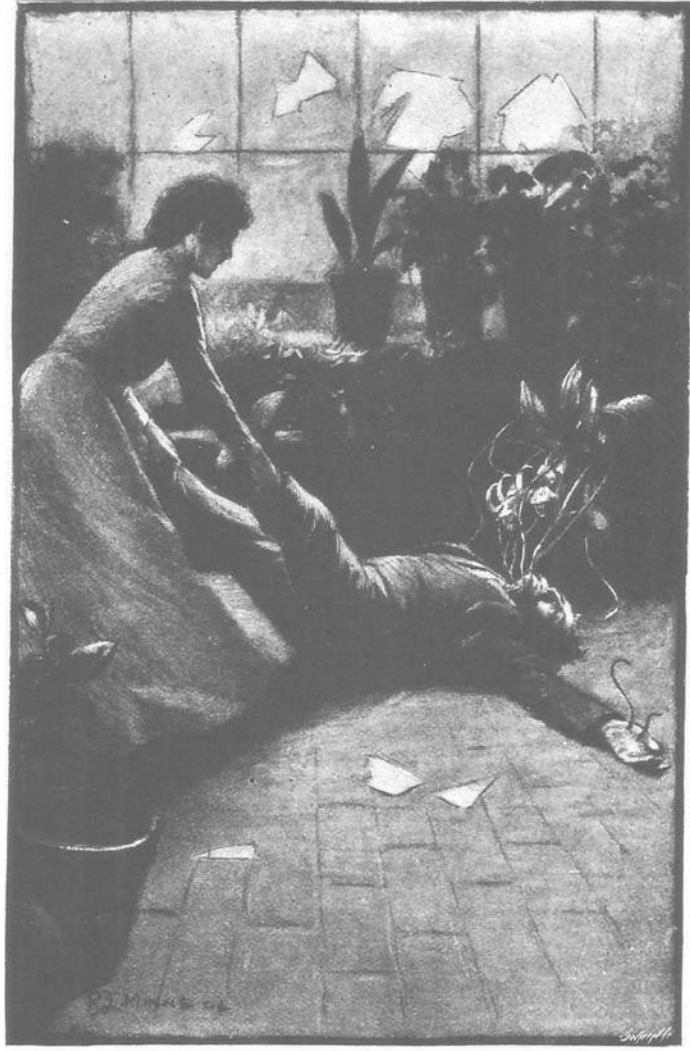
চিত্র ৫.১ অদ্ভুত অর্কিডের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ওয়েদারবার্ন।

প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি বোন। তারপরেই দেখেছিল, পুষ্ট একটা শুঁড়ের তলা থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্তের সরু ধারা নামছে গাল বেয়ে।

অস্ফুট চিৎকার করে দৌড়ে গিয়েছিল বোন। জোঁকের মতো রক্তচোষা শেকড়গুলোর খপ্পর থেকে টেনেহিঁচড়ে মুক্ত করতে চেয়েছিল ভাইকে। ছিঁড়ে ফেলেছিল দুটো শুঁড়। টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়েছিল শুঁড়ের ভেতরকার থলি থেকে।

তারপরেই উৎকট হয়ে উঠেছিল কড়া সুগন্ধ। সে কী গন্ধ! সুবাস যে এত মিষ্টি অথচ এমন সংজ্ঞালোপকারী হয়—তা জানা ছিল না বোনের। বেশ বুঝেছিল, তার চৈতন্য কেড়ে নিচ্ছে ওই আশ্চর্য মিষ্টি ভয়ানক গন্ধ। মাথা ঘুরে উঠেছিল বনবন করে। আবছাভাবে দেখেছিল, রাশি রাশি শুঁড় পরম লোভীর মতো ভাইয়ের ওপর

সেঁটে বসে রয়েছে তো রয়েছেই—শিথিল হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাজা উষ্ণ রুধির নিশ্চয় সেকেন্ডে সেকেন্ডে চালান হয়ে যাচ্ছে জীবিত দেহ থেকে কদাকার বিকট ওই উদ্ভিদের মধ্যে। এ অবস্থায় জ্ঞান হারালে তো চলবে না—কিছুতেই না। ভাইকে ফেলে রেখেই দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেবে নিয়েছিল, এরপর কী করতে হবে। বাইরে থেকে একটা ফুলের টব তুলে নিয়ে আছাড় মেরেছিল কাচের জানলায়। ফের ঢুকেছিল সবুজ ঘরে। পাগলের মতো নিস্পন্দ ওয়েদারবার্নের দেহ ধরে টান মারতেই হুড়মুড় করে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়েছিল অদ্ভুত অর্কিডের টব। চুরমার হয়ে গেলেও টবের ভয়াবহ উদ্ভিদটার একটা শুঁড়ও আলগা হয়নি ভাইয়ের থুতনি, ঘাড়, গাল থেকে। মরণ-কামড় একেই বলে। ছিনেজোঁক যেন। ক্ষিপ্তের মতো শেকড় আর টব সমেত ভাইকে টেনে এনেছিল বাইরে।

তারপর একটা একটা করে রক্তচোষা শেকড় ছিঁড়েছিল গা থেকে। মিনিটখানেকের মধ্যেই শেকড়মুক্ত দেহটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মূর্তিমান বিভীষিকার নাগালের বাইরে।

দেখেছিল, ডজনখানেক চাকা চাকা দগদগে ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে ভাইয়ের থুতনি, ঘাড় আর গলা বেয়ে। সমস্ত দেহটা যেন রক্তশূন্য—সাদা! ঠিক এই সময়ে ঠিকে কাজের লোকটা বাগানে ঢুকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ভাঙা কাচ আর ওয়েদারবার্নের রক্ত-মাখা অসাড় দেহ দেখে। তাকে দিয়েই জল আনিয়েছিল বোন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে রক্ত মুছে দিয়েছিল ভাইয়ের মুখ থেকে। 'ব্যাপার কী?' চোখ খুলেই ফের বন্ধ করে ফেলে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল ওয়েদারবার্ন।

লোকটাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিল বোন। ইতিমধ্যে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ভাই—একটু পরেই ফের জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিঁ-চিঁ করে জানতে চেয়েছিল, ব্যাপারটা কী? এভাবে বাগানের মধ্যে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে কেন? বোনই বা কাঁদছে কেন?

'হট-হাউসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি।'

'অর্কিডটা?'

'তার ব্যবস্থা আমি করছি।'

ডাক্তার এসে ওয়েদারবার্নকে নিয়ে গেল ওপরতলায়। ব্র্যান্ডি আর মাংসের স্যুপ খাইয়ে তাকে চাঙ্গা করার পর বোন এল হট-হাউসে—সঙ্গে নিয়ে এল ডাক্তারকে।

ভাঙা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস এসে কড়া এবং ভয়ানক মিষ্টি সেই গন্ধকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে বললেই চলে। ছেঁড়া শেকড়গুলো যেখানে যেখানে পড়ে, সেইসব জায়গায় ইটের ওপর জমাট কালো রক্ত। বেঞ্চি থেকে টব উলটে পড়ায় ডাঁটি ভেঙে

গেছে অর্কিড চারার। নেতিয়ে পড়েছে ফুল তিনটে। বাদামী হয়ে আসছে পাপড়ির কিনারা। সেইদিকে এক পা এগিয়েছিল ডাক্তার। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একটা বাতাসে মেলে-ধরা শেকড়কে তখনও থিরথির করে কাঁপতে দেখে।

পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল, মেঝের ওপরেই পড়ে আছে অদ্ভুত অর্কিড। বিবর্ণ কালচে। পচন ধরেছে। হাওয়ায় দমাদম করে আছড়ে পড়ছে দরজা। শিউরে শিউরে উঠছে ওয়েদারবার্নের বিপুল অর্কিড-সংগ্রহ।

আর ওয়েদারবার্ন? অতগুলো ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় কাহিল হয়ে পড়েছিল খুবই—তার বেশি কিছু নয়। বহাল তবিয়তে শুয়ে ছিল ওপরতলায়। মনে খুব ফুর্তি—অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারের প্রসাদে বুক দশ হাত!
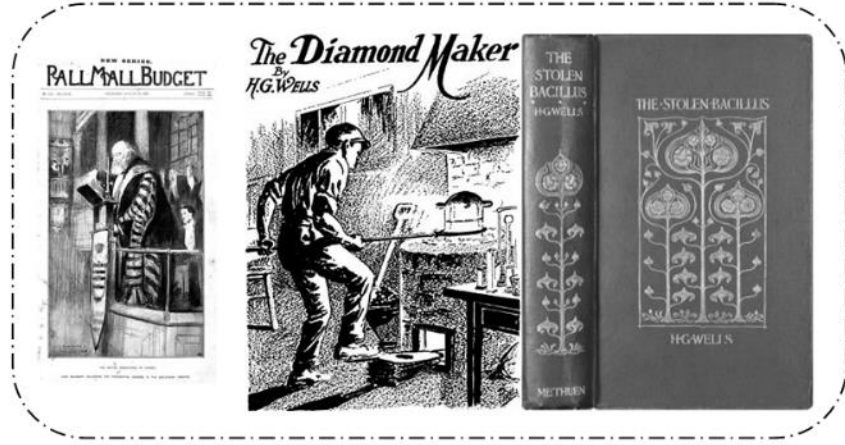
‘The Diamond Maker’ ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে ‘Pall Mall Budget’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে লন্ডনের ‘Methuen & Co.’ থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের প্রথম ছোটগল্পের সংকলন ‘The Stolen Bacillus and Other Incidents’-তে গল্পটি স্থান পায়।

হীরে কারিগর
(The Diamond Maker)

চ্যান্সারি লেনে কাজে আটকে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাত ন'টা নাগাদ মাথা টিপটিপ করতে লাগল। আমোদ-আহ্লাদ অথবা নতুন কাজ, কোনওটাই আর ভালো লাগছিল না। তাই এসে দাঁড়িয়েছিলাম নদীর পাড়ে—ব্রিজের ওপর। প্রশান্ত রাত। নদীর দু'পাড়ে ঝলমল করছে অজস্র রঙের আলো। কালো ময়লা জলের ওপর হরেক রঙের প্রতিফলন। লাল, জ্বলন্ত কমলা, গ্যাস-হলুদ, বিদ্যুৎ-সাদা, বিবিধ ছায়ামিশ্রিত অবস্থায় রকমারি রং ফুটিয়ে তুলেছে দু'পাড়ে। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশের বুকে ওয়েস্টমিনস্টারের ধূসর চূড়া। নদীর জল প্রায় নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হচ্ছে মৃদু ছলছলাত শব্দে, ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে জলের ওপরকার রঙের প্রতিবিম্ব।

পাশেই ধ্বনিত হল একটা কণ্ঠস্বর, 'চমৎকার রাত।'

মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম বক্তাকে। আমার পাশেই রেলিং-এ ভর দিয়ে চেয়ে আছে মরণ-কালো জলধারার দিকে। দেখা যাচ্ছে তার মুখের পার্শ্বরেখা। মার্জিত মুখ। অ-সুদর্শন নয়, কিন্তু মেচেতা-পড়া। বিলক্ষণ বিবর্ণ। কোটের কলার উঁচু-করা। পোশাক আর মুখ দেখলেই বোঝা যায় সমাজে তার স্থান খুব উঁচুতে নয়। নিশ্চয় ভিক্ষে চাইবে গায়ে পড়ে আলাপ করার পর।

তাকিয়ে ছিলাম কৌতূহলী চোখে। ভিক্ষুক দু'শ্রেণির হয়। এক শ্রেণির হয় গল্পবাজ, কথার ধোকড়। বোলচাল শুনিয়ে হাত পাতে, এক পেট খাওয়ার পয়সা পেলেই খুশি। আর-এক শ্রেণির মুখে খই ফোটে না, নিজের মতো হাত পেতেই খালাস। এই লোকটার কপালে আর চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ লক্ষ করে আঁচ করতে পারলাম, ভিক্ষাবৃত্তি ঘটবে কোন পথে।

বললাম, 'খুবই চমৎকার, তবে আপনার আর আমার পক্ষে নয়, অন্তত এই জায়গায়।'

নদীর দিকেই চোখ রেখে সে বলল, 'তা নয়। তবে এই মুহূর্তে বড় ভালো লাগছে।'

একটু থামল। ফের বললে, 'লন্ডনের কাজকারবার, উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা নিয়ে সারাদিন কাটানোর পর মাথাটাকে জিরেন দেওয়ার পক্ষে এমন খাসা জায়গা আর নেই। দুনিয়াটাই ধকল সওয়ার জায়গা, উদয়াস্ত মেহনত করতেই হবে, নইলে ঠাঁই নেই কোথাও। ধকল যখন ক্লান্তি আনে দেহে-মনে, তখনই মানুষ ছুটে আসে এমন নিবিড় শান্তির জায়গায়, যেমন আপনি এসেছেন। কিন্তু আমার মতো ক্লান্ত আপনি নন। আমার মতো মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল অবস্থা আপন হয়নি। আমার মতো হেঁটে হেঁটে পায়ের তলায় ফোসকা তুলে ফেলেননি। আমার মতো মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষকে বেদম করে ফেলেননি। মাঝে মাঝে মনে হয় কেন এত খেটে মরছি? লাভ কী? একখানা মোমবাতির দামও উঠবে কি না সন্দেহ। ইচ্ছে হয় নাম, যশ, প্রতিপত্তি, সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে মামুলি কারবার নিয়ে থাকি। কিন্তু পারি না। কেন জানেন? উচ্চাশা যদি ত্যাগ করি, শেষ জীবনটা অনুতাপে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাব।'

সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। এরকম দারিদ্র-বিশুষ্ক মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। শতচ্ছিন্ন পোশাক রীতিমতো ময়লা। দাড়িগোঁফ কামানোর পয়সা জোটেনি। চুলে চিরুনি পড়েনি। দিন সাতেক ডাস্টবিনে শুয়ে ছিল যেন। কিন্তু লম্বা লম্বা কথা কী! বিশাল কারবার চালিয়ে হেদিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে হল, অট্টহেসে থামিয়ে দিই বোলচাল।

ব্যঙ্গের সরে তাই বলেছিলাম, 'উচ্চাশা আর সামাজিক প্রতিপত্তি মানুষকে খাটায় ঠিকই, কিন্তু ক্ষতিপূরণও করে দেয়। প্রভাব, সৎ কাজের আনন্দ, গরিবদের সাহায্য করার সুযোগ, মাতব্বরির সুবিধে—'

কথাগুলো বলবার সময়ে একটু যে অনুতাপ হয়নি তা নয়। দারিদ্রকে এভাবে কশাঘাত করা কুরুচির পরিচয়। কিছু লোকটার চেহারা আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথার বৈষম্য তাতিয়ে তুলেছিল আমাকে।

সে কিন্তু শান্ত-সংযত মুখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার পানে।

তারপর বললে, 'ভুল করেছি আপনাকে বিশ্বাস করাতে গিয়ে। কেউ করেনি, আপনি তো করবেনই না। পুরো ব্যাপারটা এমনই উদ্ভট যে, গোড়া থেকে যদি শোনেন, হেসে খুন হবেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই বলব আপনাকে—নিজের নিরাপত্তার জন্যেই বলব। বিশ্বাস করলেই তো বিপদে ফেলবেন। সত্যিই বিরাট

কারবার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছি আমি—সে যে কত বড় ব্যাবসা, কল্পনাও করতে পারবেন না। এই কারবারই কিন্তু এখন ঝামেলায় ফেলেছে আমাকে। খুলেই বলি... আমি হীরে বানাই।'

'বেকার রয়েছেন মনে হচ্ছে?'

সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে পড়ে আমার এই টিটকিরির জবাবে—'দোহাই আপনার, আর খোঁচা মারবেন না। অবিশ্বাসের হাসি আর সহ্য করতে পারছি না।' বলতে বলতে ঘচাঘচ করে খুলে ফেলল কোটের বোতাম। সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো একটা ক্যানভাসের থলি টেনে নামিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে। টেনে বার করল একটা বাদামি নুড়ি। আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে চাপা গলায়, 'জানি না এ জিনিস চেনবার বিদ্যে আপনার আছে কি না। দেখুন, দেখুন।'

বছরখানেক আগে হাতে একটু সময় পেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। লন্ডন সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলাম। পদার্থবিজ্ঞান আর খনিজবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি ছিল সেই কারণেই। বাদামি নুড়ির মতো বস্তুকে হাতের তেলোয় নিয়ে দেখেই খটকা লাগল এই বিদ্যেটুকু জানা ছিল বলেই। জিনিসটাকে গাঢ় বর্ণের আকাটা হীরের মতোই দেখতে। কিন্তু বেজায় বড় হীরে। আমার এই বুড়ো আঙুলের মতো বিরাট। উলটে-পালটে দেখলাম, রত্নের রাজা হীরের যেমন ছ'কোনা আকৃতি থাকে, নুড়িপাথরটার আকৃতিও হুবহু তা-ই। গোলাকার মুখগুলোও অবিকল হীরের মুখের মতো। পেনশিল-কাটা ছুরি ছিল পকেটে। বার করলাম। ধারালো ফলা দিয়ে কাটতে গেলাম—আঁচড় পড়ল না। গ্যাস-ল্যাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে নুড়িপাথর দিয়ে কবজি-ঘড়ির কাঁচে আঁচড় দিতেই কাচ কেটে গেল সহজেই। কৌতূহল মাথাচাড়া দিল মগজের মধ্যে তৎক্ষণাৎ।

চোখ তুলে বললাম, 'হীরে বলেই তো মনে হচ্ছে। হীরেই যদি হয়, তাহলে বলব রাজা-হীরে। পেলেন কোথায়?'

'বললাম তো, নিজে বানিয়েছি। দিন, আর দেখতে হবে না।' ত্রস্তে অদ্ভুত হীরেটাকে থলিতে পাচার করে কোটের বোতাম এঁটে দিল হীরে কারখানার মালিক। পরক্ষণেই বললে ব্যগ্র চাপা কণ্ঠে, 'একশো পাউন্ড পেলেই বেচে দেব, এখুনি।'

শুনেই আবার ফিরে এল মনের সন্দেহ। কে জানে, হীরের মতো দেখতে হলেও জিনিসটা আসলে হয়তো একতাল কোরানডাম ছাড়া আর কিছুই নয়। হীরের মতোই প্রায় কঠিন বস্তু এই কোরানডাম দিয়ে হীরেপ্রেমিকদের ঠকানোর কত কাহিনি শুনেছি। কোরানডাম যদি না-ও হয়, সাচ্চা হীরে কেউ মাত্র একশো পাউন্ডে বেচে? তা ছাড়া পেল্লায় এই হীরে এই হাঘরেটার কাছে এল কীভাবে?

নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম তার চোখের দিকে। দেখলাম, নির্ভেজাল ব্যগ্রতার রোশনাই হীরের মতোই ঝকমক করছে চোখে। জহুরি যেমন জহর চেনে, আমিও তেমনি ওই চাহনি দেখে নিমেষে বুঝলাম জোচ্চোর নয়, রাতের ভবঘুরে, খাঁটি হীরেই বেচতে চায়। কিন্তু কেনবার মতো পয়সা কই পকেটে? গরিব মানুষ আমি। একশো পাউন্ড বার করে পথে বসব নাকি? তা ছাড়া গ্যাস লাইটের আলোয় ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা এক হাঘরের কাছ থেকে এত দামি হীরে কেউ কেনে? শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে?

অথচ, খাঁটি হীরেই দেখলাম এইমাত্র। কয়েক হাজার পাউন্ড দাম হওয়া উচিত। তা-ই যদি হয়, কোনও রত্ন-পুস্তকে পেল্লায় সাইজের এই হীরের কথা তো চোখে পড়েনি আমার। কেন? আবার জাল হীরের রাশি রাশি গল্প ভিড় করে এল মাথার মধ্যে। হীরে কেনার চিন্তা শিকেয় তুলে রাখলাম তৎক্ষণাৎ।

শুধালাম, 'পেলেন কোথায় এ জিনিস?'

'বানিয়েছি।'

নকল হীরে একজনই বানায়। তার নাম জানি। সে হীরেও আমি দেখেছি। কিন্তু তা অনেক ছোট, এত বিরাট নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিলাম, কথাটা বিশ্বাস হয়নি আমার।

স্থির চোখে সে দেখছিল আমার মুখের চিন্তা। এখন বললে, 'হীরের খবর অনেক রাখেন মনে হচ্ছে। আমার খবরটাও তাহলে শুনে রাখুন। শুনলে হয়তো কেনবার সাধ হবে।' নদীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে পকেটে দু'হাত পুরে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাতের আগন্তুক, 'শোনবার পরেও যে আপনার বিশ্বাস হবে না একবর্ণও, তা জেনেও সব বলব আপনাকে।'

একটু বিরতি দিয়ে আত্মকথা শুরু করেছিল মূর্তিমান রহস্য সেই অচেনা মানুষটা। সঙ্গে সঙ্গে পালটে গিয়েছিল কণ্ঠস্বর। এতক্ষণ গলার আওয়াজে ক্ষীণভাবে জড়িয়ে ছিল হাঘরেদের অমার্জিত সুর। এখন মনে হল যেন শিক্ষিত মানুষ কথা বলে যাচ্ছে মেপে মেপে—শব্দচয়ন এবং উচ্চারণের মধ্যে বৈদগ্ধ্য আর পাণ্ডিত্য উজ্জ্বল হীরকের মতোই দ্যুতি বিকিরণ করে চলেছে।

'সঠিক উপাদানের মিশ্রণ-প্রবাহে কার্বন ছিটিয়ে দিয়ে সঠিক চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই হীরে তৈরি করা যায়। কার্বন বেরিয়ে আসে ক্রিস্টালের আকারে—কালো সিসে বা কাঠকয়লা গুঁড়োর আকারে নয়, ছোট ছোট হীরের আকারে। বহু বছর ধরে এইটুকুই জেনে এসেছে কেমিস্টরা। মিশ্রণ-প্রবাহের সঠিক উপাদান কী হওয়া উচিত, কতখানি চাপ দেওয়া উচিত উৎকৃষ্ট হীরে বানানোর জন্যে, তা কিন্তু কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি, তাই কেমিস্টদের হাতে বানানো হীরে জহুরির কাছে দাম

পায়নি, গয়নায় তার ঠাঁই হয়নি... পুঁচকে, কালচে কার্বনের ডেলার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। সেরা হীরে তৈরির এই মূল রহস্যটা নিয়ে আমি কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছি সারাজীবন। জীবনটাকেই ব্যয় করছি বলতে পারেন এর পেছনে।

'কাজ শুরু করেছিলাম সতেরো বছর বয়সে। এখন আমার বয়স বত্রিশ। তখন মনে হয়েছিল দশ-বিশ বছরের মেহনত কিছুই নয়। মনের ভাবনাকে কাজে রূপ দেওয়াটাই একমাত্র ধ্যানধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, এত মেহনতের দাম একখানা মোমবাতিও নয়। অথচ দেখুন, রহস্যের চাবিকাঠি যদি হাতে এসে যায় কয়লার দামে হীরে বিকোবার আগে, তাহলে কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হয়ে বসা যাবে রাতারাতি।

'একুশ বছর বয়সে হাতে ছিল হাজারখানেক পাউন্ড। ভেবেছিলাম, ছেলে পড়িয়ে আর এই মূলধন নিয়ে চালিয়ে যেতে পারব গবেষণা। দু'-এক বছর দিব্যি চালিয়েও গেলাম—বেশির ভাগই বার্লিনে। তারপর শুরু হল গবেষণা গোপন রাখার ঝামেলা। আইডিয়াটা একবার ফাঁস হয়ে গেলেই তো লোকে ছেঁকে ধরবে আমাকে। এমন একখানা আইডিয়া মাথায় আনার মতো বুদ্ধিমান চেহারাখানাও দেখানো উচিত নয় পাঁচজনের কাছে। নকল হীরে টন-টন বানাতে পারি, এ কথা একবার জানাজানি হয়ে গেলে গবেষণা শিকেয় উঠবে দু'দিনেই। তাই কাজ চালাতে হল চুপিসারে—কাকপক্ষীকে না জানিয়ে। প্রথমদিকে নিজস্ব ছোট্ট ল্যাবরেটরি ছিল। হাতের পয়সা ফুরিয়ে আসার পর কেন্টিসটাউনে আমার জঘন্য নেড়া ঘরের মধ্যেই গবেষণা চালিয়ে গেলাম। যন্ত্রপাতির পাশে মেঝের ওপর লেপ-তোশক নিয়ে রাত কাটিয়েছি বছরের পর বছর। টাকা উড়তে লাগল খোলামকুচির মতো। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট গায়ে মাখিনি—কিপটেমি করিনি কেবল যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে। ছেলে পড়িয়ে দু'পয়সা রোজগার করাটাও দেখলাম এক ঝকমারি ব্যাপার। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি আমার নেই। কেমিস্ট্রি ছাড়া আর কোনও শাস্ত্র জানা নেই। তার ওপর, ছেলে-পড়ানো আমার ধাতে সয় না। সবচেয়ে বড় অসুবিধে, সময় নষ্ট। বেশ খানিকটা দামি সময় খরচ হয়ে যেতে লাগল গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে গিয়ে। এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমার লক্ষ্যের দিকে তিল তিল করে। তিন বছর আগে মিশ্রণ-প্রবাহের উপাদান বার করলাম, কতখানি চাপ দেওয়া দরকার, তা-ও বার করলাম। তারপর সেই মিশ্রণ-প্রবাহের সঙ্গে হিসেবমতো কার্বন উপাদান মিশিয়ে মুখবন্ধ বন্দুকের চোঙার মধ্যে ঢুকিয়ে, জল ভরে টাইট করে এঁটে গরম করতে লাগলাম।

'খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলেন,' হীরের কারিগর একটু থামতেই বলেছিলাম আমি।

'ঠিক কথা। ঝুঁকি না নিলে কিছু পাওয়াও যায় না। বিস্ফোরণ ঘটেছিল গান ব্যারেলেও। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল ঘরের সব ক'টা জানলা আর বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। তা হোক। ফলও পেলাম কিছু। হীরের কিছু গুঁড়ো। গলিত উপাদান-মিশ্রণকে সঠিক চাপের মধ্যে কীভাবে রাখা যায়, এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মাথায় এসে গেল সমাধানটা। প্যারিসে দব্রে গবেষণা করেছিলেন পেঁচিয়ে-আঁটা ইস্পাতের চোঙার মধ্যে ডিনামাইট ফাটিয়ে। সাংঘাতিক সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় কঠিন পাথর কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছিল—চোঙা কিন্তু ফেটে উড়ে যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরের খনিতে যেরকম কাদা দেখা যায়—এ কাদাও প্রায় সেইরকমই। পুঁজিপাটা তখন শূন্য। তা সত্ত্বেও অতি কষ্টে ওর নকশা অনুযায়ী ইস্পাতের চোঙা জোগাড় করলাম। বিস্ফোরক আর আমার যাবতীয় উপাদান ঠাসলাম তার ভেতর। গনগনে চুল্লি জ্বাললাম ঘরের মধ্যে। চোঙা চাপিয়ে দিলাম জ্বলন্ত চুল্লিতে। দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম হাওয়া খেতে।'

হো হো করে হেসে উঠেছিলাম বলার ভঙ্গিমা শুনে। এমন সহজভাবে শেষ কথাটা বলে গেল যেন আগুনের আঁচে বিস্ফোরক ভরতি সিলিন্ডার চাপিয়ে হাওয়া খেতে যাওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ—যেন কোনও ব্যাপারই নয়—রান্না চাপিয়ে গেল যেন কড়ায়।

হাসতে হাসতেই বলেছিলাম, 'সে কী! বাড়ি উড়ে যাবে যে! আর কেউ ছিল না বাড়িতে?'

'ছিল বইকী। নিচের তলায় ফলওয়ালা এক ফ্যামিলি, পাশের ঘরে চিঠি দেখিয়ে ভিক্ষে চাওয়ার একটি ভিখিরি, ওপরতলায় দু'জন ফুলওয়ালি। ব্যাপারটা হঠকারিতা সন্দেহ নেই। হয়তো তখন কেউ কেউ বাড়ির বাইরেও গিয়েছিল।

'ফিরে এসে দেখি, যেখানকার জিনিস সেখানেই রয়েছে—তেতে সাদা অঙ্গারের ওপর রাখা চোঙা ফেটে উড়ে যায়নি। বিস্ফোরক বাড়ি উড়িয়ে দেয়নি—সিলিন্ডার অটুট। সমস্যায় পড়লাম তারপরেই, বড় জবর সমস্যা। জানেন তো, ক্রিস্টালকে দানা বাঁধতে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার। হড়বড় করলে ক্রিস্টাল হবে আকারে ছোট, অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে তবেই হবে বড়। ঠিক করলাম, আগুনের আঁচে দু'বছর ফেলে রাখব চোঙা—আঁচ কমাব একটু একটু করে। পকেট তখন গড়ের মাঠ—কানাকড়িও নেই। পেটে খাবার নেই, ঘরে কয়লা নেই—অথচ দু'-দুটো বছর আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। সেই সঙ্গে জুটিয়ে যেতে হবে ঘরের ভাড়া।

'পয়সার ধান্দায় হরেকরকম কাজ করতে হয়েছে এই সময়ে। লম্বা ফিরিস্তি। সব বলতে চাই না। এদিকে হীরে তৈরি হয়ে চলেছে, ওদিকে কখনও খবরের

কাগজ ফিরি করছি, কখনও ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছি, কখনও গাড়ির দরজা খুলে ধরে হাত পাতছি, বেশ কয়েক হপ্তা খামের ওপর ঠিকানা লিখে পেটের খাবার আর চুল্লির কয়লা কিনেছি। কবরখানায় মাটি নিয়ে যাওয়ার কাজও করেছি হাতগাড়ি ঠেলে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে খদ্দের ডাকতাম। একবার তো ঝাড়া একটা হপ্তা কোনও কাজ না পেয়ে স্রেফ ভিক্ষে করে কাটিয়েছি। সেই সময়ে একজনের ছ'পেনি ছুড়ে দেওয়ার ঘটনাটা জীবনে ভুলব না। দাক্ষিণ্যের অহংকার যে কী জিনিস, তা সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। প্রতিটি পাইপয়সা খরচ করতাম আগে কয়লা কিনতে খিদে চেপে রেখে।

'শেষকালে ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। তিন হপ্তা আগে আগুন নিবিয়ে দিলাম, আর কয়লা দিলাম না। সিলিন্ডার টেনে এনে প্যাঁচ খুলতে গিয়ে হাত ঝলসে ফেললাম। বাটালি দিয়ে চেঁচে ভেতর থেকে বার করলাম ঝুরঝুরে লাভার মতো বস্তু। লোহার পাতে রেখে গুঁড়ালাম হাতুড়ি মেরে, পেলাম তিনটে বড় আর পাঁচটা ছোট হীরে। মেঝের ওপর বসে যখন হাতুড়ি পিটছি, তখন দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে মাতাল প্রতিবেশী নোংরা হেসে বলেছিল, "রত্ন তৈরি হচ্ছে বুঝি?" মদে চুরচুর অবস্থা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বার করে নিয়েছিলাম পেট থেকে। শয়তানটা থানায় খবর দিয়ে এসেছে। পুলিশ এল বলে। লাফিয়ে কলার খামচে ধরে ঘুসি মেরে তাকে শুইয়ে দিয়ে, হীরেগুলো শুধু পকেটে পুরে হাওয়া গেলাম তৎক্ষণাৎ। পুলিশ এল বলে —অ্যানার্কিস্ট পাকড়াও করতে পারলে আর কিছু যারা চায় না, তাদের কোনওরকম সুযোগ দেওয়াও যায় না। সেইদিনই সন্ধের খবরের কাগজে আমার আস্তানাকে 'কেন্টিস বোমার কারখানা' বলা হয়েছিল ফলাও করে। এখন কী ফাঁপরে পড়েছি দেখুন। এমন মায়া পড়ে গেছে হীরে ক'টার ওপর, পয়সার বিনিময়েও কাছছাড়া করতে প্রাণ চায় না। কিন্তু তা-ও এখন করতে হচ্ছে, পেটের জ্বালা এমন জ্বালা। 'কিন্তু যেখানেই যাই, সেখানেই সন্দেহ, সেখানেই জোচ্চুরি, সেখানেই গা-জোয়ারি। খুব নামকরা এক জহুরির দোকানে গেলাম। আমাকে বসতে বলে ফিসফিস করে কেরানিকে হুকুম দিলে পুলিশ ডেকে আনতে। আর কি বসি সেখানে? চোরাই মাল কেনাবেচা করে এমন একজনের কাছে গিয়ে পড়লাম আরও ঝামেলায়। একটা হীরে হাতে নিয়েই হাঁকিয়ে দিলে আমাকে। সে কী হুমকি! ফের যদি হীরের জন্যে ওমুখো হই তো আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। কয়েক লাখ পাউন্ড দামের হীরে বোঝাই থলি গলায় ঝুলিয়ে টো-টো করছি রাস্তায়—না আছে পেটে খাবার, না আছে মাথা গোঁজবার আস্তানা। আপনাকে দেখেই কী জানি কেন মনে হল, আর যা-ই করুন, ফাঁসিয়ে অন্তত দেবেন না। কাউকে যা বলিনি, তার সবই তা-ই বললাম

আপনাকে। খুব কষ্টে দিন কাটছে। আপনার মুখ দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই প্রাণ খুলে বলবার ভরসা পেলাম। এবার বলুন, কী করবেন।'

চিত্র ৬.১ লাফিয়ে কলার খামচে ধরে ঘুসি মেরে তাকে শুইয়ে দিয়ে, হীরেগুলো শুধু পকেটে পুরে হাওয়া গেলাম তৎক্ষণাৎ।

বলে, সোজা আমার দিকে চেয়ে রইল সে।

আমি বললাম, 'দেখুন মশায়, এই পরিস্থিতিতে একখানা হীরে কেনাও আমরা পক্ষে বাতুলতা। সবচেয়ে বড় অসুবিধে, পকেটের মধ্যে হাজার হাজার পাউন্ড নিয়ে রাস্তায় ঘোরার মতো বড়লোক আমি নই। তবে হ্যাঁ, আপনার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। এক কাজ করতে পারেন। কাল আসুন আমার অফিসে।'

ধারালো গলায় তক্ষুনি বললে সে, ‘চোর ঠাওরেছেন মনে হচ্ছে আমাকে? খবর দিয়ে রাখবেন পুলিশকে? না মশাই, ফাঁদে পা দিতে চাই না।’

‘না, না, চোরাই মাল নয়। চোর আপনি নন, এ বিশ্বাসটা যেভাবেই হোক, এসে গেছে মনের মধ্যে। তাহলে বরং যখন খুশি আসুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার দরকার নেই।’

আমার কার্ড দিলাম, সেই সঙ্গে একটা আধ ক্রাউন।

বললাম, ‘রাখুন, কাজে লাগবে।’

‘সুদ সমেত ফিরিয়ে দেব দেনা। ঋণী থাকব না, এইটুকু শুধু বলে রাখলাম। সুদের পরিমাণটা শুনলে কিন্তু চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। যাক গে সে কথা, যা বললাম, তা পাঁচকান করবেন না আশা করি?’

জবাবের জন্যে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল হীরে কারিগর। দেখলাম, এসেক্স স্ট্রিটের দিকে তার ছায়ামূর্তি হেঁটে যাচ্ছে হনহন করে। বাধা দিলাম না। আর তাকে দেখিনি।

দুটো চিঠি পেয়েছিলাম পরে। ব্যাঙ্ক নোট পাঠাতে বলেছে বিশেষ একটা ঠিকানায় —চেক হলে চলবে না। ভেবেচিন্তে হঠকারিতার মধ্যে পা বাড়ানো সমীচীন বোধ করলাম না। একবার সে দেখা করতেও এসেছিল। আমি তখন ছিলাম না। চিনতে পেরেছিলাম চেহারার বর্ণনা শুনে। দারুণ রোগা, নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা দর্শনার্থীর চোখ-নাক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল ভয়াবহ কাশির দমকে। চিঠিপত্র লিখে রেখে যায়নি, আমি নেই শুনেই চলে গেছে। সেই শেষ, এ কাহিনিতে আর তার আবির্ভাব ঘটেনি। জানি না সে সত্যই হীরে কারিগর, না নুড়ি জালিয়াতিতে পোক্ত। বদ্ধ উন্মাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। মাঝেমধ্যে কিন্তু মনে হয়, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি। এমন সুযোগ জীবনে দু’বার আসে না। কে জানে, এদ্দিনে হয়তো তার প্রাণপাখি উড়ে গেছে জীর্ণ খাঁচা ছেড়ে। নুড়ির মতো দেখতে হীরেগুলোকেও থলি সমেত টান মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে জঞ্জালের গাদায়। থলির মধ্যেকার একটা হীরের সাইজ কিন্তু আমার এই মোটাসোটা বুড়ো আঙুলের মতো বিরাট। নিজের চোখে দেখা, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা। এমনও হতে পারে, আজও সে হীরের বেসাতি করে বেড়াচ্ছে, খদ্দের খুঁজে যাচ্ছে বৃথাই। কেউ কর্ণপাতও করছে না অথবা হয়তো টাকার পাহাড়ে চড়ে বসেছে এদ্দিনে। মাতব্বর হয়েছে, কিন্তু টাকার বান্ডিলের দৌলতেই ভিড়ে গেছে কোটিপতিদের মেঘালয়ে, সাধারণ মানুষ খবর রাখে না সেই উচ্চমার্গের, নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা, তাই আমি তার কোনও খবর না রাখলেও আমার খবর রাখে সে। মুচকি হাসি হাসে আমার দুরবস্থা দেখে। ঝুঁকি নিতে পারিনি সেদিন, মাত্র পাঁচ পাউন্ড যদি বার করতে পারতাম, আজ আমার টাকা

খায় কে! দূর থেকে আজও হয়তো সে নীরবে ভর্ৎসনা করে চলেছে আমার এই অবিবেচক সত্তাটাকে।

NEW SERIES
PALL MALL BUDGET
1895
THE FEBRUARY
PEARSONS
Price 10 Cents
THE STOLEN BACILLUS
H.G.WELLS
METHUEN
THE·STOLEN·BACILLUS
H.G.WELLS

ইপাইওরনিস আইল্যান্ড রহস্য

একে তো ওই ষণ্ডা চেহারা, তার ওপর চোয়াড়ে মুখজোড়া বিরাট কাটার দাগ। দেখলেই গা শিরশির করে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার পুঁটলির দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'অর্কিড চারা মনে হচ্ছে?

'হ্যাঁ।'

'সাইপ্রিপেডিয়াম নিশ্চয়?'

'বেশির ভাগ তা-ই।'

'নতুন কিছুই পাননি। পঁচিশ... না, না, সাতাশ বছর আগে ও দ্বীপের সব দেখে এসেছি। কতই বা বয়স তখন। উড়ে উড়ে বেরিয়েছি। কাঁচা বয়সে যা হয় আর কী। দু'বছর ছিলাম ইস্ট ইন্ডিজে, ব্রাজিলে সাত বছর। তারপর গেলাম মাদাগাসকারে।'

'জনাকয়েক অভিযাত্রীর নাম আমার জানা আছে। কার চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'ডসন-এর। বুচার নামটা জানা আছে?'

'বুচার?' খুবই চেনা-চেনা মনে হল নামটা। তারপরেই মনে পড়ে গেল 'বুচার বনাম ডসন মোকদ্দমা-কাহিনি'—'আচ্ছা! আপনিই তাহলে বুচার! চার বছরের মাইনে আদায় করেছিলেন মামলা ঠুকে দিয়ে। চার বছর মরুদ্বীপে পরিত্যক্ত থাকার মাইনে —'

মাথা নুইয়ে সবিনয়ে অভিবাদন জানিয়ে ষণ্ডা বুচার বললে, 'খুবই মজার মামলা, তা-ই না? চার-চারটে বছর দ্বীপে আটক ছিলাম, চাকরি থেকে জবাব দিতেও পারেনি। বছর বছর মাইনের টাকা জমা হয়েছে, দ্বীপে বসে আমি তার হিসেব রেখেছি।'

‘ইন্টারেস্টিং।’

‘খুবই। ইপাইওরনিস নামটা নিশ্চয় শুনেছেন?’

‘একটু একটু। মাসখানেক আগে অ্যান্ড্রুজ বলছিল। গবেষণা করছে একটা প্রজাতি নিয়ে, শোনার পরেই পাড়ি দিয়েছিলাম সমুদ্রে। একখানা মাত্র ঊরুর হাড় নিয়ে কেন যে এত পাগলামি।’

‘ঊরুর হাড়?’

‘হ্যাঁ। গজখানেক লম্বা। যার হাড়, সে নাকি দৈত্য বললেই চলে।’

‘দৈত্য তো বটেই। সিন্দবাদের কিংবদন্তি এদের নিয়েই লেখা হয়েছে। কবে পেয়েছিল হাড়খানা?’

‘বছর তিন-চার আগে। একানব্বইতে। কেন বলুন তো?’

‘কেন মানে? ও হাড় তো আমিই আবিষ্কার করেছিলাম, বিশ বছর আগে। মাইনে নিয়ে ডসন কাদা ছোড়াছুড়ি না করলে ওই একখানা হাড়ের দৌলতেই মাতব্বর হয়ে যেতে পারত।’

‘পেলেন কী করে?’

‘হঠাৎ। নৌকোটা যে অমনভাবে নিজের খেয়ালে ঠিক ওই দ্বীপটাতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকবে, তা তো জানতাম না। আস্তানানারিভো থেকে প্রায় নব্বই মাইল উত্তরে সে বিরাট একটা জলাভূমি।’

‘অ্যান্ড্রুজ তো বলছিল, জলা জায়গায় পাওয়া গেছে হাড়খানা।’

‘পূর্ব উপকূলে আছে জায়গাটা। আপনার চোখে পড়েনি। জলের গুণেই হোক কি যে কারণেই হোক, পচন ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। গন্ধটা অনেকটা আলকাতরার মতো। ত্রিনিদাদের কথা মনে পড়ে যায়। ডিম পেয়েছিল আপনার বন্ধুরা? আমি পেয়েছিলাম। লম্বায় দেড় ফুটের মতো। গোল হয়ে ঘুরে গিয়ে জলাভূমি ঘিরে রেখেছে পুরো তল্লাটটাকে। বেশির ভাগই নুন। কপালজোরে পেয়ে গিয়েছিলাম ডিমগুলো। গিয়েছিলাম অবশ্য ডিম খুঁজতেই; দু’জন কালা আদমি ছিল সঙ্গে। খানকয়েক ক্যানো নৌকো একসঙ্গে পাশাপাশি বেঁধে নিয়েছিলাম। তাঁবু ছিল সঙ্গে। ছিল চার দিনের খাবারদাবার। জমি যেখানে মোটামুটি শক্ত, কাদা কম, তাঁবু পেতেছিলাম সেখানে। সে কী গন্ধ মশায়! এখনও নাকে লেগে রয়েছে। দিনরাত ওই আলকাতরার গন্ধ সইতে হয়েছে। কাজটা কিন্তু মজার। লোহার শিক নিয়ে কাদা খোঁচানো, বাস! ওভাবে খোঁচাখুঁচি করলে ডিম কি কখনও ব্যস্ত থাকে? ডিম ফুটে কবে তারা শেষবারের মতো দাপিয়ে বেড়িয়েছিল দ্বীপময়, কালা আদমিদের কিংবদন্তি থেকে নাকি তা জানা যায়। কথাটা মিশনারিদের। আমি কিন্তু মশাই কোনও গল্পই শুনিনি। জীবন্ত ইপাইওরনিস কোনও ইউরোপীয়ের চোখে পড়েনি

আজও। ১৭৪৫ সালে ম্যাকার নাকি মাদাগাসকার গিয়ে দেখেছিলেন। কিন্তু তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। আমি কিন্তু তাজা ডিম পেয়েছিলাম। যেন সদ্য-পাড়া। এক্কেবারে টাটকা! নৌকোয় বয়ে আনতে গিয়ে পাথরে পড়েই দমাস করে চৌচির একখানা। কী মিষ্টি গন্ধ মশায়, টাটকা ডিমে যেমন হয়। বাসি হলে পচা গন্ধ বেরত। অথচ ধরুন ডিম বেরিয়েছে যার পেট থেকে, সে অক্কা পেয়েছে চারশো বছর আগে। সারাদিন গেল কাদা ঘেঁটে ডিম বার করতে। মেজাজ খিঁচড়ে তো যাবেই। তবে হ্যাঁ, ডিমের মতো ডিম পেয়েছিলাম বটে। পরে লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে গিয়ে দেখেছিলাম খানকয়েক ডিম। চটা-ওঠা, খোলা-ভাঙা, ফুটিফাটা। আমার ডিমের মতো নয়, চিড় পর্যন্ত খায়নি খোলায়।'

চিত্র ৭.১ আমি কিন্তু তাজা ডিম পেয়েছিলাম।

এই পর্যন্ত বলে মাটির পাইপ বার করেছিল বুচার। তামাকের থলি রেখেছিলাম সামনে। অন্যমনস্কভাবে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে সে বলেছিল, 'মোট তিনটে আস্ত ডিম পেয়েছিলাম। বিলকুল তাজা, নৌকোয় রেখে ডাঙায় নেমেছিলাম তাঁবুতে বসে এক মগ কফি বানিয়ে খাব বলো। ভুল করেছিলাম সেইখানেই।'

'কেন?'

'যে কালা আদমিটার হাত ফসকে আস্ত একখানা ডিম পড়ে ফুটিফাটা হয়েছিল, তাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছিলাম রাগের মাথায়। রাগলে আমি চণ্ডাল, কী করি বলুন। তা-ই বলে শোধ নেবে ওইভাবে? ভাবতেও পারিনি। কেটলিতে জল ফুটছে,

মজাসে পাইপ টানছি—দু'চোখ ভরে দেখছি জলাভূমির ওপর সূর্যাস্ত। সে এক খাসা দৃশ্য মশায়। সামনে লাল আকাশ, ধূসর পাহাড়, পেছনে কালো কাদা। মনে মনে হিসেব করছি, নৌকোয় আছে তিন দিনের মতো খাবার আর এক পিপে জল। ভয়ের কিছু নেই। এমন সময়ে একটা শব্দ কানে ভেসে এল। চোখ ফিরিয়ে দেখি, নৌকো নিয়ে হারামজাদারা সরে গেছে ডাঙা থেকে বিশ গজ দূরে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মতলব কী শয়তানের বাচ্চাদের। বন্দুক একটা আছে বটে তাঁবুতে—কিন্তু বুলেট নেই—পাখি-মারা ছররা আছে। হারামজাদারা তা জানে। তবে একটা ছোট রিভলভার ছিল পকেটে। টেনে বের করে দৌড়ালাম সমুদ্রের ধারে। তুলে ধরে হেঁকে বললাম ফিরে আসতে। কিন্তু কাজ হল না। উলটে সে কী টিটকিরি মশায়! হাড় জ্বলে গেল আমার। দিলাম দমাদম গুলি চালিয়ে। নৌকো তখন পঞ্চাশ গজ দূরে। কিন্তু এক বেটাকে ফেলে দিলাম জলে। আর-একটা মুখ গুঁজরে শুয়ে পড়ল খোলে। দাঁড়টাও ভেসে গেল জলে।

'গলাবাজি করে কোনও লাভ নেই জেনে, জামাকাপড় খুলে, দাঁতে ছুরিখানা কামড়ে নিয়ে লাফ দিলাম জলে। সাঁতরে উঠব নৌকোয়—নৌকো যদিও ততক্ষণে বেশ দূরে। জলে হাঙর আছে জানি—সেই ভয়ে তো এই বিজন দ্বীপে একলা পড়ে থাকতে পারি না। যে নৌকোয় দাঁড় নেই, তা স্রোতের টানে কোনদিকে ভেসে যাবে, আঁচ করে নিয়ে সাঁতরে চললাম সেইদিকেই। নৌকো অবশ্য তখন দেখা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়েও এল, কালো কালির মতো অন্ধকারে ঢেউয়ের ডগায় সে কী ফসফরাসের আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়! মাথার ওপর তেমনি তারার আলো। একটু পরেই দেখলাম কালো জমাট ছায়া। নৌকো। তলায় ঢেউ আছড়ে পড়ছে—

'ফসফরাসের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। চুপিসারে গেলাম কাছে। ভেবেছিলাম, ছুরি চালানোর দরকার হবে। কিন্তু হাত গন্ধ করতে হল না। মুখ গুঁজরে যে বেটা খোলে লটকে পড়েছিল—আমার গুলিতেই তার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। লাশটা ফেলে দিলাম জলে।

'খানকয়েক বিস্কুট আর জল খেয়ে একটু ঝিমুনি এসেছিল। ভোর হল, ডাঙার চিহ্ন কোনওদিকে দেখলাম না। দূরে একটা পালতোলা জাহাজের মাস্তুলের ডগাটুকুই কেবল দেখা গেল—দূরেই তা মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর সূর্য আসতেই চড়া রোদে প্রাণ যায় আর কী। বিস্কুট মোড়া ছিল একটা খবরের কাগজে। জীবনে কাগজ পড়ি না মশায়। জঘন্য! সেদিন কিন্তু কাজে দিল কাগজখানা। মাথায় ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বার কুড়ি পড়েও ফেললাম। তা সত্ত্বেও ফোসকা পড়ে গেল সারা গায়ে।

'দিন দশেক কষ্ট সয়েছি এইভাবে। কী মারাত্মক রোদ! চোখ মেলে তাকাতেও পারিনি। ভোরবেলা আর বিকেলবেলা দেখতাম, জাহাজ-টাহাজ দেখা যায় কি না। দেখেওছিলাম—দু'বার। গলাবাজি করেও কাউকে কাছে আনতে পারিনি। দ্বিতীয় দিন একটা ডিম ভেঙে খাওয়া আরম্ভ করেছিলাম। একটু গন্ধ থাকলেও খারাপ নয়। অনেকটা হাঁসের ডিমের মতো। হলদে কুসুমের একপাশে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা এক ধ্যাবড়া দাগ দেখেছিলাম। সরু সরু সুতোর মতো রক্ত আর মইয়ের মতো কী যেন ছিল তাতে—অদ্ভুত। মানে বুঝতে পারিনি তখন—পরে পেরেছিলাম। তিন দিন ধরে খেয়েছিলাম ওই একখানা ডিম—বিস্কুট আর জলের সঙ্গে। আট দিনের দিন আর-একখানা ডিম ভাঙবার পর খাড়া হয়ে গেল গায়ের লোম। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ডিম ফুটছিল একটু একটু করে। বিশ্বাস করা যায় না। আমার কিন্তু হয়েছিল। চোখের সামনে দেখে বিশ্বাস না করে পারা যায়? তা ধরুন শ'তিনেক বছর কালো কনকনে কাদায় পোঁতা ছিল ডিমখানা—একদম নষ্ট হয়নি—এখন বাচ্চা তৈরি হচ্ছে রোদের তাতে। ভ্রূণই তো বলে?—ভ্রূণের মধ্যে বিরাট মাথা আর বাঁকা পিঠ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গলার নিচে হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে, কুসুম শুকিয়ে আসছে, মস্ত পাতলা পরদা খোলার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে, কুসুম ঢেকে ফেলছে। কী কাণ্ড বলুন তো! ভারত মহাসাগরের ঠিক মধ্যিখানে ডিমে তা দিচ্ছি! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি যারা ছিল, তাদেরই একজনের ডিম—কোনকালে লোপ পেয়েছে, কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চা বেরচ্ছে আমার সামনে! ডসন যদি জানত, চার বছরের মাইনে এককথাতে বার করে দিত! তা-ই না?

'তা-ই বলে খেতেও ছাড়িনি। আধফোটা বাচ্চাকেই খেয়েছি একটু একটু করে। বিতিকিচ্ছিরি খেতে। তৃতীয় ডিমটাকে আর ভাঙিনি। রোদ্দুরের সামনে তুলে ধরেছিলাম। খোলার মধ্যে দিয়ে কিছু দেখতে পাইনি। তবে রক্তচলাচলের শব্দ যেন শুনতে পেয়েছিলাম। কানের ভুলও হতে পারে।

'তারপর পেছোলাম অ্যাটলে। চাকার মতো প্রবালদ্বীপ—মাঝখানে উপহ্রদ। তখন সূর্য উঠেছে অ্যাটলের সামনে। আধ মাইল পথ হাতে করে দাঁড় টেনেছিলাম, কখনও ডিমের ভাঙা খোলা দিয়ে। স্রোতের টান নৌকোকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মরিয়া হয়ে জল কেটে নৌকো নিয়ে গেলাম তীরে। মামুলি অ্যাটল। ডাঙায় নেমে দেখলাম গোটাকয়েক গাছ, একপাশে একটা ঝরনা, হ্রদ বোঝাই কাকাতুয়া-মাছ। একপাক ঘুরে এলাম, মোটে মাইল চারেক। ডিমটাকে ডাঙায় রাখলাম রোদের তাতে বালির ওপর, জল সেখানে পৌঁছায় না। নৌকোটাকে টেনে তুলে রেখেছিলাম আগেই। তারপর শুরু হল রবিনসন ক্রুসোর জীবন। ছেলেবেলায় ভাবতাম খাসা

জীবন। এখন দেখলাম জঘন্য। একঘেয়ে। খাবার খুঁজতে খুঁজতেই গেল প্রথম দিনটা। দিনের শেষে ঝড় উঠল, বৃষ্টি নামল রাতে।

'ঘুমাচ্ছিলাম ক্যানোর তলায়। কপাল ভালো, ডিমটা ছিল অনেক উঁচুতে, বালির ওপর। হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ শুনলাম। যেন একশো নুড়িপাথর আছড়ে পড়ল ক্যানোর গায়ে। ঢেউ চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। স্বপ্ন দেখছিলাম। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অন্ধকারে হাতড়েছিলাম চেয়ার আর দেশলাই। তারপরেই খেয়াল হল, আছি কোথায়। ফসফরাস-জ্বলা ঢেউ যেন গিলে খেতে আসছে। আলো আর কোথাও নেই, আকাশ কালো—কালির মতো রাত। বাতাস চেঁচিয়ে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। মেঘ ঝুলে পড়েছে, মাথায় ঠেকে আর কী। বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে, আকাশ যেন ফুটো হয়ে গেছে। আগুন সাপের মতো কিলবিল করে বিরাট একটা ঢেউ তেড়ে এল আমাকে পেটে পুরতে। ভোঁ দৌড় দিলাম তক্ষুনি। ঢেউ যখন নেমে যাচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে, ফিরে এলাম ক্যানোর কাছে। কিন্তু কোথায় ক্যানো? ডিমটাকে কিন্তু ঢেউ ধরতে পারেনি। ওই ডিমের পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে কাটিয়ে দিলাম রাত। সে কী রাত! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, এই দেখুন।

'ভোর হল। ঝড় থামল। বালির ওপর নৌকোর কঙ্কালটাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখলাম। কুড়িয়ে আনলাম তক্তাগুলো। দুটো লাগোয়া গাছের ওপর পেতে বানিয়ে নিলাম ছাউনি। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরল সেইদিনই।

'আমি তখন ঘুমিয়ে কাদা ডিমটাকেই মাথার বালিশ করে। হঠাৎ খটাং করে একটা আওয়াজে চটকা ভাঙল। ঝাঁকুনি লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম। দেখি কী, খোলা ফুটো হয়ে গেছে। ফাঁক দিয়ে একটা কদাকার বাদামি মুন্ডু আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। খাতির করে ডেকেছিলাম, 'এসো বাবা এসো, দুদু দেব, মাছ দেব, টুকুটুকু এসো।' শুনেই খুটুর খুটুর করে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

'প্রথমদিকে মনের মতোই সঙ্গী পেয়েছিলাম। আকার-আয়তনে ছোট্ট মুরগি বললেই চলে। পাখির ছানার মতোই দেখতে—একটু যা সাইজে বড়। গোড়ায় পালক ছিল নোংরা বাদামি রঙের, ধুলো-রঙের মামড়ি একটু ছিল, খসে গেল দু'দিনেই। দেখা গেল চুলের মতো পালক। নাম দিলাম তার ফ্রাইডে। রবিনসন ক্রুসোর ফ্রাইডে ছিল মানুষ-সঙ্গী। আমার ফ্রাইডে হল তিনশো বছর আগেকার দানব-পাখির ছানা। কুৎসিত। গা ঘিনঘিন করেছিল ঠিকই। কিন্তু মুরগির মতোই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ক্যাঁ-কোঁ আওয়াজ করে খাবার খুঁটতে শুরু করতেই মনটা হু-হু করে উঠেছিল। আহা রে, মা নেই, বাবা নেই। খাবার জোগাতে হবে তো আমাকেই। ল্যাগুন থেকে কাকাতুয়া-মাছ ধরে এনে খেতে দিয়েছিলাম। দিতে-না-দিতেই শেষ। আরও চাই।

ঠোঁট ফাঁক করে সে কী লাফাই। মজা পেয়েছিলাম। তেমন বুঝলে ওকেই খাওয়া যাবে। বড় হোক।

'দিনরাত ঘুরত সঙ্গে ন্যাওটার মতো। মাছ ধরতাম, যখন পাশে দাঁড়িয়ে দেখত। যা মাছ উঠত, তার বখরা নিত—আমাকেও দিত। বালির ওপর একরকম আচারের শসার মতো ছোট শসা গজাত এন্তার। গায়ে ছোট ছোট আঁচিল। একদিন একটা ঠুকরেই এমন মেজাজ খিঁচড়ে গেল যে, আর এদিক মাড়ায়নি। ইন্টারেস্টিং, তা-ই না?

'দিনে দিনে বেড়ে চলল ইপাইওরনিস ছানা। রোজই দেখতাম যেন বাড়ছে একটু করে। দু'বছর দেখেছিলাম এইভাবে। বেশ সুখে ছিলাম মশায়। কাজকর্ম নেই, মাথাব্যথাও নেই। মাইনে জমা পড়ছে ডসনের অফিসে। সময় কাটানোর জন্য দ্বীপটাকে সাজাতাম মনের মতো করে। শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি কুড়িয়ে এনে বালির ওপর সাজিয়ে লিখেছিলাম দ্বীপের নাম—ইপাইওরনিস আইল্যান্ড। দ্বীপের সব দিকেই। তারপর শুয়ে শুয়ে দেখতাম, জাহাজ-টাহাজ আসে কি না। আশপাশে ঝাঁপাই জুড়তে দৈত্য-পাখির ছানা। বাড় দেখে অবাক হতাম। যত দিন যাচ্ছে, ততই খোলতাই হচ্ছে চেহারাটা। মাথায় নীল ঝুঁটি গজাল চোখের সামনেই, সবুজ পালক গজালো পেছনে। ঝড়বৃষ্টির সময়ে ছাউনির তলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থেকেছি কত দিন কত রাত। ঝড়বৃষ্টি থামলে আবার টহল দিতে বেরিয়েছি। যদি কিছু ভেসে আসে, এই আশায়; এই দু'বছরে মাঝে মাঝে পালের ডগা চোখে পড়েছে—কিন্তু দ্বীপের দিকে আসেনি কোনও জাহাজ।

'বড় সুখে ছিলাম। স্বর্গসুখ বললেই চলে। তামাক ছিল না, এইটুকুই যা দুঃখের। কিন্তু এত সুখ সইল না। দ্বিতীয় বছরের শেষাশেষি কপাল ভাঙল। ফ্রাইডে তখন মাথায় চোদ্দো ফুট উঁচু। গাঁইতির ফলার মতো ইয়া মুন্ডু ঘাড়ের ওপর। মস্ত দুটো বাদামি চোখ। চোখ ঘিরে হলুদ আংটি। ঠিক মানুষের চোখের মতোই কাছাকাছি চোখ, কিন্তু মুরগির চোখের মতো দু'দিকে সরানো নয়। মিহি পালক—অস্ট্রিচের পালকের মতো কর্কশ নয়। রং আর পালক দুটোই নিউ গিনির ক্যাসয়ারি বা এমু পাখির মতো অনেকটা।

'কিন্তু রক্তে যার বেইমানি রয়েছে, তার বাইরে দেখে কি চেনা যায়? চেহারা যত খোলতাই হয়েছে, গায়েগতরে ভারী হয়েছে আমারই হাতে খেয়ে, ততই তিরিক্ষে হয়েছে মেজাজ। ঘাড় বেঁকিয়ে কিনা তেড়ে আসে আমাকেই? নেমকহারাম কোথাকার!

'একদিন হিমশিম খেয়ে গেলাম মাছ ধরতে গিয়ে। মাছ আর পাই না—এদিকে হারামজাদা ইপাইওরনিস সমানে ঘুরঘুর করছে আমার পাশে—মনে মনে যেন একটা

মতলব আঁটছে। খিদেয় পেট জ্বলছে বুঝতে পারছি, সমুদ্রের শসা তো পড়ে রয়েছে —খেলেই হয়। শয়তানের বাচ্চার আবার তা মুখে রোচে না। অনেক কষ্টে পেলাম একখানা মাছ। পেট চুঁইচুঁই করছে আমারও। তাই ভাগ দিতে চাইনি। আরে সব্বনাশ! হোঁয়াক করে কিনা তেড়ে এসে কামড়ে নিল মাছখানা, হ্যাঁচকা টান মেরে কেড়ে নিয়ে মাথায় এক ঘা কষিয়ে দিয়েছিলাম। বাস—সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

'মুখখানা দেখুন। আচমকা রামঠোক্করেই এই কাণ্ড। এ কাটার দাগ জীবনে আর মেলাবে? ঠোক্কর মেরেও রেহাই দিল না। কী করল জানেন? ধাঁই করে সে কী লাথি! ঘোড়ার চাট সে তুলনায় কিছুই নয়। ঠিকরে পড়েই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। ফের তেড়ে আসছে দেখেই দু'হাতে মুখ ঢেকে দৌড়েছিলাম পাঁইপাঁই করে। কিন্তু কী বলব মশায়, হারামজাদা পক্ষিরাজের মতো সাঁইসাঁই করে তেড়ে এল। রেস-হর্সও অত জোরে ছুটতে পারে না। তারপরেই শুরু হল রামধোলাই। উফ! লাথির পর লাথি—সেই সঙ্গে ঠোক্করের পর ঠোক্কর! এক-একখানা লাথি দুরমুশের মতো যেন হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতে লাগল—আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগল এক-একদিকে—সেই সঙ্গে পিঠের ওপর চলল গাঁইতি ঠোঁটের ধারালো ঠোক্কর। কোনওমতে ঠিকরে গিয়ে পড়েছিলাম ল্যাগুনের জলে—গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে পড়েছিলাম। হারামজাদা বেল্লিকের বাচ্চা জলে নামবে না জানি—গা ভিজে যাবে যে! সে কী ঝাঁপাই। চিৎকারটা অনেকটা ময়ূরের ডাকের মতো, তবে সাংঘাতিক চড়া। সহ্য করা যায় না। ঝুঁটি উঁচিয়ে শুরু হল পায়চারি বালির ওপর, যেন নবাবপুত্তুর। না বলেও পারছি না, খানদানি টহল দেখে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছিল। ওরকম লর্ড স্টাইলে হাঁটা আমার দ্বারা জীবনে হবে না। দেখছি আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। সারা শরীর থেঁতলে দিয়েছে শয়তানের বাচ্চা, দরদর করে রক্ত পড়ছে মুখের এই কাটা থেকে।

'কাটাছেঁড়া থেঁতলানির যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে উঠল মনের যন্ত্রণা। ডিম ফুটিয়ে যাকে জন্ম দিলাম, খাইয়েদাইয়ে এতটা বড় করলাম, তার কাছে এইরকম নেমকহারামি আশা করতে পারিনি। বেটাছেলের মেজাজ ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকা দরকার বুঝলাম। সাঁতরে গেলাম একটা লম্বা তাল গাছের তলায়। ডগায় উঠে বসে রইলাম চোরের মতো। ভাবুন তখন আমার মনের অবস্থাটা! একটা বেইমানের ভয়ে জুজু হয়ে বসে রয়েছি বিজন দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু গাছের ডগায়! মানুষের বাচ্চা আমি। চারশো বছর আগে লোপ পেয়ে-যাওয়া একটা পাখির বাচ্চার ভয়ে কাঁপছি ঠকঠক করে।

'ভেবেছিলাম, মেজাজ ঠান্ডা হলেই শয়তানের বাচ্চা সব ভুলে যাবে। ব্রেন আর কতটুকু। তারপর মওকা বুঝে নেমে আসব। মাছ নিয়ে আস্তে আস্তে কাছে গেলেই

আহ্লাদে আটখানা হবে। আবার আগের মতো সবকিছু হয়ে যাবে। কিন্তু হাড় বদমাশটার হাড়ে হাড়ে যে শয়তানি আর কুচুটেপনা—তা তখনও বুঝিনি। নেমকহারামির জন্যে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, বিটলে বাচ্চার রক্তে ক্ষমাঘেন্না জিনিসটা যে একেবারেই নেই, সে শিক্ষা হল বড় কষ্টের মধ্যে দিয়ে।

চিত্র ৭.২ উফ! লাথির পর লাথি—সেই সঙ্গে ঠোক্করের পর ঠোক্কর!

'মাথা খাটিয়ে অনেক ফিকির, অনেক কায়দা আবিষ্কার করেছিলাম বেল্লিকটাকে বশ করতে। সব আর বলব না। কিন্তু হার মেনেছি প্রতিবারেই। নরকের পোকা কোথাকার! এখনও ভাবলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়, গাল লাল হয়! শেষকালে

খোশামোদ ছেড়ে মারধর করেছিলাম। প্রবালের ডেলা ছুড়ে ছুড়ে মারতাম দূর থেকে। কোঁত কোঁত করে গিলে ফেলত। খোলা ছুরি টিপ করে ছুড়ে ছিলাম। বড় ছুরি বলে গিলতে পারেনি—কিন্তু ছুরি ফিরিয়ে আনতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। না খাইয়ে মারবার মতলব এঁটেছিলাম। মাছ ধরাই ছেড়ে দিলাম, হারামজাদা অল্প জলে নেমে পোকা খুঁটে খুঁটে খেতে আরম্ভ করল। অর্ধেক সময় গলা-জলে ডুবে বসে থাকতাম, বাকি অর্ধেক তাল গাছের ডগায়। একটা গাছ ছিল পেল্লায় উঁচু। শয়তানের বাচ্চা একদিন সেখানেও নাগাল ধরে ফেলল। ঠোক্কর মেরে আমার পায়ের ডিম থেকে এক চাকলা মাংস খুবলে নিয়ে গেল। সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! ওই অবস্থায় তাল গাছে ঘুমানো যায়? আপনি পারবেন? সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছি, চমকে চমকে উঠেছি।

'কী লজ্জা ! কী লজ্জা! আমারই দ্বীপে রাজার মতো হেলেদুলে টহল দিচ্ছে লোপ পেয়ে-যাওয়া একটা জানোয়ার, পায়ের চেটো ছোঁয়াতে দিচ্ছে না মাটিতে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, শেষকালে কান্নাকাটিও করেছি ক্লান্তিতে। আশা মিটিয়ে গালাগালও দিয়েছি। এ কী নষ্টামি? আমারই দ্বীপে আমাকে তাড়িয়ে গাছের ডগায় তুলে দেওয়া! জাহান্নমে যেতে বলেছি যতবার, ততবারই তেড়ে এসে এমন ঠোক্কর মেরেছে যে, পালাবার পথ পাইনি। ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছি খোদ শয়তান—পাখি না কচু! দেখতে যেমন জঘন্য, স্বভাব-চরিত্রও তা-ই? ছি! ছি!

'এই অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। বেদম হয়ে পড়েছিলাম। শেষে মাথায় খুন চাপল। দক্ষিণ আমেরিকায় দড়ির ফাঁস ছুড়ে যেভাবে জানোয়ার ধরে, সেইভাবে হারামজাদাকে কুপোকাত করব ঠিক করলাম। মাছ ধরার দড়ি যা কিছু ছিল, সব একটার পর একটা বাঁধলাম। লম্বায় হল প্রায় বারো গজ। একদিনে হয়নি। ল্যাগুন থেকে লম্বা লম্বা ঘাস আর আঁশ তুলে কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি জলে, কখনও গাছের ডগায়। তারপর দুটো বড়সড়ো প্রবালের টুকরো বাঁধলাম দড়ির ডগায়। গলা-জলে ডুবে বসে থেকে মাথার ওপর বনবন করে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিলাম শয়তানের বাচ্চার দিকে। জড়িয়ে গেল দু'পায়ে। যত লাফায়, তত বেশি জড়ায়। শেষকালে উলটে পড়তেই উঠে এলাম জল ছেড়ে। ছুরি দিয়ে কাটলাম গলা...

'ভাবলেও মনটা খারাপ হয়ে যায় আজও। মানুষ খুন করছি যেন মনে হয়েছিল। কিন্তু রাগে তখন মাথায় আগুন জ্বলছে। বালির ওপর রক্তের পুকুরে সুন্দর পা আর বাহারি গলা মুচড়ে যন্ত্রণায় ছটফটানির দৃশ্য আজও ভাসছে চোখের সামনে।

'সেই থেকে নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠল। ডিম থেকে বার করে যাকে বড় করেছিলাম, দিনের পর দিন কত মজার খেলা খেলে আমার নিঃসঙ্গতাকে যে ভরিয়ে

রেখেছিল—সে না থাকায় খাঁ খাঁ করতে লাগল চারদিক। অসহ্য! অসহ্য! একেবারে মেরে ফেলাটা ঠিক হয়নি, জখম করলেই পারতাম। তারপর না হয় সেবাশুশ্রূষা করে আবার চাঙ্গা করে তোলা যেত। প্রবাল পাহাড় খোঁড়বার সরঞ্জাম ছিল না সঙ্গে। থাকলে, পাথর খুঁড়ে মানুষের মতোই তাকে কবর দিতাম। হতে পারে বেইমান জানোয়ার, আমি কিন্তু তাকে মানুষের মতোই দেখেছিলাম। ভালোবেসেছিলাম। মানুষের মাংস কি মানুষ খেতে পারে? আমিও পারিনি। জলে ফেলে দিয়েছিলাম। মাংস খেয়ে শুধু হাড়গুলো ফেলে গিয়েছিল মাছেরা। পালক পর্যন্ত রাখেনি। তারপর একদিন একটা পালতোলা জাহাজ হঠাৎ এসে গেল অ্যাটলে।

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে উইন্সলো নামে একজন দোকানদারকে বেচে দিয়েছিলাম হাড়গুলো। সে বেচেছিল হ্যাভার্সকে। হ্যাভার্স লোকটা একটা আস্ত পাঁঠা, অত বড় হাড় দেখেও জিনিসটার কদর করতে পারেনি। তার মৃত্যুর পর হইচই আরম্ভ হল ইপাইওরনিসকে নিয়ে। নামটা দেওয়া হয়েছিল তখনই, তা-ই না? পুরো নামটা জানেন?'

'ইপাইওরনিস ভ্যাসটাস,' বলেছিলাম আমি। 'গজখানেক লম্বা একখানা ঊরুর হাড় পাওয়া গিয়েছিল সবার আগে। এর চাইতে বড় হাড় আর নাকি হয় না। নাম দেওয়া হল ইপাইওরনিস ম্যাক্সিমাম। তারপর পাওয়া গেল সাড়ে চার ফুট লম্বা আর-একখানা ঊরুর হাড়। নাম দেওয়া হল ইপাইওরনিস টাইটান। হ্যাভার্সের মৃত্যুর পরে পাওয়া গেল আপনার ভ্যাসটাস। তারপরেও পাওয়া গিয়েছিল ভ্যাসটিসিমাস।'

মুখের কাটা দাগটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে বুচার বললে, 'এখন বলুন তো মশায়, আমার সঙ্গে অমন জঘন্য ব্যবহারটা করা কি উচিত হয়েছে ইপাইওরনিস ভ্যাসটাসের?'
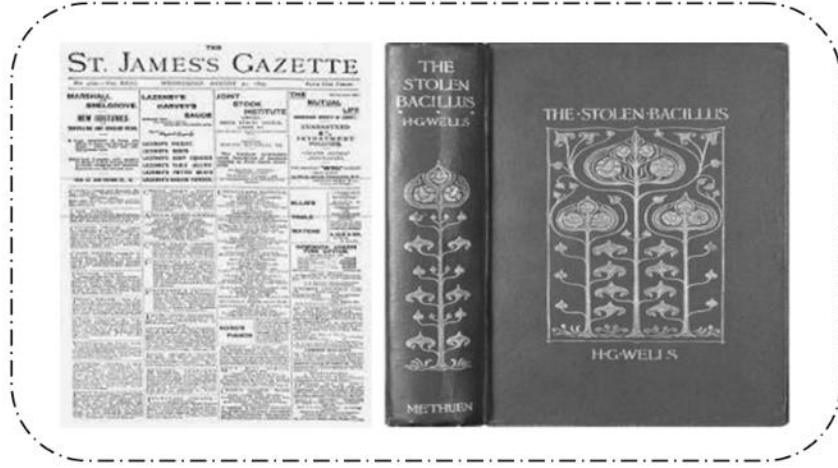
‘The Temptation of Harringay’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘The St. James’s Gazette’ পত্রিকায়। ১৮৯৫ সালে লন্ডনের ‘Methuen & Co.’ থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের প্রথম ছোটগল্পের সংকলন ‘The Stolen Bacillus and Other Incidents’-তে গল্পটি স্থান পায়।

শয়তানের ছবি
(The Temptation of Harringay)

আশ্চর্য এই কাণ্ড আদৌ ঘটেছিল কি না বলা কঠিন। হ্যারিঙ্গওয়ের মুখে শোনা তো—তার কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। হ্যারিঙ্গওয়ে—আর্টিস্ট হ্যারিঙ্গওয়ে। আর্টের কিছু বুঝুক-না বুঝুক, ছবি আঁকে। নিজের কথাতেই সাতকাহন। কল্পনা বস্তুটা মগজে খুবই কম। তবুও এঁকে যায় ছবি—সে ছবি সবসময়ে যে ছবি হয়ে ওঠে না—তা জেনেও ছবি আঁকার নেশা ছাড়তে পারে না।

বিচিত্র এই কাহিনি তারই মুখে শোনা।

বিচিত্র বলে বিচিত্র! দশটা নাগাদ একদিন স্টুডিয়োতে গিয়ে হ্যারিঙ্গওয়ে আগের দিন আঁকা ইতালিয়ান অর্গ্যানবাদকের ছবিটা খুঁটিয়ে দেখছিল। শিল্পী মানুষ তো, বড্ড খুঁতখুঁতে। ছবি পছন্দ হয়নি।

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তা-ই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন, এই আপ্তবাক্যটি অনুসরণ করেই রাস্তা থেকে অর্গ্যানবাদককে ধরে এনে ক্যানভাসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। পয়সার খাঁকতি ছিল বাদকমশায়ের। চোঙা ঘুরিয়ে বাজনা বাজিয়ে পথে পথে দু’-চার পেনি পেলেই যে বর্তে যায়, শিল্পী হ্যারিঙ্গওয়ে তাকে কবজায় এনে ফেলেছিল সহজেই। মহৎ সৃষ্টি করতে গেলে পথের ভিখিরিদের দিকেই নজর রাখতে হয়।

হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তাকে এমনভাবে হাসতে বলেছিল যেন দেখলেই মনে হয়, পেনির প্রত্যাশায় বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু মাড়ি বার করলে চলবে না, মাড়ি আঁকার জন্যে এত মেহনত করতে বসেনি হ্যারিঙ্গওয়ে, দাবড়ানি দিয়ে তা বোঝাতে কসর করেনি শিল্পীমশায়। হাসির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে মনের অতৃপ্তি, তবেই তো ছবি খুলবে ভালো।

ব্যারেল-অর্গ্যান নিয়ে বিদেয় হয়েছিল বাদকমশায়। টেনে ঘুমিয়ে রাত কাবার করে শিল্পীমশায়ের কিন্তু মনে হয়েছিল, ছবিটা মোটেই সুবিধের হয়নি। ঘাড়ের কাছে একটু তুলি বোলাতে পারলে মনে হয় উতরে যাবে—

শুরু হল পায়চারি স্টুডিয়োর মধ্যে। নানান দিক থেকে ঘাড় কাত করে নিজের সৃষ্টিকে দেখল নানানভাবে। শেষকালে যে অশ্লীল শব্দটা উচ্চারণ করেছিল, সেটা বর্তমান কাহিনিতে বাদ দেওয়া হল।

তারপর বলেছিল নিজের মনে, 'নিছক একটা ছবি যদি হত, মনটা খচখচ করত না। কিন্তু জীবন্ত মানুষের ছবি এঁকে সেই ছবিকে যদি জীবন্ত করে তুলতে না পারি, তাহলে করলামটা কী? ধুত্তোর! নিশ্চয় গলদ রয়েছে আমার কল্পনা করার ক্ষমতায়, কিছুতেই কোনও ছবিকে জীবন্ত করতে পারি না।'

খাঁটি কথা! হ্যারিঙ্গওয়ের মস্ত গলদ ওইখানেই—কল্পনাশক্তির ঘাটতি নিয়ে শিল্পী হওয়া কি সম্ভব?

মনে মনে তাই সমানে গজগজ করে যায় হ্যারিঙ্গওয়ে। ঝাল ঝাড়ে নিজের ওপরেই। গিরিমাটি রং দিয়ে আদমকে যেমন রঙিন করা হয়েছিল, সেইভাবেই রং দেওয়া দরকার ছবির মানুষে। কিন্তু দূর দূর! এ কি একটা ছবি হয়েছে! অথচ রাস্তায় হাঁটলেই ছবির মতোই স্টুডিয়ো-চিত্র দেখা যায়। স্টুডিয়োতে ঢুকলেই তা অন্যরকম! পালটে যায় খোকাখুকুরও!

জানলার খড়খড়ি তুলে দিল হ্যারিঙ্গওয়ে। আলো আসুক ঘরে। তারপর রং, তুলি, প্যালেট তুলে নিয়ে এল ছবির সামনে। এক পোঁচ বাদামি রং লাগালে মুখের কোণে। তারপর তন্ময় হল চোখের তারা নিয়ে। শেষকালে মনে হল চিবুকটি বড় বেশি ঔদাস্যে ভরা—ধর্মচর্চার জন্যে যে মানুষ রাত জাগে—এরকম উদাস ভাব তাকে মানায় না। ছবিটার নাম দিয়ে বসেছে কিন্তু সেইভাবেই—ধর্মচর্চার জন্যে রাত্রি জাগরণ।

কিছুক্ষণ পর আঁকার সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে পাইপ নিয়ে বসল। ধূমপান করে মাথা সাফ করা দরকার। ঠায় চেয়ে রইল ছবির দিকে। মনে হল যেন ছবির মানুষটা নাক সিটকিয়ে তাকে উপহাস করছে।

সত্যিই জান্তব ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ছবিতে। তবে যেভাবে হ্যারিঙ্গওয়ে চেয়েছিল, সেভাবে হয়নি। উপহাস ভাবটা অতিশয় সুস্পষ্ট। হেয়জ্ঞান করছে শিল্পীকে। শিল্পীর ক্ষমতায় যেন তিলমাত্র বিশ্বাস নেই। ঠিক এইভাবে ছবিকে সজীব করতে চায়নি হ্যারিঙ্গওয়ে। বাঁদিকের ভুরুটায় বিশ্বনিন্দা অতটা ফুটে ওঠেনি অবশ্য। সুতরাং ওর ওপরই চাপানো যাক আর-একটু রং। কানের লতিতেও একটু রং বুলিয়ে দেয় সেই সঙ্গে—সজীবতর করে তোলার জন্যে।

এইভাবেই এখানে-সেখানে একটু করে রং ছুঁইয়ে দূরে সরে গিয়ে ঘাড় কাত করে দেখে হ্যারিঙ্গওয়ে। একটু একটু করে আগের চাইতেও জ্যান্ত হয়ে উঠছে ছবিটা ঠিকই—কিন্তু মন-খুশ ছবি হচ্ছে না মোটেই। এমন কুটিল মুখ তো হ্যারিঙ্গওয়ে চায়নি। জীবনে এরকম অশুভ ভাবভরা মুখচ্ছবি কখনও আঁকেনি শিল্পীমশায়। ছবি কখনও এরকম জ্যান্তও হয়নি তার হাতে।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয় হ্যারিঙ্গওয়ে। তাচ্ছিল্যের ওই হাসি উড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত রং-তুলি চালিয়ে গেল সমানে। সে ভাবটা গেল তো স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের চাপা আগুন। এতক্ষণ এই দ্যুতি কিন্তু চোখে পড়েনি। সারা মুখখানায় যেন শয়তানি মাখানো।

কেন এরকম হল? ভুরু দুটো কি বেশি তেরচা হয়ে গেছে? খড়খড়ি আরও খুলে দিয়ে জোর আলোয় রং-তুলি নিয়ে ফের হুমড়ি খেয়ে বসল হ্যারিঙ্গওয়ে।

ক্যানভাসের ওপরে মুখটা সজীব রয়েছে যেন আত্মার প্রাণস্পন্দনে। কিন্তু পৈশাচিক ভাবটা জাগ্রত হচ্ছে কী জন্যে, কিছুতেই তা আবিষ্কার করে উঠতে পারে না হ্যারিঙ্গওয়ে। অসম্ভব! আরও এক্সপেরিমেন্ট দরকার মনে হচ্ছে। ভুরু দুটোর দিকে তাকিয়ে কিন্তু তাজ্জব হয়ে যায় বেচারা। ও কি ভুরু? না অন্য কিছু? ওই জন্যেই মুখটা কি অমন নারকীয়? ধুত্তোর! রং-তুলি যখন হাতেই রয়েছে, বিকট ভুরুকে সহজ করে তোলা এমন কী শক্ত কাজ। ভুরু পালটে গেল চক্ষের নিমেষে। কিন্তু তাতেও কমল না মুখের ভয়াবহতা—আর ওই গা-জ্বালানো তাচ্ছিল্যের হাসি! আরও শয়তান-শয়তান হয়ে ওঠে গোটা মুখটা। কী জ্বালা! কী জ্বালা! মুখের কোণটায় একটু তুলি বোলালে হয় না? শ্লেষ হাসি অমনি পালটে গিয়ে দাঁত বার-করা হাড়পিত্তি-জ্বালানো হাসি যেন নিঃশব্দে টিটকিরি দিয়ে যায় হ্যারিঙ্গওয়েকে। তাহলে গলদ আছে চোখে? যাচ্চলে! তুলিতে উঠে এসেছে টকটকে সিঁদুর রং—লাগানোও হয়ে গেল ওই রং! অথচ বেশ খেয়াল ছিল, তুলছে বাদামি রং!

টকটকে লাল চোখজোড়া এখন যেন অক্ষিকোটরে পাক দিয়ে কটমট করে চেয়ে আছে হ্যারিঙ্গওয়ের দিকে। চোখ তো নয়—আগুনের গোলক বললেই চলে।

তড়িঘড়ি বেশ খানিকটা উজ্জ্বল লাল রং-তুলি বোঝাই করে তুলে নিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। একটু যেন ভয়ত্রস্ত হয়েই ঘচাঘচ করে তুলি বুলিয়েছিল ছবির ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে। তারপরেই ঘটে গেল ভারী অদ্ভুত একটা ব্যাপার। অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! কিন্তু আদৌ তা ঘটেছিল কি না তা-ই বা কে জানে?

ছবির শয়তান ইতালিয়ান অর্গ্যানবাদক সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে, মুখ কুঁচকে, হাত তুলে সমস্ত রং মুছে ফেললে মুখের ওপর থেকে!

পরক্ষণেই ফের খুলে গেল লাল চোখ। ফট করে ঠোঁট খোলার মতো আওয়াজও হল একটা। সুড়ুত করে হাসি ভেসে গেল মুখের ওপর দিয়ে।

কথা কয়ে উঠল ছবি, 'ঝোঁকের মাথায় কী যে কর?'

এতক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল নাকি হ্যারিঙ্গওয়ে—কিন্তু যা ঘটবার নয় তা-ই যখন ঘটে গেল, তখন আর কীসের ভয়? নিমেষে আত্মস্থ হয়ে ওঠে শিল্পীমশায়। ছবির শয়তান খুব একটা হাড়বজ্জাত হবে বলে মনে যখন হচ্ছে না, তখন কোমর বেঁধেই লাগা যাক তার সঙ্গে।

কড়া গলায় বলে হ্যারিঙ্গওয়ে, 'তুমিই বা কম যাও কীসে? এত নড়াচড়া কেন? মুখ ভেংচে, চোখ টিপে, ব্যঙ্গের হাসিই বা কেন?'

'আমি?' আকাশ থেকে পড়ে যেন ছবি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।'

'আমি তো কিছু করিনি।'

'একশোবার তুমি করেছ।'

'আজ্ঞে না মশায়, গোলমালটা তুমিই পাকিয়েছ,' বলে ছবি।

তেলেবেগুনে জলে ওঠে হ্যারিঙ্গওয়ে, 'ইয়ারকি হচ্ছে?'

'পাগল, ওসব আমার পোষায় না।—আরে, আরে, কর কী? কর কী? আবার তুলি দিয়ে মারবে নাকি? পাগলামি ছাড়। যা সত্যি, তা শুনলে খারাপ তো লাগবেই। কিন্তু সকাল থেকে কী চেষ্টাই না করছ, আমি যা নই, ঠিক সেইভাবে আমাকে আঁকতে। নিজেই জান না কী আঁকতে চাও, দোষ আমার না তোমার?'

'ফটফট করো না। কী আঁকতে চাই, সে জ্ঞান আমার বিলক্ষণ আছে।'

'একেবারেই নেই। কস্মিনকালেও ছিল না, ছবিদের সঙ্গে তোমার প্রাণের কোনও সম্পর্কই নেই, তাই কোনও ছবিই শেষ পর্যন্ত জ্যান্ত ছবি হয়ে ওঠে না। আবছা ধারণা নিয়ে শুরু কর, তারপর চলে পরীক্ষানিরীক্ষা, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ার মতো রং খুলে গেল তো ভালো, নইলে নয়। ঠিক কী আঁকতে চাও, গোড়া থেকেই সেই ধারণা স্পষ্ট থাকে না বলেই কেলোর কীর্তি চালিয়ে যাও। ছ্যা! ছ্যা!'

গাঁ-গাঁ করে হ্যারিঙ্গওয়ে নাকি তখন বলেছিল, 'আমি ছবি আঁকব আমার মর্জিমাফিক—তোমার তাতে কী?'

'প্রেরণা ছাড়া ছবি আঁকতে তো পারবে না', একটু হতাশ হয়েই বলেছিল ছবি।

'প্রেরণা নেই কোনও—বলছ?'

'প্রেরণা!' ঘৃণায় নাক-ফাক কুঁচকে একাকার করে বলেছে ছবি, 'রাস্তায় যাচ্ছিল একজন অর্গ্যানবাদক। মুখ তুলে চাইল তোমার জানলার দিকে। দেখেই প্রেরণা এসে গেল তোমার মাথায়? ধর্মচর্চার জন্যে রাত্রি জাগরণ? ফুঃ! প্রেরণার প্রত্যাশায়

বসে থাক—প্রেরণা তোমার দিকে ফিরেও চায় না। দেখেই মায়া হল আমার। তাই তো ভাবলাম, যাই, কিছু জ্ঞান দিয়ে আসি।'

লাল লাল চোখ মটকে মুচকি হেসে ফের বলেছিল ছবি, 'বেশি জেনে ছবি আঁকতে শুরু কর বলেই ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পার না। বুঝলে হাঁদারাম? জ্ঞানে মটমট করছ বলেই অজানাকে জ্ঞানের সীমানায় ঢুকতে দাও না, ছবির মধ্যে আত্মা বেচারিও ঢোকার পথ খুঁজে পায় না। গলদ তোমার এইখানেই। একটু যদি কম জানতে...'

বোমার মতো ফেটে পড়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। খোদ শয়তানের মুখে এ ধরনের সমালোচনা সে আশা করেনি।

বলেছিল, 'খবরদার! আমার স্টুডিয়োতে বসে আমাকে হেনস্থা করলে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।'

বলতে বলতে তুলে ধরেছিল লাল রঙে বোঝাই শূকর-কেশের বারো নম্বর মোটা তুলিটা।

ভ্রুক্ষেপ করেনি জ্ঞানদাতা ছবি—'খাঁটি শিল্পী জেনো ছেলেমানুষের মতো অজ্ঞান হয়, জ্ঞানের মটমটানি থাকে না ভেতরে। যে শিল্পী নিজের সৃষ্টি নিয়ে তত্ত্ব রচনা করে চলে, সে কিন্তু শিল্পী থাকে না—সমালোচক হয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়াও দাঁড়াও! লাল রংটা তুললে কেন?'

'লালে লাল করে দেব বলে—লাল পরদা বানিয়ে ছাড়ব তোমাকে। আমারই স্টুডিয়োতে বসে আমাকে লেকচার দেওয়া?'

শুনেই নাকি দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল ছবি—'অত হড়বড় করার কী আছে? কথাটা শেষ করতে দাও?'

'না...'

'শোন, শোন, তোমার ভালো করব বলেই এসেছি আমি। প্রেরণা জিনিসটা তোমার মধ্যেই নেই। আমি জুগিয়ে যাব। কোলনের ক্যাথিড্রালের নাম শুনেছ? শয়তানের সেতু?'

'রাবিশ! তোমার কথা শুনে বস্তাপচা সস্তা নাম কিনে নরকে তলিয়ে যাই আর কী! নাও ধর! ফিরে যাও জাহান্নমে!'

হ্যারিঙ্গওয়ের মাথায় নাকি তখন রক্ত চড়ে গিয়েছিল। একতাল লাল রং নিয়ে গুঁজে দিয়েছিল ছবির প্রাণীর মুখের মধ্যে। ভীষণ চমকে গিয়ে থু-থু করে রং ফেলবার চেষ্টা করেছিল ইতালিয়ান বেচারা।

তারপরেই নাকি শুরু হয়ে গিয়েছিল অত্যাশ্চর্য ধস্তাধস্তি। লাল রং ছিটিয়ে গেছে হ্যারিঙ্গওয়ে সমানে—প্রতিবারই দুমড়ে-মুচড়ে শরীরটাকে তুলির পোঁচের সামনে

থেকে সরিয়ে নিয়েছে ছবির প্রাণী। সেই সঙ্গে দর কষাকষি চালিয়ে গেছে তারস্বরে—'জোড়ানিধি পাবে হে শিল্পী! দু'-দুটো উৎকৃষ্ট ছবি—বিনিময়ে যা বলব তা শুনতে হবে, কেমন? দাম পছন্দ?' এক ধ্যাবড়া রং ছুড়ে দিয়ে জবাবটা দিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে মুখে কোনও কথা না বলে!

মিনিটকয়েক কেবল ঘচাঘচ তুলি ছোড়া, রং ছিটকে পড়া আর ইতালিয়ানের তারস্বরে চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায়নি। হাত আর বাহু দিয়ে বেশ কয়েকটা তুলির পোঁচ রুখে দিলেও হ্যারিঙ্গওয়ে বাধা পেরিয়ে জ্যাবড়া জ্যাবড়া রং লাগিয়ে দিয়েছিল চোখে-মুখে-নাকে। কিন্তু এভাবে এন্তার রং ছড়ালে প্যালেটের রং তো ফুরাবেই। হ্যারিঙ্গওয়ের রং শূন্য হল একসময়ে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল হাপরের মতো। ছবি দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র গড়াগড়ি দিয়ে এল কসাইখানায়। ভিজে রং ঘাড় বেয়ে টসটস করে গড়িয়ে পড়ায় খুব অস্বস্তিও হচ্ছে ছবির প্রাণীর, তা সত্ত্বেও লড়াইয়ের প্রথম টক্করে জিতেছে সে-ই। সুতরাং লাল রঙের বেধড়ক মার খেয়েও গোঁ ছাড়েনি। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেই বলেছে, 'দু'-দুটো খাঁটি ছবির বিনিময়ে একখানা শয়তানের আত্মা-জাগানো ছবি'—অমনি ধাঁ করে স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে সোজা বউয়ের সাজঘরের দিকে দৌড়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে।

ফিরে এসেছিল এক টিন সবুজ এনামেল পেন্ট আর একটা মোটা বুরুশ নিয়ে। দেখেই গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল শিল্পী শয়তান, 'তিনটে... তিন-তিনটে সেরা ছবি—বিনিময়ে একখানা...'

হ্যারিঙ্গওয়ের সবুজ রং ঝপাত করে এসে পড়েছিল শয়তানের লাল চোখে।

গার্গল করার মতো ঘড়ঘড়ে গলায় তবু মিনতি জানিয়েছিল শয়তান, 'চারখানা মাস্টারপিস, বিনিময়ে...'

হ্যারিঙ্গওয়ে আর দাঁড়ায়? মোটা বুরুশের এক-এক পোঁচে সবুজে সবুজ করে আনল লাল রং-ছেটানো শয়তানকে। দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে গেল গোটা ক্যানভাসটা। গড়ানে রঙের ফাঁক দিয়ে চকিতের মতো উঁকি দিয়েছিল মুখটা। 'পাঁচখানা মাস্টারপিস—' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝপাস করে মুখের ওপরের এক পোঁচ মেরে দিয়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে। পরক্ষণেই গড়ানে রঙের ফাঁক থেকে একখানা লাল চোখ বেরিয়ে পড়ে বিষম ঘৃণায় প্যাটপ্যাট করে চেয়েছিল তার দিকে। হ্যারিঙ্গওয়ের হাত ঝড়ের মতো তৎক্ষণাৎ ধেয়ে গিয়েছিল সেইদিকে। অচিরেই চকচকে সবুজ এনামেল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। দ্রুত শুকিয়ে আসছে রং—তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ ধরে এদিকে-সেদিকে রঙের আস্তরণ ফুলে ফুলে উঠেছিল তলার চাপে। তারপর নিথর হয়ে গেল ক্যানভাস। মৃত্যু হল ছবির।

পাইপ ধরিয়ে বসে পড়েছিল হ্যারিঙ্গওয়ে।

শুধু একটা আপশোস থেকে গেছে আজও। ফোটো তুলে রাখা উচিত ছিল শয়তানের।

'The Remarkable Case of Davidson's Eyes' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The Story of Davidson's Eyes' নামে, ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে 'Pall Mall Budget' পত্রিকায়। যদিও ওয়েলসের খুব বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে একে গণ্য করা হয় না, গল্পটি সে যুগের রিমোট ভিউইং গোত্রের গল্পগুলির মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য। এরপর গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় বিখ্যাত সাই-ফাই পত্রিকা 'Amazing Stories'-তে, প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে। অদ্রীশের কলমে গল্পটি বাংলায় অনুদিত হয় অধুনালুপ্ত 'কিশোর মন' পত্রিকায় ১৯৮০-র দশকে 'ডেভিডসনের আশ্চর্য চোখ' নামে।

ডেভিডসনের আশ্চর্য চোখ
(The Remarkable Case of Davidson's Eyes)

সিডনি ডেভিডসনের ক্ষণস্থায়ী মানসিক ভ্রান্তি এমনিতেই রীতিমতো চমকপ্রদ। ওয়েড যে ব্যাখা শুনিয়েছেন, তা মানতে গেলে ব্যাপারটা আরও বেশি চমকপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়। দূর ভবিষ্যতে নাকি দারুণ দারুণ ঘটনা ঘটবে যোগাযোগব্যবস্থায়। পৃথিবীর এ পিঠ আর ও পিঠের মধ্যে দূরত্ব বলে আর কিছুই থাকবে না। স্বচ্ছন্দে মিনিট পাঁচেক কাটিয়ে আসা যাবে পৃথিবীর উলটোদিকে। ঘর ছেড়ে বেরতেই হবে না—চেয়ার ছেড়েও নড়তে হবে না। এমনও হতে পারে, লুকিয়ে-চুরিয়ে কোনও গোপন কাজই আর করা যাবে না। অদৃশ্য চাহনি খর-নজর রাখবে আমাদের প্রতিটি গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের ওপর। ভবিষ্যতে এমনি অনেক পিলে-চমকানো সম্ভাবনা সত্যি সত্যিই পিলে চমকে দেবে বাস্তবের চেহারা নিয়ে। ডেভিডসন এই সৃষ্টিছাড়া ভ্রান্তি-ঘোরে আক্রান্ত হয়েছিল আমার সামনেই। প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী আমিই। কাজেই কাহিনিটা কাগজে-কলমে প্রকাশ করার দায়িত্বও আমার।

ঘটনাস্থলে প্রথম হাজির হয়েছিলাম আমি—তাই আমি সেই মুহূর্তের প্রত্যক্ষদর্শী। আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটেছিল হার্লো টেকনিক্যাল কলেজে—হাইগেট আর্চওয়ের পাশেই। ছোট ঘরটায় ছিলাম আমি। নোট লিখছিলাম। ওজন করার সরঞ্জাম থাকে এই ঘরেই। কাজে অবশ্য মন দিতে পারছি না। লন্ডন শহরটার ঝুঁটি ধরে যেন ঝাঁকুনি দিচ্ছে সাংঘাতিক ঝড়। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। আচমকা একটা বাজের আওয়াজে কানের পরদা যেন ফালাফালা হয়ে গেল! দারুণ চমকে উঠেছিলাম। বজ্রপাতের কানফাটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা আওয়াজ যেন ভেসে এল কানে পাশের ঘর থেকে। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ। লেখা থামিয়ে কান খাড়া করলাম। সেকেন্ডকয়েক আর কোনও আওয়াজ পেলাম না। ঢেউখেলানো

দস্তা-ছাদের ওপর শিলাবৃষ্টির ঝমাঝম আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। ঠিক যেন শয়তানের আঙুলের বাদ্যি। খট খটা খট! খট খটা খট! খট খটা খট! তারপরেই আবার কানে এল আর-একটা আওয়াজ। দড়াম করে কী যেন আছড়ে পড়ল বেঞ্চি থেকে নিচে। বেশ ভারী জিনিস। না, এবার আর কানের ভুল নয়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে ঢুকলাম বড় ল্যাবরেটরির মধ্যে।

চিত্র ৯.১ হাত বাড়িয়ে বাতাসে কী যেন খামচে ধরার চেষ্টা করছে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বিদঘুটে একটা হাসির আওয়াজ শুনে। ডেভিডসনকে অপ্রকৃতিস্থের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ঘরের মাঝখানে। পা টলছে। চোখে-মুখে ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। দেখেই প্রথমে মনে হয়েছিল, নেশা করেছে। আমাকে লক্ষ্যই করল না। হাত বাড়িয়ে বাতাসে কী যেন খামচে ধরার চেষ্টা করছে দশ আঙুল দিয়ে। জিনিসটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ডেভিডসনের রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে, অদৃশ্য বস্তুটা রয়েছে চোখের গজখানেক সামনে। হাত বাড়িয়ে দিল খুব আস্তে আস্তে। বেশ দ্বিধার সঙ্গে খামচে ধরল বস্তুটা। কিন্তু পেল না কিছুই। আপন মনেই বললে, 'ব্যাপার কী বুঝছি না।' দশ আঙুল ছড়িয়ে হাত বুলিয়ে নিলে মুখে। 'কী আশ্চর্য!' বলেই পা তুলল বদ্ধপাগলের মতো—যেন পা আটকে যাচ্ছে মেঝেতে—বেগ পেতে হচ্ছে পা তুলতে।

চিৎকার করে বলেছিলাম, 'ডেভিডসন! হল কী তোমার?' বোঁ করে আমার দিকে ফিরে তাকাতে লাগল ডেভিডসন আমার আশপাশ দিয়ে। কখনও তাকায় আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে, কখনও দু'পাশে, কখনও সোজাসুজি আমার দিকেই।

অথচ দেখতে পেয়েছে বলে মনেও হল না। বিড়বিড় করে বললে নিজের মনে—'ঢেউ! ঢেউ! পালতোলা জাহাজটাও কী সুন্দর। বেলোজের গলা শুনলাম না? হ্যাঁ, বেলোজের গলাই তো বটে! না, ভুল হয়নি। হ্যাল্লো? তুমি কোথায়?' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল গলার শির তুলে।

আমি ভাবলাম বুঝি ফচকেমি শুরু করেছে ডেভিডসন। তারপরেই দেখলাম, তার পায়ের কাছে ভেঙেচুরে পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরির সবচেয়ে ভালো ইলেকট্রোমিটারটা। বললাম, 'কী চ্যাংড়ামি হচ্ছে ডেভিডসন? ইলেকট্রোমিটারটা ভাঙলে কেন?'

'আরে গেল যা! বেলোজই তো চেঁচাচ্ছে। ইলেকট্রোমিটার ভেঙেছি? বেলোজ! এ বেলোজ! কোথায় তুমি?' বলেই আচমকা টলতে টলতে এগিয়ে এল আমার দিকে। বেঞ্চির সামনে এসেই যেন কুঁচকে গেল। 'মাখনের মধ্যে পা চালিয়ে এলাম যেন এতক্ষণ। এখন তো আর পারছি না।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল মাতালের মতো।

এবার ভয় পেলাম। বললাম, 'কী হল তোমার?'

ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে ঘুরে ঘুরে আমাকে খুঁজল ডেভিডসন। বললে আপন মনে, 'বেলোজের গলা। কিন্তু—বেলোজ! কী ইয়ারকি হচ্ছে? সামনে এসো-না!'

ডেভিডসন কি হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে? সন্দেহটা বিদ্যুৎঝলকের মতোই ঝলসে উঠল মাথার মধ্যে। টেবিলটাকে পাক দিয়ে ওর হাতে হাত রাখলাম, সাংঘাতিক চমকে উঠল ডেভিডসন। জীবনে এভাবে চমকে উঠতে কাউকে দেখিনি। আতঙ্কে বিকৃত মুখভঙ্গি করে দাঁড়াল আত্মরক্ষার ভঙ্গিমায়। সেই সঙ্গে সেই অর্থহীন চিৎকার—'যাচ্চলে! এ আবার কে?'

'আমি—ডেভিডসন—আমি বেলোজ!'

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ডেভিডসন—আমাকে ফুঁড়ে—আমার মধ্যে দিয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেল অনেক দূর!

তারপরই শুরু হল বিড়বিড় বকুনি। নিজের মনেই বকে চলেছে—আমার উদ্দেশে বলছে না কিছুই—'এই তো দিনের আলো... ঝকঝক করছে সমুদ্রসৈকত। লুকিয়ে থাকবে কোথায়?' পাগলের মতো চাইল ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে। 'দেখি তো কোথায়?' আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েই ধাঁ করে ধেয়ে গেল সটান বড় ইলেকট্রোম্যাগনেটটা লক্ষ্য করে—পরক্ষণেই ধাঁই করে এক ধাক্কা। পরে দেখেছিলাম, কাঁধ আর চোয়ালের হাড়ে কালশিটে পড়ে থেঁতলে গিয়েছিল এইভাবে দমাস করে আছড়ে পড়ায়। যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে এক পা পেছিয়ে এসে সে কী গোঙানি—'হে

ভগবান! এ কী হল আমার!' বিষম আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত খামচে ধরে—ম্যাগনেট চোট দিয়েছিল সেখানেও।

উদ্ভট এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমি কিন্তু ততক্ষণে যেমন উত্তেজিত, তেমনি ভয় পেয়েছি। তা সত্ত্বেও অভয় দিয়েছিলাম মিনমিনে স্বরে। ও কিন্তু আমার গলা শুনেই আবার আগের মতোই আঁতকে উঠেছিল একটু বেশিরকমভাবেই। কেশে গলা সাফ করে পরিষ্কারভাবে আবার অভয় দিতে ও জানতে চেয়েছিল আমিই বেলোজ কি না।

'কেন? চোখে দেখতে পাচ্ছ না?' বলেছিলাম আমি। আবার সেই বিতিকিচ্ছিরি হাসি হেসেছিল ডেভিডসন। নিজেকেই নাকি দেখতে পাচ্ছে না, আমাকে দেখার প্রশ্নই উঠছে না!

আমি বলেছিলাম, 'সে কী! ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনেই।'

'ল্যাবরেটরি!' বিমূঢ় স্বরে জবাব দিয়েছিল ডেভিডসন—'ল্যাবরেটরিতে তো ছিলাম দারুণ ঝলকে চোখ ঝলসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। এখন তো সেখানে নেই। যাক গে! জাহাজটা দেখছ?'

'জাহাজ? কী আবোল-তাবোল বকছ?'

তেড়ে উঠেছিল ডেভিডসন। স্পষ্ট দেখছে, জাহাজ ভাসছে জলে, ঢেউ নাচছে সমুদ্রে—বললেই হল জাহাজ নেই! তাহলে নিশ্চয় অক্কা পেয়েছি দু'জনেই। কিন্তু মজা তো সেখানেই। মরে গেলে কি দেহ থাকে? দেহের যন্ত্রণা থাকে? ওর নাকি দেহ আছে—কিন্তু দেহটাকে বাগে আনতে পারছে না কিছুতেই। ধমক দিয়েছিলাম আমি। পাগলামির একটা সীমা আছে। বহাল তবিয়তে ল্যাবরেটরির মধ্যে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ আর জাহাজ দেখা যায়? এইমাত্র একটা ইলেকট্রোমিটার ভাঙা হল তো এইখানেই—বয়েস এসেই তো একহাত নেবে।

ক্রায়োহাইড্রেটসের রেখাচিত্রের দিকে যেতে যেতে ডেভিডসন বলেছিল, 'কালা হয়ে গেলাম নাকি? কামান ছুড়েছে জাহাজ থেকে—ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি—আওয়াজ তো পেলাম না।'

এ তো আচ্ছা জ্বালা! আবার হাত রেখেছিলাম ওর হাতে। এবার আর ভূত দেখার মতো চমকে ওঠেনি। বলেছিল অনেকটা আত্মস্থ স্বরে, 'তবে কি দু'জনেই অদৃশ্য দেহ পেয়ে বসেছি? বেলোজ, দেখতে পাচ্ছ না? নৌকো আসছে—ডাঙার দিকে আসছে—দেখছ?'

'ডেভিডসন!' জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলাম, 'জাগ, বন্ধু, জাগ!'

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকেছিল বয়েস। ওর গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার ডেভিডসনের—'বয়েস! তুমিও মারা গেছ! কী সর্বনাশ!'

বয়েসকে তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাপারটা। ঘুমের ঘোরে হাঁটাচলার রোগে পেয়েছে নিশ্চয় ডেভিডসনকে। শুনেই কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল বয়েসের। ঘোর কাটিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলাম দু'জনে। প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল। ডেভিডসন নিজেও প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু মনটা পড়ে রয়েছে যেন সৈকত আর জাহাজের দিকে। মরীচিকা কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই। ছায়ামায়ায় ভরা বীক্ষণাগারের মধ্যে ও নাকি সমানে দেখতে পাচ্ছে পাল আর জাহাজ, নৌকো আর ঢেউ। শুনলেও গা শিরশির করে।

বেশ বুঝলাম, চোখের দৃষ্টি একেবারেই হারিয়েছে। নিতান্ত অসহায়। দু'জনে দু'পাশ থেকে কনুই ধরে করিডর বরাবর হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম বয়েসের প্রাইভেট ঘরে।

ডেভিডসনের মনে, চোখে ভাসছে কিন্তু সেই অবাস্তব জাহাজ। বয়েসও ছেলে-ভোলানোর মতো সায় দিয়ে গেছে সমানে। ঘরে পৌঁছে খবর পাঠিয়েছিলাম কলেজের ডিন বুড়ো ওয়েডকে। ওঁর গলা শোনার পর একটু যেন শান্ত হয়েছিল ডেভিডসন। ঘ্যানর ঘ্যানর কিন্তু কমেনি। জানতে চেয়েছিল, হাত দু'খানা তার কোন চুলোয়—দেখা যাচ্ছে না কেন? কোমরসমান উঁচু জমির মধ্যে দিয়েই বা তাকে হাঁটিয়ে আনা হল কেন? শুনে-টুনে ভুরু-কপাল কুঁচকে চেয়ে রইলেন বুড়ো ওয়েড। তারপর ডেভিডসনের হাতখানা তুলে ধরে কৌচ ছুঁইয়ে বললেন, 'এই তো তোমার হাত—হাত দিয়েছ কৌচে—প্রফেসার বয়েসের প্রাইভেট রুমে। ঘোড়ার চুল-ঠাসা কুশন—তা-ই না?'

হাত বুলিয়ে আরও ঘাবড়ে গিয়েছিল ডেভিডসন। হাতে টের পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চোখে তো দেখছে না।

'তাহলে দেখছটা কী?' জানতে চেয়েছিলেন ওয়েড। ডেভিডসন আবার আরম্ভ করেছিল একই ধানাইপানাই। রাশি রাশি বালি, ভাঙা ঝিনুক ছাড়া চোখে তো আর কিছুই পড়ছে না ঠিক এই জায়গাটায়।

ওয়েড আরও খানকয়েক জিনিস ধরিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিডসনের হাতে। জানতে চেয়েছিলেন জিনিসগুলো কী। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলেন মুখের চেহারা।

কিন্তু জবাবটা এসেছিল খাপছাড়া—'জাহাজ নোঙর ফেলছে মনে হচ্ছে?' আত্মগত স্বর ডেভিডসনের।

মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন ওয়েড। জাহাজ নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। মরীচিকা-দর্শন মানেটা কি জানা আছে ডেভিডসনের?

'একটু একটু,' আনমনাভাবে বলেছিল ডেভিডসন!

'যা দেখছ, সবই মরীচিকা।'

‘বিশপ বার্কলে,’ আবার সেই খাপছাড়া জবাব।

‘দূর! পাদরির দরকার হবে কেন? দিব্যি বেঁচে রয়েছ। তবে চোখের গোলমাল হয়েছে দেখা যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ, হাত বুলিয়ে টের পাচ্ছ—অথচ দেখতে পাচ্ছ না। বুঝেছ?’

‘খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি,’ চোখ ডলে বলেছিল ডেভিডসন।

‘হয়েছে, হয়েছে। যা দেখছ, তা নিয়ে মাথাটাকে আর কষ্ট দিয়ো না। গাড়ি আনাচ্ছি—বেলোজ আর আমি পৌঁছে দেব বাড়িতে।’

‘দাঁড়ান।—ধরে বসিয়ে দেবেন?... ঠিক আছে... এবার বলুন গোড়া থেকে ব্যাপারটা কী?’

ধৈর্য না হারিয়ে পুনরাবৃত্তি করে গেলেন ওয়েড। চোখ মুদে কপালে হাত রেখে সব শুনল ডেভিডসন। তারপর বললে চোখ মুদেই, ‘এখন তো মনে হচ্ছে, সবই ঠিক আছে। ইংল্যান্ডেই রয়েছি। বেলোজ বসে রয়েছে পাশে, কৌচে। অন্ধকার।’

বলেই খুলল চোখ—‘ওই দেখা যাচ্ছে সূর্য। জাহাজ। পাগলা সমুদ্র। উড়ন্ত পাখি। সত্যি, একেবারে সত্যি। বসে রয়েছি বালির ঢিপিতে।’

চোখ ঢাকা দিয়ে হেঁট হয়েই ফের চোখ খুলে যেন ককিয়ে উঠল পরক্ষণেই —‘কালো সমুদ্র আর সূর্যোদয়! তা সত্ত্বেও কিন্তু বসে রয়েছি বয়েসের ঘরে—ওরই সোফায়!... এ কী হল আমার!’

সেই শুরু। ঝাড়া তিন-তিনটে হপ্তা চলেছিল এই বিচিত্র ভোগান্তি। আক্কেল গুড়ুম করে ছেড়েছিল আমাদের ডেভিডসনের দু’-দুটো চোখ, যে চোখে দৃষ্টি আছে, অথচ দৃষ্টি নেই। যেখানে বসে, সেখানকার কিছুই দেখছে না—দেখছে অন্য এক জায়গার দৃশ্য। অন্ধ হওয়াও বরং এর চাইতে ভালো। ওর সেই অসহায় অবস্থা ভাবলেও কষ্ট হয়। সদ্য ডিম-ফোটা পাখির ছানাকে যেভাবে খাইয়ে দিতে হয়, সেইভাবেই তাকে খাওয়াতে হয়েছে দিনের পর দিন, হাত ধরে নিয়ে যেতে হয়েছে কলতলায়, জামাকাপড় খুলে আবার পরিয়ে দিতে হয়েছে বাচ্চা ছেলের মতো। নিজের চেষ্টায় হাঁটতে গেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দেওয়ালে বা দরজায়—হোঁচট খেয়েছে পায়ের কাছে রাখা জিনিসের ওপর। দু’-একদিন পরে অবশ্য আমাদের দেখতে না পেলেও গলা শুনে আর অমন আঁতকে উঠত না। আমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বোন এসে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ডেভিডসন আশ মিটিয়ে শোনাত সাগর আর সৈকতের অলীক কাহিনি। কলেজ থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে আর-এক ফ্যাসাদ। বাড়ি তো সেই হ্যাম্পস্টিড গ্রামে। গাড়ি নাকি ওকে নিয়ে সোজা একটা বালিয়াড়ি ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। চোখে কিছু দেখতে পায়নি... অন্ধকার... কুচকুচে অন্ধকার। ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার পর আবার

চোখে পড়েছে গাছ, পাথর, নিরেট জিনিস। গাড়ি নাকি এই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই ওকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে—অথচ গাছ, পাথর, নিরেট বস্তু বালিয়াড়িটার মতোই ওকে আটকে রাখতে পারেনি। বাড়ি পৌঁছে ওপরতলার ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে কী পরিত্রাহি চিৎকার। কাল্পনিক দেশের পাথুরে জমির তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে শূন্যে তোলা হচ্ছে কেন? পড়ে গেলে ছাতু হয়ে যাবে যে! ডিমের মতো ফট করে ফেটে যাবে মাথার খুলি। একনাগাড়ে এই কাঁইমাই সহ্য করা যায়? নামিয়ে আনা হল একতলায়। বাবার কনসাল্টিং রুমের একটা সোফায় বসে তবে নিশ্চিন্ত হল ডেভিডসন।

দ্বীপটার বর্ণনা শুনেছিলাম ওরই মুখে। মন দমে যাওয়ায় মতো জায়গা। গাছপালা অতি সামান্যই। বেশির ভাগই নেড়া পাথর, পেঙ্গুইন আছে বিস্তর, পাথর সাদা হয়ে থাকে—সংখ্যায় এত, দেখতে অতি বিচ্ছিরি, সমুদ্র মাঝেমধ্যে দামাল। প্রথম দু'-একদিনের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ও দেখেছে। বজ্রপাত দেখেছে, বিদ্যুতের চমক দেখে নিজেই চমকে চমকে উঠে সমানে চেঁচিয়ে গেছে—কিন্তু বজ্রের আওয়াজ, মেঘ ডাকার গুরগুর শব্দ কানে ভেসে আসেনি। নিঃশব্দ সেই বজ্রপাত নাকি এমনই রোমাঞ্চকর যে ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বার দুয়েক বালির ওপর সিল মাছ উঠে এসেছে। পেঙ্গুইনরা নাকি ওর দেহ ফুঁড়ে হেলেদুলে দিব্যি চলে গিয়েছে—কারও কোনও অসুবিধে হয়নি। ওর শুয়ে থাকার জন্যে পেঙ্গুইনরা তিলমাত্র বিচলিত বোধ করেনি।

অদ্ভুত একটা ব্যাপার বেশ মনে আছে। সিগারেট খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল ডেভিডসনের। আঙুলে পাইপ গুঁজে দিয়েছিলাম। কোটর থেকে চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বার করে এনেও সিগারেট বা পাইপ কোনওটাই দেখতে পায়নি। ধরিয়ে দিয়েছিলাম সিগারেট। টেনে কোনও স্বাদ পায়নি। এ ব্যাপার আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ধোঁয়া না দেখতে পেলে তামাক খাওয়ার মজা পাওয়া যায় না।

আশ্চর্য দর্শনের সবচেয়ে অদ্ভুত অংশটা শুরু হয়েছিল ঠেলা-চেয়ারে বসিয়ে ওকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে। আমার বোন গিয়েছিল সঙ্গে। কেঁদে ফেলেছিল নাকি ডেভিডসন। কাকুতিমিনতি করেছিল বোনের কাছে। ভয়াবহ এই অন্ধকারে আর সে থাকতে পারছে না। অসহ্য! অসহ্য! বোনের হাত খামচে ধরে বলেছিল কাঁদতে কাঁদতে, 'নিয়ে চল, নিয়ে চল এই অন্ধকারের বাইরে—নইলে আর বাঁচব না।' খুলে বলতে পারেনি ডেভিডসন। বোন ওকে নিয়ে বাড়িমুখে রওনা হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। চড়াই ভেঙে হ্যাম্পস্টিডের দিকে যেতে যেতেই বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়েছিল বন্ধুবর। আবার নাকি তারা দেখা যাচ্ছে—অথচ তখন সূর্য মাথার ওপর।

পরে আমাকে বলেছিল, 'মনে হচ্ছিল যেন জলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে—বাধা দিতে পারছি না। প্রথমে অতটা ভয় পাইনি। যদিও তখন নিশুতি রাত—কিন্তু বড় সুন্দর রাত।

'হ্যাঁ। এখানে যখন দিন, ওখানে তখন রাত।... জলের মধ্যে সটান ঢুকে গেলাম তারপরেই। ফুলে ফুলে উঠছে জল—চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত পর্যন্ত—ঠিক যেন চকচকে চামড়া দিয়ে ঢাকা ফোঁপরা গহ্বরের মধ্যে নেমে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। নামছি ঢালু পথে। জল উঠে এল চোখ পর্যন্ত। তারপর চলে এলাম জলের তলায়। চকচকে চামড়া টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে ফের জুড়ে গেল মাথার ওপর। চাঁদ লাফ দিয়ে উঠল আকাশে, সবুজ চাঁদ। অস্পষ্ট। চারপাশে খেলছে আবছা দ্যুতিময় মাছ। ঠিক যেন কাচের মাছ—গা থেকে আলো ছিটকে যাচ্ছে। সামুদ্রিক উদ্ভিদের একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নেমে এলাম আস্তে আস্তে—তেলতেলে আভা বেরুচ্ছে জঙ্গল থেকে। নামছি, নামছি, আরও নামছি। একে একে নিবে গেল একটার পর একটা তারা। আরও সবুজ হয়ে এল চাঁদ—আরও গাঢ়। বেগুনি-লাল হয়ে এল সামুদ্রিক উদ্ভিদ। রহস্যময় সেই আলো-আঁধারির মধ্যে সবই থিরথির করে কাঁপছে আবছাভাবে। কানে ভেসে আসছে একটানা শব্দের পর শব্দ—এই জগতের শব্দ... চেয়ার গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ... আশপাশে জুতো মশমশিয়ে লোকজনের হাঁটাচলার শব্দ... দূরে খবরের কাগজ ফেরি করার চিৎকার—'নেমে গেলাম জলের আরও গভীরে। কালির মতো কালো হয়ে এল চারদিক... নিঃসীম সেই অন্ধকারে বাইরের কোনও আলো ঢোকবার যেন অধিকার নেই... অন্ধকার... অন্ধকার... সীমাহীন নিবিড় তমিস্রা ভেদ করে চলেছি তো চলেইছি... ফসফরাস-দ্যুতি বিকিরণ করে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে অন্ধকারের প্রাণীরা... গভীর জলের উদ্ভিদের সর্পিল শাখা নড়ছে স্পিরিট-ল্যাম্পের জ্বলন্ত শিখার মতো... আরও কিছুক্ষণ পরে উদ্ভিদও আর চোখে পড়ল না। বিকট হাঁ আর ড্যাবডেবে চোখ মেলে সটান আমাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। হাঁ-মুখ দেখে প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম—তারপর কিছুই টের পেলাম না—মাছেরাও পেল না। সমুদ্রে যে এরকম বিকট মাছ আছে, কোনওদিন কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি।

'আলোকময় পেনসিল দিয়ে আঁকা যেন মাছগুলো—কিনারা ঘিরে ঠিকরে যাচ্ছে আগুন। কিলবিলে অনেকগুলো হাত মেলে বিকটাকার একটা প্রাণী পেছনদিকে সাঁতরে আসতেই আঁতকে উঠেছিলাম। তারপরেই কাঠ হয়ে গেলাম অস্পষ্ট বিশাল একটা আলোকপুঞ্জকে ধীরে ধীরে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে দেখে। জমাট আঁধারের মধ্যে থেকে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বহু দূরের চাপ-বাঁধা আলোর ডেলা। কাছে আসতেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল আলোর কণা।

মাছ। ভাসমান কী যেন একটা ঘিরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে দ্যুতিময় মাছ। আমি চেয়ারে বসে সটান চলেছি সেইদিকেই। আরও কাছে... আরও কাছে... হঠাৎ দেখলাম একটা ভাঙা বরগা... মাছেদের আলোয় তুলকালাম কাণ্ডের মধ্যে মাথার ওপরে ভাসতে দেখলাম লম্বা কাঠখানা... জমাট কালো অন্ধকারের মতো একটা জাহাজের খোলও দেখলাম, কাত হয়ে রয়েছে মাথার ওপর... অন্ধকার কিন্তু ফিকে হয়ে এসেছে ফসফরাস-দ্যুতিতে... মাছেদের ঠোকরানিতে স্ফুলিঙ্গের মতো ফসফরাস-দ্যুতি ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে কতকগুলো আকৃতি থেকে... আতঙ্কে দমবন্ধ হয়ে এসেছিল আমার... চেঁচিয়ে ডেকেছিলাম তোমার বোনকে... আধখাওয়া সেই মড়াদের গায়ে অজস্র ছেঁদা... আমাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেইদিকেই... মড়াদের গায়ের ফুটোগুলোর দিকেই...! উঃ! কী বীভৎস! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, তাই না বেলোজ? দেখ তো হাতটা?'

তিন-তিনটে সপ্তাহ সেই অপচ্ছায়া-জগতের মধ্যে কাটিয়েছে ডেভিডসন—নিজের চারপাশের এই জগৎকে দেখতে পায়নি একটুও। তারপর এক মঙ্গলবারে দেখা করতে যেতেই ওর বুড়ো বাবার মুখোমুখি হলাম করিডরে। ওভারকোটে হাত গলাতে গলাতে ছুটছেন। আমাকে দেখেই সজল চোখে ধরা গলায় বললেন, 'বেলোজ, ছেলেটা এবার ঠিক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছে... নিজের বুড়ো আঙুলটা এদ্দিনে দেখতে পেয়েছে।'

দৌড়ালাম। ডেভিডসন একটা বই চোখের সামনে ধরে বসে ছিল—হাসছিল আপন মনে—অনেকটা পাগলের মতো। বলেছিল, 'কী আশ্চর্য! এইখানটা... এই জায়গাটা একটুখানি দেখা যাচ্ছে—' আঙুল রেখেছিল বইয়ের পাতায় এক জায়গায়—'পাথরের ওপর বসে রয়েছি কিন্তু এখনও। বড় গোলমাল করছে পেঙ্গুইনগুলো। দূরে মাঝে মাঝে দেখছি একটা তিমিকে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এইখানে কিছু ধর—দেখতে পাব... খুব অস্পষ্ট... ভাঙা ভাঙা... তবুও দেখা যাচ্ছে... অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়ার মতো। আজ সকালে জামাকাপড় পরানোর সময়ে প্রথম দেখেছিলাম। নারকীয় এই অপচ্ছায়া-জগতের মধ্যে যেন একটা ফুটো। রাখ—তোমার হাতটা রাখ এইখানে... না... না... ওখানে নয়। হ্যাঁ... ঠিক হয়েছে! দেখতে পাচ্ছি... তোমারই বুড়ো আঙুল... তলার দিক আর শার্টের হাতার একটুখানি। অন্ধকার আকাশ ফুটো করে যেন বেরিয়ে আছে তোমার ভূতুড়ে হাতের একটুখানি! ঠিক পাশেই ভাসছে একদঙ্গল নক্ষত্র!'

সেই থেকেই একটু একটু করে সেরে উঠতে লাগল ডেভিডসন। অপচ্ছায়া-জগৎ দেখে যে বর্ণনা দিয়েছিল—নিখুঁত সেই বর্ণনার মতোই দৃশ্য পরিবর্তনের এই বর্ণনাও বিশ্বাস না করে পারা যায় না। অপচ্ছায়া-জগতের জায়গায় জায়গায় যেন ছেঁদা হয়ে

যাচ্ছে... ছায়াবাজির মতো অলীক জগৎ ছিঁড়েখুঁড়ে উড়ে যাচ্ছে... অর্ধস্বচ্ছ ফুটোর মধ্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে স্বচ্ছ, অস্পষ্ট এই সত্যিকারের জগতের ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্য। ক্রুশঃ পরিধি বেড়েছে ফুটোগুলোর... বেড়েছে সংখ্যায়... আস্তে আস্তে গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সত্যিকারের এই জগতের দৃশ্যর ওপর—অলীক অপচ্ছায়া-জগৎ অস্পষ্ট ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে দেখা গিয়েছে এখানে-সেখানে। চোখের ওপর অন্ধত্ব দানা আকারে যেন জমে রয়েছে—সেই দানার জায়গাগুলোয় তখনও ঠেলাঠেলি করে ফুটে উঠছে অবাস্তব সেই জগতের মরীচিকাদৃশ্য। নিজে থেকে উঠে বসা, চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া, ধূমপান করা, বই পড়ায় অভ্যস্ত হল আস্তে আস্তে। দুটো ছবি ওপর-ওপর থাকায় প্রথমটা একটু গোলমাল লাগত। তা-ও সয়ে গেল দু'দিনেই। অলীক মায়াজগতের দৃশ্য আর বাস্তব জগতের দৃশ্য আলাদা করে নিতে পারল সহজেই।

প্রথমটা দারুণ খুশি হয়েছিল ডেভিডসন। ফেটে পড়েছিল মুক্তি পাওয়ার আনন্দে। তারপরেই শুরু হল উলটো টান। বিলীয়মান আশ্চর্য দ্বীপ, বিচিত্র সমুদ্র, পেঙ্গুইনের পাল, সমুদ্রের গভীরে ভাসমান জাহাজের খোল আবার ভালো করে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। একা একা ছুটে যেত হ্যাম্পস্টিডের নিচু অঞ্চলে। কিন্তু সত্যিকারের দুনিয়ার চড়া রোদ দু'দিনেই মিথ্যে দুনিয়ার রাতের অন্ধকারকে মুছে দিলে একেবারে। ছেঁড়া-ছেঁড়া দৃশ্য একটু একটু করে ফিকে হতে হতে একেবারেই গেল মিলিয়ে। তা সত্ত্বেও গভীর রাতে অন্ধকার ঘরে দেখতে পেত অলীক দ্বীপের রোদে তেতে-ওঠা সাদা পাথর, পেঙ্গুইনদের হেলেদুলে চলা। আস্তে আস্তে এ দৃশ্যও সরে গেল তার চোখের সামনে থেকে নিশুতি রাতেও। আমার বোনকে বিয়ে করার পর অলীকদর্শন তিরোহিত হল একেবারেই।

সবচেয়ে উদ্ভট ঘটনাটায় এবার আসা যাক। বিয়ের দু'বছর পরে ডিনার খেতে গিয়েছিলাম ডেভিডসন-দম্পতির সঙ্গে। খাওয়াদাওয়ার পর অ্যাটকিন্স নামে একজন ভদ্রলোক এলেন ঘরে। রয়াল নেভির লেফটেন্যান্ট। ভারী চমৎকার মানুষ। আড্ডাবাজ। আসর জমাতে ওস্তাদ। কথায় কথায় পকেট থেকে একটা ফোটো বার করে দেখিয়েছিলেন আমাদের। ছবিটা একটা জাহাজের।

দেখেই আঁতকে উঠেছিল ডেভিডসন!

সেই জাহাজ! যে জাহাজ সে বারবার দেখেছে অলীকদর্শনে—নিখুঁত বর্ণনাও শুনিয়েছে।

অ্যাটকিন্স তো অবাক! এ জাহাজ ডেভিডসন দেখবে কী করে? অ্যান্টিপোড আইল্যান্ডের দক্ষিণে জাহাজ নোঙর করে অ্যাটকিন্স নৌকো নিয়ে দ্বীপে নেমেছিলেন পেঙ্গুইনের ডিম আনবেন বলে। দ্বীপের বর্ণনা, পেঙ্গুইনের বর্ণনা, জাহাজের বর্ণনা

কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল ডেভিডসনের বর্ণনার সঙ্গে। হ্যাঁ, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় উঠেছিল সেই রাতে। বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল দ্বীপে।

সব শোনবার পর পরিষ্কার বোঝা গেল, সেরাতের সবকিছুই ডেভিডসন দেখেছে। এই লন্ডন শহরে সে যখন এখানে-সেখানে ঘুরছে আমাদের সঙ্গে—অব্যাখ্যাতভাবে তার দৃষ্টিশক্তি বহু দূরের সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়েছে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। কীভাবে, আজও তা রহস্য।

ডেভিডসনের আশ্চর্য চোখের অত্যাশ্চর্য কাহিনির পরিসমাপ্তি এইখানেই। দূরের দৃশ্য চামড়ার চোখ দিয়ে দেখার এত বড় নজির আর কেউ দিতে পারবেন না। ব্যাখ্যা অনেকরকমই শোনা যাচ্ছে—প্রফেসার ওয়েডের ব্যাখ্যাটাই সবচেয়ে জোরালো। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা চতুর্থ মাত্রিক জগৎকে কেন্দ্র করে রচিত, 'স্থান' সম্পর্কে তত্ত্বকথাপূর্ণ ভারী নিবন্ধ—ফোর্থ ডাইমেনশনের হেঁয়ালিতে পূর্ণ। দড়ি বা তার যেমন পাকিয়ে যায়, স্থান বা স্পেসও নাকি হঠাৎ পাকিয়ে গিয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। হাস্যকর ব্যাখ্যা, সন্দেহ নেই। এক্কেবারেই উদ্ভট। অবশ্য অঙ্ক জিনিসটা আমার মাথায় ঢোকে না কোনওকালেই। আট হাজার মাইলের ব্যবধান রয়েছে দুটো জায়গার মধ্যে—এটা একটা ঘটনা এবং কোনও তত্ত্বই এ ঘটনাকে উলটে দিতে পারে না। আমার এই জবর যুক্তি শুনে প্রফেসার শুধু বলেছিলেন, এক তা কাগজের ওপর দুটো বিন্দু এক গজ তফাতে রেখেও অনায়াসে মিলিয়ে দেওয়া যায় কাগজটাকে মুড়ে ধরলেই। ফোর্থ ডাইমেনশনের 'স্থান'ও নাকি ওইভাবে মোচড় খেয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। সুধী পাঠক-পাঠিকা হয়তো তাঁর এই যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারবেন। আমি পারিনি—পারবও না। প্রফেসারের আইডিয়া মাথায় আনতে গেলে মাথা ঘুরতে থাকে আমার। ডেভিডসন বড় ইলেকট্রোম্যাগনেটের দুই প্রান্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়েই নাকি এই বৈজ্ঞানিক বিস্ময়টি ঘটে যায় চকিতের মধ্যে, অস্বাভাবিক এক মোচড় মুচড়ে দেয় তার অক্ষিপটের মৌলকে—এবং সেটা ঘটে বজ্রপাতের ফলে শক্তিক্ষেত্র অকস্মাৎ পালটে যাওয়ার।

প্রফেসারের বিশ্বাস, এর পরিণামস্বরূপ, পৃথিবীর এক জায়গায় দেহ নিয়ে বিদ্যমান থেকে অপর জায়গায় শুধু চোখে দেখার জগৎ নিয়ে দিব্যি বসবাস করা অসম্ভব কিছু নয়। আইডিয়াটা সপ্রমাণ করার জন্যে কিছু এক্সপেরিমেন্টও করেছিলেন, কিন্তু কয়েকটা কুকুরকে অন্ধ করে দেওয়া ছাড়া ফললাভ কিছু ঘটেনি। বেশ কয়েক হপ্তা আর দেখা হয়নি প্রফেসারের সঙ্গে। জানি না এখনও তাঁর ওই ফ্যান্টাস্টিক তত্ত্ব নিয়ে হেদিয়ে মরছেন কি না। আমার কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস, ডেভিডসনের অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার মূল অন্যত্র—ফোর্থ ডাইমেনশনের উদ্ভট গণ্ডির মধ্যে অন্তত নয়।
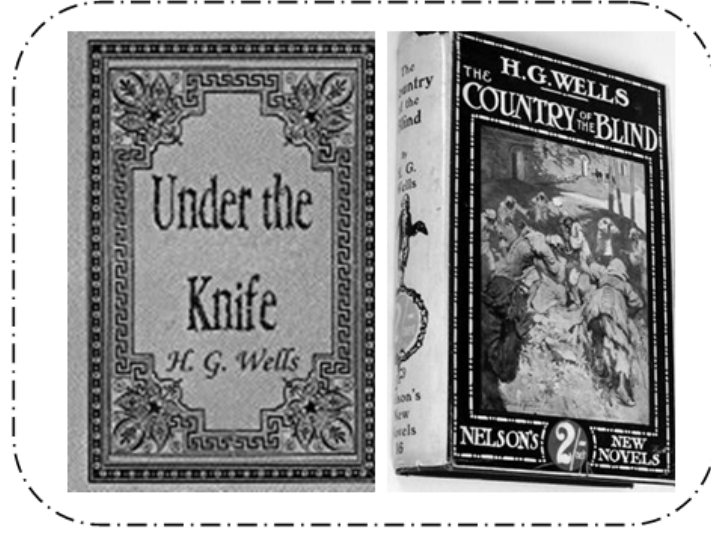
'Under the Knife' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The New Review' পত্রিকায় জানুয়ারি **১৮৯৬** সালে। **১৯১১** সালে প্রকাশিত 'The Country of the Blind and Other Stories' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়।

আত্মার ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন
(Under the Knife)

হ্যাডনের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে কেবলই ভাবছিলাম, কাল যদি মরে যাই তো কী হবে? বউ নেই যে কাঁদবে, বন্ধুবান্ধব যা আছে, তাদের ব্যাপারে আমি এমনই নিস্পৃহ যে, মোটেই শোকে বিহ্বল হবে না। বাল্যবন্ধু ছাড়া জীবনের শেষ ভাগে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী আর শুভাকাঙ্ক্ষীও জুটিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমি এতই উদাসীন যে, আমার মৃত্যুতে তাদের যেমন কোনও মাথাব্যথা নেই—আমারও তা নিয়ে অযথা মস্তিষ্কপীড়ন নেই। সুতরাং দুনিয়ায় কেউ কেঁদে ভাসিয়ে দেবে না কালকের অপারেশনে আমি অক্কা পেলে।

ভাবাবেগ জিনিসটা যেন একেবারেই মরে গেছে আমার ভেতরে। একেবারেই নির্বিকার। শরীর ভেঙে পড়ার লক্ষণ নিঃসন্দেহে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ খুব রক্তক্ষরণ হয়েছিল। মরতে বসেছিলাম। তখনকার সেই অনুভূতির ছিটেফোঁটাও আর নেই মনের ভেতরে—নিংড়ে বেরিয়ে গেছে বললেই চলে। নিবিড় প্রশান্তি—ভাগ্যের হাতে নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিলে যা হয়। বেশ কয়েক হপ্তা আগে অনুভূতি, উচ্চাশা, মমত্ববোধ—সবই ছিল পুরো মাত্রায়।

রক্তশূন্য হয়েছি আবার। হপ্তাখানেক কিছুই খেতে পারছি না। খিদেই নেই। মানুষ নামক প্রাণীটাকে চালিত করে যন্ত্রণা আর আনন্দবোধের চক্র। এই চক্র হঠাৎ আমার ভেতর থেকে সরে গেছে। তাই এই উদাসীনতা। ছোটখাটো ভয় আর আকাঙ্ক্ষা থেকেই বড় রকমের আবেগ, অনুভূতি, মমত্ববোধের সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটলেই অবসান ঘটে এই জটিল চক্রবর্তের। উদ্যম তিরোহিত হয়। তখন আর কিছুই থাকে না।

একটা কসাই-ছোকরার বারকোশে ধাঁই করে ধাক্কা খেতেই ছিঁড়ে গেল চিন্তার সুতো। ঘটনাটা ঘটল রিজেন্ট পার্ক ক্যানালের ব্রিজ পেরনোর সময়ে। নীলবসন ছোকরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে একটা কালো মালবাহী বড় নৌকোর দিকে। হাড় বার-করা সাদা ঘোড়া গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটাকে। ব্রিজের ওপরে হাত ধরে তিনটে খুশি-খুশি বাচ্চাকে নিয়ে আসছে একজন আয়া। উজ্জ্বল সবুজ গাছ, ঝকঝকে আকাশ, তরঙ্গায়িত কালো জল এবং বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণও নাড়া দিতে পারল না আমার অসাড় মনে।

কীসের পূর্বাভাস এই অসাড়তা? যুক্তিবুদ্ধির ধার তো ভোঁতা হয়নি। কেন এমন হচ্ছে, তা তো বেশ ভাবতে পারছি। অসাড়তা নয়, প্রশান্তি চেপে বসছে চেতনায়। মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ নাকি? মন জানতে পেরেছে আগে থেকেই? মৃত্যুর কনকনে আলিঙ্গনে দেহ ঠান্ডা হওয়ার আগেই কি মন নিজে থেকেই এইভাবে সরে আসে জড়জগৎ আর অনুভূতির জগৎ থেকে? দলছাড়া মনে হল নিজেকে। জীবন থেকে, চারপাশের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার দরুন কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিতাপের উদয় ঘটল না মনের মধ্যে। জীবনের চাঞ্চল্য চারদিকে। ছেলেমেয়েরা খেলছে, মালি-আয়ার সঙ্গে গল্প করছে, হাসতে হাসতে পাশ দিয়ে চলে গেল প্রাণবন্ত দু'টি তরুণ-তরুণী, রাস্তার পাশের গাছগুলো নতুন পাতা মেলে ধরছে সূর্যকিরণের দিকে, মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে ডালপালার মধ্যে। প্রাণময় এই জগতের অংশ ছিলাম আমিও। এখন নেই। ফুরিয়ে গেছে আমার ভূমিকা।

ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পা যেন আর চলছে না। বসলাম রাস্তার পাশের সবুজ চেয়ারে। বেশ গরম পড়েছে। ঢুলুনি এল বসতে-না-বসতেই। তলিয়ে গেলাম অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে। উদ্‌বেল চিন্তা ধুয়ে-মুছে গেল পুনর্জন্মের স্বপ্নদৃশ্যে। বসে রয়েছি চেয়ারেই, কিন্তু প্রাণ নেই দেহে। শুষ্ক, জীর্ণ দেহ। একটা চোখ খোবলাচ্ছে কয়েকটা পাখি। 'জাগ' বলে কে হেঁকে উঠতেই বিদ্রোহী হল যেন রাস্তার ধুলো আর ঘাসের তলাকার মাটির ঢিপি। রিজেন্ট পার্কের এই বাগানটাকে কবরখানা বলে কোনওদিনই ভাবতে পারিনি। সেই মুহূর্তে কিন্তু দেখলাম, যত দূর দু'চোখ যায়, কেবল কবর আর সমাধিস্তম্ভ। কাঁপছে, দুলছে, শিরশির করছে, কিলবিল করছে। কোথায় যেন একটা বিরাট গোলমাল চলেছে। জাগ্রত মড়ারা কবর ঠেলে উঠে আসতে চাইছে প্রাণপণে! রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। সাদা হাড় থেকে খসে পড়ছে লাল মাংস। 'জাগ' হাঁক আবার শোনা গেল কানের কাছে। কিন্তু দাঁতে দাঁত কামড়ে বসে রইলাম আমি। জাগুক সবাই, আমি জাগব না। দানোদের দলে ভিড়ব না। চাষাড়ে গলায় আবার 'জাগতে বলছি না?' বলেই কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল চোয়াড়ে লোকটা। টিকিট চাইছে বাগানের মালি।

পয়সা গুনে দিয়ে টিকিট পকেটস্থ করে, হাই তুলে উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে, চললাম ল্যাংহাম প্লেসের দিকে। আবার মৃত্যুর চিন্তা জলপ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল মনের ওপর। আর-একটু হলে গাড়িচাপা পড়তাম মোড়ের মাথায়। ধাক্কাটা গেল কাঁধের ওপর দিয়ে। রক্ত তো বেরলই, সেই সঙ্গে উত্তাল হল হৃদ্‌যন্ত্র। টলতে টলতে সরে এলাম পাশে। কালকের মৃত্যু-ধ্যান আর-একটু হলেই মৃত্যু ঘটিয়ে ছাড়ত এখুনি।

যা-ই হোক, সেই দিনের এবং তার পরের দিনের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। সময় যতই গড়িয়েছে, ততই নিশ্চিত হয়েছি। কাল অপারেশন হবে এবং আমিও মরব। বাড়ি ফিরে দেখলাম, প্রস্তুতিপর্ব সাঙ্গ হয়েছে। ঘর পরিষ্কার। সাদা চাদর ঝুলছে। নার্স মোতায়েন হয়েছে। জোর করেই শুতে পাঠাল সকাল সকাল।

বড় কুঁড়ে মনে হল নিজেকে সকালবেলা। সকালের ডাকে আসা খবরের কাগজ আর চিঠিপত্র নিয়ে বসলাম বটে, কিন্তু মন দিতে পারলাম না। আমার লেখা নতুন বইটায় কয়েক জায়গায় ত্রুটি আছে, ছাপার ভুলও আছে—লিখেছে স্কুলের বন্ধু অ্যাডিসন। বাকি চিঠিপত্র ব্যাবসা সংক্রান্ত। এক কাপ চা ছাড়া খেতে দেওয়া হল না কিছুই। পাঁজরায় যন্ত্রণাটা আরও বেড়েছে। কিন্তু অনুভব করতে পারছি না। রাত্রে ঘুমাইনি। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তেষ্টা পাচ্ছিল। সকালে কিন্তু বেশ ভালোই লাগল। সারারাত অতীতের ঘটনা ভেবেছি। ভোরের দিকে অমরত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঢুলেছি। ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে এল হ্যাডন—হাতে কালো ব্যাগ। মোব্রে এল তার পরেই। ওরা আসতে জবুথবু ভাবটা একটু কাটল। আটকোনা ছোট টেবিলটা খাটের পাশে এনে রাখল হ্যাডন। আমার দিকে পেছন ফিরে ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে রাখতে লাগল টেবিলে। শুনলাম স্টিলের ওপর স্টিল রাখার আওয়াজ। চিন্তাধারা আর ডোবা জলের মতো বদ্ধ নয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছুরি চালালে খুব লাগবে কি?

হ্যাডন বলেছিল, মোটেই না। ক্লোরোফর্ম করা হবে তো। আমার হার্ট নাকি দারুণ মজবুত। নাকে ভেসে এসেছিল ঘুমপাড়ানি ওষুধের মিষ্টি গন্ধ।

পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েই ক্লোরোফর্ম দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। প্রথমে মনে হয়েছিল, দম আটকে আসছে। মরতে চলেছি তো জানি, এবার লোপ পাবে জ্ঞান। হঠাৎ মনে হল, সে কী! মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হইনি তো এখনও। অনেক কর্তব্য যে এখনও বাকি। কী কর্তব্য তা অবশ্য জানি না, মনেও করতে পারলাম না, কী কাজ এখনও করা হয়নি। জীবনে কী কী আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূর্ণ রয়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। অথচ মরবার ইচ্ছেও হল না। শারীরিক অস্বস্তি যন্ত্রণার পর্যায়ে

পৌঁছেছে—বেশ উপলব্ধি করলাম। ছটফট করেছিলাম। তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। নৈঃশব্দ্য আর তমিস্রা গ্রাস করল আমাকে।

কত মিনিট কত সেকেন্ড জ্ঞান হারিয়েছিলাম, বলতে পারব না। হঠাৎ গা শিরশির-করা আবেগহীন অনুভূতির মধ্যে দিয়ে টের পেলাম, আমি মরিনি। দেহের খাঁচার মধ্যেই রয়েছি। কিন্তু যেন মুক্তি পেয়েছি। পুরোপুরি নয়। মাংসময় দেহে আটকে আছি ঠিকই, কিন্তু দেহটা যেন আর আমার নয়। কিছুই দেখিনি, কিছুই শুনিনি, তবুও যা যা ঘটেছে, তার সবই টের পেয়েছি—শোনা আর দেখার মতোই। হ্যাডন ঝুঁকে রয়েছে আমার ওপর, বিরাট একটা স্ক্যালপেল হাতে পাঁজরা কেটে ফালাফালা করছে মোব্রে। যন্ত্রণা নেই। মাংস কেটে যাচ্ছে টের পাচ্ছি—কিন্তু ভালোই লাগছে। যেন দু'জন দাবা খেলোয়াড়ের দান দেওয়া দেখছি—মজা লাগছে। কৌতূহল নিবিড়। হ্যাডনের মুখ শক্ত, হাত অচঞ্চল। কিন্তু অপারেশন যে সাকসেসফুল হবে না —এইরকম একটা ধারণা রয়েছে মনের মধ্যে। কী করে ওর মনের কথা টের পেলাম, তা বলতে পারব না।

মোব্রে কী ভাবছে, তা-ও টের পেয়েছিলাম। ও ভাবছিল, বিশেষজ্ঞ হয়েও হ্যাডন এত মন্থরগতি কেন? কী কী করা উচিত, বলতে চাইছে, মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো হাজার হাজার বুদ্‌বুদের মতো ঠেলে উঠছে। হ্যাডনের দক্ষ ক্ষিপ্র ছুরিচালনা দেখে মুগ্ধ হয়েছে, তা-ও টের পাচ্ছি ওর চেতনার বিস্ফোরণ অনুভব করে। হ্যাডনের দক্ষতা মোব্রের মাথার মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার ঘটাচ্ছে, তা-ও উপলব্ধি করছি। যকৃৎ খুলে বার করে নেওয়া দেখলাম। হতভম্ব হলাম নিজের অবস্থা দেখে। মরিনি। কিন্তু জীবিত সত্তা বলতে যা বোঝায়, তা-ও নই। বছরখানেক যে বিষণ্ণতায় ভুগেছি, আচম্বিতে তা উধাও হয়েছে। চিন্তা করছি, উপলব্ধি করছি—কিন্তু আবেগের ছিটেফোঁটাও অনুভব করছি না। জানি না আর কেউ এভাবে ক্লোরোফর্মে জ্ঞান হারিয়ে সবকিছু টের পেয়েছে কি না, অন্যের মনের মধ্যে ঢুকতে পেরেছে কি না, তারপরেও সব মনে রাখতে পেরেছে কি না।

মরিনি এখনও বলতে পেরেও এইটুকু বুঝলাম, মরতে আর দেরি নেই। ঢুকলাম হ্যাডনের মনের মধ্যে। ভয় পাচ্ছে একটা মূল শিরার শাখা কাটতে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর মানসিক দ্বন্দ্ব। গ্যালভানোমিটারের আয়নায় আলো কাঁপে যেভাবে থিরথির করে, ওর সজ্ঞান মনে তেমনি দুটো চিন্তার লড়াই চলছে। একটা আলো জোরালো হয়ে উঠছে। এই আলোয় দেখা যাচ্ছে ওর মনের ভাবনা—একটা কাটা শিরার ছবি। পরক্ষণেই জোরালো হয়ে উঠল আর-একটা আলোকময় চিন্তা—ভুল জায়গায় কাটা হয়েছে শিরা। ধস্তাধস্তি লেগে গেল দুটো আলোকময় সম্ভাবনাচিত্রে।

প্রথমটা জোর করে হটিয়ে দিলে দ্বিতীয়টাকে। ভয় পেয়েছে হ্যাডন। বেশি কেটে ফেললেও বিপদ, কম কেটে ফেললেও বিপদ।

আচমকা যেন লক গেট খুলে তোড়ে জল বেরিয়ে গেল। দোটানার চিন্তাপ্রবাহ হু-উ-উ-স্ করে বেরিয়ে গেল ওর চেতনাকেন্দ্রের আলোময় অঞ্চল থেকে। মনস্থির করে ফেলেছে হ্যাডন। টের পেলাম, শিরা কাটাও হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ছিটকে সরে গেল পেছনে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। বাদামি-বেগুনি রক্ত। সে কী আতঙ্ক হ্যাডনের। দুই ডাক্তারই আটকোনা টেবিল থেকে স্ক্যালপেল তুলে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিপর্যয় রোধ করার জন্যে। আমি কিন্তু জানলাম, মৃত্যু হল আমার সেই মুহূর্তেই—দেহটা অবশ্য তখনও আঁকড়ে রয়েছে আমাকে নাছোড়বান্দার মতো।

সবই উপলব্ধি করলাম। কিন্তু খুঁটিয়ে বর্ণনা আর দেব না। চেষ্টার ত্রুটি করেনি দু'জনে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে। জীবনে এত ধারালোভাবে দ্রুতগতিতে কিছু উপলব্ধি করতে পারিনি। অবিশ্বাস্য গতিবেগে চিন্তা ছুটছে মনের মধ্যে দিয়ে—আশ্চর্য রকমের অনাবিল সুস্পষ্টভাবে। সঠিক মাত্রায় আফিম খেলে চিন্তারাশি যেভাবে গাদাগাদি অবস্থায় থেকেও স্পষ্ট থাকে, আমার তখনকার অবস্থা যেন সেইরকমই। এ ছাড়া আর কোনও উপমা মাথায় আনতে পারছি না। বুঝলাম, এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে, মুক্তি পাব আমি। আমি জানি, আমি অমর। কিন্তু কী ঘটবে, তা জানি না। বন্দুকের নল থেকে ফুস করে ধোঁয়া ঠিকরে যায় যেভাবে, সেইভাবেই কি ছিটকে যাব দেহের খাঁচা থেকে? মৃতদের জগতে হাজির হব কি এবার? প্রেতচক্রে হাজির হব নাকি তারপর? বেরং প্রত্যাশা, আবেগহীন কৌতূহলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে। তারপরেই একটা চাপ অনুভব করলাম। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। যেন একটা অতিকায় মানবিক চুম্বক আমাকে আমার দেহ থেকে টেনে ওপরে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। বাড়ছে... ক্রমশ বেড়ে চলেছে অস্বস্তি। প্রচণ্ড আকর্ষণ আর এড়ানো যাচ্ছে না। অনেকগুলো দানবিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা খুদে পরমাণুর মতো যুঝে চলেছি। পারছি না... প্রচণ্ড এই আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। ক্ষণেকের জন্যে একটা বিশাল কালো তমিস্রা জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ে মহা-আতঙ্কের অমানিশায় ডুবিয়ে দিল আমাকে... ভয়াবহ আতঙ্ক চকিতের মতো চাবুক আঘাতে জড়তা কাটিয়ে দিল আমার এক নিমেষের জন্যে। পরক্ষণেই দুই ডাক্তার, ছোট্ট ঘর, পাঁজরা-কাটা দেহ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে একটা ফেণা-বুদ্‌বুদের মতো ভেসে গেল কোথায় কে জানে।

দেখলাম, শূন্যে ভাসছি। শুধু ভাসছি নয়, প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে যাচ্ছি ওপরদিকে। অনেক নিচে দ্রুত ছোট হয়ে আসছে লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড। ঊর্ধ্বগতি কিন্তু পশ্চিম-

ঘেঁষা। পাতলা ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম অসংখ্য ছাদের চিমনি, মানুষ আর যানবাহনে বোঝাই সরু সরু রাস্তা, ছোট্ট ছোট্ট ধূলিকণার মতো চৌকোনা পার্ক, আর কাপড়ের গায়ে বিঁধে থাকা কাঁটার মতো গির্জের চূড়া। অচিরেই তা সরে গেল দৃষ্টিপথ থেকে পৃথিবী ঘুরছে বলে। সে জায়গায় আবির্ভূত হল পাশের গ্রাম, শহরতলি, নদী। কোথায় যে চলেছি নক্ষত্রবেগে, কিচ্ছু বলতে পারলাম না।

পলকে পলকে নিচের নিসর্গদৃশ্য বিশাল হতে বিশালতর অঞ্চল জুড়ে জেগে উঠল চোখের সামনে, শহর আর প্রান্তর, পাহাড় আর উপত্যকা, আরও কুয়াশাচ্ছন্ন, আরও ম্যাড়মেড়ে, আরও অস্পষ্ট হয়ে এল, পাহাড়ের নীল বর্ণ আর মাঠ-ময়দানের সবুজ রঙের সঙ্গে আলোকময় ধূসরাভা আরও বেশি মিশে যেতে লাগল। নিচে অনেক পশ্চিমে ছোট ছোট মেঘের টুকরো আরও ঝকমকে সাদা হয়ে উঠতে লাগল। মাথার ওপর আকাশের রংও পালটে গেল একটু একটু করে। প্রথমে যা ছিল বসন্তের আকাশের মতো নীলিমায় নীল, আস্তে আস্তে তা গাঢ়তর হয়ে মধ্যরাতের আকাশের মতো কালো হয়ে গেল, তারপর হল তুষার-ঝরা নক্ষত্রলোকের মতো মিশমিশে কালো, তারপর যে মসিকৃষ্ণ রংটি উপস্থিত হল, সেরকম কালো রং কখনও দেখিনি। প্রথমে দেখা গেল একটা তারা, তারপর অনেক, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে—অগুনতি। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এত নক্ষত্র একসঙ্গে কেউ কখনও দেখেনি। দিনের আলোয় তারা দেখা যায় না নীল গগনে। শীতের রাতেও দেখা যায় না তারার আলো থাকে বলে। কিন্তু এখন আর চোখে ধাঁধা লাগছে না—রাশি রাশি তারার অদ্ভুত সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মরলোকের কেউ এমন স্বর্গীয় দৃশ্য কখনও দেখেনি। অবিশ্বাস্যভাবে অদ্ভুত এবং আশ্চর্য হয়ে উঠেছে সূর্য। চোখধাঁধানো সাদা আলোয় গড়া সূর্য। পৃথিবী থেকে দেখায় হলদেটে। কিন্তু আমি দেখলাম ধবধবে সাদা সূর্য। লাল ডোরা রয়েছে সাদার ওপর। কিনারা ঘিরে লকলকে লোহিত অগ্নিজিহ্বা। দু'পাশে পাখির ডানার মতো রুপোলি সাদা দুটো প্রত্যঙ্গ ঠিকরে গেছে মহাশূন্যের বহু দূর পর্যন্ত। ঠিক যেন ডানাওয়ালা গোলক। মিশরীয় ভাস্কর্যে দেখেছিলাম এই ধরনের ছবি। পার্থিব জীবনে সৌরচ্ছটার ছবি দেখেছিলাম—এখন দেখলাম স্বচক্ষে।

পৃথিবীর দিকে ফের তাকিয়ে দেখি, সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ সরে গেছে আরও দূরে। অনেক আগে থেকেই মাঠ-ময়দান-প্রান্তর পর্বতকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছিল না। সব রং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন যা দেখা যাচ্ছে তা একটা সমান উজ্জ্বল ধূসর রং। মাঝে মাঝে ঝকঝকে সাদা মেঘপিণ্ড। সমুদ্র ডাঙার চাইতে গাঢ় ধূসর রঙের। পুরো দৃশ্যটা আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে পূর্বদিকে।

দ্রুত ঘটে চলেছে ঘটনাস্রোত। পৃথিবী থেকে হাজারখানেক মাইল সরে আসার আগে নিজের কথা মনেই হয়নি। উপলব্ধি করলাম একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আমার

হাত নেই, পা নেই, দেহাংশ নেই, দেহযন্ত্র নেই, ভয় নেই, যন্ত্রণা নেই। বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। চারপাশে শূন্যতা। মানুষের কল্পনাতীত। আমি কিন্তু নির্বিকার। নির্ভয়। সূর্যালোক ধেয়ে যাচ্ছে শূন্যতার মধ্যে দিয়ে। বস্তুতে প্রতিহত হচ্ছে না বলে আলো বা উত্তাপ দিচ্ছে না। নিবিড় প্রশান্তিময় বিস্মৃতিতে আছন্ন আমার সত্তা। যেন স্বয়ং ঈশ্বর আমি। সেকেন্ডে সেকেন্ডে অসংখ্য মাইল দূরে সরে যাচ্ছে বহু নিচে লন্ডন শহরের আমার ছোট্ট ঘরখানি—দু'জন ডাক্তার আমার খোলসটাকে নিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে আবার তার মধ্যে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আমি যে মুক্তির স্বাদ, যে অনাবিল প্রশান্তি, যে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি পেয়েছি, তার সঙ্গে মরজগতের কোনও আনন্দের তুলনা হয় না।

পলকের মধ্যে এতগুলো উপলব্ধির পর পৃথিবী ছেড়ে বেগে উধাও হওয়ার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এত সহজ আর অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারটা কেন যে আগে ভাবিনি, ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি হঠাৎ—ভেসে যাচ্ছি শূন্যপথে। বস্তুজগতের সঙ্গে যেখানে এতটুকু বাঁধন ছিল, সব ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে সেকেন্ডে সেকেন্ডে প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে চলেছি আকাশভরা সব চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রর দিকে। মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ অনুভব করছি না। বস্তুরহিত বলেই মহাশূন্যে এত আকর্ষণশূন্য। মাংস দিয়ে গড়া পিঞ্জর পড়ে তো পৃথিবীতে। পৃথিবীকে আমি ত্যাগ করছি না—পৃথিবীই আমাকে ত্যাগ করছে—গোটা সৌরজগৎটাই সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। চোখে দেখতে না পেলেও উপলব্ধি করছি, আমার মতোই মুক্তির আনন্দে বিহ্বল বহু আত্মা বিরাজমান আমার চতুর্দিকে। বস্তুপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়ে, পাশবিক লোভ, নগ্ন বুদ্ধিমত্তা, অর্থহীন আবেগ-অনুভূতি থেকে ছাড়া পেয়ে আচম্বিতে উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে প্রত্যেকেই। মহাশূন্য ভেদ করে ধেয়ে চলেছে তারা আমার পাশে পাশে—অদৃশ্য অবস্থায়!

পৃথিবী আর সূর্যের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে উপলব্ধি করলাম, অবিশ্বাস্যভাবে আকারে-আয়তনে বড় হয়ে যাচ্ছি যেন। মানুষের জীবনে বড় বলতে যা কল্পনা করা যায়, সেই তুলনায় অনেক... অনেক বড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ণিমার চাঁদের মতোই বৃহদাকার ধারণ করল পৃথিবী। মিনিটকয়েক আগে দ্বিপ্রহরের সূর্য প্রদীপ্ত রেখেছিল যেখানে ইংল্যান্ডে, এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে রোদ্দুর ঝকঝকে আমেরিকাকে। মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে পৃথিবী গোলক। কিনারায় আবির্ভূত হল চন্দ্র। নক্ষত্রমণ্ডলী দেখে অবাক হলাম। চেনাজানা তার মালা ছাড়াও দেখলাম অনেক অজানা-অচেনা নক্ষত্রমণ্ডলী। প্রশান্ত দ্যুতি সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাশিতে উদ্ভাসিত মহাশূন্য। পৃথিবী পলকের মধ্যে সূর্যের মতো ছোট হয়ে এল। বিপরীতদিকে আলপিনের ডগার মতো মঙ্গল গ্রহকে দেখা গেল। মহাজাগতিক

ধূলিকণার মতো পৃথিবী মিলিয়ে যাচ্ছে বহু দূরে। আতঙ্ক বা বিস্ময়—কোনওটাতেই আচ্ছন্ন হলাম না।

চিত্র ১০.১ দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল আলোটা। শনি গ্রহ।

এরপরেই উপলব্ধি করলাম, মন মন্থরগতি হয়েছে, ধারণা নতুন রূপ নিচ্ছে, মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে আবর্তন দেখলাম, এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তার মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে—এক-এক মুহূর্তে এক-একটা হাজার বছর অতিবাহিত হচ্ছে।

অনন্ত মহাশূন্যের কালো পটভূমিকায় এতক্ষণ নিশ্চল ছিল নক্ষত্রমণ্ডলী। হঠাৎ তাদেরকেও সরে যেতে দেখলাম। ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। আচমকা অন্ধকারের মধ্যে থেকে সূর্যকরোজ্জ্বল একঝাঁক প্রস্তরখণ্ড ধূলিকণার মতো আলোকময় প্রভায় চারদিক উজ্জ্বল করে দিয়ে বেরিয়ে গেল আশপাশ দিয়ে। মিলিয়ে গেল দূরে। তারপরেই দেখলাম, একটা উজ্জ্বল আলোর কণা দ্রুতগতিতে এগিয়ে

আসছে আমার দিকে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল আলোটা। শনি গ্রহ। আকার বেড়েই চলেছে পলকে পলকে। মুহূর্তে মুহূর্তে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পেছনের মহাকাশ আর অগুনতি নক্ষত্র। চ্যাপটা, ঘুরন্ত গ্রহের চারদিকে থালার মতো বলয় আর সাতটা উপগ্রহকে স্পষ্ট লক্ষ করা যাচ্ছে। নিমেষে বিশাল হতে বিশালতর হয়ে যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অতিকায় শনি গ্রহ, ধেয়ে চললাম অগুনতি পাথরের ধারাবর্ষণের মধ্যে দিয়ে... পাথরে পাথরে সে কী সংঘাত। ধূলিকণার তাণ্ডবনৃত্য আর গ্যাস-আবর্তের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে চকিতের জন্যে দেখলাম মাথার ওপর প্রকাণ্ড তিনটে বেল্ট; একই কেন্দ্র ঘিরে যেন তিনটে চন্দ্রালোকিত খিলেন। ছায়া পড়েছে নিচের ফুটন্ত প্রলয়কাণ্ডের ওপর। বলতে যতটা সময় গেল, তার এক-দশমাংশ সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল এত কাণ্ড। বিদ্যুৎঝলকের মতো উধাও হয়ে গেল শনি গ্রহ। সূর্যকে ঢেকে রাখল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরেই দেখা গেল আলোর পটভূমিকায় পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে একটা ধ্যাবড়া কালচে দাগ। ধরিত্রী মা-কে আর দেখতে পেলাম না।

রাজকীয় গতিবেগে, অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে এলাম সৌরজগৎ। যেন একটা জামা খুলে পড়ে গেল গা থেকে। অগণিত তারকারাজির মধ্যে নিছক একটা নক্ষত্র হয়ে জেগে রইল সূর্য—আশপাশে ধূলিকণার মতো গ্রহ—বহু দূরের আলোয় স্পষ্ট নয় কোনওটাই—মিলেমিশে একাকার। সৌরজগতের বাসিন্দা আর নই আমি। এসে পড়েছি বাইরের ব্রহ্মাণ্ডে—বহিঃমহাকাশে। আরও দ্রুত ঘনীভূত হল কয়েকটা নক্ষত্রমণ্ডলী—চেনা তারকামণ্ডলীরা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর। ঘুরন্ত নীহারিকার মতো দেখতে হল মহাকাশের সেইদিকটা। তার ওপারে ব্যাদিত মহাশূন্যতা—খণ্ড খণ্ড নিঃসীম তমিস্রা—মাঝে মাঝে চিকমিক করছে নক্ষত্র। কমে আসছে সংখ্যায়। মনে হল যেন দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের ছুটে যাওয়া—ধূলিকণার আকারে নিঃশব্দে বিলীন হচ্ছে মহাশূন্যে। ঝকঝকে নক্ষত্ররা আরও ঝকঝকে হয়ে উঠছে, কাছাকাছি এসে দেখছি, গ্রহদের গা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে যেন ভৌতিক দ্যুতি। পরমুহূর্তেই দপ করে নিবে যাচ্ছে ভূতুড়ে আলো—মিলিয়ে যাচ্ছে অনস্তিত্বের মধ্যে। অস্পষ্ট ধূমকেতু, উল্কার ঝাঁক, বস্তুকণা, আলোককণার ঘূর্ণি সাঁত সাঁত করে বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কেউ কোটি কোটি মাইল দূর দিয়ে, কেউ কাছ দিয়ে। অকল্পনীয় গতিবেগ প্রত্যেকেরই। ধাবমান তারকামণ্ডলী, ক্ষণিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড রাত্রির বুক ভেদ করে ছুটে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষে নিমেষে। বিশাল হতে বিশালতর হচ্ছে নক্ষত্রহীন দূরের মহাশূন্য—যেদিকে আকৃষ্ট হয়ে চলেছি আমি বিরামবিহীনভাবে। দেখতে দেখতে মসিকৃষ্ণ এবং বেবাক শূন্য হয়ে গেল মহাকাশের সিকি অঞ্চল—দ্যুতিময় নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড পেছনে ছুটে গিয়ে কাছাকাছি হতে হতে

আলোকপুঞ্জ হয়ে গেল। এসে পড়লাম ধু ধু মহাশূন্যতার মধ্যে। কালো অমানিশা আস্তে আস্তে বিরাটতর হয়ে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল আমাকে—আগুনের কণার মতো নক্ষত্রগুলো ঝটিতি সরে গেল দূর হতে দূরে—নাস্তি আর শূন্যতার গহ্বরে একা আমি ধেয়ে চললাম কোথায় কে জানে। বস্তু দিয়ে গড়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও শেষকালে এক কণা আলোকময় ধুলোর মতো অস্পষ্ট হয়ে এল পেছনে—একেবারেই অদৃশ্য হতে আর দেরি নেই।

আচম্বিতে মহা-আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। ভাষা দিয়ে সেই আতঙ্ক অনুভূতিকে প্রকাশ করা যায় না। সীমাহীন এই অন্ধকারের মধ্যে আমার মতোই কি রয়েছে আরও অনেক অদৃশ্য আত্মা? পৃথিবীর সমাজবদ্ধ জীব আমি—আত্মাদের সমাজ কি পাব এখানে—না, একাই থাকতে হবে? কী অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছি, তা-ও তো বুঝছি না। জীবসত্তা থেকে বেরিয়ে এসে সত্তা আর সত্তাহীনতার মাঝামাঝি পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম নাকি? দেহের খোলস, বস্তুর খোলস সবই টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে—সঙ্গ আর নিরাপত্তা এখন নিছক মরীচিকা। চারদিকেই তো নিবিড় তমিস্রা—অখণ্ড নীরবতা। সত্তা ছিল—এখন নেই। কিছুই নই এখন আমি। নিতল গহ্বরে নিরতিশয় ক্ষুদ্র এক কণা আলো ছাড়া কিছুই তো আর দেখা যাচ্ছে না। প্রাণপণে শোনার, দেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অসীম নৈঃশব্দ্য, অসহ্য অন্ধকার, বিভীষিকা আর নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই উপলব্ধি করিনি।

ব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তু যেখানে জড়ো হয়েছে, সেইখানে হঠাৎ দেখলাম একটা ক্ষীণ দ্যুতি। দ্যুতির দু'পাশের পটিও নিঃসীম তমিস্রায় আবৃত নয়। যেন অনন্তকাল ধরে চেয়ে ছিলাম সেইদিকে। দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষার পর ঝাপসা দ্যুতি স্পষ্টতর হল বটে, কিন্তু বোধগম্য হল না কিছুই। তারপরেই পটির চারদিকে আবির্ভূত হল অতিশয় ক্ষীণ, অতিশয় ম্যাড়মেড়ে বাদামি রঙের মেঘ। অসহ্য অসহিষ্ণুতায় অস্থির হয়েছিলাম। কিন্তু এত ধীরগতিতে মেঘটার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলাম না কী ধরনের বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে চলেছি। মহাশূন্যের চিররাত্রির মধ্যে ওই অদ্ভুত লালাভ উষা কীসের সূচনা বহন করছে, কিছুতেই বুঝে উঠলাম না।

আস্তে আস্তে বিদঘুটে হয়ে উঠছিল মেঘের আকার। তলার দিকে যেন ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে চারটে বস্তুপুঞ্জ—ওপরদিকে কী যেন একটা উঠে গেছে সিধে সরলরেখায়। অপচ্ছায়ার মতো এ আবার কী জিনিস? এ জিনিস দেখছি আগে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি... কিন্তু কোথায় যে দেখেছি, কিছুতেই খেয়াল করতে পারলাম না। আচমকা উপলব্ধি করলাম বিচিত্র আকৃতির স্বরূপ। মুঠো-করা একটা হাত! মহাশূন্যে আমি একা, সামনে ওই প্রকাণ্ড ছায়াসম হাত, বস্তুময় গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক কণা

অকিঞ্চিৎকর ধুলোর মতো পড়ে রয়েছে ওই হাতের নিচে। তর্জনীতে ঝকঝক করছে একটা আংটি। আংটির কিনারায় চিকমিক করছে এক কণা অলো—যে ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে এলাম—ওই ব্রহ্মাণ্ড। মুঠোয় ধরা বস্তুটাকে দেখতে অনেকটা কালো ডান্ডার মতো। অনন্তকাল ধরে ভয়ে-বিস্ময়ে অসহায়ভাবে চেয়ে ছিলাম সেই হাত আর সেই ডান্ডার দিকে—কী যে ঘটবে এরপর, বুঝতে পারিনি। কেবলই মনে হচ্ছিল, ঘটবে না কিছুই, চেয়ে থাকতে হবে অনন্তকাল ধরে এইভাবে—কোনওদিনই বুঝব না ওই হাত আর ওই ডান্ডার তাৎপর্য, কেন ওই উপস্থাপন, কীসের ছায়া। আমার সত্তাহীন নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় থেকে যাবে শুধু যা অমোঘ, যা আদি এবং অন্তহীন—তারই উপস্থিতি। বৃহত্তর অন্য কোনও সত্তার ওপরে এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা প্রতিসরিত আলোককণা কি না, এ প্রশ্নের জবাবও পাব না কোনওদিন। কোনওদিনই জানব না এই রবি-শশী-তারাভরা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আরেকটা ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণুমাত্র কি না, সেই ব্রহ্মাণ্ডটাও হয়তো আরেকটা ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু। এবং সে ব্রহ্মাণ্ডও আরেক ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু ছাড়া কিছুই নয়। এইভাবেই কি চলছে সৃষ্টির পরম্পরা? কে জবাব দেবে এই প্রহেলিকার? আমিই বা কী? বাস্তবিকই কি অ-বস্তু? আমার চারদিকে একটা দেহ দানা বেঁধে উঠছে যেন মনে হল—খুবই আবছা উপলব্ধি। নারকীয় তমিস্রার মধ্যে ওই হাত যে ইঙ্গিত বহন করছে, নিশ্চিতভাবে তা বুঝলাম না। হৃদয়ভাব দিয়ে শুধু টের পেলাম, নিরাকারের মধ্যে থেকে অনেক আকার তৈরি হয়ে যাচ্ছে... কাঁপছে... দুলছে... আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টাধ্বনির মতো একটা শব্দ শুনলাম। ক্ষীণ শব্দ। যেন অসীমের ওপার থেকে ভেসে আসা শব্দ—নিরেট তমিস্রা ফুঁড়ে আসতে হচ্ছে বলে, এত অস্পষ্ট। আবার... আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি... অনুধ্বনিত হচ্ছে সুগম্ভীর শব্দে... অনুকম্পন আর অনুরণন কাঁপছে একটি ঘণ্টাধ্বনি থেকে আরেকটি ঘণ্টাধ্বনির অন্তর্বর্তী সময়ে। সেই সঙ্গে মনে হল যেন শক্তভাবে ডান্ডা চেপে ধরল হাতটা। হাতের অনেক ঊর্ধ্বে, অন্ধকারের মধ্যবিন্দুতে দেখলাম একটা আলোকবৃত্ত—অস্পষ্ট ফসফরাস-দ্যুতির মতো। ভৌতিক বর্তুলের মতো আলোক-গোলকের মধ্যে ধুক ধুক করে শব্দনাদ সৃষ্টি করে চলেছে ঘণ্টাধ্বনি। শেষ ধ্বনিটার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল হাতখানা। বুঝলাম, সময় হয়েছে নিকট। শুনলাম বিপুল জলোচ্ছ্বাসের গুরুগম্ভীর দূরায়ত গর্জন। মহাকাশের বুকে বিশাল পটির মতো কিন্তু স্থির হয়ে রইল কালো ডান্ডাটা। তারপরেই মহাশূন্যের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ধেয়ে গেল একটা কণ্ঠস্বর—অবসান ঘটল যন্ত্রণার।

তৎক্ষণাৎ অসহ্য হর্ষ-উল্লাসের আবর্তে মুহ্যমান হয়ে গেলাম। দেখলাম, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চকচকে সাদা বৃত্তটা, চেকনাই ছড়াচ্ছে কালো ডান্ডাটা, স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে আরও অনেক কিছু। বৃত্তটা হয়ে গেল ঘড়ির ডায়াল, ডান্ডাটা আমার

খাটের রেলিং। হ্যাডনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমার পায়ের দিকে রেলিং-এর পাশে—হাতে একটা ছোট কাঁচি। ঘাড়ের ওপর দিয়ে ম্যান্টেলে রাখা ঘড়ির ডায়ালে দেখা যাচ্ছে, কাঁটা দুটো এক হয়ে গিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে বারোটার ঘরে। আটকোনা টেবিলে কী যেন ধুচ্ছে মোব্রে, পাঁজরে অনুভব করলাম একটা চাপা অনুভূতি—যাকে যন্ত্রণা বলা যায় না কোনওমতেই।

সাঙ্গ হয়েছে অপারেশন। আমি মরিনি। আচম্বিতে উপলব্ধি করলাম, আধখানা বছর জুড়ে থাকা চাপা বিষাদবোধও তিরোহিত হয়েছে মনের ভেতর থেকে।
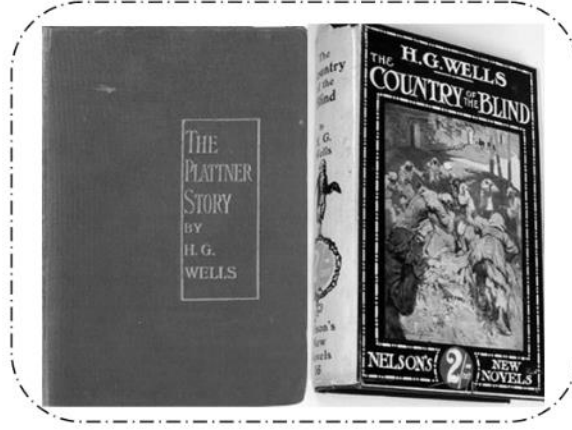
'The Plattner Story' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The New Review' পত্রিকায় এপ্রিল **১৮৯৬** সালে। **১৮৯৭** সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের ছোটগল্পের সংকলন 'The Plattner Story and Others' বইটিতে গল্পটি স্থান পায়। **১৯১১** সালে প্রকাশিত 'The Country of the Blind and Other Stories' সংকলনটিতেও গল্পটি স্থান পায়।

সবুজ গুঁড়ো
(The Plattner Story)

গটফ্রায়েড প্ল্যাটনারের গল্পকে পাত্তা দেওয়া, না-দেওয়া পুরোটাই নির্ভর করছে সাক্ষ্যপ্রমাণ কতখানি বিশ্বাসযোগ্য—তার ওপর। এদিকে রয়েছে সাতজন সাক্ষী। সঠিকভাবে বলতে গেলে সাড়ে ছ'জোড়া চোখ আর একটা এমনই ঘটনা, যা না মেনে উপায় নেই। অপরদিকে রয়েছে কুসংস্কার, উপস্থিতবুদ্ধি আর মতামতের জড়তা। যে সাতজন সাক্ষীর কথা বললাম, এদের চাইতে সৎরূপী সাক্ষী আদৌ আর হয় বলে মনে হয় না; প্ল্যাটনারের শারীরস্থান উলটে যাওয়ার মতো 'না-মেনে-উপায়-নেই' ঘটনাও আর ঘটেছে বলে জানা নেই; এবং সাতজনেই যে কাহিনিটা শুনিয়েছে, তার মতো অসম্ভব গল্পও আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি! এই সাতজনের মধ্যে প্ল্যাটনারকেও আমি ধরেছি এবং কাহিনির মধ্যে সব চাইতে অসম্ভব অংশটা তারই অবদান। একদিকে জবরদস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, আর-একদিকে নিরেট কুসংস্কার। অবস্থা আমার শোচনীয় হবে বুঝতেই পারছি। কোথাও একটা বক্রতা আছে এ ব্যাপারে—কিন্তু তা কী ধরনের, তা জানি না। অবাক হয়েছি গণ্যমান্য মহলে এমন একটা উদ্ভট কাহিনি দারুণ পাত্তা পাওয়ায়—একেবারেই আশা করা যায় না। এইসব বিবেচনা করেই গল্পটাকে বরং সরাসরি শুনিয়ে দেওয়াই ভালো—বেশি মতামত আর জাহির করতে চাই না।

গটফ্রায়েড প্ল্যাটনারের নামটা খটমট হতে পারে, কিন্তু জন্মসূত্রে সে খাঁটি ইংরেজ। তার বাবা ছিল অ্যালসেশিয়ান, ইংল্যান্ডে এসেছিল ছয়ের দশকে, বিয়ে করেছিল খানদানি ইংরেজ মেয়েকে, সারাজীবন কোনওরকম অভাবনীয় ঘটনা না ঘটিয়ে এবং প্যাটার্ন অনুযায়ী সাজানো কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে মেঝে আচ্ছাদন করে মারা যায় ১৮৮৭-তে। গটফ্রায়েডের বয়স সাতাশ, জন্মসূত্রে তিন-তিনটে ভাষায় দখল থাকার ফলে সে

দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটা ছোট্ট বেসরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের শিক্ষক। শিক্ষাগত ব্যাপারে অন্যান্য যে কোনও বেসরকারি বিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের শিক্ষকের থেকে তার কোনও পার্থক্য নেই। তার জামাকাপড়ও খুব দামি বা শৌখিন নয়—যাচ্ছেতাই সস্তা বা নোংরাও নয়, গায়ের রং, উচ্চতা, চলাফেরা চোখে পড়ার মতো নয়। লক্ষ করলেই দেখবেন, বেশির ভাগ লোকের মতোই তার মুখের দু’পাশ হুবহু এক নয়—একই অনুপাতে গড়া নয়, ডান চোখটা বাঁ চোখের চাইতে সামান্য বড়, ডানদিকের চোয়ালটাও একটু বেশি ভারী। আর পাঁচজনের মতো খুঁটিয়ে দেখার অভ্যেস আপনার না থাকলে তার খোলা বুকে কান পেতে ধুকপুকুনি শুনেও আপনার মনে হবে সে দশজনেরই একজন—কোনও তফাতই নেই। কিন্তু দক্ষ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আপনার পার্থক্য কিন্তু এইখানেই। ওর হৃৎপিণ্ড অতি মামুলি মনে হতে পারে আপনার কাছে, দক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছে নয়। ধরিয়ে দেওয়ার পর খটকা লাগবে আপনারও। কারণ, গটফ্রায়েডের হৃদ্‌যন্ত্র ধুকুর পুকুর করে চলেছে বুকের বাঁদিকে নয়—ডানদিকে।

এইটাই কিন্তু একমাত্র সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয় গটফ্রায়েডের দৈহিক কাঠামোয়। পাকা শল্যচিকিৎসকের পরীক্ষায় ধরা পড়ে আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার। শরীরের অন্যান্য যেসব দেহাংশ সুসমঞ্জস, সুষম নয়—তার প্রতিটি একইভাবে বসানো রয়েছে উলটোদিকে। যকৃতের ডান অংশ এসেছে বাঁদিকে, বাঁ অংশ ডানদিকে; ফুসফুসও উলটো-পালটা। গটফ্রায়েড কস্মিনকালেও কুশলী অভিনেতা নয়। তা সত্ত্বেও সম্প্রতি তার ডান হাত আর বাঁ হাতের ব্যবহারও যেন উলটো-পালটা হয়ে গেছে। সবচেয়ে পিলে চমকানো ব্যাপার কিন্তু এইটাই। অদ্ভুত সেই কাণ্ডকারখানার পর থেকেই সে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বাঁ হাতে লিখতে গিয়ে। ডান হাত ছুড়তে পারে না আগের মতো, খেতে বসে বড় বেকায়দায় পড়ে ছুরি-কাঁটা-চামচ নিয়ে। মহাবিপদে পড়ে রাস্তায় সাইকেল চালাতে গিয়ে। ডানদিক-বাঁদিক গুলিয়ে ফেলে। বিচিত্র এই ব্যাপারের আগে গটফ্রায়েড কিন্তু ল্যাটা ছিল না—সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। আগেই বলেছি, ছলচাতুরী তার কোষ্ঠীতে লেখা নেই—থাকলে এই অসংগত কাণ্ডকারখানার ব্যাখ্যা পাওয়া যেত।

চক্ষু-স্থির-করা এবং চমকপ্রদ আর-একটা ব্যাপারও শুনে রাখুন। নিজের তিনখানা ফোটোগ্রাফ হাজির করেছিল গটফ্রায়েড। পাঁচ-ছ’বছর বয়সের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মোটাসোটা পা ছুড়ছে ক্যামেরাম্যানের দিকে। এ ছবিতে দেখবেন, বাঁ চোখটা ডান চোখের চাইতে একটু বড়। বাঁদিকের চোয়ালও একটু ভারী। এখন কিন্তু ওর চোখ আর চোয়ালের ছবি ঠিক তার বিপরীত। চোদ্দো বছরের ছবিতে অবশ্য এই বিপরীত অবস্থাই দেখা যাবে। তার কারণ, ওই সময় ‘জেম’ পদ্ধতিতে সরাসরি ধাতুর প্লেটে

ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল—আয়নায় যেমন উলটো হয়ে ছবি পড়ে, ফোটাগ্রাফিক প্লেটেও তেমনি পড়ত। একুশ বছর বয়সে তোলা তৃতীয় ফোটোগ্রাফে কিন্তু দেখবেন, শৈশবে ওর ডানদিক-বাঁদিক যেরকম ছিল, তখনও তা-ই আছে। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গটফ্রায়েডের ডানদিক আর বাঁদিকের মধ্যে অদলবদল ঘটেছে হালে। নরদেহের এই ধরনের অত্যাশ্চর্য অদলবদল প্রকৃতই ফ্যান্টাস্টিক এবং অর্থহীন অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

গটফ্রায়েড নিজেও তো ধাঁধায় পড়েছে। অসম্ভব এই দেহাংশ বদলাবদলি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে মুখ লাল করে ফেলে। কাউকে বিশ্বাস করানোর জন্যে কোনও মাথাব্যথাই নেই—মুখ খুলতেই চায় না। চরিত্র আগে যা ছিল, এখনও তা-ই আছে। অর্থাৎ, ওর অন্তর-প্রকৃতি পালটায়নি—পালটেছে কেবল বাইরেটা এবং তার জন্যে বেচারি নিজেও ভারী লজ্জিত। চিরকালই সে মুখচোরা, স্বল্পভাষী, ধীরস্থির, বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিয়ার পছন্দ, ধূমপানে অরুচি নেই, নিত্য ভ্রমণ-ব্যায়ামে অভ্যস্ত, শিক্ষাদানের ব্যাপারে উঁচুমান বজায় রাখতে সজাগ। কণ্ঠস্বর মার্জিত, গান গাইতেও পারে। বই পড়ার নেশা আছে, ঘুমায় মড়ার মতো, স্বপ্ন দেখে কদাচিৎ। ফ্যান্টাস্টিক এই উপকথা রচনা করার মতো মানুষই নয়। ফোটোগ্রাফ নকল করা যায়, ল্যাটা হওয়ার অভিনয় করা যায়—কিন্তু চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যগুলো তো থেকে যাচ্ছে।

শবব্যবচ্ছেদ মারফত দেহাংশের বদলাবদলি সপ্রমাণের প্রস্তাব গটফ্রায়েডের মনঃপূত নয় মোটেই। সুতরাং তার মুখের গল্পকেই মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। 'স্থান'-এর মধ্যে দিয়ে কোনও মানুষকে নিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় আমাদের জানা নেই—যদি তা সম্ভব হত, তাহলেই তার ডানদিক-বাঁদিক পালটা-পালটি হতে পারত। যা-ই করুন-না কেন, ওর ডানদিক এখনও ডানদিকেই রয়েছে, বাঁদিক রয়েছে বাঁদিকে। খুব পাতলা, চ্যাপটা জিনিস নিয়ে আপনি এই বদলাবদলি ব্যাপারটা করতে পারেন। কাগজ কেটে একটা মূর্তি বানিয়ে উলটে নিলেই হল। কিন্তু নিরেট মূর্তি নিয়ে তা হয় না। গণিতবিদদের তত্ত্ব অনুযায়ী নিরেট দেহের ডানদিক-বাঁদিক অদলবদল করে দেওয়া যায় দেহটাকে সটান 'স্থান' থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে—অস্তিত্বের বাইরে নিয়ে গিয়ে। 'স্থান'-এর বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বিষয়টা দুর্বোধ্য। কিন্তু গণিত জানা থাকলে নিগূঢ় নয়। তাত্ত্বিক ভাষায়, ফোর্থ ডাইমেনশন অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক জগৎ ছাড়িয়ে চারমাত্রিক জগতে পরিভ্রমণ করে এসেছে গটফ্রায়েড—ডানদিক আর বাঁদিক অদলবদলটাই তার প্রমাণ। গালগল্প শুনছি না যদি মেনে নেওয়া যায়—তাহলে ঠিক তা-ই হয়েছে। অকাট্য ঘটনাবলির ফিরিস্তি এখানেই শেষ করা যাক। এবার আসা যাক চমকপ্রদ সেই ঘটনার বর্ণনায়, যার পর থেকে

প্ল্যাটনার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এই জগতের বাইরে। সাসেক্সভিল প্রোপ্রাইটারি স্কুলে প্ল্যাটনার ভাষা ছাড়াও পড়াত কেমিস্ট্রি, ভূগোল, হিসেব রাখার বিদ্যে, শর্টহ্যান্ড, ড্রয়িং এবং আরও অনেক বিষয়—ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী। সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকলেও কিছু অসুবিধে হত না। মাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষকদের শিক্ষার মান নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সবচেয়ে জ্ঞান কম ছিল কেমিস্ট্রিতে—তিনটে গ্যাসের অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনও খবর রাখত না—গ্যাস তিনটের নাম কী কী, তা-ও সঠিক জানত না। ছাত্রছাত্রীরা জানত আরও কম। ফলে, মাঝে মাঝে বড় বেকায়দায় পড়ত প্ল্যাটনার। হুইব্‌ল নামে একটি ছেলের জ্ঞানের স্পৃহা ছিল একটু বেশি—নিশ্চয় কোনও আত্মীয়ের নষ্টামি—শিখিয়ে দিয়েছিল মাটারমশায়কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে। প্ল্যাটনারের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনত হুইব্‌ল—কখনও সখনও রকমারি দ্রব্য এনে দিত প্ল্যাটনারকে। সুযোগ পেয়ে উৎসাহে ফুলে উঠত প্ল্যাটনার। বিশ্লেষণ করত, মতামতও শোনাত। বাড়ি বসে অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও পড়ে নিয়েছিল। অবাক হয়েছিল কেমিস্ট্রি শাস্ত্রের মধ্যে এত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে জেনে।

এতক্ষণ পর্যন্ত গেল কাহিনির মামুলি বয়ান। এবার আসছে সবুজ গুঁড়োর বৃত্তান্ত। কপাল খারাপ, সবুজ গুঁড়োটা পাওয়া গিয়েছিল কোত্থেকে—তা জানা যায়নি। শ্রীমান হুইব্‌ল কষ্টেসৃষ্টে ইনিয়েবিনিয়ে শুনিয়েছিল একটা পেঁচালো কাহিনি। ডাউন্সের একটা পরিত্যক্ত চুনের ভাটিতে নাকি পেয়েছিল সবুজ গুঁড়োর একটা মোড়ক। তখনই মোড়কটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিলে ল্যাটা চুকে যেত। প্ল্যাটনারের উপকার হত, হুইব্‌লের বাড়ির লোকেরও উচিত শিক্ষা হত। কিন্তু মোড়কে করে সে সবুজ গুঁড়ো আনেনি স্কুলে—এনেছিল একটা আট আউন্স মাপের ওষুধের শিশিতে—মুখটা বন্ধ করেছিল চেবানো খবরের কাগজের ছিপি এঁটে। বৈকালিক বিদ্যালয় শেষ হলে দিয়েছিল প্ল্যাটনারকে। সেদিন চারটি ছেলেকে প্রার্থনার পর আটকে রাখা হয়েছিল স্কুলে পড়া না করতে পারার অপরাধে। দেখাশোনার ভার ছিল প্ল্যাটনারের ওপর। কেমিস্ট্রি পড়ানোর ঘরে কর্তব্য সমাপন করছিল প্ল্যাটনার। আর পাঁচটা বেসরকারি স্কুলের মতো এ স্কুলেও হাতেকলমে কেমিস্ট্রি শেখানোর সরঞ্জাম নিতান্তই সাদাসিধে, ট্রাঙ্ক সাইজের একটা আলমারির মধ্যে ছিল জিনিসগুলো। ফাঁকিবাজ ছাত্রদের ওপর তদারকি বড় একঘেয়ে লাগছিল প্ল্যাটনারের। হুইব্‌ল সবুজ গুঁড়ো নিয়ে আসায় তাই খুশি হয়েই তৎক্ষণাৎ আলমারির তালা খুলে বার করেছিল বিশ্লেষণ করার জিনিসপত্র। ভাগ্যক্রমে হুইব্‌ল বসেছিল নিরাপদ দূরত্বে। ফাঁকিবাজ ছেলে চারটে মন দিয়ে বাকি পড়া করার ভান করে আড়চোখে চেয়েছিল প্ল্যাটনারের দিকে। কারণ, মাত্র তিনটে গ্যাসের বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে কেমিক্যাল

এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে নিতান্তই দুঃসাহসী ছিল হঠকারী মাস্টারমশাই। ভয় আর ঔৎসুক্য সেই কারণেই।

পাঁচটা ছেলেই বলেছে একই কথা। প্রথমে অল্প সবুজ গুঁড়ো একটা টেস্টটিউবে ঢেলে নিয়েছিল প্ল্যাটনার। পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করেছিল জল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে। কিচ্ছু ঘটেনি। সবুজ গুঁড়ো সবুজই থেকেছে। তখন একটা স্লেটের ওপর শিশির অর্ধেক সবুজ গুঁড়ো ঢেলে নেয় প্ল্যাটনার। ওষুধের শিশিটা বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে দেশলাইয়ের কাঠির আগুন লাগায় সবুজ গুঁড়োয়। ধোঁয়া ছেড়ে গলতে থাকে সবুজ গুঁড়ো। আর তারপরেই ফেটে যায় কানের পরদা-ফাটানো শব্দে প্রচণ্ড ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। ঝলক দেখেই বিপর্যয়ের আশঙ্কায় পাঁচটা ছেলেই গোঁত মেরে ঢুকে গিয়েছিল ডেস্কের তলায়। মারাত্মক জখম হয়নি কেউই। জানলা ছিটকে পড়েছিল খেলার মাঠে, আস্ত থাকেনি ইজেলের ওপর রাখা ব্ল্যাকবোর্ড। রেণু রেণু হয়ে গিয়েছিল স্লেটখানা। কড়িকাঠ থেকে খসে পড়েছিল পলেস্তারা। এ ছাড়া স্কুলবাড়ির বা যন্ত্রপাতির কোনও ক্ষতি হয়নি। প্ল্যাটনারকে দেখতে না পেয়ে ছেলেরা ভেবেছিল, নিশ্চয় বিস্ফোরণের সংঘাতে জ্ঞান হারিয়েছে মাস্টারমশাই—পড়ে আছে চোখের আড়ালে ডেস্কের তলায়। লাফিয়ে বেরিয়ে এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু ঘরের মধ্যে প্ল্যাটনারকে দেখতে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল পাঁচজনেই। ঘর শূন্য—প্ল্যাটনার উধাও! তবে কি জখম হয়ে প্রাণের তাগিদে বাইরে ছিটকে গেছে মাস্টারমশাই? কানে তখনও তালা লেগে রয়েছে পাঁচজনেরই, চোখে দেখছে ধোঁয়া। সেই অবস্থাতেই হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে বেরতে গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়েছিল প্রিন্সিপ্যাল মি. লিডগেটের ওপর—প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে পুরো স্কুলবাড়ি থরথর করে কেঁপে ওঠায় ভদ্রলোক পড়ি কি মরি করে দৌড়ে আসছিলেন কেমিস্ট্রির ঘরে।

একটুতেই ধাঁ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠা যাঁর স্বভাব, পিলে চমকানো এই শব্দের পর তাঁর অবস্থাটা অনুমেয়। গায়ের ওপর দমাদম করে ছেলে পাঁচটা আছড়ে পড়ায় তিড়বিড়িয়ে উঠেছিলেন একচোখো প্রিন্সিপ্যাল। গালাগাল বর্ষণ করেই জানতে চেয়েছিলেন, ‘মি. প্ল্যাটনার কোথায়?’

পরের ক’টা দিন এই একই প্রশ্ন শোনা গেছে মুখে মুখে। গেল কোথায় মি. প্ল্যাটনার? পরমাণু হয়ে গেল নাকি? না আছে এক ফোঁটা রক্ত, না আছে জামাকাপড়ের কণামাত্র সুতো। বিস্ফোরণ যেন তাকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে—ধ্বংসাবশেষটুকুও রেখে যায়নি।

চিত্র ১১.১ কারা যেন ধরতে আসছে প্ল্যাটনারকে।

ফলে চাঞ্চল্যকর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো তল্লাটে। ধামাচাপা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন লিডগেট। প্ল্যাটনারের নাম মুখে আনলেই ছাত্রদের পঁচিশ লাইন লেখার সাজা দিয়েছিলেন। ক্লাসে বলতেন, প্ল্যাটনার কোথায় আছে, তা তিনি জানেন। কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে এহেন বিপর্যয়ের ফলে স্কুলের সুনামের হানি ঘটতে পারে, প্ল্যাটনারের অন্তর্ধান রহস্যও স্কুলের নাম ডোবাতে পারে —এই ভয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলতে চেয়েছিলেন। ছেলে পাঁচটাকে এমন জেরা করেছিলেন যে, চোখে দেখা ঘটনাকেও শেষ পর্যন্ত চোখের ভ্রান্তি মনে হয়েছিল তাদের কাছে। তা সত্ত্বেও পল্লবিত কাহিনি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পুরো ন'টা দিন এবং বেশ ক'জন অভিভাবক ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্কুল থেকে বিভিন্ন অজুহাতে। প্রতিবেশীরা নাকি স্বপ্ন দেখেছিল প্ল্যাটনারকে। সুস্পষ্ট স্বপ্নগুলো অদ্ভুতভাবে একই রকম। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, রামধনুর মতো বর্ণবিকাশী ঝকঝকে আলোকপ্রভার মধ্যে হেঁটে চলেছে প্ল্যাটনার— কখনও একা, কখনও বহু সঙ্গীসহ, মুখ ফ্যাকাশে, উদ্‌ভ্রান্ত, বিমর্ষ, কয়েক ক্ষেত্রে হাত নেড়ে কী যেন বলতে চেয়েছে স্বপ্ন যে দেখছে, তাকে। কয়েকটি ছেলের স্বপ্ন আরও বিদঘুটে। প্ল্যাটনার যেন অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে কাছে এসে চোখে চোখে চেয়ে রয়েছে। দুঃস্বপ্নের প্রভাব নিঃসন্দেহে। কয়েকজন ছাত্র প্ল্যাটনারকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে স্বপ্নের মধ্যে—কেননা, কারা যেন ধরতে আসছে প্ল্যাটনারকে। তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা গেছে, এরকম গোল গোল আকারের কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী ইহলোকের এই ধরাধামে কখনও কেউ দেখেনি। ন'দিন পর বুধবারে প্ল্যাটনার ফিরে আসতেই অবসান ঘটেছিল সমস্ত জল্পনা-কল্পনার। তার ফিরে আসাটাও উধাও হওয়ার মতোই চমকপ্রদ। বুধবার সন্ধ্যায় বাগানে লিচু পেড়ে খাচ্ছিলেন মি.

লিডগেট। বেশ বড় বাগান। আইভি-ছাওয়া উঁচু লাল ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায় না। ফলভারে নুয়ে-পড়া বিশেষ একটা গাছের দিকে যেই মন দিয়েছেন ভদ্রলোক, অমনি তীব্র ঝলক দেখা দিয়েছিল শূন্যে, ধুপ করে শোনা গিয়েছিল একটা ভারী আওয়াজ। ঘুরে তাকানোর আগেই একটা গুরুভার বস্তু আছড়ে পড়েছিল পিঠে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ভদ্রলোক হাতে লিচু নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন বাগানের মাটিতে—সিল্কের টুপি কপালে এঁটে বসে গিয়ে ঢেকে দিয়েছিল একটিমাত্র চোখের বেশ কিছুটা, পিঠে আছড়ে-পড়া বস্তুটা হঠাৎ করে হড়কে গিয়ে লিচু গাছের ওপরে পড়তেই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বিমূঢ় মি. লিডগেট দেখেছিলেন নিখোঁজ প্ল্যাটনার সটান বসে তাঁর সামনে। মাথায় টুপি নেই। জামাকাপড় এবং চুল লন্ডভন্ড। শার্টের কলার উধাও। হাতে রক্ত, চটকানো লিচু মুঠোয় ধরে ওই অবস্থাতেই রেগে টং হয়ে প্ল্যাটনারকে নাকি একহাত নিয়েছিলেন প্রিন্সিপ্যাল মশায় এহেন অভব্য আচরণের জন্যে।

প্ল্যাটনার উপাখ্যানের এই গেল বাহ্যিক বর্ণনা। মি. লিডগেট তাকে চাকরি থেকে কীভাবে এবং কী অজুহাতে বরখাস্ত করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। 'অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানার তদন্ত সমিতি'র প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে খুঁটিনাটি। প্রথম দু'-এক দিনে তার ডানদিক-বাঁদিক বদলাবদলির অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটাও তেমনভাবে কারও নজরে পড়েনি। প্রথম খটকা লেগেছিল ব্ল্যাকবোর্ডে ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখবার সময়ে। নতুন চাকরিতে সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এই ভয়ে বিষয়টা প্রাণপণে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল প্ল্যাটনার। কয়েক মাস পরে ধরা পড়েছিল, তার হৃদ্‌যন্ত্রও চলে এসেছে বিপরীতদিকে। আরক প্রভাবে সংজ্ঞা লোপ করে দাঁত তোলবার সময়ে ধরা পড়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার। প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও শল্যচিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপিয়ে দেয় শারীরস্থান পত্রিকায়। বস্তুভিত্তিক ঘটনাবলির পরিসমাপ্তি এইখানেই। এবার আসা যাক প্ল্যাটনার নিজে যে কাহিনি শুনিয়েছিল—তার বর্ণনায়।

তার আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। এই পর্যন্ত যা লেখা হল তা সাক্ষ্যপ্রমাণের জোরে আদালতগ্রাহ্য। কিন্তু এরপর যা লেখা হবে, তা প্ল্যাটনারের নিজের কথা। বিশ্বাস করা কঠিন। পাঠক-পাঠিকার মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়া যাক। জড়জগতের বাইরে সূক্ষ্ম আত্মিক জগতে কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে কারও বিশ্বাস উৎপাদন করার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি শুধু লিখে যাব প্ল্যাটনার যা বলেছিল, তার প্রতিটি কথা। শোনবার পর কিন্তু মনে হতে পারে, প্ল্যাটনার এই ন'টা দিন ছিল স্থান-এর বাইরে—ভেতরে নয় এবং ফিরে এসেছে দর্পণ প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছবির মতোই উলটো অবস্থায়।

বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে, এইটাই তার মনে হয়েছিল প্রথমে। দেহটা ছিটকে উঠেছে শূন্যে, যাচ্ছে প্রবলবেগে পেছনদিকে। ভেবেছিল, বুঝি সবেগে আছড়ে পড়বে ব্ল্যাকবোর্ডের ইজেল বা কেমিস্ট্রির কাবার্ডের ওপর। সংঘাতে তখনও মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। নাকে পোড়া চুলের গন্ধ আসছে। মনে হয়েছিল যেন লিডগেটের ধমকও কানে ভেসে আসছে। আসলে মাথার ঠিক ছিল না।

ক্লাসঘরের মধ্যেই রয়েছে প্ল্যাটনার, এই মনে হওয়াটা কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্ট। টের পেয়েছে ছেলেদের হতভম্ব অবস্থা এবং লিডগেটের প্রবেশ। না, এ ব্যাপারে কোনও ধোঁয়াটে ভাব নেই প্ল্যাটনারের বর্ণনায়, কথাবার্তা, চেঁচামেচি কিন্তু এক্কেবারেই শুনতে পায়নি—নিশ্চয় আওয়াজের চোটে কানে তালা লেগে গিয়েছিল বলে। অদ্ভুত আবছা আর গাঢ় মনে হয়েছিল চারপাশ—বিস্ফোরণের ফলে নিশ্চয় তাল তাল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল বলে। এসবই প্ল্যাটনারেরই অনুমান—ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। অস্পষ্টতার মধ্যে ভৌতিক ছায়ার মতো নিঃশব্দে আবছাভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল ছেলে পাঁচটা আর লিডগেট। প্ল্যাটনারের মুখের চামড়া ঝলসে গিয়েছিল বিস্ফোরণের ঝলকে—জ্বালা করছিল। মাথা ঘুরছিল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় চোখের বারোটা বেজে গেছে, কানেরও দফারফা হয়ে গেছে। হাত-পা-মুখও যেন বশে নেই। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল অনুভূতি। অবাক হয়েছিল আশপাশে চেনা ডেস্ক আর স্কুলের আসবাবপত্র না দেখে। তার বদলে রয়েছে আবছা, অনিশ্চিত ধূসর কতকগুলো আকৃতি, তারপরেই আঁতকে উঠেছিল, বিষম চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল গলা চিরে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছিল অসাড় চৈতন্য। পিলে চমকানোর মতো ঘটনা! দু'টি ছেলে নাকি হাত-মুখ নাড়তে নাড়তে সটান তাকে ফুঁড়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল। বিন্দুমাত্র টের পায়নি প্ল্যাটনারের অস্তিত্ব—দেখেওনি। পরক্ষণেই তাল তাল কুয়াশা ঘিরে ধরেছিল তাকে। সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা বাস্তবিকই অবর্ণনীয়—কালঘাম ছুটে গিয়েছিল বেচারির ঘটনাটা বলবার সময়ে। সে যে আর বেঁচে নেই, এ ধারণাটা মাথায় এসেছিল তখনই। তা-ই যদি হবে তো দেহটা এখনও সঙ্গে রয়েছে কেন? ভেবে কূল পায়নি প্ল্যাটনার, তাহলে কি মৃত্যুটা তার হয়নি, হয়েছে বাদবাকি সবাইয়ের? স্কুল উড়ে গিয়েছে বিস্ফোরণে, সে ছাড়া অক্কা পেয়েছে প্রত্যেকেই? তা-ই বা হয় কী করে! মহাধাঁধায় পড়েছিল প্ল্যাটনার।

অস্বাভাবিক আঁধারে আশপাশের দৃশ্য স্পষ্ট দেখতেও পায়নি। আবলুশ কাঠের মতো কালো আঁধারের মধ্যে দিয়ে মাথার ওপর দেখা যাচ্ছিল কালো চাঁদোয়া। আকাশের এক কোণে ফিকে সবুজ দ্যুতি। সবুজ প্রভায় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে ঢেউখেলানো কালো পাহাড়। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার পর মালুম হয়েছিল,

একটা ক্ষীণ সবুজ রং রাতের কালো অমানিশার সঙ্গে বেশ পৃথকভাবেই যেন পরিব্যাপ্ত রয়েছে আকাশ-বাতাসে। সবুজ রং আর কালো রাতের এই বিচিত্র সমন্বয়ের পটভূমিকায় ফসফরাস দ্যুতিময় প্রেতচ্ছায়ার মতো ফুটে উঠেছে ক্লাসঘরের আসবাবপত্র, ছেলে পাঁচটা এবং প্রিন্সিপ্যাল, ঠিক যেন অতিসূক্ষ্ম ছবি—ছুঁয়ে অনুভব করা যায় না—এত মিহি।

এক হাত বাড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের দেওয়াল ছুঁতে গিয়েছিল প্ল্যাটনার—হাত গলে গিয়েছিল দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে অনায়াসেই। অনেক চেষ্টা করেছিল দু'জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ডেকেছিল লিডগেটকে। ছেলে পাঁচটা যতবার আশপাশ দিয়ে গিয়েছে, ক্যাঁক করে চেপে ধরার চেষ্টা করেছে। নিবৃত্ত হয়েছে মিসেস লিডগেট ঘরে ঢোকার পর। ভদ্রমহিলাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না প্ল্যাটনার। আশ্চর্য, সেই সবুজাভ জগতের মধ্যে থেকেও সে যেন সেই জগতের কেউ নয়—যেন কোনও যোগাযোগই নেই সবুজ অথচ তমালকালো বিচিত্র ছায়ামায়ার সঙ্গে —অদ্ভুত সেই অনুভূতি অস্বাভাবিক অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল প্ল্যাটনারের অণু-পরমাণুতে। শিকার ধরার জন্য ওত পেতে বসে থাকা বেড়ালের মতো মনে হয়েছিল নিজেকে। চেনা অথচ অল্প পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে; একটা অদৃশ্য, অবোধ্য বাধা বাক্যালাপে বাধার সৃষ্টি করে গেছে।

তিতিবিরক্ত হয়ে মন দিয়েছে নিরেট পরিবেশের দিকে। সবুজ গুঁড়োর কিছুটা তখনও ছিল শিশির মধ্যে, শিশি ছিল হাতের মুঠোয়। পকেটে রেখেছিল প্ল্যাটনার। আশপাশ হাতড়াতে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন বসে রয়েছে মখমল কোমল শেওলা-ছাওয়া পাথরের ওপর। চারপাশের তমিস্রাময় জায়গাটার কিছুই চোখে পড়েনি—ক্লাসঘরের ক্ষীণ, কুয়াশাচ্ছন্ন ছবিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গায়ে হিমেল হাওয়া লাগায় আন্দাজ করে নিয়েছিল, বসে রয়েছে সম্ভবত পাহাড়ের ওপর—পায়ের তলায় রয়েছে বহু দূর বিস্তৃত একটা উপত্যকা। আকাশপ্রান্তের সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু করে, বাড়ছে তীব্রতা। উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে চোখ ডলেছিল প্ল্যাটনার।

কয়েক পা এগিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ঢালু পাহাড়ে। উঠে বসেছিল এবড়োখেবড়ো একটা পাথরে। নির্নিমেষে চেয়ে ছিল সবুজ উষার দিকে। অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করেছিল, আশপাশের সেই বিচিত্র দুনিয়ায় শব্দ নেই কোথাও—নিস্তব্ধ আকাশ-বাতাস। হাওয়া বইছে নিচ থেকে, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। অথচ কানে ভেসে আসছে না বাতাসে আন্দোলিত পত্রমর্মর, ঘাসের খসখসানি, ঝোপঝাড়ের দীর্ঘশ্বাস। বসে আছে পরিত্যক্ত পাথুরে অঞ্চলে—খাঁ খাঁ করছে চারদিক। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও কানে কিছু না শোনার ফলে অন্তত মনে হয়েছে সেইরকম। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে আকাশপ্রান্তের সবুজ আভা, সেই সঙ্গে একটু একটু করে একটা

টকটকে রক্তলাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে কালো চাঁদোয়ার মতো আকাশে—কিন্তু সবুজ রঙের রঙ্গে লাল রং মিশে একাকার হয়ে যায়নি। সবুজ আর লালের দ্যুতিতে ছমছমে হয়ে উঠছিল পরিবেশ—ভয়ানক দ্যুতি একটু একটু করে স্পষ্টতর করে তুলছিল দশদিকের ধু ধু শূন্যতা। আমার মনে হয়, এই লালাভ ভাবটা চোখের ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। হলদেটে-সবুজ আকাশপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্যে ঝটপট করে উঠেছিল কালোমতো একটা বস্তু। তারপরেই পায়ের তলায় ব্যাদিত শূন্যতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল খুব মিহি কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা ঘণ্টার শব্দ। ক্রমবর্ধমান আলোর মধ্যে একটা অসহ্য প্রত্যাশার উৎকণ্ঠা সাপের মতোই পেঁচিয়ে ধরেছিল প্ল্যাটনারের সত্তাকে।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাঠের পুতুলের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে ছিল সে। সভয়ে দেখেছে, একটু একটু করে বেড়েই চলেছে অদ্ভুত সবুজ আলো, মন্থর গতিতে সর্পিল আঙুল মেলে ধরছে মাথার ওপরকার খ-বিন্দুর দিকে। আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই জগতের অপচ্ছায়ার মতো দৃশ্য কোথাও একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কোথাও অস্পষ্টতর হয়েছে। পার্থিব সূর্যাস্তের দরুনই বোধহয় এরকম সহাবস্থান দেখা গেছে। অর্থাৎ এখানে যখন সূর্য ডুবছে, ওখানে তখন আলো ফুটছে। সবুজ আর লাল রঙের অমন আশ্চর্য খেলা তাই রোমাঞ্চিত করছে প্ল্যাটনারকে—পার্থিব এবং অপার্থিবের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত থেকে শুধু শিহরিত হয়েছে—কার্যকারণ নির্ণয় করতে পারেনি। কয়েক পা নেমে এসেছিল প্ল্যাটনার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যে। বিস্ময় আরও বেড়েছে—কমেনি। মনে হয়েছে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে নিচের তলার বড় ক্লাসঘরের শূন্যে বাতাসের মধ্যে। পায়ের তলায় সান্ধ্য ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত লিডগেট এবং ছাত্ররা। ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে টুকলিফাই করছে ছেলেরা। আস্তে আস্তে এ দৃশ্যও ফিকে হয়ে এসেছিল সবুজ উষা স্পষ্টতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

প্ল্যাটনার তখন দৃষ্টিচালনা করেছিল নিচের উপত্যকার দিকে। দেখেছিল, সবুজ আলো পৌঁছেছে পাহাড়ের গা পর্যন্ত। খাদের নিবিড় আঁধার ভেঙে যাচ্ছে সূক্ষ্ম সবুজ আভায়—জোনাকির আলোয় যেভাবে অন্ধকার সরে সরে যায়—সেইভাবে। একই সঙ্গে দূরের পাহাড়ের ঢেউখেলানো আগ্নেয় শিলা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সবুজ রং-মাখা আকাশ আরও ওপরে উঠে যাওয়ার ফলে। দৈত্যাকার শৈলশ্রেণি অন্ধকার ফুঁড়ে জাগ্রত হচ্ছে একে একে লাল, সবুজ, কালো ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে। হাওয়ায় উঁচু জমির ওপর দিয়ে থিস্‌লডাউন কাঁটাগাছ ভেসে যাওয়ার মতো অদ্ভুত গোল বলের মতো রাশি রাশি বস্তু ভেসে যেতে দেখেছিল প্ল্যাটনার এই সময়ে। কাছে নয়—দূরে, খাদের ওপারে। পায়ের তলায় ঘণ্টাধ্বনি অধীর হয়ে উঠেছে যেন ঠিক তখনই—

মুহুর্মুহু টং-টং শব্দ ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে, এদিকে-সেদিকে দেখা গেছে কয়েকটা সঞ্চরমাণ আলো। ডেস্কে আসীন ছেলেগুলো আরও ফিকে হয়ে এসেছে—আবছা আকৃতি দেখতে হয়েছে অতিকষ্টে—চোখে না-পড়ার মতোই।

অন্য জগতের সবুজ সূর্য যখন উঠছে, আমাদের এই জগৎ তখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দেখে, ধাঁধায় পড়েছিল প্ল্যাটনার। অন্য দুনিয়ার রাত্রে হাঁটাচলা কঠিন এই দুনিয়ার দৃশ্য সুস্পষ্ট থাকার ফলে। প্রহেলিকা সেইখানেই। এই দুনিয়া থেকে অন্য দুনিয়ার ছবি চোখে ধরা না-পড়ার কোনও ব্যাখ্যা প্ল্যাটনার আবিষ্কার করতে পারেনি। সেই জগৎ থেকে যদি এ জগৎ দেখা যায় ছায়ার মতো, এ জগৎ থেকে সেই জগৎ কেন দেখা যাবে না ছায়ার মতো? সম্ভবত সেই জগতের চাইতে এই জগতে আলোর তীব্রতা বেশি বলে—এখানকার সবকিছুই বেশি আলোক সমুজ্জ্বল বলে। প্ল্যাটনার দেখেছে, সেই জগতের ভরদুপুর এই জগতের মাঝরাতের জ্যোৎস্নার মতো। সেই জগতের মাঝরাত একেবারেই আঁধারে ঢাকা। নিবিড় অন্ধকারে ফিকে ফসফরাস-দ্যুতি যেমন দৃশ্যমান, মোটামুটি অন্ধকার ঘরে অন্য দুনিয়ার সবকিছুই তেমনি অদৃশ্য। ওর কাহিনি এবং ব্যাখ্যা শোনবার পর ফোটোগ্রাফারের ডার্করুমে রাতের অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি অন্য দুনিয়ার চেহারা দেখবার অভিপ্রায়ে। সবুজাভ চড়াই-উতরাই আর পাহাড় দেখেছি ঠিকই—কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে। পাঠক-পাঠিকারা হয়তো আরও বেশি দেখতে পাবেন। সেই দুনিয়া থেকে ফিরে আসার পর স্বপ্নে নাকি সেখানকার অনেক জায়গা দেখে চিনতে পেরেছিল প্ল্যাটনার—কিন্তু সেটা স্মৃতির কারসাজিও হতে পারে। চারপাশের এই অদ্ভুত অন্য দুনিয়ার চকিত আভাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের চোখে পড়ে যাওয়াটা খুব একটা অসম্ভব না-ও হতে পারে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চলে আসছি। সবুজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটনারের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একটা টানা লম্বা রাস্তার দু'ধারে কালো বাড়ির সারি। স্পষ্ট নিকেতনের পর নিকেতন। খাদের মধ্যে। দ্বিধায় পড়েছিল প্ল্যাটনার—টহল দিয়ে আসাটা কি উচিত হবে? তারপর পা বাড়িয়েছিল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে। খাড়াই পথ বেয়ে নেমে এসেছিল পাহাড়ের গা দিয়ে। কালঘাম ছুটে গিয়েছিল নামবার সময়ে। পাহাড়ি পথ এমনিতেই বন্ধুর, তার ওপর ছড়ানো রয়েছে আলগা নুড়ি। তেমনি খাড়াই। ঘণ্টাধ্বনি তখন থেমেছে। নিস্তব্ধ সেই অন্য দুনিয়ায় ওর পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। পায়ের ঠোক্করে ঠিকরে যাচ্ছে শিথিল প্রস্তরখণ্ড। আগুন ঠিকরে যাচ্ছে পায়ের তলায়। কাছে আসতেই খটকা লেগেছিল প্ল্যাটনারের। এ কী আশ্চর্য সাদৃশ্য! রাস্তার দু'ধারে প্রতিটা বাড়িই কবর-প্রস্তর, স্মৃতিসৌধ, সমাধিমন্দিরের মতো দেখতে—তবে সাদা নয়—কালো। একই রকমের কালো

আঁধার জমাট করে যেন নির্মিত গোরস্থানের মৃত্যুপুরী। তারপরেই চোখে পড়েছিল, সবচেয়ে বড় বাড়িটা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে ম্যাড়মেড়ে, ফিকে সবুজ, গোলাকার বহু মূর্তি—ঠিক যেন গির্জার মধ্যে থেকে বেরচ্ছে ভক্তরা। ছড়িয়ে পড়ছে প্রশস্ত পথের দু'পাশের অলিগলিতে। কাউকে দেখা যাচ্ছে গলি থেকে বেরিয়ে খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠতে, কেউ কেউ ঢুকছে পথের দু'পাশে ছোট ছোট মসিবর্ণ বাড়িগুলোয়। প্ল্যাটনারের দিকেই অদ্ভুত গোলাকার সবুজ বস্তুগুলো ভাসতে ভাসতে উঠে আসছিল। দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল সে। পালে পালে যারা আসছে, তাদের কেউই কিন্তু হেঁটে আসছে না—হাত-পা-জাতীয় কোনও প্রত্যঙ্গই নেই তাদের; আকারে তারা মানুষের মাথার মতো—তলায় ঝুলছে ব্যাঙাচির মতো সরু একটা দেহ। ঝুলছে আর দুলে দুলে উঠছে। না, ভয় পায়নি প্ল্যাটনার। বিষম অবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই মনে ভয় ঠাঁই পায়নি। এরকম সৃষ্টিছাড়া জীব সে জীবনে দেখেনি—কল্পনাতেও আনা যায় না। পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরের দিকে বয়ে আসা কনকনে হিমেল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে তারা উঠে আসছিল নিঃশব্দে—ঠিক যেন দমকা হাওয়ায় ভেসে আসছে রাশি রাশি সাবানের বুদ্‌বুদ। সবচেয়ে কাছের প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল প্ল্যাটনারের। সত্যি তা একটা মানুষের মুন্ডু! চোখ দুটো কেবল আশ্চর্য রকমের বিশাল। আত্যন্তিক বিষাদ আর নিদারুণ মনস্তাপ ভাসছে দুই চোখে—মরজগতের কোনও প্রাণীর চোখে এহেন ক্লিষ্ট ভাব দেখেনি প্ল্যাটনার। অবাক হয়েছিল ভাসমান মুন্ডুদের চাহনি অন্যদিকে রয়েছে লক্ষ করে। প্ল্যাটনারকে দেখছে না কেউই—নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে এমন কিছুর দিকে, যা দেখা যাচ্ছে না। প্রথমটায় ধাঁধায় পড়েছিল সে। তারপরেই মনে হয়েছিল, অসম্ভব এই প্রাণীরা বিশাল চোখ মেলে ছেড়ে-আসা এই দুনিয়ার কোনও কিছুর দিকে চেয়ে আছে নিষ্পলকে—খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা; যা ওদের চোখে স্পষ্ট, প্ল্যাটনারের চোখে নয়। আরও কাছে এগিয়ে এসেছিল ভাসমান বর্তুলাকার ব্যাঙাচি দেহওয়ালা আজব প্রাণীরা—বিষম বিস্ময়ে চেঁচাতেও ভুলে গিয়েছিল প্ল্যাটনার। কাছাকাছি আসতে একটা বিরক্তি প্রকাশের খিটখিটে মেজাজের শব্দও কানে ভেসে এসেছিল—খুবই অস্পষ্ট—যেন চাপা অসন্তোষ ক্ষীণ কম্পন সৃষ্টি করে চলেছে অন্য দুনিয়ার বায়ুমণ্ডলে। আরও কাছে এসেই আলতোভাবে প্ল্যাটনারের মুখে ঝাপটা মেরে পাশ কাটিয়ে ভেসে গিয়েছিল পাহাড়চূড়ার দিকে! ঝাপটাটা মৃদু, কিন্তু বরফের মতো কনকনে।

একটা মুন্ডুই মুখ চাপড়ে দিয়ে গিয়েছিল প্ল্যাটনারের। কেন জানি ওর মনে হয়েছিল, বিশেষ এই মুন্ডুটার সঙ্গে লিডগেটের মুন্ডুর সাদৃশ্য আছে দারুণভাবে। অন্য মুন্ডুরা ঝাঁকে ঝাঁকে তখন উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে। প্ল্যাটনারকে চিনতে পেরেছে,

এমন ভাব প্রকাশ পায়নি কারওই চোখে। দু'-একটা মুন্ডু ওর খুব কাছাকাছি এসেছিল, প্রথম মুন্ডুর মতো ঝাপটা মারতেও গিয়েছিল—প্রতিবারেই তিড়বিড়িয়ে উঠে শরীর কুঁচকে নিয়ে তফাতে সরে গিয়েছিল প্ল্যাটনার। প্রত্যেকের চোখেই কিন্তু একই সীমাহীন পরিতাপের অভিব্যক্তি দেখেছিল প্ল্যাটনার। একই রকমের নিঃসীম বিরক্তির ক্ষীণ গজগজানি ভেসে এসেছিল কানে। দু'-একজনকে কাঁদতেও দেখেছিল। একজনকে দেখেছিল পৈশাচিক ক্রোধে প্রচণ্ড বেগে সাঁত করে পাশ কাটিয়ে ওপরে ধেয়ে যেতে। বাদবাকি সকলেই নিরুত্তাপ, নির্বিকার। কয়েকজনের চোখে অবশ্য দেখা গিয়েছিল পরিতৃপ্ত আগ্রহ। বিশেষ করে একজনের চোখে সুখ যেন ফেটে পড়ছিল! এর বেশি আর কিছু দেখেছে বলে মনে নেই প্ল্যাটনারের।

বেশ কয়েক ঘণ্টা এই দৃশ্য দেখেছিল সে। দলে দলে ভাসমান বর্তুলাকার প্রাণী বেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়চূড়ায়। তারপর যখন কাউকে আর বেরতে দেখা যায়নি কালো ছোট বাড়িগুলোর মধ্যে থেকে, তখন সাহসে বুক বেঁধে পা বাড়িয়েছিল নিচের দিকে। চারপাশের নিবিড় অন্ধকার তখন এমনই গাঢ় যে, পা ফেলতে হয়েছে আন্দাজে অন্ধের মতো। উজ্জ্বল ফ্যাকাশে সবুজ হয়ে উঠেছিল মাথার ওপরকার আকাশ। খিদে-তেষ্টার কোনও অনুভূতিই ছিল না। খাদের মাঝবরাবর পৌঁছে দেখেছিল একটা হিমেল জলস্রোত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। বড় বড় গোলাকার পাথরে বিরল শৈবাল। মরিয়া হয়ে তা-ই মুখে পুরেছিল প্ল্যাটনার। মন্দ লাগেনি।

খাদের ঢাল বেয়ে নির্মিত সমাধিসৌধগুলির পাশ দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নামবার সময়ে মস্তিষ্ককে কিন্তু বিরাম দেয়নি। অব্যাখ্যাত এই রহস্যের সমাধানসূত্র অন্বেষণের চেষ্টা চালিয়ে গেছে বিরামবিহীনভাবে। অনেকক্ষণ পরে পৌঁছেছিল মস্ত জমকালো সমাধিস্তম্ভের মতো দেখতে সেই অট্টালিকার সামনে। এই সৌধের ভেতর থেকেই পিলপিল করে গোল মুন্ডুদের ভেসে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল একটু আগে। থমকে দাঁড়িয়েছিল প্রবেশ পথের সামনে। দেখেছিল, ভেতরে একটা আগ্নেয় শিলা জাতীয় প্রস্তরবেদির ওপর জ্বলছে বেশ কিছু সবুজ আলো। মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে ঘণ্টা-গম্বুজ থেকে বেদির ওপর নেমে এসেছে একটা ঘণ্টার দড়ি, চারপাশের দেওয়ালে আগুন অক্ষরে লেখা রয়েছে অনেক দুর্বোধ্য বিষয়—অজানা হরফগুলো কিন্তু চিনতে পারেনি। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে যখন আকাশ-পাতাল ভাবছে, তখন কানে ভেসে এসেছিল ভারী পায়ের আওয়াজ, প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে রাস্তা থেকে। পায়ের মালিকরা যেন সরে যাচ্ছে দূর হতে দূরে—ধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল প্ল্যাটনার। দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে, কিন্তু কিছুই দেখেনি। প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল ঘণ্টার দড়ি ধরে নৈঃশব্দ্য ভেঙে দেয় এই মৃত্যুপুরীর।

তারপর বাসনাটা মন থেকে তাড়িয়ে দৌড়েছিল বিলীয়মান পায়ের আওয়াজের পেছনে। দৌড়েছিল আর গলার শির তুলে চেঁচিয়ে গিয়েছিল। অনেক দূরে গিয়েও কিন্তু দেখতে পায়নি পায়ের মালিকদের—হাঁকডাক শুনে কেউ কৌতূহল চরিতার্থ করতেও এসে দাঁড়ায়নি ওর সামনে। খাদের যেন শেষ নেই—অসীম অনন্ত। পৃথিবীর নক্ষত্রালোকে যে আঁধার, সেই আঁধারে ঢাকা পুরো খাদ। ওপরে পাহাড়চুড়োয় কেবল দিনের আভাস—রক্ত হিম-করা সবুজ দিবস। খাদের নিচে ভাসমান মুন্ডুদের আর দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের ওপরে অন্তর্হিত হয়েছে প্রত্যেকেই। মাথা তুলে তাদের দেখতেও পেয়েছিল প্ল্যাটনার। কেউ ভাসছে স্থির হয়ে শূন্যে, কেউ বাতাস কেটে ধেয়ে যাচ্ছে কামানের গোলার মতো বিপুল বেগে, কেউ কেউ মৃদু গতিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়চূড়ার আনাচকানাচে, ঠিক যেন 'তুষারপাত' ঘটেছে মস্ত আকাশে—তবে তুষারের মতো ধবধবে সাদা নয় কেউই। কেউ কালো, কেউ ম্যাড়মেড়ে সবুজ।

পদশব্দ অনুসরণ করেও কিন্তু কারও নাগাল ধরতে পারেনি সে। ভারী ভারী পা ফেলে ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ শব্দে খাদ কাঁপিয়ে যারা হেঁটে গেছে, তারা কিন্তু একটুও তাড়াহুড়ো করেনি—তাল কেটে যায়নি। একই ছন্দে গুরুভার পদশব্দ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ জাগিয়ে তুলেছে অসীমের পানে বিস্তৃত অন্ধকারময় খাদের মধ্যে—তা সত্ত্বেও দৌড়ে বেদম হয়ে গিয়েও কারও টিকি ধরতে পারেনি প্ল্যাটনার—দেখতেও পায়নি। শয়তান-খাদের নানা অঞ্চলে ছুটে গিয়েছে, পাহাড় বেয়ে উঠেছে, নেমেছে, শিখরে শিখরে ঘুরে বেড়িয়েছে পাগলের মতো, ভাসমান মুন্ডুদের পর্যবেক্ষণ করেছে নানানভাবে। এইভাবেই কেটেছে সাত-আটটা দিন। সঠিক হিসেব মনে নেই—হিসেব রাখার চেষ্টাও করেনি। দু'-একবার মনে হয়েছে, সন্ধানী চোখের নজর রয়েছে তার ওপর—কিন্তু জীবন্ত কোনও সত্তার সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ ঘটেনি। ঘুমিয়েছে পাহাড়ের ঢালু গায়ে, খাদের মধ্যে পার্থিব সব কিছুই অদৃশ্যই থেকে গিয়েছে—কারণ পার্থিব বিচারে সেখানকার সমস্তই তো গভীর পাতালে। উঁচু অঞ্চলে পার্থিব দিবস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান হয়েছে জগৎ। কখনও হোঁচট খেয়েছে গাঢ় সবুজ পাথরে, কখনও খাদের মধ্যে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছে কিনারা ধরে। সাসেক্সভিলের গলির পর গলি জেগে থেকেছে চোখের সামনে সর্বক্ষণ, যেন পাতলা ছায়ার মতো থিরথির করে দুলেছে, কেঁপেছে, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছে। কখনও মনে হয়েছে যেন হেঁটে চলেছে সাসেক্সভিলের রাস্তা বেয়ে, দু'পাশের সারি সারি বাড়ির মধ্যে উঁকি মেরে দেখেছে গেরস্তদের ঘরকন্না—যা একান্তই গোপনীয়, তা-ও তার অজানা থাকেনি, তাকে কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি, তার অস্তিত্বও টের পায়নি। তারপরেই আবিষ্কৃত হয়েছে চমকপ্রদ তথ্যটি। এই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের

জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে সেই দুনিয়ার এক-একটি মুন্ডু। ভাসমান মুন্ডু। প্রত্যঙ্গহীন অসহায় সত্তারা খর-নজরে রেখেছে এই দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তির ওপর।

প্ল্যাটনার কিন্তু কোনওদিনই জানতে পারেনি এরা কারা—সজীব মানুষদের যারা চোখে চোখে রেখেছে সবুজ দুনিয়া থেকে—আজও তাদের পরিচয় অজ্ঞাত রহস্যই থেকে গেছে তার কাছে। এদের দু'জন অবশ্য দু'-একদিনের মধ্যেই দেখেছিল তাকে, ছায়ার মতো লেগে থাকত পেছনে। প্ল্যাটনারের মা আর বাবা মারা গেছে শৈশবে। স্মৃতির মণিকোঠায় মুখের ছবি এখনও রয়ে গেছে। ছেলেবেলায় সেই স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় এই দু'জনের মুন্ডুচিত্র। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে অন্য মুখরাও বিশাল চোখের চাহনি নিবদ্ধ করেছে তার ওপর। একদা যারা ছিল তার আশপাশে, কেউ আঘাত দিয়েছে, কেউ সাহায্য করেছে, যৌবনে সঙ্গ দিয়েছে, আরও বড় হলে কাছে কাছে থেকেছে—কিন্তু এখন কেউ বেঁচে নেই—তাদের চোখের চাহনির সঙ্গে সবুজ দুনিয়ার এই এদের চাহনির মিল রীতিমতো বিস্ময়কর। চোখাচোখি হলেই অদ্ভুত দায়িত্ববোধে অভিভূত হয়েছে প্ল্যাটনার। মায়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে—কিন্তু উত্তর পায়নি। বিষণ্ণভাবে স্থিরচোখে কেবল চেয়ে থেকেছে ছেলের দিকে—স্নেহকোমল চাহনির মধ্যে মিশে ছিল যেন মৃদু তিরস্কার।

প্ল্যাটনার নিজে থেকে ব্যাখ্যা হাজির করার কোনও চেষ্টাই করেনি—যা দেখেছে, সেই গল্পই কেবল শুনিয়েছে। সজীব মানুষদের চোখে চোখে রেখেছে যারা, তারা কে, সত্যিই তারা মৃত সত্তা কি না, লোকান্তরে যাওয়ার পরেও ইহলোকের মানুষদের নিয়ে কেন তাদের এত মাথাব্যথা—এসবই আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। আমার যা মনে হয়, তা এই: এ জীবনে ভালো করি কি মন্দ করি, তার রেশ থেকে যায় জীবন সমাপ্ত হয়ে যাবার পরেও। লোকান্তরের পরেও তা দেখে যেতে হয় আমাদের প্রত্যেককেই—পার পায় না কেউই। মৃত্যুর পর আত্মা যদি থাকে, মৃত্যুর পর মানবিক আগ্রহও টিকে থাকে। বিনাশ নেই আত্মার, বিনাশ নেই আগ্রহেরও। প্ল্যাটনার কিন্তু জানায়নি ওর মনের কথা—যা বললাম, তা আমার নিজস্ব ধারণা। দিনের পর দিন সবুজ দুনিয়ার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে ক্ষিপ্তের মতো সে ঘুরে বেড়িয়েছে, ক্লান্তিতে দেহ-মন ভেঙে পড়েছে, মাথায় চরকিপাক লেগেছে, শেষের দিকে খিদে-তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়েছে। দিনের বেলায়—মানে পার্থিব দিবসের আলোকে—পরিচিত সাসেক্সভিলের ভূতুড়ে ছায়ার মতো মানুষজন-দৃশ্য তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। বুঝতে পারেনি কোথায় পা রাখা উচিত—প্রায়ান্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি কিছুই। এরই মধ্যে কখনও সখনও সজাগচক্ষু আত্মার হিমশীতল পরশ বুলিয়ে গেছে মুখের ওপর। মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে রাত নামলে।

ছেঁকে ধরেছে অসংখ্য পর্যবেক্ষক—পাহারাদারও বলা যায়। অগুনতি বিশাল চোখে মূর্ত নিঃসীম, বেদনা উন্মাদ করে ছেড়েছে তাকে। আতীব্র বাসনা হয়েছে ইহলোকে কিন্তু আসার—এত কাছে থেকেও কিন্তু অনেক দূরে থেকে গিয়েছে চেনাজানা এই জগৎ। অতৃপ্ত বাসনা ধিকিধিকি অনলের মতো পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে তাকে। মানসিক গ্লানি, অব্যক্ত বিষাদ তুঙ্গে পৌঁছেছে আশপাশের অপার্থিব ব্যাপারস্যাপার ইচ্ছে না থাকলেও দেখতে হয়েছে বলে। যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়েছে নীরব পাহারাদারদের ছিনেজোঁকের মতো পেছনে লেগে থাকা দেখে, চেঁচিয়েছে, যা মুখে এসেছে তা-ই বলেছে, পালাতে গিয়েছে, পালাতে গিয়ে বন্ধুর পথে মুখ থুবড়ে পড়েছে—তবুও সবুজ দুনিয়ার নাছোড়বান্দা পাহারাদাররা তার সঙ্গ ছাড়েনি, তার ওপর থেকে নজর সরিয়ে নেয়নি, তাকে রেহাই দেয়নি। অগুনতি মূক চাহনি নজরবন্দি রেখেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। প্ল্যাটনারের তখনকার আতীব্র যন্ত্রণা পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারবেন।

নবম দিবসে সন্ধ্যা নাগাদ আবার সেই অদৃশ্য পায়ের আওয়াজ শুনেছিল প্ল্যাটনার। তালে তালে পায়ের মালিকরা এবার এগিয়ে আসছে বহু দূর থেকে খাদের সীমাহীন পথের ওপর দিয়ে—ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ আওয়াজ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রক্ত-জমানো শব্দতরঙ্গ তুলছে দিকে দিকে। ন'দিন আগে ইহলোক থেকে মরলোকের যে পাহাড়ে অবতীর্ণ হয়েছিল প্ল্যাটনার, সেই মুহূর্তে ছিল সেই পাহাড়েই, প্রায় সেই জায়গাটিতেই। আওয়াজ শুনেই ধড়ফড় করে নেমে আসছিল পাহাড় বেয়ে খাদের দিকে। রহস্যময় পায়ের মালিকদের স্বচক্ষে দেখবার এ সুযোগ কি ছাড়া যায়? কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল স্কুলের কাছেই একটা ঘরের মধ্যেকার দৃশ্য দেখে। দু'জন মানুষ ছিল ঘরে। দু'জনেই তার মুখ-চেনা, জানলা খোলা। খড়খড়ি তোলা। অস্তগামী সূর্যের আলো সটান ঢুকছে ঘরের মধ্যে খোলা জানলা দিয়ে। ঘরের সবকিছুই তাই প্রথমদিকে দেখা গিয়েছিল উজ্জ্বলভাবে। বেশ বড় লম্বাটে খোলামেলা ঘর। কালো নিসর্গদৃশ্য আর নীল-কৃষ্ণ সবুজাভ উষার পটভূমিকায় ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মতোই তা বিচিত্র। রোদ্দুরের আলো ছাড়াও সবে ঘরে জ্বালানো হয়েছে একটা মোমবাতি।

শয্যায় শুয়ে এক লিকলিকে কঙ্কালসার পুরুষ। লন্ডভন্ড বালিশে রাখা মাথা। বীভৎস সাদা মুখে অতি ভয়ংকর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। দু'হাত মুঠি পাকিয়ে তুলে রেখেছে মাথার দু'পাশে। খাটের পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলের কাছে ওষুধের খানকয়েক শিশি, কিছু সেঁকা রুটি আর জল, আর খালি গেলাস। মুহুর্মুহু দ্বিধাবিভক্ত হচ্ছে তার দু'ঠোঁট, কী যেন বলতে চাইছে—পারছে না। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না। সেদিকে দৃষ্টি নেই ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তির। পেছন ফিরে উলটোদিকে সেকেলে

আলমারি খুলে কাগজপত্র হাঁটকাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। প্রথমদিকে রীতিমতো উজ্জ্বল স্পষ্ট থাকলেও পেছনের সবুজ উষা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠার ফলে সামনের এই ছবিও তাল মিলিয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল একটু একটু করে।

প্রতিধ্বনির রেশ তুলে দূরের পদশব্দ তখন এগিয়ে আসছে তো আসছেই। অন্য জগতে সেই নিয়মিত ছন্দের ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ আওয়াজ মাদল-বাজনার মতোই গুরুগম্ভীর, বুকের রক্ত ছলকে ছলকে ওঠে। এই জগতে আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে কিন্তু শব্দহীন কম্পনের আকারে। প্ল্যাটনারের বর্ণনাই হুবহু তুলে দিলাম। ভয়-ধরানো রক্ত হিম-করা সেই পদশব্দ যতই নিকটে এসেছে, ততই কোত্থেকে যেন অগুনতি অস্পষ্ট মুখ জড়ো হয়েছে মুমূর্ষুর ধারেকাছে, জানালায় জানলায়। অন্ধকারের ভেতর চেয়ে থেকেছে ঘরের দুই ব্যক্তির দিকে—একজন শব্দহীন কণ্ঠে মরার আগে কিছু চাইছে—আর একজন সেদিকে না তাকিয়ে কাগজ হাঁটকে চলেছে। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে প্ল্যাটনার। এই ক'দিন সবুজ দুনিয়ায় কাটিয়েও একসঙ্গে এত পাহারাদার পর্যবেক্ষককে এক জায়গায় জড়ো হতে সে একবারও দেখেনি। একদল নির্নিমেষে দেখছে মুমূর্ষুকে—আর-একদল নিঃসীম ও নিদারুণ মনস্তাপ নিয়ে চেয়ে থেকেছে স্ত্রীলোকটির দিকে। কাগজের পর কাগজ দেখছে সে—কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না ঈপ্সিত বস্তু। চোখে ঝরে পড়ছে সীমাহীন লোভ, কদর্য লালসা। প্ল্যাটনারকে ঘিরে ধরেছিল এরা, চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ানোয় ঘরের দৃশ্য আর সুস্পষ্ট দেখা যায়নি। শুধু শোনা গেছে অবিরাম আক্ষেপের হাহাকার। মাঝেমধ্যে অবশ্য পলকের জন্যে দেখা গেছে ঘরের দৃশ্য। প্ল্যাটনার দেখেছে, বিশাল চক্ষু মেলে অগুনতি মুখের একটা দল ভিড় করেছে স্ত্রীলোকটির চারপাশে। সবুজ প্রতিফলন কেঁপে কেঁপে ওঠা সত্ত্বেও সে দেখেছে, নিস্তব্ধ নিথর ঘরের মধ্যে মোমবাতির সটান ধোঁয়া উঠছে ওপরে। কানে ভেসে এসেছে বজ্রনির্ঘোষের মতো ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ পায়ের আওয়াজ। দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তারা আসছে... তারা আসছে! যাদের দেখা যায় না... তারা আসছে। ততই নিবিড় হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে কাতারে কাতারে ভিড়-করা ভাসমান মুখগুলোর চাহনি। মেয়েটির একদম কাছ ঘেঁষে ভেসে থাকা বিশেষ দু'টি মুখের বর্ণনা বড় নিখুঁতভাবে দিয়েছিল প্ল্যাটনার। দু'জনের একজন নারী। মুখভাব কঠোর ছিল নিশ্চয় এককালে। অপার্থিব জ্ঞানের পরশে এখন তা কোমল। অপরজন নিশ্চয় স্ত্রীলোকটির পিতৃদেব। দু'জনেই পলকহীন চোখে স্ত্রীলোকটির জঘন্য নীচ কাণ্ডকারখানা দেখে যেন মরমে মরে রয়েছে—কিন্তু বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই বলে কিছু করতেও পারছে না। এদের পেছনে ভাসছে সম্ভবত কিছু কুলোকের মুখ—একদা যারা কুশিক্ষা দিয়ে অধঃপাতে নামিয়েছে স্ত্রীলোকটিকে—রয়েছে সৎ বন্ধুরা—ব্যর্থ হয়েছে যাদের সৎ প্রভাব। ভাসমান মুখদের আর-একটা দল কাতারে

কাতারে জড়ো হয়েছে শয্যাশায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তির ওপর। দেখে মনে হয় না বাবা-মা বা বন্ধুবান্ধবস্থানীয়। প্রতিটি মুখ নারকীয়ভাবে আচ্ছন্ন ছিল নিশ্চয় কোনও এককালে, কিন্তু রুক্ষতা কোমল হয়ে এসেছে অপরিসীম দুঃখতাপে! সবার সামনে রয়েছে একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ। রাগ নেই, অনুশোচনা নেই। অসীম ধৈর্য নিয়ে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে যেন প্রতীক্ষা করছে সব কষ্ট অবসানের। একসঙ্গে এত মুখ এক জায়গায় কখনও দেখেনি বলেই সব মুখের বর্ণনা দিতে আর পারেনি প্ল্যাটনার। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তমিস্রা ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছিল এদের প্রত্যেকে নিঃশব্দে... চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই এত দৃশ্য দেখে নিয়েছিল প্ল্যাটনার। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয় লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, অণু-পরমাণুতে, শিরায়, ধমনিতে। তাই অজান্তেই কখন জানি পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবুজ গুঁড়োর শিশিটা টেনে এনে বাড়িয়ে ধরেছিল সামনে। একেবারেই অজান্তে—কখন যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিশি টেনে বার করেছিল—প্ল্যাটনারের তা একেবারেই মনে নেই।

আচম্বিতে স্তব্ধ হয়েছিল পদশব্দ। কান খাড়া করেছিল প্ল্যাটনার আবার সেই রক্ত উত্তাল-করা অপার্থিব আওয়াজ শোনার প্রত্যাশায়। কিন্তু নিথর নীরবতা ছাড়া কানের পরদায় আর কিছুই ধরা পড়েনি। তারপরেই, সহসা যেন শানিত ছুরিকাঘাতে ফর্দাফাঁই হয়ে গিয়েছিল থমথমে নৈঃশব্দ্য—কানের ওপর আছড়ে পড়েছিল তীক্ষ্ণ ঘণ্টাধনি।

প্রথম শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুখ দুলে উঠে ছুটে গিয়েছিল আশপাশ দিয়ে। আরও জোরালো হাহাকারের বুক-ভাঙা বিলাপে শিউরে উঠেছিল প্ল্যাটনার। স্ত্রীলোকটার কানে কিন্তু বুক চাপড়ানোর মতো এত জোর আওয়াজের বিন্দুবিসর্গ পৌঁছায়নি। তন্ময় হয়ে সে তখন মোমবাতির আলোয় পুড়িয়ে ছাই করছে একটা কাগজ। দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবছা হয়ে এসেছিল সবকিছুই, হিমশীতল একটা দমকা হাওয়া পাঁজর-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মতোই বয়ে গিয়েছিল ভাসমান মুখগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে। বসন্তের হাওয়ায় মরা পাতা যেভাবে উড়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে, সেইভাবেই অগুনতি মুখকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কনকনে বাতাসের ঝাপটা, তৃতীয়বার ঘণ্টার আওয়াজ শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা এগিয়ে গিয়েছিল শয্যা অবধি। অলোকরশ্মির কথা আপনারা অনেক শুনেছেন। কিন্তু সেদিন প্ল্যাটনার যা দেখেছিল চোখ রগড়ে নিয়ে, তা অন্ধকারের রশ্মি, ছায়াময় একটা হাত আর তার বাহু!

দিগন্তব্যাপী ধু-ধু কালো শূন্যতাকে তখন গ্রাস করছে সবুজ সূর্য। ভোর হচ্ছে সবুজ দুনিয়ায়। আসছে ঘরের দৃশ্য। শয্যায় শায়িত হাড় বার-করা মানুষটা বিষম যন্ত্রণায় তেউড়ে ফেলেছিল সারা শরীর, বীভৎসভাবে বিকৃত হয়েছিল মুখ। চমকে ঘাড় ফিরিয়েছিল স্ত্রীলোকটা।

ঠান্ডা কনকনে হাওয়ার ঝাপটায় সন্ত্রস্ত মুখগুলো ভেসে উঠেছিল মাথার ওপর মেঘের মতো—সবুজ ধুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল দমকা বাতাসে খাদের মধ্যেকার মন্দিরের দিকে হু হু করে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে বিস্তৃত ছায়াময় কালো বাহুর অর্থ আচম্বিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল প্ল্যাটিনারের অবশ চেতনায়।

অন্ধকারের হাত তখন খামচে ধরেছে মুমূর্ষু শিকারকে। ঘাড় ফিরিয়ে বাহুর অধিকারী কৃষ্ণ ছায়াকে দেখার সাহস হয়নি প্ল্যাটনারের। প্রবল চেষ্টায় শক্তি জুগিয়েছিল অসাড় পা দু'খানায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে দৌড়াতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল একটা গোল পাথরের ওপর—হাতের শিশি পাথরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে চুরমার তো হয়েছিলই—প্রলয়ংকর বিস্ফোরণটা ঘটেছিল ঠিক তখনই।

পরের মুহূর্তেই দেখেছিল, রক্তাক্ত হাতে বিমূঢ় মস্তিষ্কে বসে রয়েছে লিডগেটের মুখোমুখি—স্কুলের পেছনে পাঁচিলে ঘেরা বাগানে।

প্ল্যাটনারের গল্পের শেষ এইখানেই। গল্প-লেখকের কায়দায় কিন্তু গল্পটা উপহার দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সে চেষ্টাও করিনি। কল্পনার সাজ পরিয়ে এ ধরনের আজগুবি কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করার ধারকাছ দিয়েও যাইনি। প্ল্যাটনার যেভাবে বলেছে, লিখলামও সেইভাবে। মৃত্যুদৃশ্যকে গল্পের প্লটে ফেলে প্ল্যাটনারকে তার মধ্যে জড়িয়ে দিতে পারলে মন্দ হত না ঠিকই। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে নির্জলা সত্য কাহিনিটা মিথ্যা হয়ে দাঁড়াত। সবুজ দুনিয়ার ছায়ামায়া এভাবে ফুটে উঠত না, ভাসমান মুখদের এভাবে হাজির করা যেত না, অন্ধকারের দুনিয়ার বিচিত্র প্রভাবকে এভাবে উপলব্ধি করা যেত না। খেয়াল রাখবেন, তাদের দেখা যাচ্ছে না ঠিকই—অষ্টপ্রহর কিন্তু বিশাল চোখ মেলে নজর রেখেছে আমাদের প্রত্যেকের ওপর।

শুধু একটা কথা বলা দরকার। স্কুল-বাগানের ঠিক পাশেই ভিনসেন্ট টেরেসে সত্যিই মারা গিয়েছিল এক ব্যক্তি—প্ল্যাটনারের পুনরাবির্ভাবের মুহূর্তে। মৃত ব্যক্তি পেশায় খাজনা আদায়কারী এবং বিমা এজেন্ট। বিধবা স্ত্রী-র বয়স অনেক কম। গত মাসে বিয়ে করেছে অলবিডিং-এর পশুচিকিৎসক মি. হোয়াইম্পারকে। উপাখ্যানের এই অংশটা লোকমুখে জেনেছে এ তল্লাটের প্রত্যেকেই। এই কারণেই কাহিনিতে তার নাম উল্লেখ করার অনুমতিও দিয়েছে আমাকে। একটি শর্তে। মৃত স্বামীর অন্তিম মুহূর্তে প্ল্যাটনার যা যা দেখেছে, তার সবই যে ভুল, আমাকে তা লিখতে

হবে। না, কোনও উইল সে পোড়ায়নি। একটাই উইল করেছিল লোকান্তরিত স্বামী—বিয়ের ঠিক পরেই। প্ল্যাটনার কিন্তু উইল পোড়ানোর কোনও কথাই বলেনি অথচ ঘরের কোন ফার্নিচারটি কোথায় আছে, তা নিখুঁতভাবে বলে গেছে। বাস্তবে তা মিলেও গেছে।

আরও একটা কথা। যদিও আগেও বলেছি কথাটা, আবার বলছি। বলতে বাধ্য হচ্ছি কুসংস্কারাচ্ছন্নদের ভয়ে। প্ল্যাটনার ন'দিন অন্তর্হিত হয়েছিল এই দুনিয়ার বাইরে—এ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। তাতে কিন্তু তার কাহিনির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে না। 'স্থান'-এর বাইরেও চোখের ভ্রান্তি অসম্ভব কিছু নয়। পাঠক-পাঠিকারা শুধু এইটুকুই মনে রাখবেন।
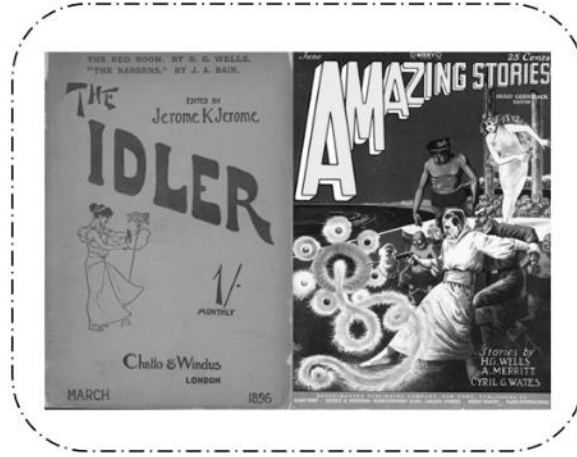
'The Story of the Late Mr. Elvesham' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The Idler' পত্রিকায় মে ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের ছোটগল্পের সংকলন 'The Plattner Story and Others' বইটিতে গল্পটি স্থান পায়। জুন ১৯২৭ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories'-তে।

দেহ-লুঠেরা

(The Story of the Late Mr. Elvesham)

কাহিনিটা লিখে যাচ্ছি স্রেফ পরোপকারের মনোবৃত্তি নিয়ে। আমার মতো আর কেউ যেন ফাঁদে পা না দেয়। আমার দুর্গতির কাহিনি পড়ে যেন পাঁচজনে উপকৃত হয়। আমার যা হবার, তা তো হয়েই গেছে। পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুর জন্যে তৈরি হচ্ছি।

জানি, অবিশ্বাস্য এই কাহিনি পড়ে মুচকি হাসি হাসবেন প্রত্যেকেই। সত্যি কথা বলতে কী, বিশ্বাস করানোর প্রত্যাশা নিয়েও কলম ধরিনি। উদ্দেশ্যটা স্রেফ পরোপকার—আমার মতো হাল আর যেন কারও না হয়।

এবার শুনুন আমার নামধাম, বাবা-কাকার পরিচয়। এডওয়ার্ড জর্জ ইডেন, এই নামে আমি ধরায় আগমন করেছিলাম খুবই মন্দ কপাল নিয়ে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ট্রেন্টহ্যামে। বাবা চাকরি করত ওখানকার বাগানে। মা-কে হারিয়েছি তিন বছর বয়সে, বাবাকে পাঁচ বছরে। ছেলের মতো করেই মানুষ করেছিল কাকা জর্জ ইডেন। বিয়ে-থা করেনি কাকা। উচ্চশিক্ষিত। পেশায় সাংবাদিক। বার্মিংহ্যামে চিনত সবাই। শিক্ষার বীজ, উচ্চাশার নেশা ভালোভাবেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার ভেতরেও। মারা যাওয়ার সময়ে উইল করে নিজের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যায় আমার নামে। সবার পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দেখা গেল তার পরিমাণ পাঁচশো পাউন্ড। উইলে একটাই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিল কাকা। লেখাপড়া শেষ করার পর যেন টাকাটা খরচ করি। ডাক্তারি পড়ব বলে তখন মনস্থ করে ফেলেছি। স্কলারশিপের টাকায় আর কাকার সম্পত্তির জোরে ভরতি হয়ে গেলাম লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ডাক্তারি ক্লাসে। তখন থাকতাম ১১এ, ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের বাড়িতে ওপরতলার যাচ্ছেতাইভাবে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একটা ছোট্ট ঘরে। কানাকড়ির হিসেব রেখে অত্যন্ত

মিতব্যয়ী থাকব, এই অভিলাষে ছোট্ট এই ঘরখানাতেই থাকা, খাওয়া, শোয়া, পড়া— একাধারে সবই চালিয়ে যেতাম।

একদিন বগলে পুরানো একজোড়া জুতো নিয়ে বেরতে যাচ্ছি টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে মুচির কাছ থেকে মেরামত করে আনব বলে, এমন সময়ে দেখলাম, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ চেয়ে আছে দরজার নম্বরের দিকে। নম্বর সঠিক কি না বুঝতে পারছে না। চৌকাঠ পেরিয়ে পড়লাম একেবারে বুড়োর সামনেই। মুখখানা হলদেটে। জীবনে কখনও দেখিনি। কিন্তু আমার সারাজীবন এখন জড়িয়ে গেছে এই বুড়োর জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম জটিলভাবে।

দরজা খুলে বেরতেই বৃদ্ধর চোখ পড়ল আমার মুখের ওপর। নিষ্প্রভ ধূসর চোখ, কিনারার দিকে লালচে। আমাকে দেখামাত্র মুখখানা ঢেউখেলানো করোগেটেড টিনের মতো তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল মধুর আপ্যায়নের ভঙ্গিমায়।

'যাক, এসে গেছেন। বাড়ির ঠিকানাটা একদম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। বলুন আছেন কেমন, মি. ইডেন!'

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। চিনি না, শুনি না, কিন্তু এমন সাদর সম্ভাষণ করে বসল যেন সাত জন্মের চেনাশোনা। বগলের বুটজোড়ার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখে মেজাজটাও গেল খিঁচড়ে। সুতরাং পালটা ভদ্রতা অবশ্যই দেখাইনি।

বুড়ো তা লক্ষ করে বললে, 'ভাবছেন এ আবার কে? বন্ধু... বন্ধু বলেই মেনে নিন। কেমন? আমাকে আপনি দেখেননি ঠিকই, কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি। কোথায় কথা বলা যায় বলুন তো?'

দ্বিধায় পড়লাম। আমার নিজের ঘরের যা ছিরি, কোনও অজানা-অচেনা মানুষকে সেখানে বসানো যায় না।

তাই বললাম, 'চলুন-না, হাঁটা যাক।'

'রাস্তায় তো? কোনদিকে বলুন?'

টুপ করে বুটজোড়া নামিয়ে নিলাম ফুটপাতে।

বুড়ো বললে, 'এসেছি তো বাজে কথা বলতে। লাঞ্চ খেতে খেতে বলা যাবে'খন। বুড়ো হয়েছি, গলার আওয়াজ তো ফাটা বাঁশির মতো, গাড়ি-ঘোড়ার যা আওয়াজ—'

বলে, আমার বাহু স্পর্শ করেছিল বুড়ো, যাতে অমত না করি। লক্ষ করলাম, হাত কাঁপছে—বুড়োর পয়সায় খেতে মন চায়নি। ক্ষীণ আপত্তি করেছিলাম। বুড়ো শোনেনি। পাকা চুলকে একটু শ্রদ্ধা জানালে ক্ষতি কী? রাজি হয়ে গেলাম যুক্তি শুনে।

দু'জনে গেলাম ব্ল্যাভিট্স্কির হোটেলে। এমন খাসা খানা অনেকদিন খাইনি। খেতে খেতে যখন কাজের প্রশ্ন করলাম, সুকৌশলে এড়িয়ে গেল বুড়ো। চেহারাটা দেখে নিলাম বেশ খুঁটিয়ে। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। মুখ সরু। চামড়া কোঁচকানো। দাঁত বাঁধানো। শিথিল ঠোঁট ঝুলছে বাঁধাই দাঁতের ওপর। সাদা চুল খুবই পাতলা আর লম্বা। আমার যা বিরাট শরীর, বেশির ভাগ লোকই সে তুলনায় বামন বললেই চলে। সুতরাং বুড়োর ছোটখাটো আকৃতি দেখে খুব একটা মাথা ঘামালাম না। কাঁধ গোল। একটু কুঁজো।

লক্ষ করলাম, আমার ওপরেও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে বুড়ো। চাহনি যেন লোভাতুর। এরকম অদ্ভুত লোভ-চকচকে চোখ বড় একটা দেখা যায় না। আমার বৃষস্কন্ধ, আমার রোদে জ্বলা হাত, আমার ফুটফুটে দাগযুক্ত মুখ—সবই যেন লোভের উন্মেষ ঘটিয়ে চলেছে বৃদ্ধের চোখে।

খাওয়া শেষ হল, সিগারেট ধরিয়ে বুড়ো বললে, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। প্রথমেই বলে রাখি, বয়স আমার খুবই বেশি—অথর্ব বলতে যা বোঝায়, তা-ই। কিন্তু আমার টাকা আছে। ছেলেপুলে নেই। ভাবনাটা সেই কারণেই, এত টাকা দিয়ে যাব কাকে?'

এসব চালাকি আমার জানা আছে। পাঁচশো পাউন্ড না বেহাত হয়। সাবধান হয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। বুড়ো কিন্তু ইনিয়েবিনিয়ে গাওনা গেয়ে গেল নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের। বড় একা, বড় একা। উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না পেলে এত সম্পত্তি দেবে কাকে? নানা পরিকল্পনা এসেছিল মাথায়—কিন্তু খারিজ করেছে একটার পর একটা। দাতব্য প্রতিষ্ঠান, স্কলারশিপ, সমাজসেবী সংস্থা, লাইব্রেরি—সব নাকচ হয়ে গেছে মনে মনে তৌল করার পর।

'শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি,' আমার মুখের ওপর খর-নজর নিবদ্ধ রেখে বলেছিল বৃদ্ধ, 'নওজোয়ান কাউকে দিয়ে যাব আমার বিপুল সম্পত্তি। এমন একজন যুবা পুরুষ চাই, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, যার মন নির্ভেজাল, যে গরিব কিন্তু দেহ-মনে স্বাস্থ্যবান। হ্যাঁ, আবার বলছি, এইরকম একটি ছেলেকেই দিয়ে যাব আমার যা কিছু আছে—স-ব। ঝঞ্ঝাটমুক্ত হব তখনই—কিন্তু আমার টাকায় সে উচ্চশিক্ষা পাবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করবে, স্বাধীন জীবনযাপন করবে।'

এমন ভান দেখানোর চেষ্টা করলাম যেন আমার কোনও আগ্রহই নেই। ছলনাটা নিতান্তই স্বচ্ছ যদিও। কাষ্ঠ হেসে বলেছিলাম, 'আমাকে দিয়ে সেইরকম একটা ছেলে খুঁজে বার করতে চান, এই তো?'

ছলনা যে ধোপে টিকল না তা বুড়োর হাসি দেখেই বুঝলাম। সিগারেটে লম্বা টান মেরে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললে, 'কয়েকটা শর্ত অবশ্য থাকবে। প্রথম, আমার নাম তাকে নিতে হবে। কিছু না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়? দ্বিতীয়, সে যে যে পরিস্থিতিতে যে যে মহলে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সবকিছুর মধ্যে আমাকেও রপ্ত করে দিতে হবে। বাজিয়ে নেব ভালো করেই। জানব তার বংশপরিচয়, জানব কীভাবে মারা গেছেন তার বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা। এমনকী তার চরিত্রের যেদিকটা পাঁচজনকে না জানিয়ে করা হয়—তা-ও জানব।'

'সেরকম ছেলে বলতে কি আমাকেই—'

'হ্যাঁ, বাবা, তোমাকেই!'

জবাব দিতে পারলাম না। মন-ময়ূর তখন পাখা মেলে ধরেছে। কল্পনার রথ তখন উড়ে চলেছে। বলবার মতো ভাষা এল না মুখে।

কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকার পর বলেছিলাম আমতা আমতা করে, 'কিন্তু দুনিয়ায় এত ছেলে থাকতে আমাকেই—'

'প্রফেসার হ্যাসলারের কাছে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তোমার স্বাস্থ্য, চরিত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সবই নিরেট। নির্ভরযোগ্য। সততা আর স্বাস্থ্য যার মধ্যে আছে, আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে একমাত্র সে-ই। তুমিই সেই ছেলে।'

বুড়োর সঙ্গে সেই আমার প্রথম মোলাকাত। প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম, রহস্যের আবরণে ঘিরে রেখে দিয়েছে নিজেকে। নাম বলেনি। দু'-চারটে প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল—বেশি নয়। বিদায় নিল ব্ল্যাভিট্স্কির গাড়িবারান্দা থেকে। লাঞ্চের দাম মিটিয়ে দিয়েছিল পকেট থেকে এক মুঠো মোহর বার করে। কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার বলেছিল, দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট থাকা চাই। চাহিদা বড়ই অদ্ভুত। খটকা লেগেছিল তখনই। সেইদিনই বৃদ্ধের ইচ্ছেমতো মোটা টাকার জীবনবিমা করিয়েছিলাম। ডাক্তারদের চুলচেরা পরীক্ষা সত্ত্বেও খুশি হয়নি বুড়ো। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডক্টর হেন্ডারসনকে দিয়ে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বাজিয়ে নিয়েছিল। পরের সপ্তাহের শুক্রবারে নিয়েছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। ডাক শুনে নেমে এলাম নিচে। দেখলাম, বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে ম্যাড়মেড়ে গ্যাস-লণ্ঠনের তলায়। ছায়ামায়ায় বিদঘুটে হয়ে উঠেছে শীর্ণ মুখখানা। প্রথম দিন যতখানি কুঁজো দেখেছিলাম, সেদিন দেখলাম আরও বেশি। তোবড়ানো গাল তুবড়েছে আরও খানিকটা।

চাপা আবেগে কাঁপা গলায় বলেছিল, 'ইডেন, সবই তো মনের মতো হল—এবার তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। তার আগে একটু উৎসব করে নেওয়া যাক—আজ রাতেই—দেরি না—একদম না।...'

বলতে বলতে কুঁজো দেহটা দুমড়ে গিয়েছিল কাশির ধমকে। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে, হাড় বার-করা আঙুলে আমার বাহু খামচে ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। ছ্যাকড়া গাড়ি থামিয়ে ভেতরে উঠে বসেছিল আমাকে নিয়ে, ঝড়ের মতো গাড়ি বেয়ে গিয়েছিল রিজেন্ট স্ট্রিটের খানদানি রেস্তরাঁয়। সেদিনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দৃশ্য জ্বলজ্বল করছে মনের মধ্যে। গ্যাসের লণ্ঠন, তেলের বাতি, বিজলি আলো সাঁত সাঁত করে বেরিয়ে গিয়েছিল দু'পাশ দিয়ে। জনবহুল পথেও গাড়ি উড়ে যাচ্ছিল যেন পক্ষিরাজের মতো।

দারুণ খানা খেয়েছিলাম রেস্তরাঁয়। আমার সাদামাটা পোশাকের দিকে সুবেশ ওয়েটারের তির্যক চাহনি প্রথমটা একটু দমিয়ে দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল পেটে শ্যাম্পেন পড়তেই। ফিরে এসেছিল আত্মবিশ্বাস।

নিজের কথা দিয়েই কথাবার্তা শুরু করেছিল বৃদ্ধ। গাড়িতে আসবার সময়ে বলেছিল নিজের নাম। স্কুলে পড়বার সময়েই শুনেছিলাম সেই নাম। বিরাট দার্শনিক। এগবার্ট এলভেসহ্যাম, ছেলেবেলা থেকেই যার বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পড়েছে আমার ওপর, যার জীবনদর্শন নাড়া দিয়ে গেছে আমাকে বিলক্ষণ, বিখ্যাত সেই ধীশক্তিটি কৃশকায় অপটু জীর্ণ দেহে আমার এত সান্নিধ্যে এসেছে জেনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম আমি। স্মরণীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে হতাশ হয় অনেকেই—আমার হতাশা উপলব্ধি করতে পারবে তারাই। কথার তোড়ে অনেক কথাই বলে গিয়েছিল বৃদ্ধ। আয়ু তো প্রায় শেষ, প্রাণবহ্নি নিবু নিবু—কোনওরকমে টিকিয়ে-রাখা জীবনধারা ধু ধু মরু হয়ে যাবে সর্বস্ব আমাকে দান করার পর। বাড়ি, লেখার স্বত্ব, জমানো টাকা, নানা ব্যবসায়ে লগ্নি করা অর্থ—সমস্ত এবার থেকে হবে আমারই। দার্শনিকরা যে এত বড়লোক হয়, আগে জানা ছিল না। আমার খাওয়া এবং মদ্যপান —দুটোই ঈর্ষার চোখে নিরীক্ষণ করে গেছে বৃদ্ধ। বলেছিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'বাঁচবার সামর্থ্য আছে বটে তোমার—তবে বেশি দিন থাকে না কিছুই।' দীর্ঘশ্বাসের ধরনটা আমার কাছে মনে হয়েছিল একটু অন্য রকমের। যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেল বৃদ্ধ।

শ্যাম্পেন খেয়ে আমার মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বলেছিলাম সোল্লাসে, 'কিন্তু ভবিষ্যৎ তো আছে। উজ্জ্বলতর হবে সেই ভবিষ্যৎ আপনার কৃপায়। আপনার নাম ব্যবহারের সম্মান পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? আপনার গৌরবময় অতীতও হবে আমার ভবিষ্যতের পাথেয়।...'

তোষামুদে তারিফ শুনে একটু বিষণ্ণভাবেই মাথা নেড়ে ক্ষীণ হাসি হেসেছিল বুড়ো। বলেছিল, 'ভবিষ্যৎ কি পালটাতে পারবে? আমার নাম নিতে তোমার আপত্তি নেই, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিতেও দ্বিধা নেই, কিন্তু পারবে কি আমার বয়সের ভার মাথায় নিতে?'

‘আপনার সমস্ত কীর্তির সঙ্গে সঙ্গে তা তো নেবই,’ বলেছিলাম বুক চিতিয়ে।
ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। হেসে সুপেয় সুরার অর্ডার দিয়েছিল বৃদ্ধ। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বার করে হলদেটে কাঁপা আঙুলে মোড়ক খুলতে খুলতে বলেছিল, ‘এর মধ্যে আছে আমার অপ্রকাশিত জ্ঞানের একটুখানি। অডার দিলাম কুমেল-এর—এই জিনিস একটু ছিটিয়ে দাও তার মধ্যে—দেখবে কুমেল হয়ে গেছে হিমেল।’

‘কুমেল’ একজাতীয় উৎকৃষ্ট আসব। যে জিনিসটা ছিটিয়ে দেওয়ার জন্যে মোড়ক খুলে দেখালে, সেটা একটা গোলাপি গুঁড়ো। শেষ কথাটা বলতে বলতে মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

সুরার সৌরভ নিয়েও এত বড় দার্শনিক মাথা ঘামায়, ভাবতে গিয়ে মনে মনে আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু মদের নেশা সত্ত্বেও বুড়োর সৌরভবাতিক নিয়ে তোষামোদ করতে ছাড়িনি।

গোলাপি গুঁড়ো দু’ভাগ করে দু’টি মদিরাপাত্রে মিশিয়ে দিয়েছিল বৃদ্ধ। তারপরেই আচমকা এমন মর্যাদাগম্ভীর ভঙ্গিমায় সুরাপাত্র বাড়িয়ে তুলেছিল আমার দিকে যে, থতমত খেয়ে অনুকরণ করেছিলাম আমিও। টুং করে ঠোকাঠুকি লেগেছিল দুই গেলাসে। ‘উত্তরাধিকার বর্তাক অবিলম্বে,’ বলেই গেলাস তুলেছিল ঠোঁটের গোড়ায়।

‘না, না,’ দ্রুত স্বরে বাধা দিয়েছিলাম আমি।

থমকে গিয়েছিল বৃদ্ধ। সুরাপাত্র নেমে এসেছিল চিবুকের তলায়। দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল আমার ওপর।

আমি বলেছিলাম, ‘কামনা জানাই দীর্ঘ জীবনের।’

দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল বৃদ্ধ।

পরক্ষণেই অট্টহেসে বলেছিল, ‘তা-ই হোক, কামনা জানাই দীর্ঘ জীবনের।’

দু’জনে দু’জনের চোখে চোখে চেয়ে খালি করে দিয়েছিলাম গেলাস। চোঁ চোঁ করে চুমুক দেওয়ার সময়েও দেখেছিলাম, বুড়োর চোখ নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। গেলাস খালি হতেই অদ্ভুত তীব্র একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। বিচিত্র সেই অনুভূতির প্রথম পরশেই তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল মস্তিষ্কের মধ্যে। খুলির মধ্যে কোষগুলো যেন সত্যি সত্যিই লাফালাফি জুড়েছে মনে হয়েছিল। কানের মধ্যে শুনেছিলাম একটানা গুঞ্জনধ্বনি। সুরার স্বাদ পাইনি জিবে অথবা গলায়, সৌরভে মুখ-গলা ভরে গেলেও তার উপলব্ধি ঘটেনি—বুড়োর ধূসর অনিমেষ চাহনির তীব্রতা যেন পুড়িয়ে দিয়েছিল আমার সত্তা। এক চুমুকেই শেষ করেছিলাম পাত্র। কতটুকুই বা আর সময় লাগে তাতে? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যেন অনন্তকাল ধরে চুমুক দিয়েই চলেছি। মাথার মধ্যে লন্ডভন্ড কাণ্ডও অব্যাহত রয়েছে

অনন্তকাল ধরে। দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মগজের প্রতিটা কোষ যেন তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছে করোটির মধ্যে। চিন্তা-বুদ্ধি সবকিছুই ঘোলাটে—আবিলতা কাটছে না কিছুতেই। চৈতন্য লোপ পেলেও পাচ্ছে না—অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় আবছাভাবে শুধু মনে আছে যেন বিস্তর অর্ধবিস্মৃত ঘটনা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে অস্ফুট অবস্থাতেই।

সম্মোহনের ঘোর ভঙ্গ করল বৃদ্ধ নিজেই। আচম্বিতে পাঁজর-ভাঙা দমকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নামিয়ে রাখল গেলাস।

বললে, 'কেমন বুঝছ?'

'অপূর্ব!' সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে না পেরেও বলেছিলাম মুহ্যমানের মতো।

মাথায় তখন চরকিপাক দিচ্ছে। বসে পড়েছিলাম ধপ করে। প্রলয়কাণ্ড চলছে ব্রেনের মধ্যে, এইটুকুই কেবল উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম হাড়ে হাড়ে। একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল অনুভূতি। ফাঁপা, বক্র, অবতল আয়নায়।

যেভাবে সবকিছুই খুদে খুদেভাবে দেখা যায়, মনে হয়েছিল, সেইরকমই দেখছি সামনের দৃশ্য—কাছে থেকেও যেন দূরে সরে গেছে, ছোট হয়ে গেছে। বুড়োর হাবভাবেও পরিবর্তন এসেছে। ধড়ফড় করছে অত্যন্ত নার্ভাসভাবে। চেনে বাঁধা ঘড়ি টেনে বার করল হন্তদন্ত ভঙ্গিমায়। এক পলক দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এখুনি না বেরলেই নয়। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। আরেকজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভাড়াটে গাড়িতে উঠে বসার পর নিজের কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, 'গুঁড়োটা তোমাকে না খাওয়ালেই হত। কাল তো মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক কাজ কর। এই গুঁড়োটা নাও। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে খেয়ে নিয়ো, কেমন? শুতে যাওয়ার আগে কিন্তু—খেয়াল থাকে যেন।'

বলে একটা সাদা প্যাকেট গছিয়ে দিল আমার হাতে। অনেকটা সিডলিজ পাউডারের মতো দেখতে, যা নাকি মৃদু জোলাপ হিসেবে খাওয়া হয়। বুড়োর ঝুলে-পড়া চোখের পাতা দেখে বুঝলাম, আমার মতোই অবস্থা হয়েছে নিজেরও। প্যাকেটটা হাতে গছিয়ে 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই হাত খামচে ধরে আমিও বিদায় জানিয়েছিলাম সোল্লাসে। গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে বুকপকেট হাতড়ে শেভিং স্টিকের মতো একটা ছোট চোঙা বার করে গুঁজে দিলে আমার হাতে। দেখ দিকি কাণ্ড। এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল তো আবার দেখা হবে—তখন খুলো—তার আগে নয়। কেমন?'

ঘড়ঘড় শব্দে বেরিয়ে গেল গাড়ি। পুঁচকে চোঙাটা হাত পেতে নিয়েছিলাম আলগোছে—আর-একটু হলেই হাত ফসকে পড়ে যেত রাস্তায়। দারুণ ভারী। সিসের

না প্ল্যাটিনামের? দু'পাশে আর মাঝখানের জোড় বরাবর লাল গালা লাগানো।

সযত্নে বস্তুটা রাখলাম পকেটে। মাথার মধ্যে চাকা ঘুরছে তখনও। ওই অবস্থাতেই হাঁটতে শুরু করলাম রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে। রাস্তার লোক কী ভাবল কে জানে। চলেছি আপন মনে। অন্ধকার গলিঘুঁজি পেরিয়ে এলাম পোর্ট স্ট্রিটে। হাঁটছি যেন আফিমের ঘোরে। কে জানে গোলাপি গুঁড়োটা সত্যিই আফিম কি না। হাঁটার সময়ে যা যা অনুভব করেছিলাম, এখনও তা সুস্পষ্ট মনে আছে। আফিম খাওয়ার অভিজ্ঞতা আগে তো কখনও হয়নি। মনটা যেন দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অনুভূতিটা কী করে বোঝাই, ভেবে পাচ্ছি না। রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন যেন বলতে চাইল, ওয়াটারলু স্টেশনে এসে গেছি—ট্রেনে ওঠা দরকার। চোখ রগড়ে নিয়ে দেখলাম, আরে গেল যা, রিজেন্ট স্ট্রিটেই তো হাঁটছি। বোঝতে পারলাম কি? পাকা অভিনেতা যেন কটমট করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—আমি যেন আর-এক মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম—কটমটে চাহনির সময়ে জোর করে যা ছিলাম, তা-ই হয়ে গেলাম। রিজেন্ট স্ট্রিটকে রিজেন্ট স্ট্রিট মনে হতেই মনের মধ্যে ভিড় করে এল সৃষ্টিছাড়া অনেক স্মৃতি, মনে মনে ভাবলাম, 'ত্রিশ বছর আগে এইখানেই ঝগড়া করেছিলাম ভাইয়ের সঙ্গে।' হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। ফ্যালফ্যাল করে পাশের পথচারীরা চেয়ে ছিল আমার দিকে। ত্রিশ বছর আগে তো জন্মই হয়নি আমার—ভাই-টাইও নেই কস্মিনকালে। গোলাপি গুঁড়োর মাহাত্ম্য কী অপরিসীম। ভাই যে একটা ছিল, এই চিন্তাটা কিন্তু জাঁকিয়ে বসল মাথার মধ্যে এর পরেও। পোর্টল্যান্ড রোড দিয়ে যাওয়ার সময়ে নতুন মোড় নিল পাগলামি। মনে পড়ল এমন অনেক দোকানের কথা, যা অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তা আগে যা ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম বর্তমান রাস্তার চেহারা। আবিল চিন্তাধারার পুরানো স্মৃতি ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিলে অন্যান্য অনেক স্মৃতিও। ঘাবড়ে গেলাম খুবই। ভূতুড়ে স্মৃতির আনাগোনায় আরও গুলিয়ে গেল মাথা। স্টিভেন্স-এর দোকানের সামনে পৌঁছাতেই খেয়াল হল, কী যেন একটা কাজ ছিল দোকানটায়, কিন্তু মনে করতে পারছি না কিছুতেই। সশব্দে একটা বাস বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে, আওয়াজটা মনে হল অবিকল চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আগামীকাল তিনটে ব্যাং পাঠানোর কথা ছিল স্টিভেন্স-এর। আশ্চর্য! এই সহজ ব্যাপারটা ভুলে মেরে দিয়েছিলাম!

একটার পর একটা স্মৃতিদৃশ্য ভৌতিক ছায়ার মতো মনের মধ্যে ঠেলে উঠেই হটিয়ে দিচ্ছে তার একটা অপচ্ছায়ার মতো স্মৃতিকে। স্মৃতি আর স্মৃতি! কোনওটাই আমার জীবনে কখনও ঘটেনি—অথচ তা আমারই স্মৃতি মনে হচ্ছে! হুটোপাটি করছে মনের মধ্যে।

চেনা রাস্তা ছেড়ে কখন যে অন্য পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, সে খেয়ালও ছিল না মাথার মধ্যে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলায়। ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটে পৌঁছানোর পর বাড়ির নম্বর মনে পড়ল না। অনেক চেষ্টার পর ২১এ নম্বর মনে পড়ল বটে, কিন্তু বেশ মনে হল, আর কেউ যেন নম্বরটা বলেছে আমাকে—আমার নিজের বাড়ির নম্বর আমারই মনে নেই—অন্যে মনে করিয়ে দিয়েছে। মাথা ঠান্ডা করার জন্যে ডিনার খাওয়ার ঘটনাগুলো মাথায় আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই বুড়োর মুখটা আনতে পারলাম না মনের মধ্যে। আবছা ছায়ার মতো একটা আকৃতি বারবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল স্মৃতির পরদায়। ঠিক যেন কাচের শার্সিতে প্রতিফলিত কারও মুখ দেখছি। বুড়োর মুখের বদলে দেখলাম নিজের অদ্ভুত রকমের বাহ্য আকৃতি। টেবিলে বসে উজ্জ্বল চোখে রাঙা মুখে বকর বকর করে চলেছি বিষম উৎসাহে।

'অসম্ভব! অন্য গুঁড়োটা এবার খাওয়া দরকার! আর তো পারা যাচ্ছে না,' বলেছিলাম নিজের মনেই।

হলঘরে ঢুকে দেশলাই আর মোমবাতি খুঁজলাম যেদিকে, সেদিকে দেশলাই আর মোমবাতি কখনও থাকে না। সিঁড়িতে উঠে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কোন তলায় রয়েছে আমার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলাম। মাতাল হয়েছি নিঃসন্দেহে। নইলে হোঁচট খাব কেন?

ঘরে ঢুকেই অচেনা লাগল সবকিছুই। জোর করে বশে আনলাম মনকে। উদ্ভট চিন্তাভাবনা তাড়ালাম মন থেকে। চেনা-চেনা মনে হল ঘরখানা। ওই তো আয়না—কোণে সাঁটা কাগজ। ওই তো চেয়ার—মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে জামাকাপড়। তা সত্ত্বেও বেশ মনে হল, জোর করে চেনবার চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু আমি যেন সেই মুহূর্তে বসে রয়েছি রেলগাড়িতে। গাড়ি থামল একটা স্টেশনে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি একটা অচেনা প্ল্যাটফর্মের দিকে।

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি পেয়ে গেলাম নাকি হঠাৎ? নাঃ! কালকেই চিঠি লিখতে হবে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে।

খাটে বসে বুট খুললাম পা থেকে। বেশ বুঝছি, আমার এই বর্তমান অনুভূতি আঁকা রয়েছে আর-একটা অনুভূতির ওপর। সেই অনুভূতিটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আসতে চাইছে ওপরে। একই সঙ্গে দু'জায়গায় থাকা তো যায় না! জামাকাপড় অর্ধেক খুললাম, অর্ধেক পরেই রইলাম। পাউডারটা গেলাসে ঢেলে দিতেই ভুসভুস করে বুদ্‌বুদ উঠল কিছুক্ষণ। দ্যুতিময় অম্বর রঙে রঙিন হয়ে উঠল জল। গলায় ঢেলে দিলাম তৎক্ষণাৎ। বিছানায় শোয়ার সময়ে বুঝলাম, মাথা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বালিশটা মাথার তলায় লাগাতে না লাগাতেই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ। স্বপ্ন দেখছিলাম। অদ্ভুত জানোয়ারদের স্বপ্ন। মন ভারাক্রান্ত। নামহীন আতঙ্কে বুক তোলপাড়। মুখ বিস্বাদ। হাত-পা অবশ। চামড়ায় অস্বস্তিকর শিহরন। শুয়ে রইলাম বালিশে মাথা দিয়ে। অস্বস্তি আর আতঙ্কের ভাবটা কেটে গেলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। কিন্তু তা হল না। বেড়েই চলল রহস্যজনক অপার্থিব অনুভূতি। চারপাশের খাপছাড়া দৃশ্য প্রথমে ধরতে পারিনি। মৃদু আলো রয়েছে ঘরে—প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। তাল তাল তমিস্রার জায়গায় রয়েছে আসবাবপত্রগুলো। চাদরের ওপর দিয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম সেইদিকে।

মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কেউ ঘরে ঢুকেছে। মানিব্যাগ নিয়ে চম্পট দেওয়ার মতলব। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর বুঝলাম, আশঙ্কাটা মনের ভ্রান্তি। তা সত্ত্বেও খটকা গেল না মন থেকে। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটেছে। মুন্ডু তুলে তাকালাম ঘরের চারদিকে। যা দেখলাম তা কল্পনাতে আনতে পারলাম না। অন্ধকার কোথাও কম, কোথাও বেশি। দেখা যাচ্ছে পরদা, টেবিল, ফায়ারপ্লেস, বইয়ের তাক এবং আরও অনেক কিছু। তারপরেই দূরের অন্ধকারের মধ্যে অচেনা-অপরিচিত অনেক কিছুই দেখতে পেলাম। খাট ঘুরে গেল নাকি? বইয়ের তাক হতে পারে দূরের ওই জমাট অন্ধকার, কিন্তু তার পাশে যা দেখছি, সেটা তো আমার চেয়ার নয়। চেয়ারের চেয়ে অনেক বড়।

ছেলেমানুষি আতঙ্কে গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়ে পা বাড়ালাম খাট থেকে নামব বলে। কিন্তু মাটিতে পা ঠেকা দূরের কথা, তোশকের কিনারা পর্যন্ত পা পৌঁছাল না। এগিয়ে গিয়ে বসলাম খাটের ধারে। খাটের পাশেই থাকা উচিত মোমবাতি, ভাঙা চেয়ারের ওপর দেশলাই। হাত বাড়ালাম। হাতে ঠেকল না কোনওটাই। প্রায়ান্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে হাত ঠেকল ভারীমতো একটা বস্তুতে। খসখস আওয়াজ হল হাত দিতেই। খামচে ধরে টান দিতেই বুঝলাম, খাটের মাথায় ঝুলছে পরদা।

ঘুমের জড়তা তখন কেটে গেছে। বেশ বুঝলাম, অজানা-অচেনা একটা ঘরে বসে আছি। ঘাবড়ে গেলাম। গত রাতের ঘটনাগুলো মনে করলাম। অবাক কাণ্ড! সুস্পষ্ট মনে করতে পারলাম। খাওয়া, হাত পেতে মোড়ক নেওয়া, নেশাখোরের মতো হাঁটাচলা, আধখ্যাঁচড়াভাবে জামাকাপড় খোলা, বালিশে মাথা দেওয়ার পর নিবিড় প্রশান্তি। বিশ্বাস করতে পারলাম না নিজেকেই। গতকালের ঘটনা না পরশু রাতের ঘটনা? চুলোয় যাক, এ ঘরটা তো আমার নয়—এলাম কী করে? আবছা আঁধার আরও পাতলা হয়ে আসছে, জানলা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, খড়খড়ি দিয়ে যেন ভোরের আলো ঢুকছে। ডিম্বাকৃতি কাচটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতেই বড় কাহিল মনে হল নিজেকে। টলছি। কাঁপা হাত সামনে বাড়িয়ে জানলার দিকে এগতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে গেল একটা চেয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়ায়। কাচে হাত বোলালাম। বেশ বড়

কাচ। হাতে ঠেকল বাহারি ঝুলন্ত দীপাধার—পেতলনির্মিত। খড়খড়ির দড়ি খুঁজলাম। পেলাম না। হাত ঠেকল ঝুমকোয়। টান মারতেই খট করে খড়খড়ি উঠে গেল ওপরে।

যে দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে, তা কখনও দেখিনি। আকাশ মেঘে ঢাকা। ভোরের আবছা আলো মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। রক্ত-রঙিন হয়ে উঠেছে মেঘস্তূপের কিনারা আকাশের প্রান্তে। নিচে অন্ধকার। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়, মসিকৃষ্ণ মহীরুহ, আবছা বাড়ির সারি। জানলার তলায় কালো ঝোপ, ফিকে ধূসর পথ। স্বপ্ন দেখছি নাকি? এসব তো কস্মিনকালেও দেখিনি! প্রসাধন টেবিলে হাত বোলালাম। পালিশ-করা কাঠ। সাজানোয় ত্রুটি তো নেই-ই, বরং বাহুল্য আছে। ছোট ছোট কাট-গ্লাসের শিশি রয়েছে বিস্তর। রয়েছে একটা বুরুশ। আরও একটা অদ্ভুত বস্তু হাতে ঠেকল। ঘোড়ার খুরের মতো আকার। মসৃণ। খোঁচা দুটো বেশ শক্ত। জিনিসটা রয়েছে একটা প্লেটের ওপর। দেশলাই পেলাম না। মোমবাতিও পেলাম না। আবার চোখ বোলালাম ঘরময়। খড়খড়ি খোলা থাকায় আলো আসছে বলে দেখতে পেলাম, চারদিকে ঝোলানো পরদা দিয়ে ঢাকা বিরাট একটা খাট, খাটের পায়ের দিকে ঝকঝকে সাদা মার্বেল পাথরের মতো বস্তু দিয়ে তৈরি ফায়ারপ্লেস।

প্রসাধন টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে ফের চোখ খুলে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন নয়। এক্কেবারে বাস্তব। গত রাতের নেশার ঘোর বোধহয় কাটেনি। রাতারাতি সম্পত্তির দখল নিয়ে ফেলেছি—এই পাগলামিটাই নেশার ঘোরে অবাস্তবকে বাস্তবের মতো নিশ্চয় তুলে ধরেছে চোখের সামনে। নিজের ঘরদোর সব ভুলে মেরে বসে আছি। সবুর করলেই নিশ্চয় আবার মনে পড়বে। বৃদ্ধ এলভেসহ্যামের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার স্মৃতিটা তো কিন্তু বেশ জ্বলজ্বলে।

শ্যাম্পেনের স্বাদ, ওয়েটারের তাচ্ছিল্যপূর্ণ চাহনি, গোলাপি গুঁড়ো, কড়া মদ—বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। যেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা।

তারপরেই ঘটল একটা তুচ্ছ কিন্তু ভয়ংকর ঘটনা। এখনও ভাবতে গিয়ে গা কাঁপছে। স্বগতোক্তি করেছিলাম—বেশ জোরেই।

'কী মুশকিল! এলাম কোন চুলোয়?'... কণ্ঠস্বর কিন্তু আমার নয়!

না, সে কণ্ঠস্বর কখনওই আমার নয়! অত সরু গলা আমার নয়! উচ্চারণ জড়িত। মুখের হাড়ে স্বরের অনুরণন অন্য ধরনের। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এক হাত দিয়ে আরেক হাত বুলিয়েছিলাম। হাতে ঠেকেছিল শিথিল চামড়া—ভাঁজ-খাওয়া কোঁচকানো চামড়া, হাড়ের ওপর সেঁটে থাকা চামড়া। স্বপ্ন! নিঃসন্দেহে স্বপ্ন দেখছি! গলা তাই

বিকৃত, চামড়াও খসখসে মনে হচ্ছে! হাত বুলিয়েছিলাম মুখে, দাঁত নেই। আঙুল ঠেকেছিল শুকিয়ে-যাওয়া মাড়িতে। ঘিনঘিন করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ।

আয়নায় দেখা দরকার মুখখানা। টলতে টলতে গিয়েছিলাম ম্যান্টেলের দিকে। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে ভয়ানক কাশির ধমকে প্রাণ যায় আর কী। খামচে ধরেছিলাম ফ্লানেলের রাত্রিবাস। আমার গায়ে ফ্লানেলের রাত্রিবাস?

দেশলাই পাইনি। খুব শীত করছিল। নাক বুজে আসছিল। কাশতে কাশতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। টলতে টলতে খাটে উঠে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখছি! স্বপ্ন দেখছি! খাটে উঠতে উঠতে বলেছিলাম গোঙানির স্বরে। অথর্ব বৃদ্ধরাই কিন্তু এইভাবে এক কথা বারবার বলে। চাদর মুড়ি দিয়ে জোর করে চোখে ঘুম টেনে আনার চেষ্টা করেছিলাম। ঘুমালেই স্বপ্ন উধাও হবে। ভোরের আলোয় চিনতে পারব চেনা ঘরকে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তা হয়নি। ঘুমাতে পারিনি। পরিবর্তনটা ধীরগতিতে কিন্তু বেশ দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়ে বসছিল মনের মধ্যে। অব্যাখ্যাত রহস্যজনক পন্থায় আমি রাতারাতি বুড়িয়ে গেছি। যৌবন হারিয়েছি—হারিয়েছি শক্তি, সামর্থ্য, ভবিষ্যতের স্বপ্ন! প্রতারিত হয়েছি রাতারাতি—ঠগবাজের হাতে সঁপে দিয়েছি আমার জীবন আর যৌবনের অমূল্য সম্পদ। অজান্তেই আবার শীর্ণ আঙুল বুলিয়েছিলাম কুঁচকে-যাওয়া মাড়িতে। ভ্রান্তি নয়। সত্যি, নিষ্ঠুর সত্যি।

স্পষ্টতর হয়েছিল ভোরের আলো। ঘুমের চেষ্টা বাতুলতা বুঝে উঠে বসেছিলাম। হিমশীতল উষালোকে স্পষ্ট দেখেছিলাম ঘরের সব জিনিস। পেল্লায় ঘর। ফার্নিচারও বিস্তর। রুচিসম্মত। জীবনে এমন ঘরে ঘুমাইনি। এক কোণে নিচু তেপায়ার ওপর মোমবাতি আর দেশলাই দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়ে নেমে পড়েছিলাম খাট থেকে। ভোরের ঠান্ডায় শিরশির করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ—অথচ তখন গরমকাল। মোমবাতি ধরে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম —

এলভেসহ্যামের মুখ!

এই আতঙ্কটাই আবছাভাবে জড়িয়ে রেখেছিল এতক্ষণ আমাকে।

এলভেসহ্যামের শীর্ণকায় চেহারা আগেও দেখেছি—তখন গায়ে ছিল ধরাচূড়া। এখন দেখলাম অনাবৃত অবস্থায়। রাত্রিবাস খসে পড়ায় সরু গলা আর হাড় বার-করা বুক দেখে শিউরে উঠেছিলাম। তোবড়োনো গাল। লম্বা নোংরা সাদা চুল, ঘোলাটে চোখ। শুকিয়ে-যাওয়া ঠোঁট কাঁপছে থিরথির করে। নিচের শিথিল ঠোঁটের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালচে মাড়ি। সমবয়সিরা উপলব্ধি করবেন আমার মানসিক অবস্থা। পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম স্বাধীনতা হারিয়ে সহসা বন্দি হয়েছি এক জরাকম্পিত বৃদ্ধের জীর্ণ খাঁচায়—আয়ু যার নিঃশেষিত।

চিত্র ১২.১ মোমবাতি ধরে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম।

মূল কাহিনি থেকে কিন্তু সরে আসছি। ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া আচমকা দেহ-পরিবর্তন নিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল চিন্তা করার ক্ষমতা। জানি না কোন জাদুমন্ত্রবলে এক দেহ থেকে আরেক দেহে যাওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু অব্যাখ্যাতভাবে ঠিক তা-ই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে। এলভেসহ্যামের পৈশাচিক মৌলিকতার নগ্নরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের মধ্যে। আমি যেমন তার দেহে ঢুকে বসে আছি, নিঃসন্দেহে এলভেসহ্যামও ঢুকে পড়েছে আমার দেহে—আমার ভবিষ্যৎ, আমার শক্তি এখন তারই দখলে। কিন্তু তা প্রমাণ করা যায় কী করে?

সম্ভাবনাটা এমনই অসম্ভব যে, যাচাই করার জন্যে আবার চিমটি কেটেছিলাম চামড়ায়, আঙুল বুলিয়েছিলাম মাড়িতে, আয়নায় দেখেছিলাম মুখখানা। ঘটনা কিন্তু ঘটনাই থেকেছে। এমন জীবন-মরীচিকাও কি সম্ভব? সত্যিই কি আমি হয়েছি এলভেসহ্যাম, আর এলভেসহ্যাম হয়েছে আমি? ইডেনকে স্বপ্ন দেখছি না তো? ইডেন বলে সত্যিই কেউ কখনও ছিল কি? বেশ তো, আমি যদি এলভেসহ্যামই হই, তাহলে মনে থাকা উচিত গতকাল সকালে ছিলাম কোথায়, আছি কোন শহরে এবং কী কী ঘটেছিল স্বপ্ন শুরুর অগে। ধস্তাধস্তি করেছিলাম চিন্তার সঙ্গে। গত রাতে দুটো স্মৃতি হুড়োহুড়ি করেছিল মনের মধ্যে। এখন মন পরিষ্কার। আসল ইডেনের কোনও স্মৃতিকেই টেনেটুনে তুলে আনতে পারলাম না মনের পরদায়।

'যত্তসব পাগলামি!' ফাটা বাঁশির মতো সরু গলায় চিৎকার করে উঠে টলতে টলতে দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মুখ ধোয়ার বেসিনের সামনে, ঠান্ডা জলে ভিজিয়েছিলাম মাথার সাদা চুল। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে আবার ভাবতে চেষ্টা

করেছিলাম। বৃথা চেষ্টা। নিঃসন্দেহে আমি ইডেনই ছিলাম—এলভেসহ্যাম নয়। ইডেন কিন্তু এখন বন্দি রয়েছে এলভেসহ্যামের শরীরে!

অন্য বয়সের মানুষ হলে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতাম নিজেকে। মন্ত্রের কাছে জারিজুরি খাটে না, অতএব হাল ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করতাম। কিন্তু এ যুগটা যাচাই করে নেওয়ার যুগ। অলৌকিক বা দৈব ঘটনা এ যুগে পাত্তা পায় না। অতএব পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয় মনোবিজ্ঞানের কারসাজি। ওষুধ খাইয়ে আর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে যা ঘটানো যায়, তার উলটোটা ঘটিয়ে দেওয়া যেতে পারে অন্য ওষুধ খাইয়ে আবার নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতে পারলে। স্মৃতিলোপের ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু স্মৃতিবিনিময়ের ঘটনা কেউ কখনও শোনেনি! হাসতে গিয়ে বুড়োটে কেশো হাসি বেরিয়ে এসেছিল গলা দিয়ে। বুড়ো এলভেসহ্যামও নিশ্চয় আমার দুরবস্থা কল্পনা করে হাসছে এই মুহূর্তে। ভাবতেই প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলাম দপ করে—অথচ এরকম রাগে অগ্নিশর্মা হওয়ার ধাত আমার নয়। জামাকাপড় পরতে গিয়ে মেঝে থেকে যা কুড়িয়ে পেলাম তা সান্ধ্য পোশাক। ওয়ার্ডরোব খুলে বার করলাম সেকেলে ট্রাউজারস আর ড্রেসিং গাউন। সাদা মাথায় বুড়োটে টুপি চাপিয়ে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এলাম চাতালে।

তখন বোধহয় পৌনে ছ'টা। বাড়ি নিস্তব্ধ। সব জানালাতেই খড়খড়ি বন্ধ। চাতালটা বেশ চওড়া। দামি কার্পেট পাতা প্রশস্ত সোপান নেমে গেছে নিচের তলার অন্ধকার হলঘরে। সামনেই খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লেখবার টেবিল, ঘোরানো বুককেস, চেয়ারের পেছনদিক আর মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত তাক বোঝাই সারি সারি চমৎকার বাঁধানো কেতাব।

'আমার পড়ার ঘর,' বিড়বিড় করে বলে খোলা দরজার দিকে এগিয়েই থমকে গিয়েছিলাম কণ্ঠস্বর কানে বেজে ওঠায়। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে নকল দাঁতের পাটি মাড়িতে বসিয়ে অভ্যস্ত কায়দায় কামড় বসাতে খাপে খাপে বসে গিয়েছিল বাঁধাই দাঁত।

লেখবার টেবিলের সব ড্রয়ারেই চাবি দেওয়া। ওপরে খাড়াই ঘোরানো অংশটাতেও চাবি দেওয়া। চাবি কোথাও নেই—এমনকী আমার প্যান্টের পকেটেও নেই। শোবার ঘরে পা টেনে টেনে গিয়ে সব ক'টা জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়ালাম। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হল যেন চোর ঢুকেছিল। ঘরময় ছত্রাকার জামা-প্যান্টের কোনও পকেটেই নেই চাবি, নেই টাকাপয়সা, নেই একচিলতে কাগজ—গত রাত্রের ডিনার খাওয়ার বিলটা ছাড়া।

বসে পড়েছিলাম। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম প্রত্যেকটা টেনে বার করা জামা-প্যান্টের দিকে। প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি তখন নিবে গেছে। নিঃসীম নিরাশায় ভেঙে পড়েছি।

প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করেছি শত্রুর বিপুল বুদ্ধিমত্তা, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি কতখানি অসহায় আমি। জোর করে উঠে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিলাম পড়ার ঘরে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খড়খড়ি টেনে তুলছিল একজন পরিচারিকা। আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় চেয়ে রইল চোখ বড় বড় করে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুল্লি খোঁচানোর লোহার ডান্ডা মেরে ভাঙতে লাগলাম লেখবার টেবিল। চুরমার হয়ে গিয়েছিল টেবিলের ওপরদিক, খসে পড়েছিল তালা, খুপরি থেকে চিঠিপত্র ছিটকে পড়েছিল ঘরময়। রগচটা বৃদ্ধের মতোই কলম ছুড়ে ফেলেছিলাম, দোয়াত উলটে দিয়েছিলাম, লেখবার হালকা সরঞ্জাম সমস্ত ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছিলাম। ম্যান্টেলের ওপর বিরাট ফুলদানিও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল—কীভাবে তা বলতে পারব না। তছনছ করেও পাইনি চেকবই, টাকা অথবা আমার দেহ ফিরিয়ে আনার কোনও নিদর্শন। ড্রয়ারগুলো পিটিয়ে তক্তা করার সময়ে দু'জন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে খাসভৃত্য ঘরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর।

সংক্ষেপে, এই আমার দেহ-পরিবর্তনের গল্প। ছিটগ্রস্তের এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি কি তা জানি না? পাগল হয়ে গেছি, তাই নাকি নজরবন্দি আমি। কিন্তু পাগল যে হইনি, তা প্রমাণ করার জন্যেই কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসেছি এই কাহিনি লিখব বলে। কিছু বাদ দিলাম না—খুঁটিয়ে লিখলাম। পাঠক-পাঠিকারা পড়ে বলুন, রচনাশৈলী বা বলার ভঙ্গির মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি? এক বৃদ্ধের দেহপিঞ্জরে বন্দি এক তরুণের হাহাকার নয় কি এই কাহিনি? এত বড় একটা সত্যি ঘটনাও কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় কারও কাছেই। আমার ডাক্তারের, আমার সেক্রেটারিদের, আমার চাকর-চাকরানি এবং প্রতিবেশীদের নাম জানি না। খুবই স্বাভাবিক। তারা আসছে রোজ, কিন্তু যেহেতু তাদের চিনতে পারছি না, তাই আমাকে অপ্রকৃতিস্থ ধরে নিচ্ছে। এদের চোখে তো আমি পাগলই—বদ্ধ পাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছি এদের প্রত্যেককে, কাঁদছি, গলাবাজি করছি, নিষ্ফল রাগে হাত-পা ছুড়ছি। আমার অবস্থায় এর প্রতিটি স্বাভাবিক—ওদের কাছে অস্বাভাবিক। আমার কাছে টাকা নেই, চেকবইও নেই। ব্যাঙ্কে আমার সই মিলবে না—কাঁপা হাতে যে সই করব, তাতে তো মনে হয় ইডেনের লেখার টান থাকবেই। আমি যে নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে সব কথা বলব, সে পথও বন্ধ। এই শুভানুধ্যায়ীরা বেরতে দিচ্ছে না। আমার অ্যাকাউন্ট রয়েছে লন্ডনের কোনও এক পাড়ায়। ধড়িবাজ এলভেসহ্যাম নিশ্চয় নিজের আইনবিদের নামও গোপন রেখেছে বাড়ির লোকের কাছে—যাচাই করার সে পথও বন্ধ। এলভেসহ্যাম মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিল। আমার কাহিনি শুনে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, মন নিয়ে বেশি তন্ময় থাকায় মাথা বিগড়েছে এলভেসহ্যামের, মানে আমার। নিজেকেই নাকি আর নিজে বলে চিনতে পারছি না। দু'দিন আগে

ছিলাম প্রাণবন্ত যুবক—সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর আজ আমি জরাজীর্ণ; ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে হনহন করে টহল দিচ্ছি বাড়িময়, রেগে টং হয়ে আছি, ভয়ে কেউ সামনে আসছে না—দূর থেকে নজরবন্দি রেখেছে উন্মাদকে। লন্ডনে এই মুহূর্তে পূর্ণ যৌবনের সমস্ত সুযোগ নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চলেছে এলভেসহ্যাম—সেই সঙ্গে মগজের মধ্যে ঠাসা রয়েছে সত্তর বছরের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা। চুরি করেছে কেবল আমার জীবনটা! কীভাবে যে এ কাণ্ড ঘটল, আজও তা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। পড়ার ঘর ভরতি অনেক পাণ্ডুলিপিতে দেখেছি মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সংক্ষেপে লিখে রেখেছে এলভেসহ্যাম, সাংকেতিক হরফে অনেক গণনাও রয়েছে—আমার কাছে সবই দুর্বোধ্য। কয়েক জায়গায় যা লিখেছে, তা পড়ে এইটুকু বুঝলাম যে, অঙ্কশাস্ত্রের দর্শনবাদ নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে বিস্তর। যে জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের জন্যে এলভেসহ্যামের আসল ব্যক্তিত্ব, জীর্ণ এই মগজ থেকে তার সবটুকুই চালান করেছে আমার তাজা মগজে এবং আমার যা কিছু তা বিদেয় করেছে এই বাতিল মগজের খাঁচায়। এককথায়, দেহবদল করেছে বুড়ো। এ জিনিস সম্ভব হয় কী করে, তা-ই তো ভেবে থই পাচ্ছি না। আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। চিন্তার জগতে আমি বরাবর বস্তুবাদী। হঠাৎ এই ঘটনার পর দেখছি বস্তু থেকে ব্যক্তির সত্তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব।

মরিয়া হয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব ঠিক করেছি। মরবার আগে বসেছি সব কথা লিখে রাখার জন্যে। আজ সকালে প্রাতরাশের টেবিল থেকে একটা ছুরি দিয়ে অভিশপ্ত এই টেবিলের একটা গুপ্ত ড্রয়ার ভেঙে ফেলেছি। গুপ্ত ড্রয়ার নামেই—চোখের সামনে রেখে যেন গুপ্ত করা হয়েছে। ভেতরে পেয়েছি একটা ছোট্ট সবুজ শিশি—আর কিচ্ছু না। শিশির মধ্যে রয়েছে খানিকটা সাদা গুঁড়ো। লেবেলে লেখা একটাই শব্দ—'মুক্তি'। নিঃসন্দেহে বিষ। এলভেসহ্যামই রেখেছে আমার নাগালের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অছিলায়—যাতে খেয়ে মরি এবং তার অপকর্মের একমাত্র সাক্ষীটি ইহলোক থেকে বিদায় নেয়। লোকটা যত দুরাত্মাই হোক, অমর হওয়ার পথ যে আবিষ্কার করেছে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। দুর্ঘটনা না ঘটলে, আমার শরীর নিয়ে বাঁচবে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। তারপর সুযোগ বুঝে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে প্রবেশ করবে আবার কোনও হতভাগ্য তরুণের দেহে। চুরি করবে তার জীবন, যৌবন, ভবিষ্যৎ। হৃদয়হীন সন্দেহ নেই... কিন্তু আমি ভাবছি, এইভাবে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকবে কোথায়... ভাবছি, কতকাল ধরে এইভাবে দেহ থেকে দেহান্তরে লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে বৃদ্ধ... কিন্তু আর পারছি না। ক্লান্তি বোধ করছি। সাদা গুঁড়ো জলে গুলে যায় দেখেছি। খেতেও খারাপ নয়।

মি. এলভেসহ্যামের টেবিলে পড়ে-থাকা লেখাটার শেষ এইখানেই। মৃতদেহটা পড়ে ছিল চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে। শেষ মুহূর্তে খিঁচুনির সময়ে সম্ভবত চেয়ার ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল পেছনে। গল্পটা পেনসিলে লেখা, হাতের লেখাও মি. এলভেসহ্যামের সুন্দর হস্তাক্ষরের মতো নয়। দুটো অদ্ভুত ঘটনা নথিভুক্ত করেই ইতি টানা যাক উপাখ্যানে। ইডেন আর এলভেসহ্যামের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশই নেই। কেননা এলভেসহ্যামের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হয়েছে ইডেনকে। ইডেন কিন্তু উত্তরাধিকারী হয়েও হতে পারেনি। মারা গিয়েছিল এলভেসহ্যাম আত্মহত্যা করার চব্বিশ ঘণ্টা আগে—জনবহুল চৌমাথায় গাড়িচাপা পড়ে। অত্যাশ্চর্য এই কাহিনিতে আলোকসম্পাত করতে পারত একমাত্র যে ব্যক্তি, এখন সে জেরার বাইরে।

‘In the Abyss’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘Pearson’s Magazine’ পত্রিকায় আগস্ট **১৮৯৬** সালে। **১৮৯৭** সালে লন্ডনের ‘Methuen & Co.’ থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের ছোটগল্পের সংকলন ‘The Plattner Story and Others’ বইটিতে গল্পটি স্থান পায়। সেপ্টেম্বর **১৯২৬** সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ‘Amazing Stories’ পত্রিকায়।

নিতল নগরী
(In the Abyss)

ইস্পাত গোলকটার সামনে দাঁড়িয়ে পাইন কুচি চেবাতে চেবাতে লেফটেন্যান্ট বললে, 'দেখে কি মনে হয়, স্টিভেন্স?'

'আইডিয়াটা ভালোই,' খোলা মনেই জবাব দিয়েছিল স্টিভেন্স।

'চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে কিন্তু।'

'জলের চাপ তো সাংঘাতিক। জলের উপরিভাগে এই চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে চোদ্দো পাউন্ড, ত্রিশ ফুট নিচে তার দ্বিগুণ, ষাট ফুট নিচে তিনগুণ, নব্বুই ফুট নিচে চারগুণ, ন'শো ফুট নিচে চল্লিশগুণ, পাঁচ হাজার ফুট নিচে তিনশোগুণ—প্রায় মাইলখানেক—চোদ্দো পাউন্ডের দু'শো চল্লিশগুণ—প্রায় দেড় টন। প্রতি বর্গইঞ্চিতে দেড় টন। সমুদ্র যেখানে পাঁচ মাইল গভীর, সেখানে সাড়ে সাত টন—'

'ইস্পাতের চাদরও তো দারুণ মোটা।'

নিরুত্তর রইল লেফটেন্যান্ট।

আলোচনা হচ্ছে স্টিলের একটা অতিকায় বল নিয়ে। ব্যাস প্রায় ন'ফুট। দেখতে অনেকটা দানবিক কামানের গোলার মতো। জাহাজের ওপর বিরাট ভার আর মঞ্চ তৈরি করে বলটা রাখা হয়েছে তার ওপর। এইখান থেকেই নামিয়ে দেওয়া হবে সমুদ্রের জলে। বলের গায়ে দুটো গোলাকার জানলা। একটার ওপর আর-একটা। দারুণ পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা। স্টিলের ফ্রেম। একটা জানলা খোলা রয়েছে। লেফটেন্যান্ট এবং স্টিভেন্স সাত সকালেই গোলকের ভেতর দেখে এসেছে। পুরু কুশন দিয়ে মোড়া। কুশনের ফাঁকে ফাঁকে হাতল—সাদাসিধে যন্ত্রপাতি চালু রাখার ব্যবস্থা। ভেতরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে দেওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্বনিক অ্যাসিড শুষে নিয়ে তার বদলে অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়ার মায়ার্স যন্ত্রটাও গদি দিয়ে

সুরক্ষিত। পুরো ভেতরটা এমনভাবে গদি দিয়ে মোড়া যে কামান থেকে গোলার মতো ছুড়ে দিলেও ভেতরে যে বসবে, তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। একটু পরেই কাচের ম্যানহোল দিয়ে সত্যিই এক ব্যক্তির প্রবেশ ঘটবে ভেতরে, গোলক নিক্ষিপ্ত হবে জলে—তলিয়ে যাবে অনেক নিচে—মাইল পাঁচেক তো বটেই।

তারপর? কাচ বেঁকে ভেতরে ঢুকে যাবে—জানলার দফারফা হয়ে যাবে। সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলে লেফটেন্যান্ট। তখন হুড়হুড় করে জল ঢুকবে ভেতরে। লোহার ফলা ঢুকিয়ে দেওয়ার মতোই জলের খোঁচায় প্রাণটা উধাও হবে চক্ষের নিমেষে। বুলেট বলাও যায়। জলের বুলেট। চিঁড়েচ্যাপটা তো হবেই ভেতরের মানুষ, সেই সঙ্গে টুঁটি দু'টুকরো হবে, ফুসফুস ফাটিয়ে দেবে, কানের পরদা—

'গোলকের অবস্থাটা?' জানতে চেয়েছিল স্টিভেন্স।

'বেশ কিছু বুদ্‌বুদ ছেড়ে চিরকালের মতো তলিয়ে যাবে কাদার ওপর। রুটিতে মাখন মাখানোর মতো ব্যাপার আর কী।'

উপমাটা মনে ধরল লেফটেন্যান্টের নিজেরই। নিজের মনেই বারকয়েক আওড়ে গেল একই কথা।

এল্‌সটিড কথাটা শুনল পেছনে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রতলের ভাবী অ্যাডভেঞ্চারার এল্‌সটিড। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। দাঁতের ফাঁকে সিগারেট। টুপির কিনারার নিচে কৌতুক-তরলিত দুই চক্ষু।

'কী হে ওয়েব্রিজ? লোকজন বেশি মাইনে চাইছে নাকি? রুটিতে মাখন মাখানো নিয়ে খুব ফাঁপরে পড়েছ দেখছি। আরে বাবা, আজ বাদে কালই তো ডুব মারল জলে। চমৎকার আবহাওয়া। সিসে আর লোহা নিয়ে বারো টন তলিয়ে যাবে টুপ করে। এত ঝামেলা কীসের?'

'ভাবছি, তোমার অবস্থাটা তখন কী হবে,' বললে ওয়েব্রিজ।

'দূর! জলের ওপর ঢেউ যতই উঁচুতে উঠুক-না কেন, বারো সেকেন্ডের মধ্যে তলিয়ে যাব সত্তর-আশি ফুট নিচে। সেখানে শান্তি... শুধুই শান্তি!'

'ঘড়ি-যন্ত্র ঠিকমতো চলবে তো?'

'পঁয়ত্রিশবার চালিয়ে পরখ করে নিয়েছি।'

'যদি না চলে?'

'কেন চলবে না?'

'বিশ হাজার পাউন্ড দিলেও ওই নচ্ছার গোলার মধ্যে ঢুকব না আমি।'

'কিন্তু আমি ঢুকব। ভেতরে ঢুকে স্ক্রু টাইট দিয়ে জানলাটা আগে বন্ধ করব। তারপর ইলেকট্রিক লাইটটা তিনবার জ্বালব, তিনবার নেবাব। বুঝিয়ে দেব, বহাল তবিয়তে আছি। তখন কপিকলে টুপ করে নামিয়ে দেবে গোলা। বলের তলায়

সিসের ওজনগুলো যেভাবে ঝুলছে, ঝুলবে ঠিক ওইভাবেই। গোলার ওপরে ওই যে সিসের কাটিমটা রয়েছে, ওতে জড়ানো আছে একশো ফ্যাদম লম্বা দড়ি। তারের দড়ি লাগাইনি ইচ্ছে করেই—কাটতে সুবিধে, ভাসেও ভালো। তারের দড়ি হলে তো ডুবে যাবে। বিষয়টা গুরত্বপূর্ণ। যথাসময়ে বুঝবে।'

'কিন্তু—'

'প্রত্যেকটা সিসের ওজনের মধ্যে একটা ফুটো রয়েছে দেখছ? একটা করে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়া হবে ফুটোগুলের মধ্যে দিয়ে। ছ'ফুট নিচে নেমে থাকবে প্রত্যেকটা রড। নিচ থেকে রডে ধাক্কা লাগালেই ধাক্কা লাগবে একটা হাতলে—চালু হয়ে যাবে ঘড়ি-যন্ত্র।

'কপিকলে ঝুলিয়ে সবসুদ্ধ জলে নামিয়ে ঝোলানোর দড়ি কেটে দিলেই গোলা ভাসবে জলে। বাতাস ভরতি গোলা। হালকা। সিসের ওজনগুলো তলিয়ে যাবে নিজেদের ওজনেই—কাটিম থেকে দড়িও খুলে যাবে। বেশ খানিক দড়ি খুলে যাওয়ার পর গোলাও তলিয়ে যাবে—দড়ির টানে।'

'দড়ির টানে কেন? সিসের ওজনগুলো সরাসরি গোলার গায়ে লাগাওনি কেন?' স্টিভেন্সের প্রশ্ন।

'নিচের ধাক্কা এড়ানোর জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই হু হু করে মাইলের পর মাইল নেমে যাবে গোলা। দড়ি না থাকলে আছড়ে পড়ে থেঁতলে যাবে। দড়ির তলায় ঝোলানো সিসের ওজনগুলো আগে ঠেকবে তলায়, কমে আসবে গোলার তলিয়ে যাওয়ার গতিবেগ, আস্তে আস্তে গিয়ে ঠেকবে তলায়, তারপর ভেসে উঠতে থাকবে আস্তে আস্তে।

'ঘড়ি-যন্ত্র চালু হবে ঠিক তখন। লোহার ডান্ডাগুলো সমুদ্রের তলায় ধাক্কা দিয়ে ঘড়ি-যন্ত্র চালু করে দিলেই কাটিমে গুটিয়ে যাবে দড়ি। আধ ঘণ্টা থাকব সাগরতলে। ইলেকট্রিক লাইট জ্বেলে দেখব চারপাশ। তারপরেই ঘড়ি-যন্ত্র খুলে দেবে একটা স্প্রিং-এর ছুরি। কেটে দেবে দড়ি। সোডা ওয়াটার বুদ্‌বুদের মতো হু হু করে গোলা ভেসে উঠবে ওপরে, দড়িটাই সাহায্য করবে ভেসে উঠতে।'

'নিচ থেকে অত জোরে উঠে এসে গোলা যদি ঢুঁ মারে কোনও জাহাজের তলায়?'

'বেশ ফাঁকা জায়গায় কামানের গোলার মতো নামব, উঠব আধ ঘণ্টা পরে। কাজেই দুশ্চিন্তা কীসের?'

'যদি কোনও সামুদ্রিক জীব ঘড়ি-যন্ত্রে শুঁড় জড়িয়ে ধরে?'

'সানন্দে দাঁড়িয়ে যাব।'

বলে, মুগ্ধ চোখে ইস্পাতের গোলকের দিকে চেয়ে রইল এল্‌সটিড।

এগারোটা নাগাদ এল্‌সটিডকে নামিয়ে দেওয়া হল কপিকলে করে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। বাতাস মৃদুমন্দ। দিগন্তে কুয়াশা। ওপরের কামরার ইলেকট্রিক আলো জ্বলল তিনবার, নিবল তিনবার। সামান্য দুলছে গোলা। কাচের জানলা দুটো একজোড়া গোল গোল চোখ মেলে যেন অবাক হয়ে দেখছে ডেকের লোকজনদের। ডেকের ওপর গোলাটাকে মনে হয়েছিল না জানি কী বিরাট, জলে নামিয়ে দেওয়ার পর ধু ধু সমুদ্রের মধ্যে মনে হল নিতান্তই পুঁচকে।

দড়ি কেটে দিতেই একটা ঢেউ চলে গেল গোলার ওপর দিয়ে, দুলছে গোলা, ভীষণভাবে ওলট-পালট খাচ্ছে। দশ পর্যন্ত গুনতেই হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে সিধে হয়ে গেল কিম্ভূত গোলক।

ক্ষণেকের জন্যে ভেসে থেকেই আস্তে আস্তে গেল তলিয়ে। তিন পর্যন্ত গোনবার আগেই অদৃশ্য হল দৃষ্টিপথ থেকে। অনেক নিচে দেখা গেল আলোর দ্যুতি—আস্তে আস্তে আলোককণিকায় পর্যবসিত হয়ে মিলিয়ে গেল একেবারেই। অন্ধকার জলে ঘুরপাক খেয়ে গেল কেবল একটা হাঙর।

মাইলখানেক তফাতে সরে এল জাহাজ। ভেসে ওঠার সময়ে ইস্পাতের গোলা তলায় যাতে ঢুঁ না মারে।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশব্দে কাটল আধ ঘণ্টা। মাথার ওপর ডিসেম্বরের সূর্য বেশ গরম।

ওয়েব্রিজ কিন্তু বলেছিল, জলের তলায় নাকি এত ঠান্ডা যে, এল্‌সটিড নিশ্চয় এতক্ষণে হি হি করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরেও গোলা ভেসে উঠল না। শুরু হল উৎকণ্ঠা। সূর্য ডুবে যাওয়ার একুশ মিনিট পরেও গোলার পুনরাবির্ভাব না দেখে শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। মাঝরাতে আরম্ভ হল দুর্ভাবনা। পাঁচ মাইল নিচে কাদার মধ্যে দড়িদড়া সমেত গোলা আটকে গিয়েছে নিশ্চয়। মায়ার্স যন্ত্র আর কাজ করছে না। অক্সিজেন নেই, খাবার নেই, জল নেই। এল্‌সটিড কি আর বেঁচে আছে?

গোলক যেখানে ডুব দিয়েছে, সেই জায়গা ঘিরে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল গানবোট।

আচমকা বহু দূরে একটা আলোর রেখা জল থেকে ঠিকরে উঠে গেল আকাশ অভিমুখে—শূন্যে আলোকবৃত্ত রচনা করে গিয়ে পড়ল জলে।

'এল্‌সটিড!'

ভোর হয়ে গেল—তবে নাগাল ধরা গেল গোলকের। কপিকল থেকে আংটা ঝুলিয়ে গোলকের মাথায় লাগিয়ে টেনে তুলে আনা হল ডেকে। ম্যানহোল খুলে উঁকি দিল

লেফটেন্যান্ট। কালির মতো অন্ধকার। ইলেকট্রিক লাইট লাগানো হয়েছিল শুধু গোলকের চারপাশ আলোকিত করার জন্যে—ভেতরটা নয়।

ভীষণ উত্তাপ ভেতরে। ম্যানহোলের কিনারা বরাবর রবারের পটি নরম হয়ে গেছে উত্তাপে। নড়াচড়া নেই, উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাবও নেই। জাহাজের আলো ফেলে দেখা গেল, মড়ার মতো পড়ে এল্‌সটিড। মুখ হলুদবর্ণ, ঘামে চকচকে। ডাক্তার এল। তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল কেবিনে।

না, মরেনি, কিন্তু স্নায়ুর অবস্থা কাহিল। সারা গা থেঁতলে কালশিটে পড়ে গেছে। দিনকয়েক পড়ে রইল নিস্পন্দ দেহে। মুখে কথা ফুটল সাত দিন পরে। শোনা গেল অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার অবিশ্বাস্য কাহিনি।

প্রথম কথাটাতেই প্রকাশ পেল অদ্ভুত জেদ। আবার যাবে ও সমুদ্রের তলায়। গোলকটাকে একটু পালটে নিতে হবে। দড়ি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। অসংলগ্নভাবে বলেছিল, সমুদ্রের তলায় কাদা ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না যারা বলেছিল—চোখ তাদের ঠিকরে যাবে সেখানকার দৃশ্য দেখলে। চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এল্‌সটিড—দেখে এসেছে আশ্চর্য এক জগৎ!

খাপছাড়া কথাগুলো গুছিয়ে লেখা হল নিচে।

প্রথমে গোলকটা ভীষণভাবে ওলট-পালট খেয়েছিল ঠিকই। পা ওপরে চলে গিয়েছিল। মাথা নিচের দিকে করে কুশনে আছড়ে পড়েছিল। জানলার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল আকাশ আর জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো লোকজনকে।

আচমকা সিধে হয়ে গিয়েছিল গোলক। শুরু হয়েছিল তলিয়ে যাওয়া। সবুজ-নীলাভ মনে হয়েছিল চারপাশের জল। একটু একটু আলো আসছিল ওপর থেকে। ছোট ছোট ভাসমান বস্তু ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে যাচ্ছিল ওপরের আলোর দিকে। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছিল। মাথার ওপর যেন মধ্যরাতের কালো আকাশ—সামান্য সবুজাভ। নিচের জল কালির মতো কালো। খুদে খুদে আলোকময় স্বচ্ছ বস্তু আবছা সবজে রেখা রচনা করে ধেয়ে যাচ্ছিল ওপরদিকে।

পতনের বেগ নাকি মনে রাখবার মতো। ঠিক যেন লিফ্‌ট নামছে হু হু করে। এবার একটু ভয় হয়েছিল এল্‌সটিডের। অক্টোপাস, তিমি বা ওই জাতীয় কিছুর খপ্পরে পড়লেই তো দফারফা। ঘড়ি-যন্ত্র যদি আর চালু না থাকে?

পঞ্চাশ সেকেন্ড পর মিশমিশে অন্ধকারে প্রখর ইলেকট্রিক আলোয় কেবল দেখা গেল, মাছ বা ভাসমান বস্তু ধেয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে ওপরদিকে—এত জোরে যাচ্ছে যে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একবার মনে হল, একটা হাঙর ধড়ফড় করতে করতে ছিটকে গেল পাশ দিয়ে। জলের ঘর্ষণে গোলক তখন গরম উঠছে। অতএব সমুদ্রের গভীরে নাকি কনকনে ঠান্ডা—এ ধারণাটা একেবারেই ভুল।

ঘামে সারা গা সপসপে হয়ে গেছে লক্ষ করে খটকা লেগেছিল এল্সটিডের। পরক্ষণেই কানে ভেসে এসেছিল সোঁ সোঁ শব্দ। শব্দটা আসছে পায়ের তলা থেকে। বেড়েই চলেছে। চোখে পড়েছিল বিস্তর বুদ্বুদ। সাঁ সাঁ করে ধেয়ে যাচ্ছে ওপরদিকে। যেন পাখা ঘুরছে বাইরে জলের মধ্যে। বাষ্প নাকি? নিশ্চয় তা-ই! হাত দিয়েছিল জানলায়। কাচ গরম। জ্বালিয়ে নিয়েছিল ছোট্ট লণ্ঠনটা। হাতলের ডগায় গদি দিয়ে মোড়া ঘড়িতে দেখেছিল, মোটে দু'মিনিট হয়েছে। এরই মধ্যে জলের ঘর্ষণে এত উত্তাপ? কাচ তো ফেটে যাবে এবার। নিচে ঠান্ডা, গোলকের গা গরম—তাপের তারতম্য কাচ তো সইতে পারবে না।

আচমকা কমে এসেছিল তলিয়ে যাওয়ার গতিবেগ। সেই সঙ্গে কমে এসেছিল ওপরদিকে ধাবমান বুদ্বুদের সংখ্যা। পায়ের তলায় মেঝে অনুভব করেছিল শক্তভাবে। কমে এসেছিল সোঁ সোঁ শব্দ। সামান্য দুলে উঠেই স্থির হয়ে গিয়েছিল গোলক। না, কাচ ভাঙেনি। অঘটন কিছুই ঘটেনি। নির্বিঘ্নে তলদেশ স্পর্শ করতে চলেছে গোলক। খুব জোর আর মিনিটখানেক।

মনে পড়েছিল স্টিভেন্স আর ওয়েব্রিজের কথা। রয়েছে পাঁচ মাইল ওপরে। অত উঁচুতে মেঘও থাকে না।

উঁকি মেরেছিল জানলা দিয়ে। বুদ্বুদ আর দেখা যাচ্ছে না। সোঁ সোঁ শব্দও একেবারে থেমে গেছে। বাইরে মসিকৃষ্ণ অন্ধকার। নরম ভেলভেটের মতো। ইলেকট্রিক আলো যেখানে যেখানে পড়ছে, শুধু সেই জায়গাগুলোতেই দেখা যাচ্ছে জলের রং হলদেটে-সবুজ। তারপরেই আলোক বলয়ের মধ্যে ভেসে উঠল তিনটে বস্তু। অগ্নিময় আকৃতির মতো। ওর বেশি আর কিছু দেখা যায়নি। বস্তু তিনটে ছোট না বড়, কাছে না দূরে—বোঝা যায়নি।

মাছ ধরার জাহাজে যেমন জোরালো আলো থাকে, প্রায় সেইরকম নীলাভ আলোর রেখা দিয়ে ঘেরা তিনটে আকৃতিই। প্রচুর ধোঁয়া বেরচ্ছে যেন সেই আলো থেকে। জাহাজের দু'পাশে যেমন সারি সারি পোর্টহোল থাকে, সেইরকম সারবন্দি ফুটো রয়েছে প্রত্যেকের দু'পাশে। এল্সটিডের প্রখর আলোকবৃত্ত এসে পড়তেই যেন নিবে গিয়েছিল তাদের আলোকপ্রভা।

চিত্র ১৩.১ তারপরেই আলোক বলয়ের মধ্যে ভেসে উঠল তিনটে বস্তু।

দেখতে তাদের অদ্ভুত মাছের মতো। বিরাট মাথা। প্রকাণ্ড চোখ। কিলবিলে দেহ আর লেজ। চোখ ফেরানো রয়েছে এল্‌সটিডের দিকেই। যেন তাকেই অনুসরণ করছে। আলো দেখে আকৃষ্ট হয়েছে নিশ্চয়।

অচিরেই এই ধরনের আরও সামুদ্রিক প্রাণী ভিড় করে এল চারদিক থেকে। গোলক তখনও নামছে নিচের দিকে। ঘোলাটে হয়ে উঠছে জলের রং। আলোকরশ্মির মধ্যে চিকমিক করছে খুদে খুদে কণা—সূর্যরশ্মির মধ্যে ধূলিকণার মতো। সিসের ওজন কাদা ঘুলিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।

সিসের ওজন আস্তে আস্তে গোলক টেনে নামিয়েছিল কাদার ওপর। চারপাশে ঘন সাদা কুয়াশা। কয়েক গজের বেশি এগচ্ছে না বিদ্যুৎ বাতির আলো। বেশ কয়েক মিনিট পর থিতিয়ে গিয়েছিল ঘুলিয়ে-যাওয়া তলানি। বিদ্যুৎ বাতির আর দূরের স্বচ্ছ প্রভাময় মাছের ঝাঁকের আলোয় দেখা গিয়েছিল ধূসর-সাদাটে তলানির ওপর দুলে দুলে সরে যাচ্ছে ঘন কালো সীমাহীন জলরাশি। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক লিলি ফুলের জটলা। ক্ষুধিত শুঁড় নাড়ছে শূন্যে।

দূরে দেখা যাচ্ছে দানবিক স্পঞ্জের জটলা। অর্ধস্বচ্ছ বহিঃরেখাই কেবল চোখে পড়ছে। মেঝেময় ছড়িয়ে গাঢ় বেগুনি আর কালো রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ চকচকে চ্যাটালো বিস্তর বস্তু। নিশ্চয় কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক প্রাণী। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বিশালচক্ষু অথবা চক্ষুহীন অদ্ভুত আকারের জিনিস। কাউকে দেখতে কেঠোপোকার মতো, কাউকে গলদাচিংড়ির মতো। আলোকরশ্মির সামনে দিয়ে চলেছে মন্থরগতিতে —অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে—পেছনে রেখে যাচ্ছে ফুটকি ফুটকি রেখা।

আচমকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল খুদে মাছের ঝাঁক—গোলকের দিকে ধেয়ে এসেছিল হরবোলা পাখির ঝাঁকের মতো। প্রভাময় তুষারের মতো উড়ে গিয়েছিল গোলকের ওপর দিয়ে। পলাতকদের পেছনে দেখা গিয়েছিল আরও বড় প্রাণী। সংখ্যায় অনেক। আসছে গোলকের দিকেই।

প্রথমে দেখা গিয়েছিল অস্পষ্ট দেহরেখা। চলমান আকৃতি। ঠিক যেন মানুষের মূর্তি। তারপরেই আলোকরশ্মির আওতায় এসে গিয়েছিল চলমান বিস্ময়রা। হতভম্ব হয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল এল্সটিড। পরক্ষণেই চোখ খুলে চেয়েছিল ফ্যালফ্যাল করে। মেরুদণ্ডী প্রাণী নিঃসন্দেহে। অতিশয় বিদঘুটে। গাঢ় বেগুনি রঙের মাথার সঙ্গে বহুরূপী গিরগিটির মাথার কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অত উঁচু কপাল আর বিরাট করোটি আজ পর্যন্ত কোনও সরীসৃপের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। মুখের খাড়াই দিকটার সঙ্গে অস্বাভাবিক মিল রয়েছে মানুষের মুখের।

বহুরূপী গিরগিটির চোখের মতোই দুটো বিরাট চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। রয়েছে ডাঁটির ডগায়। মুখবিবর সরীসৃপ-মুখবিবরের মতো চওড়া। ছোট্ট নাসিকাগহ্বরের নিচে আঁশযুক্ত ঠোঁট। কানের জায়গায় দুটো বিরাট কানকো-ঢাকনি। ঢাকনি থেকে বেরিয়ে রয়েছে সরু সরু সুতোর মতো প্রবালময় তন্তু। গাছের মতো কানকো বললেও চলে। খুব বাচ্চা রে মাছ আর হাঙর মাছেদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

শুধু মুখখানাই মানুষের মতো বলেই যে এদের মানুষের মতো আকৃতি, তা নয়। এর চাইতেও বড় মিল রয়েছে অন্যান্য প্রত্যঙ্গে। অসাধারণ মিল। অত্যন্ত অসাধারণ। প্রতিটি প্রাণীই দু'পেয়ে। খাড়া রয়েছে অবশ্য তিনটে প্রত্যঙ্গের ওপর। একটা লেজ

আর দু'খানা পায়ের ওপর ঠিক যেন পেটমোটা ব্যাঙের পা। এদের দেহও প্রায় গোলাকার। ব্যাঙের সামনের দু'টি প্রত্যঙ্গের মতোই দু'খানা প্রত্যঙ্গও রয়েছে সামনে। বিদঘুটে গড়ন। মানুষের অতি বিতিকিচ্ছিরি হাত যেন। দু'হাতে ধরে রয়েছে একটা লম্বা হাড়। হাড়ের ডগায় তামার ফলা। গায়ের রং এক-এক জায়গায় এক-একরকম। মাথা, হাত আর পা বেগুনি রঙের। চামড়া আলোকময় ধূসর রঙের। জামাকাপড়ের মতোই ঢিলেভাবে চামড়া ঝুলে রয়েছে সারা গায়ে। প্রখর আলোয় ধাঁধিয়ে যাওয়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে গোলকের সামনে।
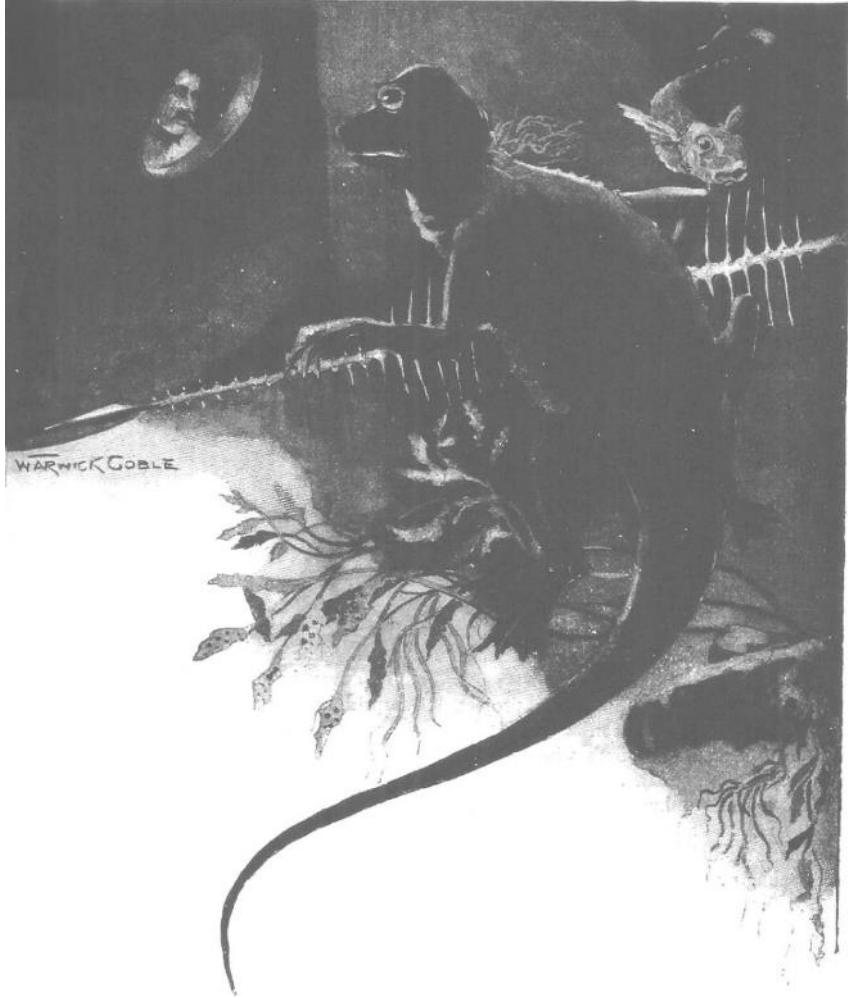
চিত্র ১৩.২ শুধু মুখখানাই মানুষের মতো।

হঠাৎ জোরালো আলোয় ড্যাবডেবে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল বটে, খুলেছিল পরক্ষণেই। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে আলো সইয়ে নিয়েছিল এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে। তারপরেই মুখ হাঁ করে বিকট চিৎকার। নিছক আওয়াজ নয়—চিৎকারই বলা উচিত। যেভাবে কথা উচ্চারণ করা হয় মুখ নেড়ে—ঠিক সেইভাবে। স্টিলের আবরণ ভেদ করে চিৎকার পৌঁছেছিল গদি গোলকের ভেতরে। ফুসফুস

ছাড়া চেঁচানি সম্ভব হয় কী করে, এল্‌সটিডের মাথায় তা ঢোকেনি। চেঁচিয়ে উঠেই আলোকরশ্মির দু'পাশের অন্ধকারে সরে গিয়েছিল কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিবাহিনী। চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও এল্‌সটিডের মনে হয়েছে, নিশার দুঃস্বপ্নরা এগিয়ে আসছে গোলকের দিকেই। আলো নিবিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিল এল্‌সটিড। আলো দেখে যদি ছুটে এসে থাকে, অন্ধকারে সরে পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু তা হয়নি, আলো নিবে যেতেই আচমকা নরমমতো ধাক্কা লেগেছিল গোলকে। দুলে উঠেছিল গোলক।

আবার শোনা গিয়েছিল বিষম চিৎকার। প্রতিধ্বনি ভেসে এসেছিল যেন অনেক দূর থেকে। প্রতিধ্বনি না বলে তাকে প্রত্যুত্তরই বলা যায়—অন্তত এল্‌সটিডের মনে হয়েছিল তা-ই। আবার থপথপ করে ধাক্কা পড়েছিল গোলকে। দুলে উঠে গোলক, ঘষটে গিয়েছিল তলায় তার জড়ানো কাটিমের ওপর দিয়ে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে এল্‌সটিড চেয়ে ছিল চিরন্তন রাত্রির দিকে। ধু ধু বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে বহু দূরে দেখেছিল খুব আবছা কয়েকটা দ্যুতিময় অর্ধনর আকৃতি। দ্রুতচরণে আসছে তার দিকেই।

বাইরের জোরালো আলো জ্বালানোর জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে এল্‌সটিড হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ভেতরকার লণ্ঠনের সুইচের ওপর। আছড়ে পড়েছিল গদি-মোড়া মেঝের ওপর। দুলে উঠেছিল গোলক। জ্বলে উঠেছিল আলো। কানে ভেসে এসেছিল বিস্ময়ধ্বনি। অপার্থিব সেই চিৎকার। যেন অবাক হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েই দেখেছিল, নিচের জানলায় চেপে বসেছে দু'জোড়া ডাঁটি-চোখ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে
রয়েছে তার দিকে।

পরক্ষণেই বহু হাতের ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গিয়েছিল গোলকের ওপর। প্রচণ্ড ধাক্কায় সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারেনি এল্‌সটিড। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল দমদম আওয়াজ শুনে। যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে বাইরের ঘড়ি-যন্ত্রের ওপর!

সর্বনাশ! ঘড়ি-যন্ত্র বিগড়ালে সলিলসমাধি যে অনিবার্য! আচম্বিতে ভীষণভাবে দুলে উঠেছিল গোলক। পা যেন চেপে বসেছিল মেঝেতে। তাড়াতাড়ি ভেতরের লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বাইরের জোরালো আলো। সমুদ্রতল খাঁ খাঁ করছে। অজানা প্রাণীরা উধাও হয়েছে। দুটো মাছ পরস্পরকে ধাওয়া করতে করতে তলিয়ে গেল জানলার তলায়।
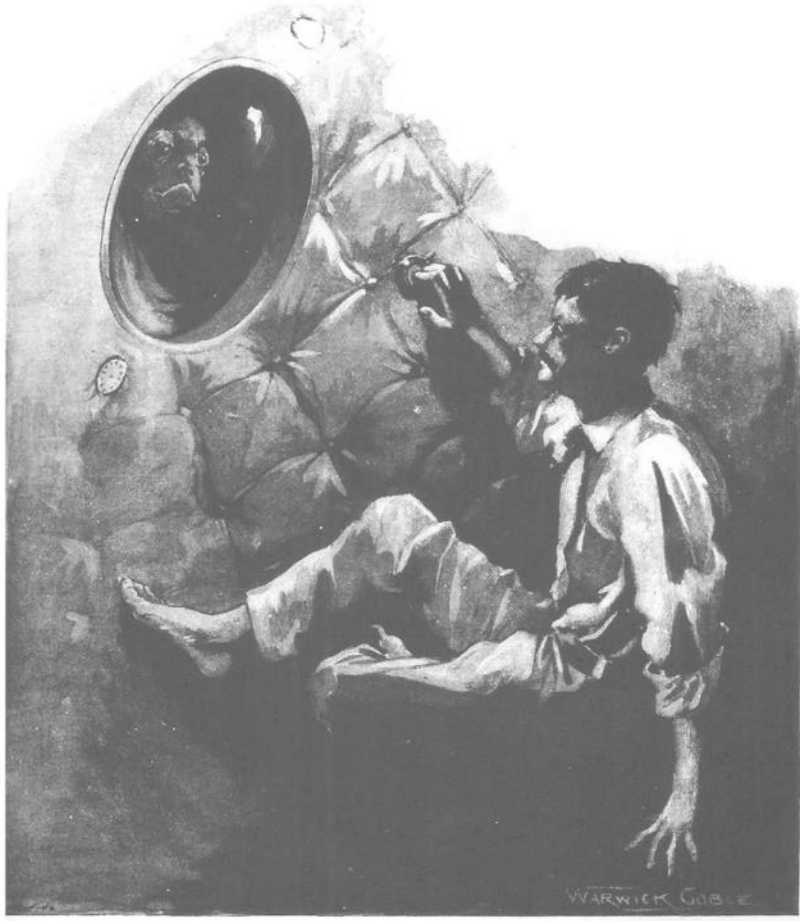
চিত্র ১৩.৩ নিচের জানলায় চেপে বসেছে দু'জোড়া ডাঁটি-চোখ।

গভীর সমুদ্রের বিচিত্র বাসিন্দারা কি তাহলে দড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে? গোলক তাই সবেগে ভেসে উঠছে? মুক্তি তাহলে আর বেশি দূরে নেই।

বাড়ছে... ওপরদিকে ধেয়ে যাওয়ার গতিবেগ বেড়েই চলেছে। আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গোলক। এল্‌সটিড ছিটকে গিয়ে ছাদের গদিতে মাথা ঠুকে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। আধ মিনিটের মতো চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। শুধু বিস্ময়বোধ। অপরিমেয়।

তারপরেই আস্তে আস্তে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল গোলক। সেই সঙ্গে অল্প অল্প ঝাঁকুনি। মনে হয়েছিল যেন জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইস্পাত বর্তুলকে। হামাগুড়ি দিয়ে জানলার দিকে গিয়েছিল এল্‌সটিড। নিজের দেহের ওজন চাপিয়ে বর্তুলকে কাত করিয়ে নিয়েছিল সেইদিকে, যাতে জানলা দিয়ে দেখা যায় তলার দৃশ্য। কিন্তু নিঃসীম অন্ধকারে প্রখর আলোর ফিকে হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। আলো নিবিয়ে দিলে নিশ্চয় অন্ধকারে চোখ সয়ে যাবে—এই ভরসায় আলো নিবিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর অর্ধস্বচ্ছ হয়ে এসেছিল

মখমল কোমল তমিস্রা। গোধূলি-আলোকের মতো ক্ষীণ আভা দেখা গিয়েছিল বহু দূরে। সেই সঙ্গে চলমান আকৃতি। একাধিক। দড়ি কেটে দিয়ে নিশ্চয় বিদঘুটে প্রাণীরা গোলক টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে সাগরের তলা দিয়ে।

তারপরেই জলতল-প্রান্তরের ওপর দিয়ে বহু দূরে আবছামতো চোখে পড়েছিল ক্ষীণ প্রভাময় প্রশস্ত দিগন্ত। খুদে জানলা দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে চোখ চালিয়েও সুদীর্ঘ সেই দিগন্তের শেষ দেখতে পায়নি এল্‌সটিড। গোলক টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইদিকেই। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে শহরের দিকে বেলুন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন। এগচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ম্যাড়মেড়ে আলোকপ্রভা। কাছাকাছি জড়ো হয়ে, জমাট বেঁধে, যেন নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে।

পাঁচটা নাগাদ গোলক এসে পৌঁছেছিল আলোকময় সেই অঞ্চলে। দূর থেকে মনে হয়েছিল যেন বিস্তর পথঘাট বাড়ি ঘিঞ্জি অবস্থায় দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড ছাদহীন একটা মঠের চারদিকে। মঠের মতোই মনে হয়েছিল এল্‌সটিডের। উদ্ভট মঠ। ছাদ নেই। ভেঙে ধসে পড়েছে। পুরো দৃশ্যটা বিরাট মানচিত্রের মতো এলিয়ে রয়েছে পায়ের তলায়। বাড়িগুলো শুধু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, ছাদের বালাই নেই। পরে দেখেছিল, ভেতরে প্রভাময় হাড়ের স্তূপ। দূর থেকে মনে হয়েছিল যেন ডুবো জ্যোৎস্না দিয়ে নির্মিত প্রতিটি বাড়ি।

ঘিঞ্জি অঞ্চলের ভেতরে গুহার মতো সুড়ঙ্গ থেকে দুলছে সামুদ্রিক উদ্ভিদের শুঁড়। দীর্ঘ, হিলহিলে, স্ফটিকসদৃশ স্পঞ্জ ঠেলে উঠেছে চকচকে খুদে মিনারের মতো। গোটা শহর জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা চাপা আভায় চিকমিক করছে মিহি লিলি ফুলের স্তবক। খোলা প্রাঙ্গণে সঞ্চরমাণ যেন বিপুল জনতা। বহু ফ্যাদম নিচে থাকায় আলাদা করে কাউকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে গোলককে টেনে নামিয়েছিল অদ্ভুত প্রাণীরা। স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল খুঁটিনাটি দৃশ্য। একটু একটু করে ভয় জাঁকিয়ে বসেছিল শিরায়-উপশিরায়। মেঘের মতো বাড়িগুলো যেন গোলাকার বস্তুর মতো পুঁতির লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে। বেশ কিছু খোলা জায়গায় জাহাজের মতো বিস্তর আকৃতি জড়ো করা রয়েছে।

ধীরগতিতে টেনে নামানো হচ্ছিল গোলককে। নিচের আকৃতিগুলো আরও স্পষ্ট, আরও পরিষ্কার, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। গোলক নামানো হচ্ছিল শহরের কেন্দ্রে একটা পেল্লায় ইমারতের দিকে। দড়ি ধরে টানছে অসংখ্য প্রাণী—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের। একটা জাহাজের কিনারায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে গোলক

দেখাচ্ছে অগণিত প্রাণী। তারপরেই বিশাল ইমারতের দেওয়াল আস্তে আস্তে উঠে এল চারপাশে—শহর আর দেখা গেল না।

এল্‌সটিড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল দেওয়ালের চেহারা। ডোবা কাঠ, দোমড়ানো তারের দড়ি, লোহার কড়িবরগা, তামার পাত, মানুষের হাড় আর করোটি। আঁকাবাঁকা লাইনে পড়ে রয়েছে করোটি। করোটির বৃত্ত। অত্যাশ্চর্যভাবে বাঁকা করোটির রেখা। অক্ষিকোটরে ঢুকছে আর বেরচ্ছে অগণিত ছোট ছোট রুপোলি মাছ।

আচম্বিতে কানের পরদায় আছড়ে পড়েছিল চাপা গলার চিৎকার। শিঙা বাজানোর মতো প্রচণ্ড আওয়াজ। ফ্যান্টাস্টিক বন্দনাসংগীতে যেন মুখরিত হয়েছিল পুরো অঞ্চল। গোলক তখনও নামছে আস্তে আস্তে। ছুঁচোলো জানলার পাশ দিরে যেতে যেতে এল্‌সটিড দেখেছিল, দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে কিম্ভূতকিমাকার ভৌতিক প্রাণী। নির্নিমেষে ডাঁটি-চোখ মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। অবশেষে স্থির হয়েছিল গোলক—অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক মাঝখানে একটা বেদির ওপরে।

নিতল বাসিন্দাদের আবার স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিল এল্‌সটিড। অবাক হয়েছিল সাষ্টাঙ্গে সবাই শুয়ে আছে দেখে। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল একজনই। গায়ে যেন আঁশ দিয়ে তৈরি শক্ত পোশাক। মাথায় আলোকময় মুকুট। সরীসৃপসদৃশ মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। পূজারি যেন স্তোত্রপাঠ করে যাচ্ছে—শুনে শুনে বলে যাচ্ছে উপাসনারত ভক্তের দল। চাপা গুমগুম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে ইমারতের ভেতরে বিরাট জায়গা। অদ্ভুত একটা বাসনা মাথায় এসেছিল এল্‌সটিডের। নিজেকে দেখানোর বাসনা। জ্বালিয়ে দিয়েছিল গোলকের ভেতরকার ছোট্ট লণ্ঠন। সঙ্গে সঙ্গে যদিও অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল বিদঘুটে জীবগুলো। আচমকা ওকে দেখতে পেয়ে প্রবল নির্ঘোষ জেগে ছিল চারদিকে। ভক্তি গদগদ মন্ত্রোচ্চারণ আর নয়—উল্লাসধ্বনি। অন্ধকারে শুধু চেঁচানি শুনে ক্ষান্ত থাকতে পারেনি এল্‌সটিড। ছোট লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বাইরের জোরালো আলো। নিজে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল বিহ্বল ভক্তদের দৃষ্টি থেকে—কিন্তু দেখা গিয়েছিল, হাঁটু গেড়ে বসে আবার সমস্বরে স্তোত্রপাঠ শুরু করেছে আজব প্রাণীরা। বিরাম নেই, ছেদ নেই। একটানা তিন ঘণ্টা চলেছিল গোলক-পূজা।
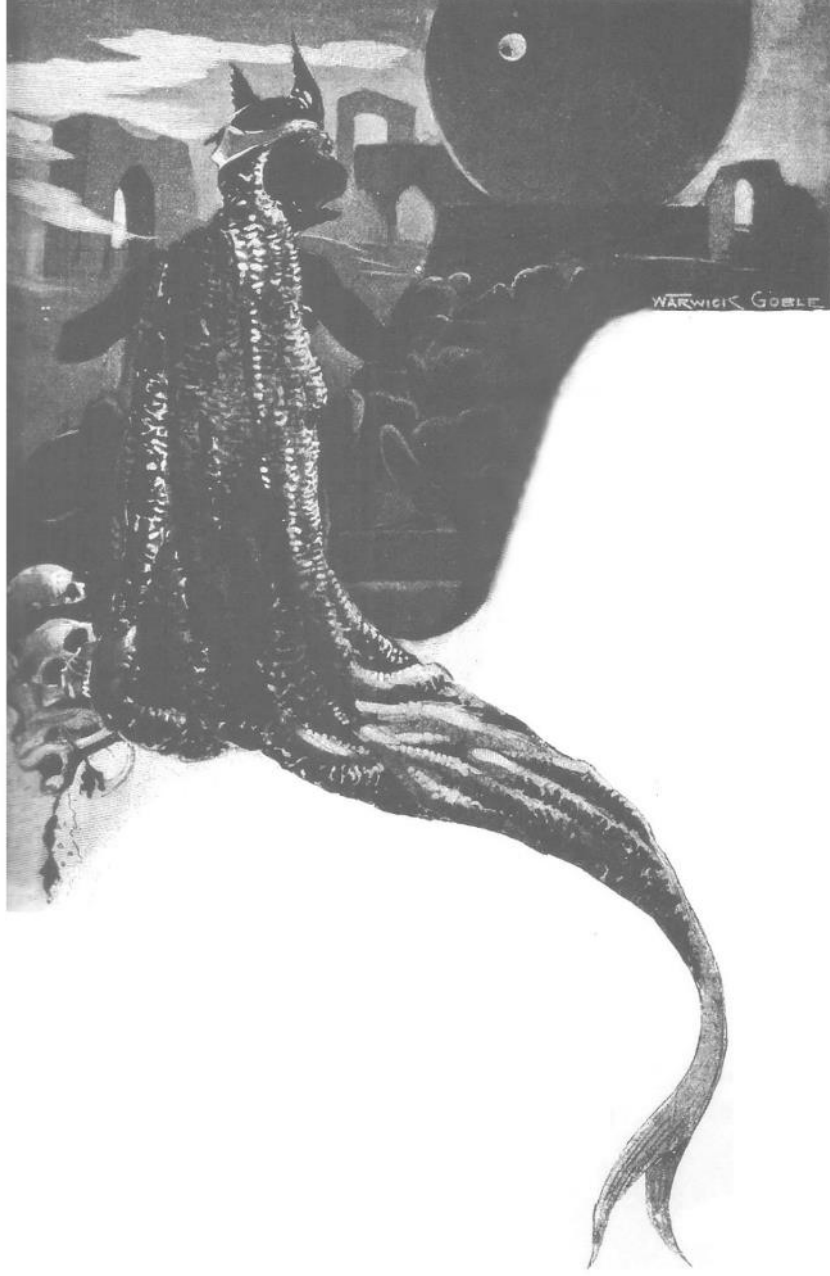
চিত্র ১৩.৪ পূজারি যেন স্তোত্রপাঠ করে যাচ্ছে।

আশ্চর্য শহর আর শহরবাসীদের বর্ণনায় খুঁত রাখেনি এল্‌সটিড। চিররাত্রি বিরাজমান সেই দেশে। সূর্য বা চাঁদ কখনও দেখেনি। দেখেনি তারার মালা। দেখেনি সবুজ পাদপ অথবা বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাসে অভ্যস্ত সজীব জীব। আগুন কী জিনিস, তারা জানে না। সামুদ্রিক জীব আর উদ্ভিদের ফসফরাস-দ্যুতি ছাড়া অন্য কোনও আলোর সঙ্গে কখনও পরিচয় ঘটেনি।

উদ্ভট গল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু অ্যাডাম্‌স আর জেনকিন্সের মতো বিজ্ঞানীরা মনে করেন এমন ব্যাপার সম্ভব হলেও হতে পারে। উদ্ভট বলব বরং তাঁদের এই বিশ্বাসকে। তাঁদের মুখেই শুনেছি, নিউ রেড স্যান্ডস্টোন মহাযুগের মহান

থেরিওমোরফাদের বংশধররা আমাদের মতোই টিকে আছে নিতল সমুদ্রে। জলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। ধীশক্তি থাকাটাও উদ্ভট মোটেই নয়। মেরুদণ্ডী শুনেও চমকে ওঠার কোনও কারণ নেই। অতি স্বল্প তাপমাত্রায় নিশ্চয় মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের। প্রচণ্ড চাপে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সজীব অথবা নিষ্প্রাণ ভারী বস্তুগুলো ভেসে উঠতে পারে না বলেই তলিয়ে রয়েছে সাগরের গভীরে।

সাগরতলের এই বিচিত্র বাসিন্দাদের মধ্যে আমরা খসে-পড়া উল্কার মতোই মৃত প্রাণী বা বস্তু ছাড়া কিছুই নই। দুর্ঘটনা আর বিপর্যয়ের পর তলিয়ে যায় আমাদের মৃতদেহ অথবা ডোবা জাহাজ। জলময় আকাশের রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করে অবতীর্ণ হয় তাদের লোকালয়ে। তাই আমরা অদ্ভুত তাদের কাছেও। নিথর তমিস্রাময় রাতের মধ্যে দিয়ে খসে পড়ে আমাদের যন্ত্রপাতি ধাতু, জাহাজ—বৃষ্টির মতো। ঘাড়ের ওপরেও নিশ্চয় পড়ে—থেঁতলে যায়। মাথার ওপরকার মহাশক্তির কাণ্ডকারখানা বলে মেনে নেয়। মাঝে মাঝে এমন জিনিস খসে পড়ে, যা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য অথবা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কিম্ভূত আকৃতি দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। বর্বর অসভ্যদের দেশে আচমকা মহাশূন্য থেকে চকচকে গোলকের মধ্যে আলোকপ্রদীপ্ত প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলে যেমন চাঞ্চল্য এবং ভয়মিশ্রিত উপাসনা দেখা যায়, এদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তা-ই হয়েছে।

এত ব্যাপার একবারে বলেনি এল্‌সটিড। বলতে পারেনি। বারো ঘণ্টার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছাড়া-ছাড়াভাবে শুনিয়েছিল গানবোটের বিভিন্ন অফিসারকে। খুব ইচ্ছে ছিল, নিজেই লিখবে পুরো কাহিনি। কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠেনি। তাই উদ্যোগী হতে হয়েছে আমাদেরকেই। কম্যান্ডার সিমন্স, ওয়েব্রিজ, স্টিভেন্স, লিন্ডলে এবং অন্যান্য অনেকের মুখ থেকে টুকরো টুকরো কাহিনি শুনে নিয়ে সাজিয়ে দিলাম পরপর।

টুকরো টুকরো বর্ণনার মধ্যে দিয়েই কিন্তু গা-ছমছমে দৃশ্যটা যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বিরাট ভৌতিক ইমারত, হেঁট মাথায় স্তোত্রপাঠে তন্ময় আজব প্রাণী, বহুরূপী গিরগিটির মতো গাঢ় রঙের মাথা, ক্ষীণ প্রভাময় বসন, ফের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে এল্‌সটিডের বৃথাই বোঝানোর চেষ্টা যে, গোলকে বাঁধা দড়িটা এবার কেটে দেওয়া হোক। মিনিটের পর মিনিট কেটেছে অসহ্য উৎকণ্ঠায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে এল্‌সটিডের, অক্সিজেন ফুরাতে আর মোটে চার ঘণ্টা বাকি। কিন্তু বিরতি নেই ভজনায়। এল্‌সটিডের কাছে তা মৃত্যু-সংগীতই মনে হয়েছে।

কী করে যে শেষকালে মুক্তি পেয়েছিল এল্‌সটিড, তা নিজেই বোঝেনি। গোলকের তলায় ঝোলা দড়িটা বেদির কিনারায় ঘষটে কেটে যেতে পারে। আচমকা

ভয়ানকভাবে ঘুরপাক খেয়ে বর্তুল সাঁ সাঁ করে ধেয়ে গিয়েছিল ওপরদিকে। বায়ুশূন্য আধারের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় ইথিরীয় প্রাণীর ছিটকে যাওয়ার মতো—ভূপৃষ্ঠের ঘন বায়ুমণ্ডল থেকে স্বদেশের ইথিরীয় পরিমণ্ডলে ফিরে যাওয়া যেন। বাতাসের স্তর ভেদ করে তীব্রবেগে হাইড্রোজেনের বুদ্‌বুদ যেভাবে ছিটকে যায়, গোলকের সেই ধরনের চকিত ঊর্ধ্বগতি দেখে নিশ্চয় থ হয়ে গিয়েছিল নিতল বাসিন্দারা।

সিসের ওজন নিয়ে যে গতিতে গোলক তলিয়েছিল, ভেসে উঠল তার চেয়ে অনেক বেশি গতিবেগে। ফলে, গরম হয়ে গিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। জানলা দুটো ওপরদিকে করে ছিটকে যাওয়ায় এল্‌সটিড দেখেছিল, ফেনার মতো বুদ্‌বুদের প্রপাত আছড়ে পড়ছে কাচের ওপর। প্রতিমুহূর্তে মনে হয়েছে, এই বুঝি কাচ খুলে ঢুকে এল ভেতরে, তারপরেই আচমকা যেন একটা চাকা বনবন করে ঘুরপাক দিয়ে উঠেছিল মাথার মধ্যে, গদি-মোড়া কামরা চরকিপাক দিয়েছিল চারপাশে। জ্ঞান হারিয়েছিল এল্‌সটিড। এরপরেই মনে পড়ে, শুয়ে আছে কেবিনে, কানে ভেসে এসেছে ডাক্তারের গলা।

এল্‌সটিড নিজেই লিখবে বলেছিল অত্যদ্ভুত এই উপাখ্যান যন্ত্রপাতি মেরামত করে নেওয়ার পর।

কিন্তু ১৮৯৬ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি আবার গোলক নিয়ে সমুদ্রতলে পাড়ি জমায় এল্‌সটিড, আর ফেরেনি। তেরো দিন অপেক্ষা করার পর গানবোট রিওতে ফিরে এসে তারবার্তা পাঠায় বন্ধুবান্ধবদের।

আপাতত এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি। গভীর সমুদ্রের তলদেশে এমন একটা শহরের অস্তিত্ব কেউ কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি। সুতরাং আশ্চর্য এই কাহিনি ছড়িয়ে পড়ার পর নিশ্চয় অন্য কেউ গোলক নিয়ে যাবে শহর দেখতে, এই আশা নিয়েই শেষ করা যাক নিতল নগরীর কাহিনি।
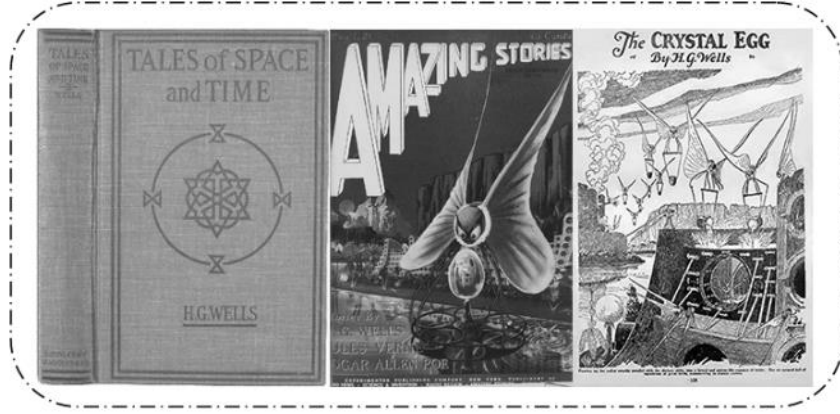
'The Crystal Egg' প্রথম প্রকাশিত হয় 'Pearson's Magazine' পত্রিকায় ১৮৯৭ সালে। গল্পটি উল্লেখযোগ্য কারণ এর ঠিক এক বছর বাদে ওয়েলস 'The War of the Worlds' উপন্যাস হিসেবে প্রকাশ করেন, এবং এই গল্পের মঙ্গল গ্রহবাসীদের দেখতে অথবা তাদের মেশিনগুলির বর্ণনা একদম মিলে যায়। যদিও 'The War of the Worlds' এর মঙ্গল গ্রহবাসীদের পৃথিবী আক্রমণ নিয়ে এই গল্পে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এই গল্পটিকে 'The War of the Worlds' জগতের পূর্বসুরি ধরা হয়। 'Doubleday & McClure Co.' থেকে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'Tales of Space and Time' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories' পত্রিকায়।

ক্রিস্টাল ডিম
(The Crystal Egg)

বছরখানেক আগেও ছিল দোকানটা। ছোট্ট এবং অত্যন্ত নোংরা। সেভেন ডায়াল্‌স-এর কাছেই। রোদে-জলে ফিকে হয়ে এসেছিল হলুদ অক্ষরে লেখা নামটা:

—প্রকৃতিপ্রেমিক মি. কেভ।

—পুরানো জিনিসের দোকান।

শোকেসগুলোয় ঠাসা থাকত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। হাতির দাঁত, বেজোড় দাবার ঘুঁটি, পুঁতি, অস্ত্রশস্ত্র, এক বাক্স চোখ, দুটো বাঘের করোটি, একটা নরকরোটি, পোকায় খাওয়া কয়েকটা খড় আর কাঠের কুঁচো ঠাসা বাঁদর (একটা বাঁদর লম্ফ ধরে আছে), মান্ধাতার আমলের একটা ক্যাবিনেট, অস্ট্রিচের ডিম কয়েকখানা, মাছ ধরার কিছু সরঞ্জাম, একটা অসাধারণ নোংরা, শূন্য কাচের মাছ-চৌবাচ্চা।

ছিল আরও একটা বস্তু, এই গল্প শুরু হওয়ার সময়ে। ডিমের আকারে একতাল ক্রিস্টাল। খুব চকচকে পালিশ করা। দুই ব্যক্তি বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল একদৃষ্টে। একজন পাদরি। লম্বা, শীর্ণ আকৃতি। অপরজন বয়সে তরুণ। গালে কালো দাড়ি। গায়ের রং কালচে। জামাকাপড় চোখে পড়ার মতো নয়।

ডিমটার দিকে এমনভাবে আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল ছোকরা যেন কেনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে পাদরিকে।

এমন সময়ে দোকানে এল মি. কেভ। সবে চা খেয়ে এসেছে। মাখন আর রুটি লেগে রয়েছে ঝোলা দাড়িতে। দু'জন খদ্দের দাঁড়িয়ে ডিম দেখছে দেখেই ঝুলে পড়ল চোয়াল। চোরের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পেছনদিকে এবং আলতো করে ভেজিয়ে দিলে দরজা।

মি. কেভের বয়স হয়েছে। খর্বকায় পুরুষ। ফ্যাকাশে মুখ-চোখ দুটো অদ্ভুত নীল—যেন জল টলটল করছে। চুল ধূসর এবং ময়লা। গায়ে নোংরা ফ্রক-কোট। মাথায়

মান্ধাতার আমলের টুপি। পায়ে গোড়ালি ক্ষয়ে চুন-হয়ে-যাওয়া কার্পেট-চটি।

শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দু'জন—মি. কেভও চেয়ে আছে তাদের দিকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো খুচরো বার করে মুচকি হাসল পাদরি—ভাবখানা, কুলিয়ে যাবে এই পয়সাতেই। দেখেই কিন্তু আরও ঘাবড়ে যায় মি. কেভ। মুখ একেবারেই শুকিয়ে গেল দুই খদ্দের দোকানে ঢুকতেই।

গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেল না পাদরি—দাম জানতে চাইল ডিমটার। ভয়ে ভয়ে পেছনে অন্দরমহলের দরজায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে পাঁচ পাউন্ড দাম হাঁকল মি. কেভ।

এত দাম? হতেই পারে না।—সে কী রাগ পাদরির। হতে যে পারে না, তা কি জানে না মি. কেভ? জেনে-শুনেই হেঁকেছে চড়া দাম। ফলে শুরু হয়ে গেল দর কষাকষি।

কিন্তু কথা না বাড়িয়ে দোকানের দরজা খুলে ধরে মি. কেভ জানিয়ে দিলে, পাঁচ পাউন্ডের এক পাই কম হবে না।

ঠিক এই সময়ে অন্দরের দরজার ওপরকার কাচে দেখা গেল একটি স্ত্রী-মুখ। নির্নিমেষে চেয়ে আছে খদ্দের দু'জনের দিকে। গলা কেঁপে গেল মি. কেভের।

এতক্ষণ চুপ করে দর কষাকষি শুনছিল ছোকরা। তীক্ষ্ণ চাহনি ঘুরছিল চারদিকে।

হঠাৎ বললে, 'পাঁচ পাউন্ডই দিন।'

আপত্তি জানালে পাদরি। কিন্তু ধোপে টিকল না। ব্যাজার মুখে পকেট হাতড়ে দেখলে, তিরিশ শিলিং-এর বেশি হচ্ছে না। এই সুযোগে বোঝাতে লাগল মি. কেভ, ক্রিস্টাল ডিমটা নাকি বিক্রির জন্য নয়। বিক্রির জন্যে নয় তো দর হাঁকা হল কেন? —জানতে চায় দুই খদ্দের। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মি. কেভ বলে, 'বিকালেই একজন লোক এসেছিল তো। কিনবে বলে গেছে। তাই একটু দর চড়িয়ে নিরাশ করতে চেয়েছিলাম।'

এমন সময়ে খুলে গেল অন্দরের দরজা। দরজার ওপরকার কাচ দিয়ে এতক্ষণ উঁকি দিচ্ছিল যে, দোকানে ঢুকল সে।

স্থূল, কর্কশ-আকৃতি এক স্ত্রীলোক। মি. কেভের চেয়ে বয়স কম—কিন্তু আয়তনে অনেক বড়। ভারী ভারী পা ফেলে মুখ লাল করে বললে, 'কে বললে, বিক্রি হবে না ক্রিস্টাল ডিম? আলবত হবে। বিক্রির জন্যেই রাখা হয়েছে। পাঁচ পাউন্ড তো ভালো দাম। কেভ, ভদ্রলোকদের ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন শুনি?'

বাধা পেয়ে ভীষণ রেগে গেল কেভ। কটমট করে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে কড়া গলায় জানিয়ে দিলে ব্যাবসাটা তার, চালাতে হয় কী করে, সে জ্ঞানও তার আছে।

শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। মজা পেয়ে কেভ-গৃহিণীকে উসকে দিতে থাকে খদ্দের দু'জন। বড়ই কোণঠাসা হয়ে পড়ে মি. কেভ বেচারি, কিন্তু গোঁ ছাড়ে না কিছুতেই।

কথা কাটাকাটির অবসান ঘটায় প্রাচ্যের সেই ছোকরা। বিকেল নাগাদ যে লোকটা ক্রিস্টাল ডিম কেনবার আগ্রহ দেখিয়ে গেছে, সে যদি ইতিমধ্যে নিয়ে যায় যাক, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যদি না নেয়, দু'দিন পরে এসে পাঁচ পাউন্ড দাম দিয়েই ক্রিস্টাল ডিম নিয়ে যাবে তারা।

বিদেয় হল দুই খদ্দের। চরমে উঠল স্বামী-স্ত্রী-র কোঁদল। রাগের মাথায় উলটো-পালটা বকতে থাকে মি. কেভ। একবার বলে, আগে যে কিনতে এসেছে, ক্রিস্টাল ডিম তারই প্রাপ্য। 'তাহলে পাঁচ পাউন্ড চাইলে কেন?' সে কী তম্বি কেভ-গৃহিণীর। ব্যাবসাটা যেন তারই, হুকুম দিতে পোক্ত। তেলে-আগুনে জ্বলে উঠে মি. কেভ শুনিয়ে দিলে মুখের ওপর, 'আমার ছাগল, আমি মাথায় কাটি কি লেজে কাটি, তোমার কী দরকার?'

রাতে খেতে বসে আবার শুরু হল ঝগড়া ক্রিস্টাল ডিম নিয়ে। এবার মায়ের দলে ভিড়েছে মি. কেভের সৎ-ছেলে আর সৎ-মেয়ে। তিনজনের কারওই উচ্চধারণা নেই মি. কেভের ব্যাবসা-বুদ্ধি সম্পর্কে।

সৎ-ছেলের বয়স আঠারো, সৎ-মেয়ের বয়স ছাব্বিশ। বড় তার্কিক।

তেড়েমেড়ে বললে সৎ-ছেলে, 'বেশি বোঝে। এর আগেও ডিমটা পাচার করার ব্যাপারে আমার মতামতকে পায়ে মাড়িয়ে গেছে।'

'পাঁচ পাউন্ড কি কম কথা!' মন্তব্য প্রকাশ করে সৎ-মেয়ে। পরের ব্যাপারে নাক গলাতে ওস্তাদ।

বেচারা মি. কেভ। তিন-তিনটে তোপের মুখে পড়ে কান-টান লাল করে যুক্তিবুদ্ধি এক্কেবারে গুলিয়ে ফেলল। তাড়া খেয়ে আধ-খাওয়া খাবার ফেলেই সরে পড়ল দোকানঘর বন্ধ করতে। পেছন থেকে শুনল গজগজানি, 'এদ্দিন ধরে শোকেসে ডিমখানা ফেলে রাখার কোনও মানে হয়?'

সত্যিই হয় না। ওইখানেই তো ভুল করে বসেছে মি. কেভ। বিক্রি না করে এখন উপায় নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিপিতাকে আর-এক হাত নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরল সৎ-ছেলে আর সৎ-মেয়ে। গরম জলে লেবু-চিনি মিশিয়ে শরবত খেতে বসল কেভ-গৃহিণী ওপরতলায়। মি. কেভ কিন্তু রয়ে গেল দোকানঘরেই, অনেক রাত পর্যন্ত। কী করল দোকানে, তা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, পরে প্রকাশ করা যাবে। পরের দিন সকালে কেভ-গৃহিণী দেখলে সামনের শোকেস থেকে ডিমটাকে সরিয়ে এনে রাখা

হয়েছে মাছ ধরার খানকয়েক পুরানো বইয়ের পাশে, এমন জায়গায় যে খদ্দেরদের চোখে চট করে পড়বে না। মাথা দপদপ করছিল বলে কথা না বাড়িয়ে ডিমটাকে চোখে পড়ার মতো জায়গায় রেখে দিলে কেভ-গৃহিণী। তিলমাত্র বাগড়া দিলে না মি. কেভ। কথাও বলল না। সারাদিনটা কাটল কিন্তু খিটখিটে মেজাজে। বিকেল নাগাদ যথারীতি ঘুমাতে গেল কেভ-গৃহিণী। সেই ফাঁকে শোকেস থেকে ডিমটাকে ফের সরিয়ে দিলে মি. কেভ।

পরের দিন সকালে স্থানীয় স্কুলে মাছ দিয়ে আসতে গেল মি. কেভ—ক্লাসে কেটেকুটে বিজ্ঞান শেখানোর জন্যে দরকার। ঠিক ওই সময়ে দোকানে এল কেভ-গৃহিণী ক্রিস্টাল ডিম দেখতে। ডিমটা বিক্রি হয়ে গেলে ওই পাঁচ পাউন্ড কীভাবে খরচ করা হবে, তার একটা ফিরিস্তি খাড়া হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে এর মধ্যেই। খুবই লম্বা ফর্দ। তার মধ্যে আছে নিজের জন্যে একটা সবুজ সিল্কের পোশাক আর রিচমন্ডে বেড়িয়ে আসা। কিন্তু ডিম দেখবার আগেই উত্তপ্ত মেজাজে দোকানে এল এক খদ্দের। আগের দিন ব্যাং দেওয়ার কথা ছিল, দেওয়া হয়নি কেন? স্বামীমশায়ের এই ব্যাং ব্যাবসাটা কোনওদিনই সুনজরে দেখেনি কেভ-গৃহিণী। ব্যাঙের খদ্দেরকেও তাই মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে বার করে দিলে দোকান থেকে। তারপর দেখতে গেল, ডিমটা ঠিক জায়গায় আছে কি না, ওই ডিমই যে নিয়ে আসবে কড়কড়ে পাঁচটা পাউন্ড... পূর্ণ হবে তার স্বপ্ন।

ও মা! ডিম তো নেই শোকেসে!

সওয়া দুটো নাগাদ ফিরে এসে মি. কেভ দেখলে, মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মরা জানোয়ারের ভেতরে খড়কুটো ঠাসার সরঞ্জাম টেনে নামাচ্ছে তার বউ। দোকানঘর তছনছ। কোনওখানেই দেখতে বাকি রাখেনি কেভ-গৃহিণী। স্বামীরত্নকে দেখেই ঝাঁপাই জুড়াল চোখ পাকিয়ে—'আস্পদ্দা তো কম নয়! লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

'লুকিয়ে রেখেছি? কী বল তো?'

'ন্যাকা আর কী! ডিমটা... ডিমটা... কোথায় রেখেছ?'

'ডিম!' শোকেসের সামনে ছুটে গিয়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল মি. কেভ—'কী আশ্চর্য! গেল কোথায়?'

ঠিক সেই সময়ে খেতে এসে খাবার না পেয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দোকানে ঢুকল মি. কেভের সৎ-ছেলে। ক্রিস্টাল ডিম নিপাত্তা হয়েছে শুনে রাগটা মায়ের ওপর থেকে সরে এসে পড়ল বিপিতার ওপর। মা আর ছেলে মিলে নির্মমভাবে দুষতে থাকে মি. কেভকে—পাছে বেচতে হয়, তাই লুকিয়ে রেখেছে নিজেই। পালটা অভিযোগ নিয়ে এল মি. কেভ—টাকার লোভে নিশ্চয় তাকে না জানিয়ে বেচে দেওয়া হয়েছে ক্রিস্টাল।

ফলে লাগল তুমুল ঝগড়া। ঝগড়ার পর দেখা গেল, মৃগীরুগির মতো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রণে ভঙ্গ দিচ্ছে কেভ-গৃহিণী। আর, কর্মক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা দেরি করে পৌঁছাল সৎ-ছেলে। ক্ষিপ্ত বউকে আর না ঘাঁটিয়ে দোকানে বসে মাথা ঠান্ডা করতে লাগল মি. কেভ।

সন্ধের সময়ে আবার খাওয়ার টেবিলে শুরু হল চেঁচামেচি। এবার আক্রমণ চলল সৎ-মেয়ের নেতৃত্বে। সহ্য করতে না পেরে দড়াম করে দরজা খুলে চম্পট দিল মি. কেভ। সেই ফাঁকে চিলেকোঠা থেকে পাতাল কুঠুরি পর্যন্ত সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখেও ক্রিস্টাল ডিমকে কিন্তু পাওয়া গেল না।

পরের দিন খদ্দের দু'জন দোকানে আসতেই সজল চোখে কেভ-গৃহিণী তাদের খাতির করে বসিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে শুনিয়ে দিলে তার অসীম দুঃখ-দুর্দশার নানান কাহিনি। সবার মূলে ওই মি. কেভ। জীবনটা নাকি মাঠে মারা যেতে বসেছে কেভের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পর থেকে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ! তাকে তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছেই, ক্রিস্টাল ডিমটাকে নিয়েও কী খেলাই না খেলছে। কেভের সারাজীবনটাই এইরকম নষ্টামিতে ভরতি। পাদরি সাহেব যদি ঠিকানাটা দিয়ে যান, তাহলে বাড়ি বয়ে গিয়ে একদিন শুনিয়ে আসবে। সকৌতুকে সব শুনে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল পাদরি। কিন্তু সে ঠিকানা হারিয়ে যাওয়ায় পাদরিকে আর খুঁজে পায়নি কেভ-গৃহিণী।

সন্ধে হলে দম ফুরিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল গোটা কেভ পরিবার। মি. কেভকে একা একাই খেতে হল রাতের খাবার—আগের দু'রাতের ঝড় বইল না খাওয়ার টেবিলে। পুরো বাড়িটা কিন্তু থমথম করতে লাগল এই ব্যাপারের পর থেকে।

ক্রিস্টাল ডিম কিন্তু আর ফিরে এল না—এল না খদ্দেররাও।

কেচ্ছাকাহিনির মধ্যে না গিয়ে এককথায় বলা যায়, মি. কেভ পয়লা নম্বরের মিথ্যুক, ক্রিস্টাল ডিমটা সরিয়েছিল সে নিজেই। মাছের থলির মধ্যে করে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিল সেন্ট ক্যাথরিন'স হসপিটালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিমনস্ট্রেটর মি. জ্যাকোবি ওয়েসের কাছে। ক্রিস্টাল ডিম রয়েছে সেখানেই—আমেরিকান হুইস্কির পাশে কালো ভেলভেট-ঢাকা অবস্থায়। সব কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি মি. ওয়েস। তবে কেভ-দম্পতির মধ্যে যে নিরন্তর খিটিরমিটির লেগেই আছে—তা জানত, মি. কেভের মুখেই শুনেছিল। মিসেস কেভকেও দেখেছিল, বিচিত্র চরিত্র ভালো লাগত বলেই মি. কেভকে তার ভারী পছন্দ। তাই ক্রিস্টাল ডিম রেখে দিতে আপত্তি করেনি। সামান্য একটা ডিমের ওপর কেন মি. কেভের মায়া পড়ে গেছে, তা পরে বিস্তারিতভাবে বলবে বলেছিল ভদ্রলোক। তবে হ্যাঁ, ডিমের মধ্যে নাকি মরীচিকার মতো অনেক ছায়াবাজি সে দেখেছে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

এই কাহিনি মি. ওয়েসের মুখেই শোনা। সুতরাং মি. কেভের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সন্ধের দিকে মি. ওয়েসের কাছে ফের গিয়েছিল মি. কেভ। শুনিয়েছিল রহস্যনিগূঢ় এক কাহিনি। ক্রিস্টাল ডিমটা তার হাতে এসেছিল অন্যান্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে এক কিউরিয়ো দোকানির কাছ থেকে—দেনার দায়ে জলের দামে বেচে দিয়েছিল সমস্ত হাবিজাবি জিনিস। ডিমটার মূল্যায়ন করা তখন সম্ভব হয়নি বলে মি. কেভ দীর্ঘদিন 'দশ শিলিং'-এর টিকিট ঝুলিয়ে রেখেছিল ডিমের গায়ে। তারপর যখন ভাবছে, দামটা আরও কমানো যায় কি না, এমন সময়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল অদ্ভুত একটা আবিষ্কারের পর।

শরীর তখন খুবই খারাপ যাচ্ছে মি. কেভের। এই ঘটনার গোড়া থেকেই স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু হয়েছিল ভদ্রলোকের। নিজেও গা করেনি। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙেছে মনও। স্ত্রী আর সৎ ছেলেমেয়ে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার চালিয়ে গেছে স্বাস্থ্যভঙ্গ সত্ত্বেও, গুণের শেষ নেই বউয়ের, এক নম্বরের দাম্ভিক, স্বামীর জন্যে তিলমাত্র সহানুভূতি নেই মনে, অত্যন্ত খরুচে। লুকিয়ে-চুরিয়ে মদও খায়। সৎ ছেলেমেয়ে দুটোই নীচ প্রকৃতির—বিপিতা যে চোখের বালি—তা সোজাসুজি জানাতে দ্বিধা করেনি কোনওদিনই। ব্যাবসার চাপে মি. কেভও নিশ্চয় মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। রুপোর চামচ মুখে দিয়ে ধরায় আগমন ঘটেছিল ভদ্রলোকের, পেটে মোটামুটি বিদ্যেও আছে। মাসের পর মাস মানসিক অত্যাচার সইবার ফলে ঘুমাতে পারত না রাত্রে। বিষণ্ণ হয়ে থাকত সারাদিন। পাছে কেউ বিরক্ত হয়, তাই গভীর রাতে শয্যা ছেড়ে উঠে ঘুরঘুর করত বাড়িময়, একদিন রাত তিনটের সময়ে ঢুকেছিল দোকান ঘরে।

অন্ধকার ঘর, অথচ চাপা দ্যুতি দেখা যাচ্ছে একদিকে। শোকেসের দিকে। ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সরু আলোকরেখা পড়েছে ক্রিস্টাল ডিমের ওপর এবং ঝলমল করছে ডিম্বাকার ক্রিস্টাল। আলোকরেখা যেন আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুলেছে ক্রিস্টালের ভেতরটা।

দেখেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মাথচাড়া দিয়েছিল মি. কেভের মনে। বিজ্ঞান সে পড়েছে—বিজ্ঞানকে ভাঙিয়েই তার যা কিছু রোজগার। খটকা লেগেছিল সেই কারণেই। ক্রিস্টালের মধ্যে আলোক প্রতিসরণ হয় কী করে, তা তার জানা। কিন্তু ক্রিস্টালের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে কী করে, তা তো জানা নেই!

ক্রিস্টালটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আরও বেশি গুলিয়ে গেল মাথাটা। আলো স্থির নয়—যেন সরে সরে যাচ্ছে ক্রিস্টালের মধ্যে। তালগোল পাকিয়ে যেন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে!

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ক্রিস্টাল নয়, যেন দ্যুতিময় বাষ্প-ভাত ফোঁপরা কাচের বর্তুল!

আচমকা আলোকরেখা আর ক্রিস্টালের মাঝখানে এসে পড়েছিল মি. কেভ। তা সত্ত্বেও দ্যুতি কমেনি ডিমটার। ঝলমলে ক্রিস্টাল ডিম নিয়ে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকারে যাওয়ার পরেও দেখা গেছে, আলো যেন ফেটে পড়ছে আশ্চর্য ক্রিস্টালের ভেতরে। মিনিট চার-পাঁচ ঝলমলে থাকার পর আস্তে আস্তে ফিরে এসেছে দ্যুতি। একেবারে নিবে যাওয়ার পর আবার খড়খড়ির সামনে আলোকরেখার সামনে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে আলো ঝলমলে হয়ে উঠেছে আজব ক্রিস্টাল।

অদ্ভুত উপাখ্যানের এই অংশটুকু কিন্তু যাচাই করা হয়েছে—মিথ্যে বলেনি মি. কেভ। এক মিলিমিটারের সরু ব্যাসের আলোকরেখার সামনে ক্রিস্টাল ডিম রেখে একই কাণ্ড দেখেছে মি. ওয়েস। সবার চোখে সমানভাবে কিন্তু ধরা দেয়নি আশ্চর্য ক্রিস্টালের অত্যাশ্চর্য আলোকপ্রভা। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক মি. হারবিঞ্জার কিছুই দেখেননি। মি. ওয়েস দেখেছে বটে—কিন্তু মি. কেভের মতো নয়। মি. কেভও শরীর যখন খুব খারাপ গিয়েছে, ক্লান্তিতে যখন ভেঙে পড়েছে—তখনই অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখেছে ক্রিস্টালের ভেতরকার আজব কাণ্ডকারখানা।

প্রথম থেকেই মি. কেভ কিন্তু অবিশ্বাস্য এই অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলতে সাহস পায়নি—বেমালুম চেপে গিয়েছে। অষ্টপ্রহর যাকে দাঁতে পেষা হচ্ছে, তার পক্ষে এরকম লুকোচুরি খুবই স্বাভাবিক। বললেই তো অত্যাচার বাড়ত। তাই ফাঁক পেলেই ক্রিস্টাল ঘুরিয়ে দেখত একাই—কাকপক্ষীকেও জানায়নি। ক্রিস্টাল যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। লক্ষ করেছে, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টালের আলো অন্যের চোখে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন জিনিসটা নেহাতই একটা ক্রিস্টাল ডিম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু রাত ঘনিয়ে এলেই তার ওপর আলো ফেললে জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন ডিমটা। দিনরাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে আরও অনেক আবিষ্কার করেছে মি. কেভ। যেমন, দিনের বেলাতেও বিশেষ কোণ থেকে দেখলে অন্ধকারের মধ্যেও আলোময় ক্রিস্টালের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত দৃশ্য।

সবচেয়ে ভালো দেখা যায় বিকেলের দিকে। খাণ্ডারনি বউ যখন খেয়েদেয়ে নাক ডাকাত ওপরে, মি. কেভ তখন কাউন্টারের তলায় কালো ভেলভেট ডবল ভাঁজ করে মাথা মুখের ওপর ঢেকে চেয়ে থাকত ক্রিস্টালের দিকে। এইখানেই একদিন দেখলে, আলোকরেখা থেকে ১৩৭ ডিগ্রি কোণে চোখ রাখলে ক্রিস্টালের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত একটা দেশ। নিছক ছবি নয়, যেন প্রাণস্পন্দনে ভরপুর একটা দৃশ্য। যেন সত্যিই সে দেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মি. কেভ—নড়ে নড়ে যাচ্ছে ছবিটার মধ্যে অনেক জিনিস। আলো যত ভালোভাবে পড়ে, চারদিক যত অন্ধকার হয়—আশ্চর্য সেই জীবন্ত দৃশ্য ততই স্পষ্ট দেখা যায়। আলোকরেখা বা চোখের অবস্থানে

তিলমাত্র হেরফের ঘটলেই জীবন্ত দৃশ্যটাও পট পালটায়। যেন একটা গোল কাচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে সত্যিকারের প্রাণময় জীবনধারার দিকে—প্রাণচাঞ্চল্যে স্পন্দিত সেই দেশের হরেকরকম দৃশ্যপট ঝলক দিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিকোণ এবং আলোকব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথম যখন এই দৃশ্য দেখেছিল মি. কেভ, তখন তা ক্ষণেকের জন্যে ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল—অস্পষ্ট কুয়াশার আড়ালে যেন ঢেকে গিয়েছিল। বিশাল একটা তেপান্তরের মাঠের দিকে যেন চেয়ে আছে ভদ্রলোক। চেয়ে আছে ওপর থেকে নিচে। খুব উঁচু বাড়ি বা মাস্তুলের ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে বহু দূরের বহু দৃশ্য যেমন একসঙ্গে দৃষ্টিসীমায় জেগে ওঠে—ঠিক সেইভাবে দেখেছিল একসঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণের দৃশ্য। পরিচিত তারা দেখে বুঝতে পেয়েছিল কোনদিকটা উত্তর, আর কোনদিকটা দক্ষিণ। পূর্ব আর পশ্চিমে বহু দূরে রয়েছে আকাশছোঁয়া লালচে খাড়া পাহাড়—কোথায় যেন এর আগেও দেখেছে এই পাহাড় মি. কেভ, চেনা চেনা মনে হয়েছে, কিন্তু মনে করতে পারেনি। উত্তর আর দক্ষিণেও ঘুরে এসেছে লালচে পাহাড়। পাহাড়বেষ্টিত ধু ধু প্রান্তরে সঞ্চরমাণ অনেক কিছুই। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে বিশাল উঁচু বাড়ির পর বাড়ি। অদ্ভুত আকারের ঘন শেওলা-সবুজ গাছপালা। কয়েকটা গাছ উৎকৃষ্ট ধূসর। দেখা যাচ্ছে একটা চকচকে খাল। মি. কেভ রয়েছে পূর্বদিকের পাহাড়ের কাছে। পাহাড় পেরিয়ে যেন একদল পাখি উড়ে আসতে আসতে প্রতিসরিত আলোর অস্পষ্টতায় মিলিয়ে গেল। সুস্পষ্টভাবে আর দেখা গেল না। তখন সূর্য উঠছে পাহাড়ের ওপর। সূর্যের সামনে কালো ছায়ার মতো উড়ুক্কু বস্তুগুলোকে পাখি বলেই মনে হয়েছিল মি. কেভের। তারপরেই ঝলমলে রঙিন বিশাল একটা বস্তু উড়ে গেল ছবির ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে। প্রথমবার দেখেই হাত কেঁপে গিয়েছিল ভদ্রলোকের, মাথা সরে গিয়েছিল। দৃশ্যপট কুয়াশা-আবিল হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে অনেক সময় নিয়ে আবার তা দেখতে পেয়েছিল পরে।

মি. ওয়েসের কাছে শুনেছি, মি. কেভের এই অভিজ্ঞতায় নাকি বাড়াবাড়ি নেই মোটেই। যদিও অনেক চেষ্টা করেও মি. কেভের মতো পরিষ্কারভাবে সেই দৃশ্য দেখতে পায়নি মি. ওয়েস—তা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতাকে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটাও ঠিক যে, মি. কেভের কাছে যা সুস্পষ্ট দৃশ্য, মি. ওয়েসের কাছে তা ধোঁয়াটে নীহারিকার মতো দৃশ্যপট ছাড়া আর কিছুই নয়।

দৃশ্যটা আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দিন সাতেক পরে। এই সাত দিনে তেপান্তরের মাঠে ভাসা-ভাসা অনেক কিছুই চোখে পড়েছিল। কিন্তু প্রতিবারেই কেন

জানি মনে হয়েছিল, একই জায়গায় থেকে অদ্ভুত এই দৃশ্যপটের দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে মি. কেভ। দৃষ্টিকোণ পালটালেই এক-একদিকের দৃশ্য ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট বাড়ির অসম্ভব দীর্ঘ ছাদ। ছাদের মাঝখানে রয়েছে অনেকগুলো উঁচু খুঁটি। প্রত্যেকটা খুঁটির ডগায় সূর্যের আলোয় চকচক করছে একটা করে খুদে জিনিস। খুঁটিগুলো সমান দূরত্বে, নিয়মিত ব্যবধানে খাড়া ছাদের ঠিক মাঝখানে। চকচকে খুদে জিনিসগুলো যে আসলে কী, তা পরে বুঝেছিল মি. কেভ। বাড়ির পরেই নিবিড় গাছপালা। তারপর ঘাস-ছাওয়া মাঠের ওপর গুটিগুটি নড়ছে গুবরেপোকার মতো অনেকগুলো প্রাণী—আয়তনে যদিও প্রকাণ্ড। মাঠের পরেই গোলাপি পাথর-বাঁধাই একটা রাস্তা। রাস্তার ওপারে দূরের পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত একটা নদী। দু'পাশে ঘন লাল ঝোপ। নদীর জল চকচকে আয়নার মতো। উপত্যকার একদিক থেকে আরেকদিকে চলে গিয়েছে এই চওড়া নদীপথ। বাতাস যেন মথিত বহু পাখির ডানাসঞ্চালনে। ঘুরছে গোল হয়ে। নদীর ওপারে অসংখ্য আকাশছোঁয়া প্রাসাদ। উজ্জ্বল রঙিন এবং যেন চকচকে ধাতু দিয়ে কারুকাজ করা। আশপাশে শেওলা-সবুজ অরণ্য। আচমকা কী যেন ডানা ঝাপটিয়ে চলে এসেছিল চোখের সামনে—মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল মি. কেভের মুখের সামনে। যেন রত্নখচিত হাত-পাখা সঞ্চালন অথবা ডানা ঝাপটানির সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সেই মুখের ওপরের অংশ, অর্থাৎ শুধু দুটো বিশাল চোখ চলে এসেছিল মি. কেভের চোখের একদম সামনে—এত কাছে যেন ক্রিস্টাল ডিমের ঠিক উলটোদিকে। আঁতকে উঠে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল মি. কেভ। আবার ফিকে হয়ে এসেছিল ক্রিস্টাল। অন্ধকার দোকানঘরে পরিচিত মিখাইল আর সোঁদা সোঁদা গন্ধের মধ্যে বসে ঘেমে গিয়েছিল ভদ্রলোক। নিবিষ্ট হয়ে থাকায় এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, বসে রয়েছে নিজের দোকানেই—অন্য জগতে নয়।

ক্রিস্টাল ডিমের ভেতরের আশ্চর্য দেশ যেন পেয়ে বসেছিল মি. কেভকে সেই থেকেই। সময় পেলেই উঁকি মেরে দেখত ক্রিস্টালের ভেতরে। যেমন নতুন খেলনা নিয়ে তন্ময় থাকে শিশু—অন্য কোনওদিকে হুঁশ থাকে না, কারও হাতে খেলনা ছাড়তে চায় না—মি. কেভের অবস্থাও হয়েছিল সেইরকম। প্রথমদিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাই সহজ-সরলভাবে খোলাখুলি শুনিয়েছিল মি. ওয়েসকে। আজব ক্রিস্টাল হঠাৎ আবির্ভূত খদ্দেরদের হাতে পাচার হওয়ার সম্ভাবনা ঘটতেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। তুমুল ঝগড়া লেগেছিল বাড়িতে। অত্যাচার চলেছিল মনের ওপর।

কিন্তু মি. কেভের মতো ক্রিস্টাল দুনিয়া নিয়ে ছেলেমানুষের মতো ভুলে থাকতে পারেনি মি. ওয়েস। বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তদন্তকারীর মতোই পদ্ধতিমাফিক অবিশ্বাস্য এই নয়া জগৎকে খুঁটিয়ে দেখতে প্রয়াসী হয়েছিল বিজ্ঞানীদের মতোই।

আলোকরেখা কখন পড়বে ক্রিস্টালে—এই ভরসায় না থেকে বৈদ্যুতিক আলো ফেলার ব্যবস্থা করেছিল ক্রিস্টাল ডিমে। মোটা ভেলভেট চাপা দেওয়ার চাইতে উন্নততর ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়ে এবং ক্রিস্টালকে ঠিক কোনদিক থেকে দেখলে দৃশ্যাবলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তা আবিষ্কার করার পর থেকে—ক্রিস্টাল জগতের সব দৃশ্যই যখন খুশি দেখতে পেত মনের আশ মিটিয়ে।
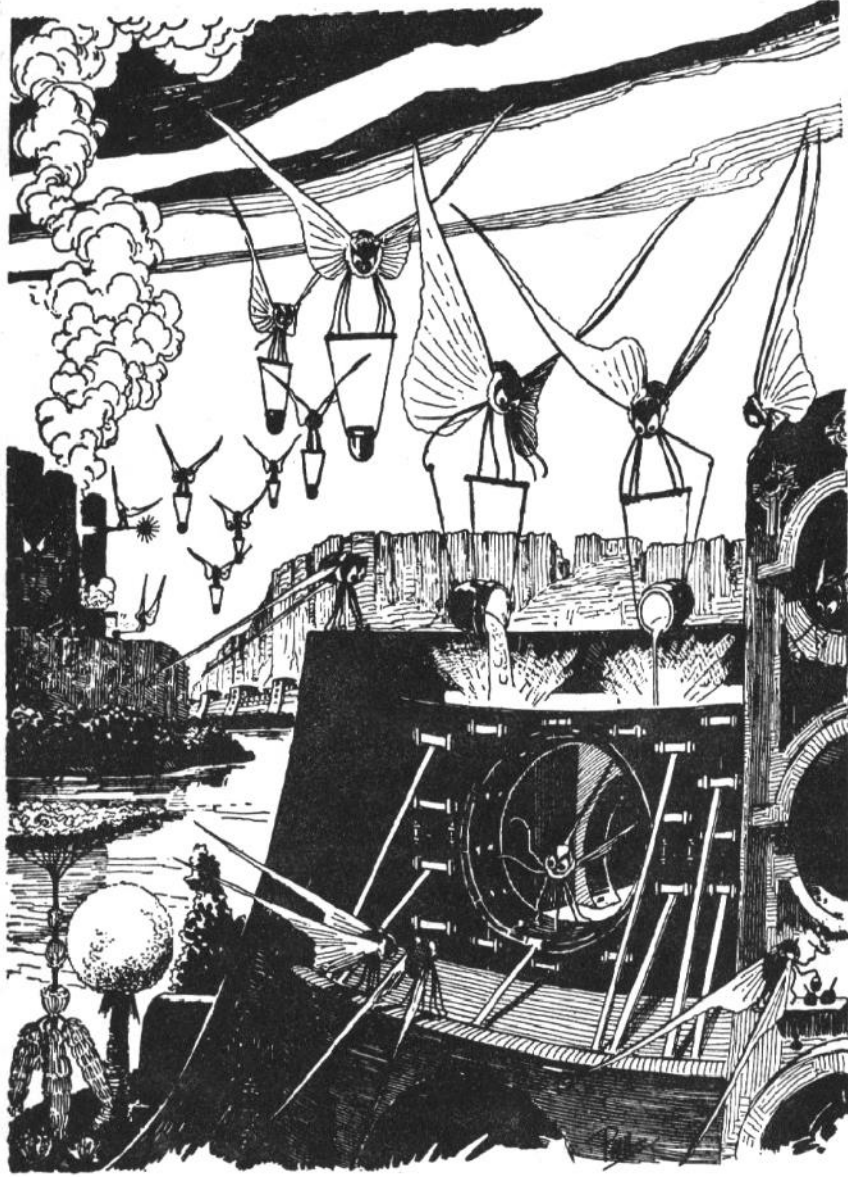
চিত্র ১৪.১ প্রথমে মনে হয়েছিল বাদুড়। তারপর মনে হল পরি-টরি নয় তো?

মি. ওয়েস দেখত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে—মি. কেভও আসত প্রায় রোজই—কল্পনা-রঙিন মনোজগতের খোরাক জোগানোর জন্যে। যেহেতু দেখার ব্যাপারে ভদ্রলোকের ক্ষমতা ছিল মি. ওয়েসের চাইতে বেশি, তাই গড়গড় করে বলে যেত মি. কেভ আশ্চর্য দেশের অদ্ভুত বৃত্তান্ত—অন্ধকারেও লেখার অভ্যেস থাকায়

সেই বর্ণনা খুঁটিয়ে লিখে নিত মি. ওয়েস। লিখেছিল বলেই এই কাহিনি লেখবার সুযোগ এসেছে।

পাখির মতো উড়ুক্কু প্রাণীগুলো সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল মি. কেভের মনকে। প্রথমে মনে হয়েছিল এক জাতের বাদুড়। তারপর মনে হল পরি-টরি নয় তো? মাথাটা গোলাকার—অনেকটা মানুষের মাথার মতো। চওড়া রুপোলি ডানায় কিন্তু পালক নেই—পাখি, বাদুড়ের ডানার নকশায় নির্মিত নয় মোটেই। মরা মাছের মতোই চকচকে রং ঝলমলে পাখা বরাবর রয়েছে বাঁকা পাঁজরা—যেমনটা থাকে প্রজাপতির ডানায়। দেহটা ছোট। কিন্তু মুখের কাছে আছে দু'গুচ্ছ শুঁড়, এদেরই একজনের বিশাল চোখ দেখে প্রথমদিকে অমন আঁতকে উঠেছিল মি. কেভ।

মি. ওয়েসের কেন জানি মনে হয়েছিল, আশ্চর্য দেশের বাগান, বাড়ি, খুঁটি—সবকিছুরই প্রভু কিন্তু এই উড়ুক্কু জীবেরা। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করত তারা অদ্ভুত পন্থায়। দরজা দিয়ে নয়। দরজার বালাই ছিল না বিশাল বাড়িগুলোয়। ছিল বিস্তর গোলাকার গবাক্ষ। উড়ুক্কু প্রাণীগুলো শুঁড়ের ওপর ভর দিয়ে টুক করে নামত জানলার সামনে, ডানা মুড়ে পাশে গুটিয়ে আনত সরু রডের আকারে, তারপর ছোট্ট লাফ মেরে ঢুকে যেত ভেতরে। ছোট ডানাওয়ালা বিস্তর প্রাণী ঘুরত এদের সঙ্গে। অনেকটা বিশালকায় গঙ্গাফড়িঙের মতো। অথবা মথ আর উড়ুক্কু গুবরেপোকার মতো। খোলা লনে গুটিগুটি ঘুরে বেড়াত রং ঝলমলে দানবিক গুবরেপোকাসদৃশ ডানাহীন প্রাণী। পথে আর ছাদেও দেখা যেত উড়ুক্কু প্রাণীদের মতো প্রাণী—ডানা বাদে। মাথা বিরাট। শুঁড়ের ওপর হাতের মতো ভর দিয়ে লাফ দিয়ে ঘুরত ছাদে, রাস্তায়, লনে।

খুঁটির মাথায় চকচকে বস্তুগুলো নিয়েও মাথা ঘামিয়ে চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে এসেছিল মি. ওয়েস। দেখেছিল, বিশটা খুঁটি অন্তর একটা করে খুঁটির মাথায় রয়েছে চকচকে বস্তুগুলো। মাঝে মাঝে ডানাওয়ালা উড়ুক্কু প্রাণীরা এসে শুঁড় দিয়ে খুঁটির ডগা জড়িয়ে ধরে চেয়ে থাকে চকচকে বস্তুগুলোর দিকে।

দেখেই খটকা লেগেছিল। তবে কি ক্রিস্টাল ডিমের মতোই অগুনতি ডিম বসানো রয়েছে খুঁটির মাথায়? এখানকার ডিম দিয়ে যেমন ওখানকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, ওখানকার ডিমের মধ্যেও কি তেমনি এখানকার দৃশ্য ফুটে উঠছে? এখানকার ডিম যেখানে খুশি বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়—ওখানকার ডিম কিন্তু খুঁটির ডগায় আটকানো। এইরকম ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে অন্য জগতের এক বাসিন্দা কি দেখতে পেয়েছিল মি. কেভকে? তার বিশাল চোখ দেখেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল মি. কেভের। তবে কি এখানকার ক্রিস্টাল একই সঙ্গে অবস্থান করছে দুটো

জগতে? দুটো ক্রিস্টালের মধ্যে যোগসাজশ আছে? পৃথিবীজোড়া কাণ্ডকারখানার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাবনাটাকে একান্ত সম্ভবপর বলেই মনে হয়—অন্তত আমার কাছে।

আশ্চর্য এই জগৎটা তাহলে রয়েছে কোথায়? অচিরেই এই প্রশ্নের জবাব জুগিয়ে দিয়েছিল মি. কেভ। ভারী হুঁশিয়ার লোক। যা দেখে তা ভোলে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল বলেই জানা গিয়েছিল আশ্চর্য সেই জগতের ঠিকানা।

চোখ পাকিয়ে একদিন ক্রিস্টালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মি. কেভ দেখলে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে আশ্চর্য জগতে; তারা দেখা যাচ্ছে কালো আকাশে। তবে আকাশ যেন আরও কালচে। তারাগুলোও চেনা—সৌরজগতে যেসব নক্ষত্রমণ্ডলী দেখা যায়—সেইগুলোই, তবে রয়েছে আরও দূরে। অদ্ভুত এই জগৎ তাহলে রয়েছে সৌরজগতেই—পৃথিবী থেকে আরও কয়েক কোটি মাইল দূরে, তাই সূর্যকে আরও ছোট দেখিয়েছে দিনের বেলা—আকাশকে মনে হয়েছে আরও ঘন নীল। এই সূর্যই সেদিন ডুব দিতেই দু'-দুটো চাঁদকে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে আকাশে!

হ্যাঁ, জোড়া চাঁদ। উত্তেজিতভাবে মি. কেভ বলেছিল, আমাদের চাঁদা মামার মতোই তাদের দেখতে। তবে আয়তনে অনেক ছোট। দুটোর একটা এত জোরে ছুটছে যে, শুধু চোখেই ছোটার বেগ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ দুটো চাঁদই গ্রহের এত কাছে রয়েছে যে, দিক্‌রেখা ছাড়িয়ে বেগে উঠে আসতে-না-আসতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়ে যাচ্ছে!

সৌরজগতে একটি গ্রহের ক্ষেত্রেই এইসব তথ্যপঞ্জি মিলে যায়। নাম তার মঙ্গল গ্রহ!

ডানাওয়ালা জীবগুলো তাহলে মঙ্গলগ্রহী। ডানা যাদের নেই, কিন্তু বাদবাকি চেহারা একই রকম—তারা তাহলে কে? তারাও কি মঙ্গলগ্রহী? কৃত্রিম ডানা লাগিয়ে উড়ে বেড়ায় দরকারমতো?

ডানা থাকুক আর না থাকুক, এরাই যে মঙ্গল গ্রহের প্রভু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদঘুটে দু'পেয়ে একজাতীয় জীবকে শেওলা বৃক্ষ খেতে দেখেছিল মি. কেভ। দেখতে অনেকটা নর-বানরের মতো। দেহ আংশিক স্বচ্ছ। হঠাৎ শুঁড় বাড়িয়ে তেড়ে এল ডানাহীন একটা মঙ্গলগ্রহী। হুটোপাটি করে পালিয়েও আংশিক স্বচ্ছ দু'পেয়েরা রক্ষে পায়নি। শুঁড় বাড়িয়ে একজনকে সাপটে ধরেছিল গুবরেপোকার মতো মঙ্গলগ্রহী। তারপরেই ক্রিস্টাল অস্পষ্ট হয়ে আসায় আর কিছু দেখা যায়নি। কিন্তু ঘাম ছুটে গিয়েছিল মি. কেভের।

আর-একটা চলমান বস্তু দেখেছিল মি. কেভ। হনহন করে আসছিল রাস্তা বেয়ে। কাছাকাছি আসতেই দেখা গিয়েছিল ধাতুর জটিল চকচকে কলকবজা। পরক্ষণেই দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়েছিল চলমান রহস্য।

মঙ্গলগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনেক চেষ্টা করেছে মি. কেভ। পৃথিবীর দৃশ্য নিয়ে যেন সন্তুষ্ট নয়, অথবা যেন যা দেখা যাচ্ছে তা মনের মতো নয়—এরকম ভাব দেখা দিয়েছে বিশাল চোখে। তাই একদিন গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল মি. কেভ—নজর কাড়ার জন্যে বিশাল চোখ দুটো এক্কেবারে সামনাসামনি দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আলো-টালো জ্বেলে নানারকম ইশারা ইঙ্গিত করেছিল। কিন্তু পলকের মধ্যেই সরে গিয়েছিল মঙ্গলগ্রহী—অন্য খুঁটির ডগায় চোখ রেখেছিল। মি. কেভের অস্তিত্ব যেন টেরই পায়নি।

নভেম্বর মাসটা গেল এইভাবে। ডিসেম্বরের গোড়ায় পরীক্ষার চাপে মি. ওয়েস সময় দিতে পারেনি দিন সাতেকের মতো। এই ফাঁকে ক্রিস্টাল সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরত মি. কেভ—বাড়ির হাঙ্গামা ততদিনে ঝিমিয়ে এসেছিল। দিন দশ-এগারো পরে ক্রিস্টালের জন্যে মনটা হু হু করে ওঠায় মি. ওয়েস নিজেই দৌড়েছিল মি. কেভের বাড়ি।

গিয়ে দেখলে, বন্ধ হয়ে গেছে দোকান। কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এল মিসেস কেভ। পরনে কালো পোশাক।

মি. কেভ? এখন পরলোকে। এইমাত্র কবরখানা থেকেই ফিরছে মিসেস কেভ।

মি. ওয়েসের কাছ থেকে ক্রিস্টাল নিয়ে আসবার পরের দিন খুব ভোরবেলায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় মি. কেভকে। শক্ত, আড়ষ্ট আঙুলের ফাঁকে ধরা ছিল ক্রিস্টাল ডিমটা—পায়ের কাছে লুটাচ্ছিল কালো ভেলভেটটা—যা দিয়ে মাথা-মুখ চাপা দিত মি. কেভ। ক্রিস্টালের ভেতর দিয়ে অন্য জগতের দৃশ্য দেখার সময়ে।

মরে কাঠ হয়ে গেলেও মি. কেভের মুখে নাকি তৃপ্তির হাসি লেগে ছিল। যেন অনেক সুখ, শান্তি নিয়ে এসেছে মরণ।

শরীর তার খারাপ যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন—চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল মি. ওয়েসের। না করার ফলেই তো এই কাণ্ড। মনটা তাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের। তা সত্ত্বেও খোঁজ নিয়েছিল ক্রিস্টাল সম্বন্ধে। আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল মিসেস কেভের জবাব শুনে।

বেচে দেওয়া হয়েছে ক্রিস্টাল ডিম। মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বউ ডিমটা নিয়ে ওপরতলায় গিয়ে খুঁজেছিল পাদরির ঠিকানা। ঠিকানা আর পাওয়া যায়নি। কড়কড়ে পাঁচ পাউন্ড এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পাগলের মতো ছুটেছিল আরেক দোকানদারের কাছে—দোকানের হাবিজাবি জিনিস বেচে সেই টাকায় ধুমধাম করে মালিককে গোর দিতে হবে। ধুরন্ধর সেই দোকানদার জলের দামে ক্রিস্টাল ডিম সমেত অনেক জিনিসই কিনে নিয়ে গেছে।

মি. ওয়েস তৎক্ষণাৎ দৌড়েছিল তার কাছে। দুঃসংবাদ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। ডিমটা এই তো সেদিন বিক্রি হয়ে গেল। লম্বামতো একটা লোক কিনে নিয়ে গেছে—জামা-প্যান্ট ধূসর রঙের। কোনদিকে গেছে, কোথায় থাকে—তা তো জানা নেই দোকানদারের।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও লাভ হয়নি। কেউ সাড়া দেয়নি। যে কিনেছে, সে নিশ্চয় কিউরিয়ো-সংগ্রাহক নয়। হলে বিজ্ঞাপন পড়ে সাড়া দিত। খেয়ালের বশে কিনে নিয়ে গিয়ে এই লন্ডন শহরেই হয়তো কাগজ-চাপা করে টেবিলে রেখে দিয়েছে। ক্রিস্টালের মহিমা এখনও জানে না।

মি. ওয়েসের কাছে লেখা বিবরণগুলো ছিল। বিষয়টি দুটো পত্রিকায় প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দুটো পত্রিকাই এসব গালগল্পে কান দেয়নি।

তাই কাগজপত্র এল আমার হাতে। এ কাহিনি আমি লিখলাম গল্পের আকারে। মনে মনে কিন্তু মি. ওয়েসের সঙ্গে একমত। আশ্চর্য সেই জগৎ মঙ্গল গ্রহ নিঃসন্দেহে। মঙ্গলগ্রহীরাই ক্রিস্টালটাকে পাঠিয়েছে পৃথিবীতে—ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দৃশ্য দেখবার জন্যে। হয়তো তাদের কেউ কেউ এসেওছে এই গ্রহে। এটা ঘটনা, কল্পনা নয়, মরীচিকা নয়।

দীর্ঘদেহী ধূসরবেশী লোকটা কে, তা আজও জানা যায়নি। তবে পাদরি আর তার সঙ্গী তরুণের হদিশ পাওয়া গেছে। পাদরির নাম রেভারেন্ড জেমস পার্কার। সঙ্গী তরুণটি জাভার বোসেন-কুনির যুবরাজ। মি. কেভ ক্রিস্টাল বেচতে অনিচ্ছুক দেখেই চড়া দামে বস্তুটি দখলে আনতে চেয়েছিল—আর কোনও উদ্দেশে নয়।

ক্রিস্টাল যেখানেই থাকুক—তার সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ রয়েছে মঙ্গল গ্রহের জুড়ি ক্রিস্টালের—এটাও একটা ঘটনা, অলীক কল্পনা নয়!

‘A Story of the Stone Age’ প্রথম প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক আকারে ‘The Idler’ পত্রিকায় ১৮৯৭ সালে। পরে ‘Doubleday & McClure Co.’ থেকে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত ‘Tales of Space and Time’ সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। নভেম্বর ১৯২৭ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ‘Amazing Stories’ পত্রিকায়।

প্রস্তর-যুগের একটি গল্প
(A Story of the Stone Age)

১। আঘ-লোমি আর উয়ায়া

এ গল্প ইতিহাস শুরু হওয়ার আগের গল্প। মানুষের স্মৃতি যদ্দূর পৌঁছায়, তারও ওপারের গল্প। তখন মানুষ হেঁটেই চলে যেতে পারত আজকের ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে। তখন ঘোলাটে জলের চওড়া নদী টেম্‌স আর তার জনক নদী রাইনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল জলাভূমির মধ্যে দিয়ে। মাঝখানে ছিল বিরাট সমতলভূমি—এখন যা উত্তর সাগর নামক জলরাশির তলায় তলিয়ে গেছে। ডাউন্সের সানুদেশ বরাবর উপত্যকার অস্তিত্ব ছিল না সুদূর সেই যুগে। সারের দক্ষিণে ছিল একটা পর্বতমালা। মাঝামাঝি ঢালু জায়গায় বিরাজ করত নিবিড় ফার বৃক্ষ। বছরের বেশির ভাগ সময় তুষার-ঢাকা থাকত শীর্ষদেশ। পর্বতমালার নিচের থাকে তৃণভূমিতে চরে বেড়াত বুনো ঘোড়া, জঙ্গলে টহল দিত হায়না আর বৃহদাকার ভয়ংকর ধূসর রঙের গ্রিজলি ভালুক। ডালে ডালে বিচরণ করত ধূসরবর্ণ বনমানুষ। তারও নিচে অরণ্য, জল আর ঘাসজমির মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ছোট্ট একটা নাটক। এ কাহিনি সেই নাটকেরই কাহিনি। পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার কাহিনি—ভূতত্ত্ববিদদের হিসাব অনুযায়ী।

এ যুগের মতো সে যুগেও বসন্ত ঋতুতে পলক জাগত প্রাণে, রক্ত উত্তাল হত ধমনিতে। বিকেলের আকাশ টলটলে নীল। পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে সাদা মেঘের স্তূপ। দক্ষিণ-পশ্চিম সমীরণে গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে খেলা করছে সোয়ালো পাখি। নদীর জল ঘুলিয়ে তুলছে কালো দৈত্যের মতো জলহস্তীর দল।
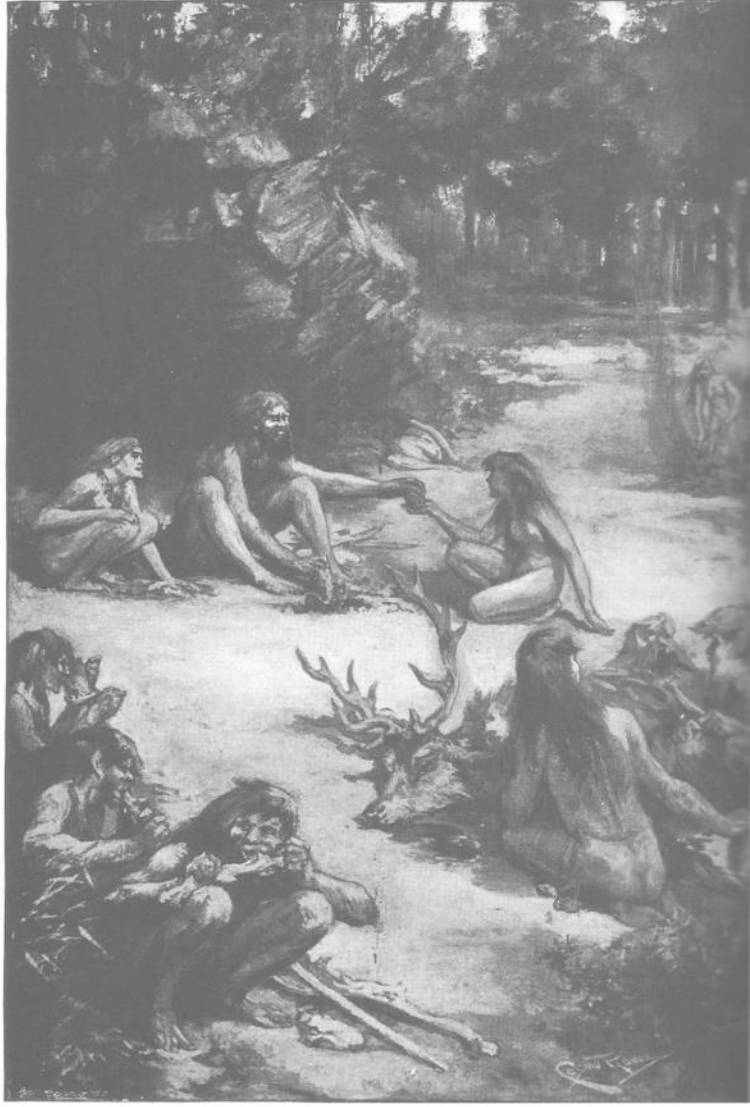
চিত্র ১৫.১ মেয়েরা এখনও হাড় চিবুচ্ছে আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলছে চারপাশে।

একটু দূরেই নদীর জলে দাপাদাপি করছে একদল ছেলেমেয়ে। এদের বসতি নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে—সেইখানে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও। কানে লতি নেই—ওপরের অংশ ছুঁচোলো—আজও এই ধরনের কান দেখা যায় কোনও কোনও জায়গায়। নাক থ্যাবড়া। পরনে কিস্‌সু নেই। লম্বা বাহু। যাযাবরে ভবঘুরেদের ছেলেমেয়ে। মাথার চুল জট পাকানো—কপাল ঢেকে গেছে চুলের জটায়—ফ্যাশনটা দেখা যায় আজও।

জল ঘুনিয়ে খেলা করছে এরাও। জলহস্তীদের এগিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে—'বোলু! বোলু! বোলু! বায়ায়া, বোলু!'

ফুর্তিবাজ ঠিকই—কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষাটা অপর্যাপ্ত।

বাচ্চাদের এই খেলার জায়গায় ছড়িয়ে আছে বিস্তর চকমকি পাথর। বাবা-মায়েরা দু'হাত ভরে তুলে নিয়ে গিয়ে জড়ো করেছে নদীর বাঁকে। সকালবেলা শিকারি কুকুরের কামড়ে জখম হওয়া একটা হরিণের মাংস খেয়ে ভরপেট ঘুমাচ্ছে পুরুষরা হাঁটুতে মাথা রেখে। মেয়েরা এখনও হাড় চিবুচ্ছে আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলছে চারপাশে। বুড়িরা কাঠ গুঁজে দিচ্ছে 'ভায়া আগুন'-এর মধ্যে যাতে—রাত ঘনিয়ে এলেই লম্বা হয়ে বনের পশুকে ঠেকিয়ে রাখে—নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়।

এদের কারও গায়ে পোশাক বলে কিছু নেই। কয়েকজনের কোমর ঘিরে ঝুলছে পশুর চামড়া। আর ঝুলছে একটা করে থলি। থলি ভরতি চকমকি পাথর—সেই যুগের মূল হাতিয়ার। কোনওমতে মেজে-ঘষে ধারালো করা পাথর। এদের সর্দারের নাম 'ধড়িবাজ উয়ায়া'। গালে কালো দাড়ি। বুকে কালো লোম। বাহুবল এবং বুদ্ধিবলে সে এদের দলপতি। চকমকি পাথর দিয়ে ছুঁচোলো করছে একটা হাড়। সবাই ঘুমাচ্ছে—জেগে বসে আছে কেবল উয়ায়া। তার বউয়ের গলা ঘিরে দুলছে ছেঁদা-করা জীবাশ্মর মালা। বসে বসে যারা ঘুমাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের পাশে রয়েছে শান দিয়ে ছুঁচোলো করা হরিণের শিং আর চকমকির ফলা লাগানো কাঠের ডান্ডা।

জঙ্গলের অলডার গাছের আড়ালে লুকিয়ে একটি মেয়ে চেয়ে রয়েছে এইদিকে। এর নাম ইউদেনা। নেহাতই বালিকা। চকচকে চোখ। হাসিটি সুন্দর। আজ তাকে উয়ায়া বড় রকমের মাংসের টুকরো খেতে দিতেই নেকলেস গলায় বউটা গজরে উঠছিল গলার মধ্যে। ঈর্ষা। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গজরানি ছেড়েছিল একটি তরুণ। নাম তার আঘ-লোমি। ইউদেনা একদৃষ্টে আঘ-লোমির দিকে চেয়ে ছিল কিছুক্ষণ। চোখ নামিয়ে নিয়েছিল আঘ-লোমি। কিন্তু ইউদেনার দিকে চোখ তুলেছিল উয়ায়া। চোখের চাহনিটা ভালো লাগেনি ইউদেনার। ভয়ে পালিয়ে এসেছে জঙ্গলে। উয়ায়া হাড় ছুঁচোলো করছে কেন, বোঝা যাচ্ছে না। আঘ-লোমিকেও ধারেকাছে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা কাঠবেড়ালি এসে ধমকাধমকি শুরু করে দিলে ইউদেনাকে। ভাবখানা যেন, সাহস তো তোমার কম নয়? বেটাছেলেদের কাছ থেকে এত দূরে এসেছ জঙ্গলে? যাও, ভাগ হিঁয়াসে!

কাঠের টুকরো ছুড়ে মেরেছিল ইউদেন। পাশ কাটিয়ে দূরে সরে গিয়েও তড়পানি কমেনি কাঠবেড়ালির। কাঠ ছুড়তে ছুড়তে এবার তাড়া করল ইউদেনা। খেলা মন্দ নয়। কিন্তু...

চোখ তুলে তাকিয়েছে উয়ায়া। অলডার গাছ খুব নিচু গাছ। গাছের মাথায় হাত দেখা গেছে ইউদোর। উঠে দাঁড়াল উয়ায়া। চকমকি হাতে এগল সেইদিকে।

পিঠটান দিল ইউদেনা। উয়ায়ার রকমসকম তার ভালো লাগেনি। ঢাল বেয়ে উঠে গেল গভীর জঙ্গলে। দূর হতে দূরে। এত দূরে কখনও না এলেও খেলার ছলে এর

কাছাকাছি আগে সে এসেছে। তাই প্রাণে ভয় নেই।

সন্ধ্যা নামছে। হঠাৎ শূকরের ঘোঁতঘোঁতানি শোনা গেল অদূরে।

সরে দাঁড়াল ইউদেনা।

তারপরেই শুনল ধাবমান একটা শব্দ।

গাছের ডাল ধরে বানরের মতোই দোল খেয়ে ওপরে উঠে বসল ইউদেনা।

তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল দাঁতালো বরাহটা, ধাবমান শব্দটা কিন্তু এগিয়েই আসছে। একটা হরিণও ছুটে গেল তলা দিয়ে। ভয় পেয়েছে। বরাহ আর হরিণ—দুটোই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। কীসের ভয়ে?

বিষম উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে শব্দের দিকে চেয়ে রইল ইউদেনা।

আচমকা জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল আঘ-লোমি। মুখে রক্তের দাগ। ফের উধাও হল জঙ্গলের মধ্যে।

ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে-আসা শব্দটা তো কই থামল না?

আবার দেখা গেল একটা ছুটন্ত মূর্তিকে। উয়ায়া। প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। মুখ সাদা। লম্বা লম্বা লাফ মেরে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

তারপরেই বেরিয়ে এল জঙ্গলের রাজা—গ্রিজলি ভালুক। রাজামশাইকে কোনওদিন দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ইউদেনার। নাম শুনেছে ছেলেবেলা থেকেই। দুষ্টুমি করলেই মায়েরা যার নাম করে ভয় দেখায়, এই সেই অরণ্য অধিপতি মহাভয়ংকর গ্রিজলি ভালুক। বিরাটকায় লোমশ সচল টিলা বললেই চলে। অরণ্যের আতঙ্ক নামটা অকারণে দেওয়া হয়নি।

পলায়মান মানুষ দুটোকে উদ্দেশ্য করেই তর্জন-গর্জন করে চলেছে জঙ্গলের বিভীষিকা। এত বড় আস্পদ্দা—তারই এলাকায় রক্তারক্তি, মারামারি? আরে, আমি হলাম গিয়ে জঙ্গলের রাজা, গুহামানবদেরও রাজা... একটু সমঝে চল!

ঘোঁতঘোঁত গরগর করতে করতে হেলেদুলে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল অরণ্য আতঙ্ক।

গাছেই বসে রইল ইউদেনা। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল জঙ্গলের রাজা, উধাও হল ওপরের দিকে। কিন্তু উয়ায়া অথবা আঘ-লোমি তো কই এল না। রাত হল। নদীর ধারে জল খেতে নামল ম্যামথ হাতির দল। দূর থেকেই বৃংহতি ডাক শুনেই চিনতে পারল ইউদেনা। বাছুরের মতো ডাকতে ডাকতে গাছের তলা দিয়ে চলে গেল বৃহদাকার একটা প্রাণী। খুব সম্ভব ইয়ায়া গন্ডার। তারা দেখা দিল আকাশে। সারারাত ভয়ের চোটে ঘুমাতে পারল না বেচারি। সঞ্চরমাণ ছায়া দেখে আঁতকে উঠল বারবার।

ভোর হল। সূর্য উঠল। ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল ইউদেনা। নেমে এল গাছ থেকে। কিন্তু যাবে কোনদিকে? একরাত বনে কাটিয়েই পথ গুলিয়ে গেছে। কান খাড়া করে

রইল কিছুক্ষণ। অনেক দূর থেকে ভেসে এল একটা ক্ষীণ ঠং ঠং শদ। চকমকি শান দেওয়ার শব্দ।

শব্দ লক্ষ্য করে এগল ইউদেনা। অচিরেই দেখল একটা চেনা গাছ, ওপরে মৌমাছি উড়ছে ভনভন করে। তারপরেই কানে ভেসে এল নদীর জলে জলহস্তী আর বাচ্চাদের দাপাদাপির শব্দ। ওই তো দেখা যাচ্ছে নদী। ওই তো সেই অলডারকুঞ্জ, যার মধ্যে লুকিয়েছিল ইউদেনা। দেখেই উয়ায়া-আতঙ্ক আবার পেয়ে বসল বেচারাকে। লুকিয়ে রইল জঙ্গলে।

খিদে? পেলেও কাতর হয়নি। আধুনিকাদের মতো তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ার ট্রেনিং তো পায়নি। দরকার হলে তিন দিন না খেয়েও থাকতে পারে, কাহিল হয় না। সারারাত বনে কাটিয়ে গা-হাত-পা একটু আড়ষ্ট হয়েছে বটে, তবে সহবত দেখাতে গিয়ে আধুনিকাদের আড়ষ্ট হওয়ার মতো নয়। ভয়? পাবে বইকী। ডাগর চেহারা হলেও মনে মনে ইউদেনা তো বালিকা। তবে আধুনিকাদের মতো ছায়া দেখে চিল-চেঁচানোর মতো ভয়কাতুরে নয় আমাদের ইউদেনা।

বাউ ছাড়া কোনও পুরুষকে দেখা যাচ্ছে না। চকমকি ঠুকে শান দেওয়াই ওর কাজ। বাউকে দেখে নিশ্চিন্ত হল ইউদেনা। অন্য পুরুষরা নিশ্চয় শিকারে বেরিয়েছে। কয়েকজন মেয়েও গেছে নদীর ধারে। হেঁট হয়ে শামুক-গেঁড়ি কুড়াচ্ছে। দেখেই খিদে পেয়ে গেল ইউদেনার। দৌড়ে গেল ফার্ন গাছের আশপাশ দিয়ে। মতলব, মেয়েদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। আচমকা শুনল, মৃদুস্বরে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে। থমকে দাঁড়াতেই পেছন থেকে খড়মড় শব্দে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল আঘ-লোমি। দু'চোখে যেন আগুন জলছে। মুখে রক্ত। শুকিয়ে বাদামি হয়ে গেছে। হাতে উয়ায়ার সেই সাদা পাথর। সাদা আগুন-পাথর। এ পাথর উয়ায়া ছাড়া কেউ ছোঁয় না, কিন্তু বুকের পাটা তো কম নয় আঘ-লোমির! উয়ায়ার সাদা পাথর ওর হাতে এল কী করে?

লাফিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল আঘ-লোমি। খপ করে খামচে ধরল ইউদেনার বাহু, ঠেলে নিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে।

যেতে যেতেই ইউদেনা শুনল, শোরগোল উঠেছে পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, জল ঠেলে এগিয়ে আসছে দু'টি মেয়ে। উঠে দাঁড়িয়েছে অন্য মেয়েরা। আগুনে কাঠ গুঁজে আগুন জ্বালিয়ে রাখা যার কাজ, দাড়িওয়ালা সেই বুড়িটা দু'হাত নেড়ে চেঁচাচ্ছে। চকমকি ঠোকা বন্ধ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে বাউ। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে বাচ্চার দল।

ব্যাপারটা কী? স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ইউদেনা।

তাড়া লাগাল আঘ-লোমি। বুঝিয়ে দিল কী ব্যাপার। উয়ায়া মৃত্যু পরোয়ানা ছেড়েছে দু'জনের নামে। রক্ষে নেই ইউদেনা আর আঘ-লোমির।

আর বোঝানোর দরকার হল না। শুধু মেয়েরা নয়, আস্তানার দিক থেকেও দু'জন বেটাছেলে আসছে এদিকে। জঙ্গলের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একজনকে।

ইউদেনার হাত ধরে টেনে দৌড়াল আঘ-লোমি। দেখতে দেখতে আবার পৌঁছে গেল চেস্টনাট জঙ্গলে। এখন আর ভয় নেই ইউদেনার—আঘ-লোমি রয়েছে তো সঙ্গে। দৌড়ে বেশ মজাও পাচ্ছে। হাসছে খিলখিল করে। আঘ-লোমি দৌড়ায় ভালোই—তবে ইউদেনার সঙ্গে পাল্লা দিতে সে পারছে না।

খোলা জমি পেরিয়ে ফের চেস্টনাট জঙ্গলে গতিবেগ কমিয়ে আনল দু'জনে। আর ভয় নেই। এত দূরে কেউ আসতে সাহস পাবে না।

ভুল ভেঙে গেল অচিরেই। হাত তুলে দেখাল ইউদেনা। গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো মানুষের ছুটন্ত পা। উয়ায়ার ক্রুদ্ধ হুংকার শোনা গেল তারপরেই।

এবার ভয় পেল দুই পলাতক। দু'দিক থেকে তেড়ে আসছে দুটো দল। একটা দলে রয়েছে উয়ায়া। আরেকটা দলে বাউ আর মেয়েরা। বাচ্চাগুলোসুদ্ধ ভিড়ে গেছে দল দুটোয়।

এবার ইউদেনা দৌড়াল আগে—আঘ-লোমি পেছনে। ঝোপঝাড় টপকে, খানাখন্দ পেরিয়ে, পশুচলা পথ মাড়িয়ে, কাদা পেরিয়ে, জলা পেরিয়ে দে দৌড়, দে দৌড়!

পেছন ফিরে দেখল ইউদেনা, পেছিয়ে পড়েছে আঘ-লোমি। খুবই স্বাভাবিক, উয়ায়ার আগুন-পাথর বয়ে আনতে হচ্ছে যে তাকে।

স্বয়ং উয়ায়াকে দেখা যাচ্ছে তার পেছনে। দলের আর সব পেছিয়ে পড়লেও শক্তিমান উয়ায়া এগিয়ে আছে সবার আগে—মাথার ওপর তুলে ধরেছে হরিণের ডালপালাওয়ালা শিং... যার প্রতিটি শাখার ডগা শানিয়ে ছুঁচোলো করা।

দু'জনের মধ্যে ব্যবধান মোটে পঞ্চাশ গজ!

তাই পাশ ফিরে দৌড়াতে দৌড়াতে পেছনে নজর রাখল ইউদেনা। দেখল, ব্যবধান আরও কমে আসতেই হরিণের শিং ছুড়তে উদ্যত হয়েছে উয়ায়া।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ইউদেনা, 'আঘ-লোমি, সাবধান!'

শুনেই টুপ করে বসে পড়েছিল আঘ-লোমি। শনশন করে হরিণের শিং বেরিয়ে গিয়েছিল মাথার ওপর দিয়ে—কিন্তু একটা শাখার খোঁচা লেগে কেটে গেল মাথার চামড়া।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হুংকার ছেড়ে পেছন ফিরেই দু'হাতের আগুন-পাথর ছুড়ে মারল আঘ-লোমি উয়ায়ার দিকে। পাথর গিয়ে লাগল উয়ায়ার পাঁজরে। দম আটকে এল তৎক্ষণাৎ। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

হরিণের শিংখানা কুড়িয়ে নিয়েই আঘ-লোমি দৌড়াল ইউদেনার দিকে। এবার আর ধরে কে! দৌড়! দৌড়! দৌড়!

এদিকে মাটিতে আছড়ে পড়েও টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ফের দৌড়াতে গিয়ে উয়ায়া দেখলে, দম ফুরিয়ে যাচ্ছে—হাঁপ ধরছে। বাউ ছুটে এসেছে পেছন থেকে। উয়ায়ার পাশ দিয়ে দুদ্দাড় করে সে দৌড়ে গেল দুই পলাতকের দিকে।

পলাতকরা ততক্ষণে নদীর ধারে পৌঁছে গেছে। আঘ-লোমি নদী পেরিয়ে ওপরে উঠে দৌড়াচ্ছে। নদীর মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছে ইউদেনা, এমন সময়ে...

নদীর এপারে এসে পৌঁছাল বাউ। বিকট উল্লাসে ফেটে পড়ল নাগালের মধ্যে ইউদেনাকে পেয়ে। আদিম মানুষদের কাছে নরমাংস বড় প্রিয়। আজকের ভূরিভোজ হবে যে ওই দু'জনের অন্তত একজনকে দিয়ে।

অতএব দু'হাতে ধরা চকমকি পাথর দুটোর একটা উঁচিয়ে ধরল মাথার ওপর। ঝিনুকের গড়নে ক্ষুরের মতো ধারালো পাথর।

পাথর নিক্ষিপ্ত হল ইউদেনার দিকে। বাউয়ের লক্ষ্য কখনও ফসকায় না। ইউদেনার হাঁটু কেটে রক্তারক্তি করে দিয়ে ঠিকরে গেল পাথর। যন্ত্রণায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাড় বেয়ে উঠতে যাচ্ছে ইউদেনা, এমন সময়ে ঠিকরে এল দ্বিতীয় ধারালো পাথরটা।

কিন্তু বেরিয়ে গেল মাথার পাশ দিয়ে। কেন-না, ইউদেনার গোঙানি শুনে ফিরে এসেছিল আঘ-লোমি। এক ঝটকায় ইউদেনাকে টেনে এনেছিল পাথরের গতিপথ থেকে।

চিত্র ১৫.২ দু'হাতের আগুন-পাথর ছুড়ে মারল আঘ-লোমি উয়ায়ার দিকে।

বাউ লাফিয়ে পড়েছে জলে। দেখল আঘ-লোমি। ইউদেনাকে টেনে টেনে ওপরে নিয়ে গিয়েই ছুটল লম্বা লম্বা লাফ মেরে। কিন্তু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে অত জোরে দৌড়ানোর ক্ষমতা তো আর নেই ইউদেনার। পিছিয়ে পড়ল বেচারি।

এদিকে বাউ উঠে এল বলে পাড়ে।

দেখেই আবার ফিরে এল আঘ-লোমি। হিংস্র বিকট চিৎকার ছেড়ে হরিণের শিং ঘোরাতে ঘোরাতে ধেয়ে গেল বাউয়ের দিকে। এক ঘায়েই ঠিকরে গেল বাউ। জল লাল হয়ে গেল তার রক্তে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওপারে তখন এসে পৌঁছেছে উয়ায়া। দু'জন ডাকাবুকো ছোকরা নদীর মাঝবরাবর গিয়েই আঘ-লোমির খুনে চেহারা দেখে পেছন ফিরেই চম্পট

দিচ্ছে উয়ায়ার দিকে।

ওই পর্যন্ত দেখেই আর দাঁড়ায়নি আঘ-লোমি। পালিয়েছিল ইউদেনাকে নিয়ে। শক্তের ভক্ত প্রত্যেকেই। তরুণ আঘ-লোমি দেখিয়ে দিয়েছে শক্তির নমুনা। হঠাৎ যেন পূর্ণ মানুষ হয়ে গিয়েছে। উয়ায়া পর্যন্ত অবাক হয়েছে, ভয় পেয়েছে তার হুংকার শুনে, তার শিং ঘোরানো দেখে, এক ঘায়ে বাউ-নিধন দেখে।

অতএব, কেউ আর তার পেছন নিল না। ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসে বার্চ গাছে উঠে রাত কাটাল দু'জনে। ঘুম এল না চোখে। খিদেও পেয়েছে বিলক্ষণ। শাখাপ্রশাখা আর কচি পাতা চিবিয়ে নিয়ে পেটের জ্বালা কমানো গেল কোনওমতে। গভীর রাতে অনেক হিংস্র পশু টহল দিয়ে গেল গাছতলায়। হেলেদুলে চলে গেল একটা লোমশ গন্ডার।

ভোর হতেই আরও দূরে সরে এল দু'জনে। পৌঁছাল একটা নদীর পাড়ে। বিস্তর চকমকি পাথর পড়ে ছিল সেখানে। পাথর ঠুকে জ্বালিয়ে নিল দু'জনে। পাথর ছুড়ে একটা খরগোশ মেরে আনল আঘ-লোমি। আগুনে পুড়িয়ে খেল মাংস। তারপর বসল চকমকি পাথরে শান দিতে।

হঠাৎ হাতে উঠে এল একটা অদ্ভুত পাথর। মাঝখানে একটা ফুটো। এরকম পাথর কখনও দেখেনি আঘ-লোমি। উলটে-পালটে দেখে কাঠের ডান্ডাটা গলিয়ে দিল ভেতরে খেলার ছলে। ডান্ডার ডগায় এত জোরে এঁটে গেল পাথরটা, যে টেনে খুলে আনতেও পারল না। মাথার ওপর বাঁইবাঁই করে ঘুরিয়ে দেখলে, বেশ ভারীও বটে। অস্ত্র হিসেবে মন্দ নয়।

কুঠার আবিষ্কার করল মানুষ এইভাবে।

তারপর? দিনকয়েক পরে পুরানো আস্তানায় ফিরে গেল আঘ-লোমি—একা। দু'দিন দু'রাত আগুন জ্বালিয়ে একা বসে রইল। আঘ-লোমি ফিরে এসে উপহার দিলে একটা কণ্ঠহার।

চিত্র ১৫.৩ মাথার ওপর বাঁইবাঁই করে ঘুরিয়ে দেখলে, বেশ ভারীও বটে।

চমকে উঠেছিল ইউদেনা। এ যে উয়ায়ার কণ্ঠহার!

কুঠার তুলে দেখিয়েছিল আঘ-লোমি। রক্তরঞ্জিত কুঠার। উয়ায়ার রক্ত। নতুন অস্ত্র কুঠারের এক ঘায়েই খতম হয়ে গিয়েছে ধড়িবাজ উয়ায়া। অঙ্গভঙ্গি করে বাঁইবাঁই করে মাথার ওপর কুঠার ঘুরিয়ে আঘ-লোমি দেখিয়ে দিলে, পরম শত্রুকে হনন করেছে সে কীভাবে।

পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এইভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষ শিখল প্রস্তর কুঠারের মহিমা।

২। গুহা ভালুক

নতুন অস্ত্র দিয়ে জঙ্গলের রাজাকে জখম করল আঘ-লোমি এর ক'দিন পরেই।

দু'জনে ঠাঁই নিয়েছিল একটা সংকীর্ণ খাদের মধ্যে। জন্তুজানোয়ারের উপদ্রব এখানে নেই। রাত্রে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে দিব্যি ঘুমানো যায়।

কিন্তু এহেন নিরাপদ জায়গাতেও একরাত্রে হানা দিল অরণ্যের আতঙ্ক আন্দু— মানে, গুহা-ভালুক।

আন্দু ক'দিন ধরেই দেখছিল, দুটো দু'পেয়ে জানোয়ার ঘুরঘুর করছে তার এলাকায়। দেখতে বাঁদরের মতো, আবার শুয়োরের মতোও বটে। শুয়োরের গায়েই অত লোম থাকে। গিন্নিকেও বলেছিল এই নতুন উৎপাতের কথা। মানুষ তখনও এ অঞ্চলে বেশি আসেনি। আন্দু তাই অবাক হয়েছিল প্রথম মানুষ দেখে।

চুপিসারে একদিন হানা দিয়েছিল খাদের মধ্যে। গাছপালা আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে খাড়া দেওয়াল বেয়ে নেমে এসেছিল নিচে। কিন্তু শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থাতেই কোপ খেল প্রস্তর-কুঠারের।

মারাত্মক কোপ! জখম হয়ে রাগে গজরাতে গজরাতে, দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল রাজা আন্দু। সেই ফাঁকে চম্পট দিলে মানুষ-শুয়োর দুটো।

মুখ চুন করে রক্তাক্ত দেহে গুহায় ফিরে এসেছিল আন্দু। গিন্নি তো অবাক রাজামশায়ের হাল দেখে।

এরপরেই যা ঘটল, তা কহতব্য নয়।

ভালুক-গুহায় পাথর খসে পড়ল ওপর থেকে। পড়ল একেবারে আন্দুর মাথার ওপর। করোটি চুরমার হল সঙ্গে সঙ্গে। আন্দু আর নড়ল না।

বিকট হল্লা শুনে কোনওরকমে ওপরে তাকিয়ে আন্দুর বউ দেখেছিল সেই বাঁদর-শুয়োর দুটোকে। নাচছে আর চেঁচাচ্ছে।
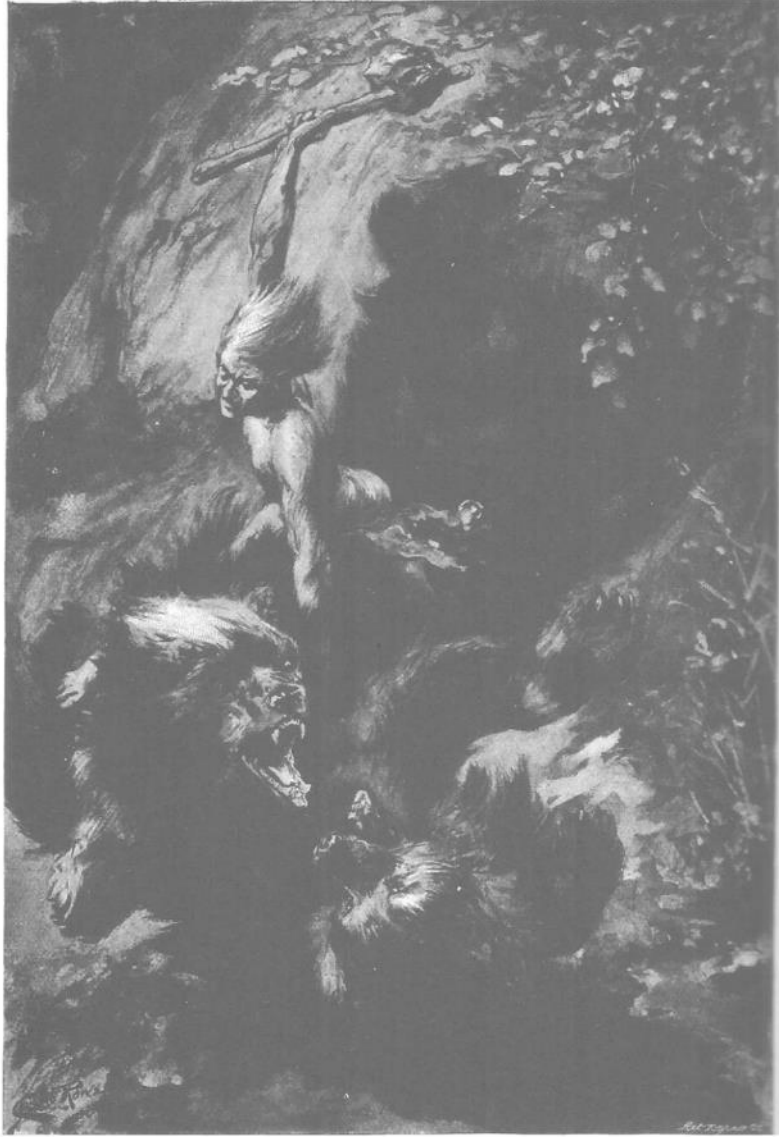
চিত্র ১৫.৪ মারাত্মক কোপ! জখম হয়ে রাগে গজরাতে গজরাতে, দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল রাজা আন্দু।

প্রস্তর-কুঠার আর বুদ্ধির জোরে এইভাবেই জঙ্গলেও আধিপত্য বিস্তার শুরু করল আদিম মানব... আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে।

৩। প্রথম ঘোড়সওয়ার

বুদ্ধিই শক্তি। মানুষ আজ বুদ্ধির জোরেই মুঠোয় এনেছে পৃথিবীটাকে। কিন্তু তা একদিনে ঘটেনি। জঙ্গলের পশুনিধনই শুধু নয়, পশুকে বশও করতে হয়েছে এই বুদ্ধির জোরে।

ঘোড়া আজকে অতীব প্রিয় বাহন। কলের বাহনের অভাব নেই—ঘোড়ার কদর কিন্তু আজও যায়নি।

আঘ-লোমিই প্রথম মানুষ, যে ঘোড়া দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, ঘোড়ার কদর করতে শিখেছিল, ঘোড়ার পিঠে চেপেছিল।

ওদের আস্তানার কিছু দূরেই খোলা ঘাসজমিতে চরতে আসত একপাল বুনো ঘোড়া। দূর থেকে অবাক হয়ে দেখত আঘ-লোমি। শিং নেই, খোঁচা দাঁত নেই—কিন্তু কী আশ্চর্য ছোটার বেগ। লাথির জোর অবশ্য আছে—কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর কায়দাটা অপূর্ব।

রোজ এইভাবে দেখতে দেখতে একটা মতলব মাথায় এল আঘ-লোমির।

নিরস্ত্র অবস্থায় বসে রইল মাঠের মাঝখানে। ঘোড়ার পাল দূর থেকে দেখল, বাঁদরের মতো একটা জীব চুপচাপ বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কাজেই অযথা মাথা না ঘামিয়ে ব্যস্ত রইল ঘাস খাওয়া নিয়ে।

প্রথম দিন গেল এইভাবে। দ্বিতীয় দিন আরও কাছে সরে বসল আঘ-লোমি।

তৃতীয় দিন আরও কাছে। আস্তে আস্তে ওর সান্নিধ্য গা-সওয়া হয়ে গেল ঘোড়াদের।

সবচেয়ে তেজিয়ান ঘোড়াটাকে আগে থেকেই দেখে রেখেছিল আঘ-লোমি। তক্কে তক্কে ছিল তার পিঠে চাপবার। তরুণ বয়স তো, অ্যাডভেঞ্চারের মোহ রক্তে।

একদিন সুযোগটা এসে গেল হাতে।

ঘোড়ার পাল যে পথ দিয়ে রোজ ফিরে যায় ধুলো উড়িয়ে, সেই পথে একটা গাছের ডালে বসে রইল আঘ-লোমি। তেজিয়ান ঘোড়াটা পায়ের তলায় আসতেই টুপ করে লাফিয়ে নেমে এল পিঠে।

আচমকা পিঠের ওপর কী খসে পড়ায় বিষম আতঙ্কে টেনে দৌড়েছিল ঘোড়াটা। খটখটাখট শব্দে প্রান্তির কাঁপিয়ে, চার পায়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটেছিল দিশেহারা হয়ে। কেশর খামচে ধরে, দু'পা দিয়ে ঘোড়ার দু'পাশ আঁকড়ে ধরে কোনওমতে পিঠে বসে ছিল আঘ-লোমি। মাঠ-বন-নদী পেরিয়ে ঘোড়া বেচারা ছুটেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ফেনা গড়িয়ে পড়েছিল কষ বেয়ে। বেদম হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শির-পা হয়ে খসিয়ে ফেলতে চেয়েছিল পিঠের উৎপাতকে, দু'পা মুড়ে বসে পড়েও পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল আপদটাকে। কিন্তু পারেনি—কিছুতেই পারেনি। নাছোড়বান্দা আঘ-লোমিকে কিছুতেই পিঠ থেকে খসিয়ে ফেলা যায়নি। আবার শুরু হয়েছিল খটখটাখট খটখটাখট শব্দে মাঠ-বন-প্রান্তর কাঁপিয়ে দৌড়।

চিত্র ১৫.৫ ঘোড়ার দু'পাশ আঁকড়ে ধরে কোনওমতে পিঠে বসে ছিল আঘ-লোমি।

দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পৌঁছেছিল একটা নদীর ধারে। ঝাঁকুনির চোটে আঘ-লোমির অবস্থাও তখন কাহিল। ঝুলছে একপাশে। কিন্তু কেশর ছাড়েনি মুঠো থেকে। এইখানেই আচমকা বাহন দাঁড়িয়ে যেতেই পিঠ থেকে ঠিকরে গিয়েছিল আঘ-লোমি। তৎক্ষণাৎ হ্রেষা-রবে দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল মানুষের হাতে পরাভূত প্রথম ঘোড়াটি।

বিশ্বের প্রথম ঘোড়সওয়ারটি কিন্তু এল কোথায়? এ যে তারই পুরানো আস্তানা। নদীর ওপারে ওই তো মেয়েরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। চার পেয়ের পিঠ থেকে দু'পেয়েকে অবতীর্ণ হতে দেখে হতভম্ব প্রত্যেকেই।

এরপরেই নতুন অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়ে গেল আঘ-লোমির টগবগে তাজা জীবনে।

৪। সিংহের নাম উয়ায়া

জোর যার মুলুক তার—এই তো নীতি এখনকার দুনিয়ার?

কিন্তু এ নীতি খুবই আদিম নীতি। এ গল্পের নায়ক আদিম মানুষ আঘ-লোমি গায়ের জোরে আর বুদ্ধির জোরে মুলুক দখল করেই তার প্রমাণ রেখে গিয়েছিল ইতিহাসেরও আগের ইতিহাসে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ঠিকরে পড়েই চম্পট দিয়েছিল সে। নদীর ওপার থেকে মেয়েরা তাকে ডেকেছিল—তবুও যায়নি। শুধু দেখেছিল, দলে পুরুষ একজনও না। শিকারে গেছে নিশ্চয়।

শিকারে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পশু শিকারে নয়, মানুষে শিকারের অভিযানে। এবং, আঘ-লোমি আর ইউদেনাই সেই মানুষ।

তাই, নিজের ডেরায় ফিরে এসে ইউদেনাকে আর দেখতে পায়নি আঘ-লোমি।

ব্যাপারটা আঁচ করতে দেরি হয়নি। তৎক্ষণাৎ কুঠার ঘাড়ে রওনা হয়েছিল ইউদেনা উদ্ধারের অভিযানে।

ইতিমধ্যে ইউদেনাকে নিয়ে ফিরে এল তারই উপজাতির মানুষরা। বিস্তর নিগ্রহ করার পর দিনকয়েক পরে বেঁধে রেখে এল জঙ্গলের মধ্যে সিংহ দিয়ে খাওয়ানোর জন্যে।

বেশ কিছুদিন ধরেই বুড়ো সিংহটা উৎপাত জুড়েছিল এদের ডেরায়। রোজই একজনকে ধরে নিয়ে যেত আগুনের কুণ্ড টপকে এসে। গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল, ধড়িবাজ উয়ায়া মরে সিংহ হয়েছে। হত্যাকারী আঘ-লোমি আর তার দোসর ইউদেনাকে না-খাওয়া পর্যন্ত কারও নিস্তার নেই।
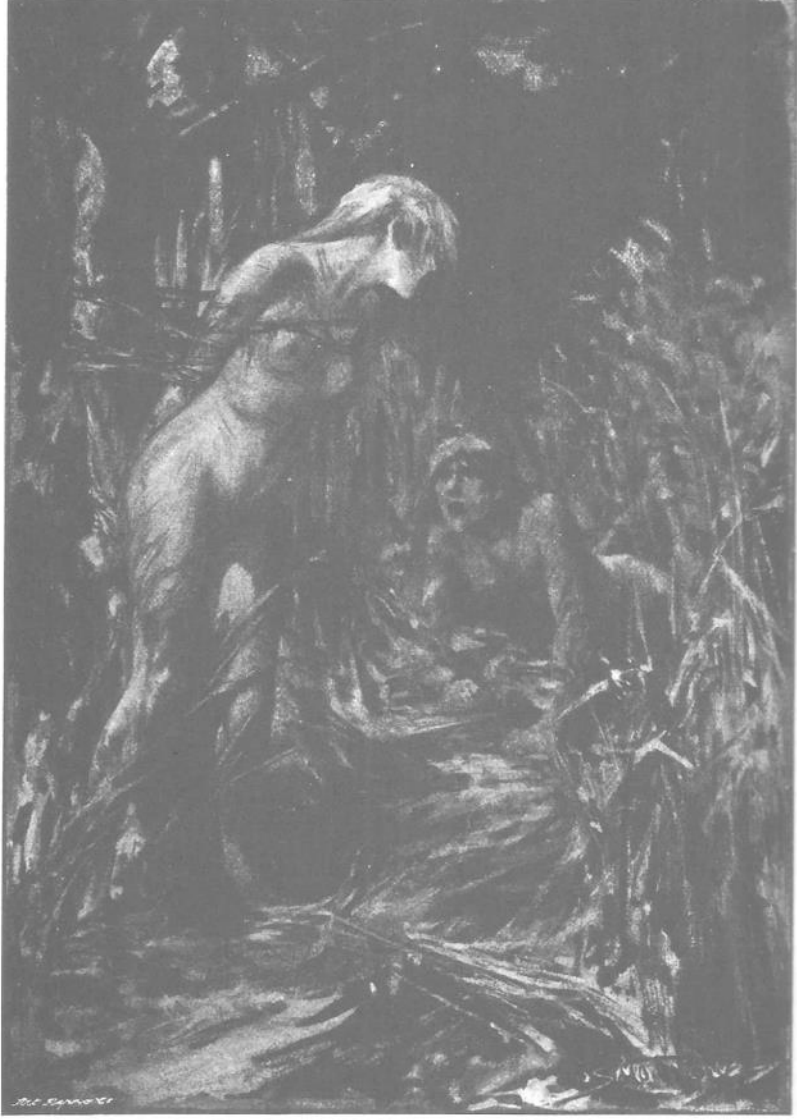
চিত্র ১৫.৬ দিনকয়েক পরে ইউদেনাকে বেঁধে রেখে এল জঙ্গলের মধ্যে।

সুতরাং উয়ায়া নামক সিংহটিকে ঠান্ডা করার জন্যেই ইউদেনাকে বেঁধে রেখে আসা হল গভীর জঙ্গলে।

রাত হল। কাঠ হয়ে রয়েছে ইউদেনা। আশপাশে শোনা যাচ্ছে নিশাচরদের হাঁকডাক। একবার রক্ত জল-করা গজরানিও শোনা গেল। সিংহের গর্জন। সত্যিই যেন রক্ত জল হয়ে এল ইউদেনার।

তারপরেই খসখস করে নড়ে উঠল ঝোপঝাড়। টলতে টলতে বেরিয়ে এল—

সিংহ নয়—আঘ-লোমি।

প্রস্তর-কুঠারের মহিমা প্রাণ দিয়ে বুঝেছে সিংহ। কিন্তু মারাত্মক জখম করে ছেড়েছে আঘ-লোমিকেও। একটা পা ফালাফালা করে দিয়েছে থাবার ঘায়ে।

জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল ইউদেনা নিঝুম আঘ-লোমিকে নিয়ে।

৫। শেষ লড়াই

দু'জনে লুকিয়ে রইল একটা অলডার গাছের তলায়। ওঠবার ক্ষমতা নেই আঘ-লোমির। গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে বসে রইল দিনের পর দিন। সে যুগের মানুষ বলেই ওষুধপত্তরের দরকার হল না। ক্ষতস্থান সেরে আসতে লাগল একটু একটু করে।

কিন্তু খিদের জ্বালা যে বড় জ্বালা। ইউদেনা তো আর আঘ-লোমির মতো শিকারি নয়। তাই চুরি করা ছাড়া আর করে কী বেচারি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুরি। খাবার চুরি। ইউদেনাকে সিংহের আস্তানায় বেঁধে রেখে আসার পরের দিন সকালে পুরুষ যোদ্ধারা জঙ্গলে গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে ধরে নিয়েছিল, আপদ গেছে সিংহের পেটে। কিন্তু রোজই এক ডেলা মাংস খুঁটির ডগায় গেঁথে রেখে আসত জঙ্গলের কিনারায় উয়ায়া সিংহের জন্যে। এই মাংসই চুরি করে এনে ভাগাভাগি করে খেত আঘ-লোমি আর ইউদেনা। কাঁচা মাংস অতিশয় বলকারক। দু'দিনেই শক্তি ফিরে পেয়েছিল আঘ-লোমি। কিন্তু খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল বাকি জীবনের মতো।

কিন্তু রোজ রোজ চুপিসারে চুরি কি সম্ভব? একদিন ইউদেনাকে দেখেই আঁতকে উঠেছিল পুরুষ যোদ্ধারা। তারপরেই অবশ্য মার মার করে তেড়ে এসেছিল পেছন পেছন। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। প্রস্তর-কুঠারের এক-এক কোপে এক-একজনকে ধরাশায়ী করেছিল খোঁড়া আঘ-লোমি। ইউদেনাও কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকেনি—এ যুগের মেয়েরা যা করে। হরিণের শিং ঘুরিয়ে জখম করেছিল বেশ কয়েকজনকে। জনা তিনেক পুরুষ যোদ্ধা প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল জঙ্গলে।
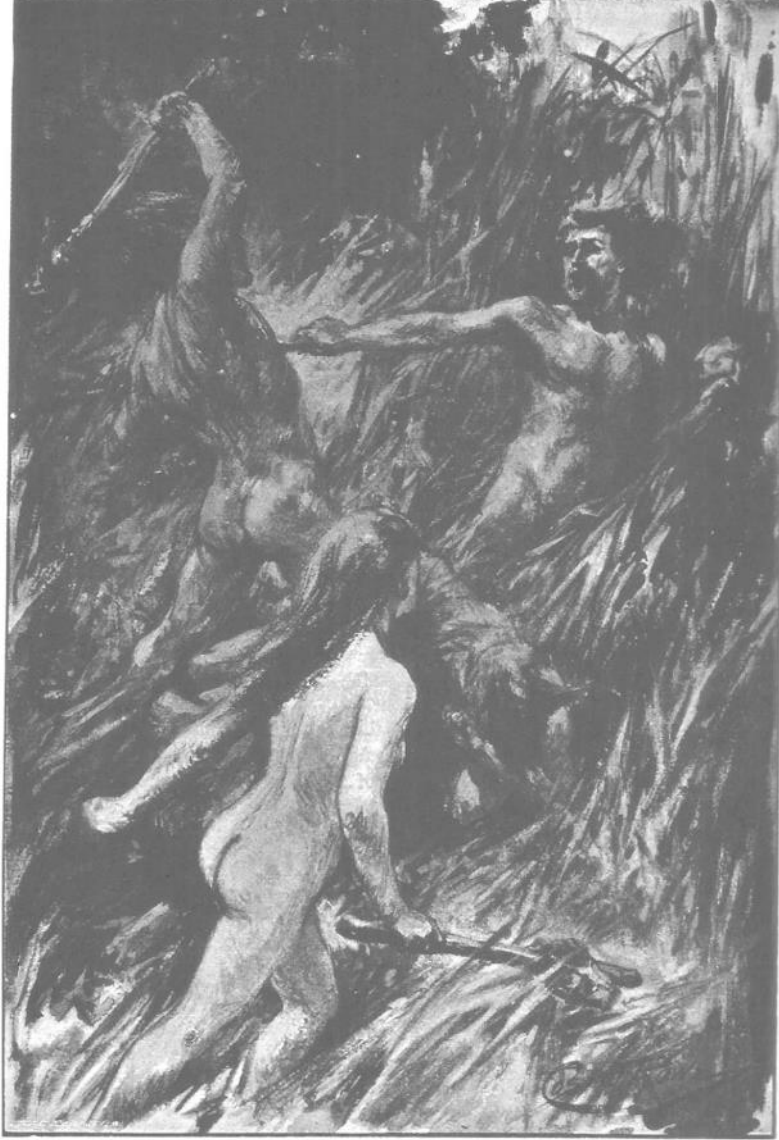
চিত্র ১৫.৭ প্রস্তর-কুঠারের এক-এক কোপে এক-একজনকে ধরাশায়ী করেছিল খোঁড়া আঘ-লোমি।

পুরুষশূন্য দলটার অধিপতি হয়ে বসেছিল আঘ-লোমি—বাহুবলে এবং শক্তিবলে।

শুধু জিঘাংসা নয়, ক্ষমাও ছিল বইকী তার অন্তরে—যা এ যুগের মানুষের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। জীবিত যোদ্ধা তিনজন পরে ফিরে এসেছিল—রোজ রোজ কাঁচা মাংস দূরে রেখে দূরেই বসে থাকত। একদিন মন নরম হল আঘ-লোমির। ক্ষমা করেছিল তিনজনকে।

দীর্ঘদিন দলপতি ছিল সে। তারপর বুড়ো হলে তার জায়গায় এসেছিল আর-একজন।

পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে চলছে এই একই কাণ্ড। সভ্যতা এগিয়ে চলেছে শনৈঃ শনৈঃ।

অনুবাদক: ওয়েলস এই বৃহৎ গল্পটি লেখেন ১৮৯৯-তে। এডগার রাইস বারোজ টারজানের জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারের প্রথম কাহিনি লেখেন ১৯১৪-তে। টারজানের গল্প আজ অধিকতর জনপ্রিয়। ওয়েলসের গল্পটি সংক্ষেপিত করা হল জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে।

'The Star' প্রথম প্রকাশিত হয় 'The Graphic' পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৮৯৭ সালে। 'Doubleday & McClure Co.' থেকে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'Tales of Space and Time' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। জুন ১৯২৬ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories' পত্রিকায়।

প্রলয়-তারার ধ্বংসলীলা
(The Star)

সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহদের মধ্যে দূরতম গ্রহ নেপচুন যে হঠাৎ টলমল করে উঠেছে, এ খবর প্রথম প্রচারিত হল নতুন বছরের পয়লা তারিখেই। সব ক'টা মানমন্দির থেকেই প্রায় একই সঙ্গে জানানো হল, নেপচুনের গতিপথ আগের মতো আর নেই—রীতিমতো টলটলায়মান! গতিবেগ যে কমে এসেছে, এরকম একটা সন্দেহের আভাস ডিসেম্বরেই দিয়েছিলেন ওগিলভি। বেশির ভাগ মানুষই খবরটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি—কেন-না নেপচুন গ্রহের অস্তিত্বের খবরই তারা রাখত না। অত দূরে ধূলিকণার মতো একটা আলোকবিন্দুর সহসা আবির্ভাবে নেপচুন গ্রহ চঞ্চল হয়েছে কেন, তা উত্তেজিত করেনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী যারা নয়, তাদের কাউকেই। চঞ্চল হয়েছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানীরা। ছোট্ট আলোককণাটা দ্রুত বড় হচ্ছে, উজ্জ্বলতর হচ্ছে, অন্য গ্রহদের নিয়মমাফিক গতিপথের ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছে না—সবই তাঁরা লক্ষ করেছিলেন। উপগ্রহ সমেত নেপচুনের কক্ষপথচ্যুতি এভাবে এর আগে কখনও ঘটেনি।

বিজ্ঞানে যাদের অনুশীলন নেই, সৌরজগতের বিশাল বিচ্ছিন্নতা তাদের কল্পনায় আসবে না। সৌরজগতের বাইরের মহাশূন্যতাও ধারণা করতে পারবে না। নেপচুনের পর যে ধু ধু শূন্যতা, তা দশ লক্ষ মাইলকে দু'কোটি দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায়—তা-ই। এখানে আলো নেই, তাপ নেই, শব্দ নেই। নিকষ শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। নিকটতম তারামণ্ডল রয়েছে এরপরেই। মাঝেমধ্যে ক্ষীণতম অগ্নিশিখার মতো দু'-একটা ধূমকেতু দেখা যায় এই বিপুল মহাশূন্যতার মধ্যে—এ ছাড়া এখানকার আর কোনও খবর রাখে না মানুষ। রহস্যময় এই কালো অঞ্চল থেকেই সহসা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হল এই আগন্তুক টহলদার। বিশাল বস্তুপুঞ্জ। কৃষ্ণরহস্য থেকে বেরিয়ে এসেই ধেয়ে চলল জ্বলন্ত সূর্যের দিকে। দ্বিতীয় দিনেই

দূরপাল্লার যন্ত্রে দেখা গেল তাকে রেগুলাসের কাছে লিও তারামণ্ডলের পাশে। বিশাল ব্যাস। অল্পক্ষণের মধ্যেই মামুলি দূরবিনেও ধরা পড়ল তার চেহারা।

তৃতীয় দিনে পৃথিবীর সব মানুষকে সজাগ করে দিলে খবরের কাগজগুলো। মহাশূন্যের এই প্রেতচ্ছায়াকে আর উপেক্ষা করা যায় না। লন্ডনের একটা দৈনিক লিখল, খুব সম্ভব নেপচুন গ্রহকে ধাক্কা মারতে চলেছে মহাকাশের আগন্তুক। তেসরা জানুয়ারি সূর্যাস্ত হতেই পৃথিবীর মানুষরা আকাশপানে চেয়ে রইল আসন্ন সংঘাতের আশঙ্কায় শিহরিত অন্তরে।

লন্ডনের রাস্তাঘাট থেকে দেখা গেল একটা বিশাল সাদা তারা—দেখা গেল সমুদ্র থেকেও। আচমকা পশ্চিম আকাশে উঠে এসেছে নবাগত নক্ষত্র!

সন্ধ্যাতারার চাইতেও উজ্জ্বল নক্ষত্র। মিটমিটে আলোককণা নয়—পরিষ্কার চাকাপানা দেহ। সারারাত ধরে বড় হচ্ছে আকার। ভোরের দিকে হল আরও স্পষ্ট। বিজ্ঞান যার বৃত্তান্ত জানে না, সাধারণ মানুষ তার এই চেহারা দেখে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল। না জানি আবার কী মহামারী আর মহাযুদ্ধ নিয়ে এল এই উৎপাত। বুয়র, হটেনটট, নিগ্রো, ফরাসি, স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগিজ প্রত্যেকেই ভোরের আলোয় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল অদ্ভুত নতুন নক্ষত্রের দিকে।

সংঘর্ষটা লাগল তারপরেই। বহু দূরের দু'টি জ্যোতিষ্ক কাছাকাছি হয়েই মিশে গেল একসঙ্গে। রুদ্রতেজের ঝলক সূচনা করল নেপচুন গ্রহের মৃত্যু। আগন্তুক গ্রহের ধাক্কায় দুই জ্যোতিষ্ক তালগোল পাকিয়ে আরও বিরাট নক্ষত্রের আকারে ঢলে পড়ল পশ্চিমের আকাশে পূর্বে সূর্য ওঠার আগেই। দূর সমুদ্রের নাবিকরা দেখল, আচমকা আকাশে উঠে এল এক নয়া চাঁদ—স্থির হয়ে ভেসে রইল মাথার ওপর—রাত ফুরালেই ঢলে পড়ল পশ্চিমে। ক্যামেরা আর স্পেকট্রোস্কোপে ধরে রাখা হল সেই দৃশ্য।

ইউরোপের আকাশে নবাগতকে দেখেই আঁতকে উঠল আপামর মানুষ। আকারে আরও বড়—গতকালের চাইতেও। সাদা আগুনের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে সামনে। পশ্চিমের চাঁদও সে তুলনায় নিষ্প্রভ। প্রতিটি ছাদ আর পাহাড় থেকে দেখা গেল তাকে।

মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিকরা দেখল আরও ভয়ংকর ঘটনা। বিচিত্র নতুন তারা শুধু আকারেই বড় হয়নি—আরও কাছে এগিয়ে আসছে!

টেলিগ্রাম মারফত বিদ্যুৎ বেগে খবর ছড়িয়ে গেল তামাম দুনিয়ায়। রহস্যময় আগন্তুক এগিয়ে এসেছে পৃথিবীর অনেক কাছে। মাঠে-ঘাটে-হাটেও দেখা গেল, সত্যিই অনেক কাছে চলে এসেছে নবাগত হানাদার!

চিত্র ১৬.১ ইউরোপের আকাশে নবাগতকে দেখেই আঁতকে উঠল আপামর মানুষ।

সন্ধে নামল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল আকাশের আতঙ্ককে—যেন একটা হলদে প্রেত—চাঁদের মতো সাদা ঝকঝকে নয়। সূর্য ডুবেছে, অথচ আকাশ আলোয় আলো হয়ে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বড়লোক রাস্তায় আলোর মালা ঝুলিয়েছিল বিয়ে উপলক্ষে। আকাশের আলো দেখে হতবাক হল সে। খুশিও বটে। আকাশেও আলো ঢেলে দিয়ে গেল নতুন তারা।

গণিত-গুরু কাগজপত্র সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর নিজস্ব ঘরে। চার রাত ওষুধ খেয়ে জেগে থেকেছেন—শুধু অঙ্ক কষে গেছেন। হিসেবে তাঁর ভুল হয়নি। সাদা শিশির মধ্যে এখনও একটু ওষুধ পড়ে রয়েছে—কিন্তু আর রাত জাগার দরকার হবে কি? হিসেব ঠিকই আছে। পৃথিবীর শেষ দিন। ঘনিয়ে এল বলে।

উঠে দাঁড়ালেন গণিত-গুরু। জানলার সামনে গিয়ে খড়খড়ি তুলে চেয়ে রইলেন চিমনি আর বাড়ির ছাদের ওপর ঝুলন্ত তারার দিকে।

চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। অকুতোভয় সৈনিক যেন নিরীক্ষণ করছেন বিষম বৈরীকে। চোখের পাতা ফেললেন না বেশ কিছুক্ষণ। তারপর নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে বললেন নিজের মনে, 'হত্যা তুমি করতে পার আমাকে—কিন্তু তোমাকে আর এই গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে এই মাথার মধ্যে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার আছে। ছোট্ট এই মস্তিষ্কে বন্দি রইলে তুমি।'

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দুপুরবেলা ঢুকলেন ক্লাসঘরে। তুলে নিলেন একটা চকখড়ি। এটা তাঁর মুদ্রাদোষ। চকখড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া না করলে বক্তৃতা দিতে পারেন না। ছাত্রছাত্রীরা একবার সে এক্সপেরিমেন্ট করে খুব মজা পেয়েছে। আজ কিন্তু তাঁর মুখচ্ছবি দেখে থমথম করতে লাগল গোটা ক্লাস। চকখড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন গণিত-গুরু, 'যা পড়াব ঠিক করেছিলাম, তা আর শেষ করতে পারব না। কারণ, মানুষ জাতটা বৃথাই এসেছিল পৃথিবীতে—সংক্ষেপে, এই আমার আজকের বক্তৃতা।'

বিমূঢ় ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিলেন অচিরেই—ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষে।

সেই রাতেই আরও বৃহৎ, আরও স্পষ্ট, আরও ঝকঝকে হয়ে উঠল নতুন তারা। একটু দেরিতেই আবির্ভূত হল আকাশে। দ্যুতিময় নীলচে হয়ে উঠল কালো আকাশ। আলোর দাপটে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল লিও প্রমুখ অনেক নক্ষত্র—বৃহস্পতিকেই কেবল দেখা গেল মাথার ওপর। নবাগতের চারধারে জ্যোতির্বলয়ের মতো নিষ্প্রভ আলোকচ্ছটা। নিরক্ষীয় অঞ্চলের পরিষ্কার আকাশে তার আয়তন চাঁদের আয়তনের চার ভাগের এক ভাগ। ইংল্যান্ডের মাটি ছুঁয়ে রয়েছে কুয়াশা তখনও—কিন্তু গোটা পৃথিবী উদ্ভাসিত হল অত্যুজ্জ্বল চাঁদের আলোয়। শীতল পরিষ্কার আলোয় স্পষ্ট পড়া গেল ছাপা হরফ। হলদে ম্যাড়মেড়ে হয়ে উঠল শহরের বাতিগুলো।

জেগে রইল তামাম দুনিয়ার মানুষ। গির্জায় গির্জায় বাজল ঘণ্টা, দেবালয়ে উপাসনালয়ে শুরু হল প্রার্থনা—অনেক পাপ করেছ পৃথিবীর মানুষ, আজ রাতে আর ঘুমিয়ো না, আর পাপ করো না। এসো, বন্দনা কর নতুন তারাকে। নতুন তারা তখন মুহূর্তে মুহূর্তে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে—ভীমবেগে ধেয়ে আসছে যেন পৃথিবীর দিকেই।

তাই ঘুম এল না কারও চোখে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল ছাদে, রাস্তায়, জাহাজের ডেকে। এক-এক সেকেন্ডে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড পেরিয়ে আসছে কয়েকশো মাইল।

গণিত-গুরুর ভবিষ্যদ্‌বাণী আর কারও অজানা নেই। আগন্তুকের লক্ষ্য সূর্য। নেপচুনকে কোলে নিয়ে মহাবেগে সোজা ছুটছে সূর্যের দিকে। পৃথিবীর কয়েক লক্ষ মাইল দূর দিয়ে বেরিয়ে যেত, যদি না বৃহস্পতির টলটলায়মান অবস্থা না দেখা যেত। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। তার পাশ দিয়েই আসতে হবে আগন্তুককে। প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে কক্ষ্যচ্যুতি ঘটবে বৃহস্পতির—উপবৃত্তের আকার নেবে কক্ষপথ। নতুন তারাও সোজা পথ থেকে একটু বেঁকে গিয়ে ছুটবে সূর্যের দিকে—যাওয়ার পথে হয় আছড়ে পড়বে পৃথিবীর ওপর, নয়তো এত গা ঘেঁষে যাবে যে, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সাইক্লোন মিলেমিশে মহাপ্রলয় ডেকে আনবে পৃথিবীর বুকে।

গণিত-গুরুর এহেন ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়ে তুলতে যাচ্ছে মাথার ওপর ওই শীতল জ্বলন্ত একক তারকা।

সারারাত চেয়ে থেকে যারা চোখ টনটনিয়ে ফেলল, তারা কিন্তু স্পষ্ট দেখল, শনৈঃ শনৈঃ এগচ্ছে দুরন্ত তারকা। আবহাওয়াও পালটে গেল সেই রাতেই। মধ্য ইউরোপ, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের বরফ নরম হয়ে এল বাতাস গরম হয়ে ওঠায়।

গণিত-গুরুর কথা কিন্তু সবাই মেনে নিতে পারেনি। পৃথিবীর সব মানুষ ভয়ে কাঠ হয়ে থাকেনি। প্রতি দশজনের মধ্যে একজন উৎকণ্ঠিত থেকেছে—বাকি ন'জন স্বাভাবিক জীবনযাপন করে গেছে—আকাশের উৎপাত নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এক হাজার সালেও নাকি এমনি উদ্ভট ভবিষ্যদ্‌বাণী শোনা গিয়েছিল। তারপরেও অনেকে এমনি বুক-কাঁপানো শেষের সেদিনের বার্তা শুনিয়েছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এখনও কিছু হবে না। যে আসছে, সে নক্ষত্র নয়—নিছক ধূমকেতু, গ্যাসের পিণ্ড। নক্ষত্রও যদি হত, পৃথিবীকে ধাক্কা মারতে তার বয়ে গেছে। সুতরাং আজগুবি তত্ত্বকথা নিয়ে বেশির ভাগ মানুষই বাজে সময় নষ্ট করতে চাইলে না। তাচ্ছিল্য করল গণিত-গুরুর সাবধানবাণীকে। ডুবে রইল যে যার কাজে। এমনকী অপরাধীমহলও আবার তৎপর হল অপরাধ অনুষ্ঠানে। দু'-একটা কুকুরের ডাক ছাড়া পশুজগৎও মাথা ঘামাল না নতুন তারাকে নিয়ে।

গণিত-গুরু বলেছিল, সেই রাতেই গ্রিনউইচ সময়ের ৭টা ১৫ মিনিটে, বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে আসবে নতুন তারা।

সন্ধে হল। যথাসময়ে আগন্তুককে দেখা গেল ইউরোপের আকাশে। এক ঘণ্টা পরেও আকার বাড়ল না তার। শুরু হয়ে গেল হাসি আর টিটকিরি। হায়! হায়! গণিত-গুরুর এত অঙ্ক শেষে বৃথাই গেল! বিপদ তো কেটে গেছে, দেখাই যাচ্ছে।

তারপরেই মিলিয়ে গেল হাসি। আবার বাড়ছে তারার আকার। আগের চাইতেও দ্রুত। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বড় হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। থেমে থাকার কোনও লক্ষণই

নেই। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঔজ্জ্বল্য। মাথার ওপর খ-বিন্দুতে আসার পর যেন দিনের আলো ছড়িয়ে গেল মর্তে। বৃহস্পতির টানে বাঁকা পথে না এলে পাঁচ দিনের পথ একদিনেই ছুটে আসত। বাঁচিয়ে দিয়েছে বৃহস্পতি। কিন্তু এখন? পরের রাতেই ইংরেজরা দেখলে, চাঁদের তিন ভাগের এক ভাগ আয়তন নিয়েছে আগন্তুক তারা, বরফ গলে যাওয়া আর চোখের ভুল নয়—ঘটনা। আমেরিকার আকাশে নতুন তারা আবির্ভূত হতেই আঁতকে উঠল দেশের লোক। সর্বনাশ! এ যে চাঁদের মতোই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু চাঁদের মতো ঠান্ডা তো নয়। গনগনে সাদা চোখ মেলে চেয়ে থাকাও যাচ্ছে না। নিদারুণ উত্তাপে গরম বাতাস ঝড়ের মতোই বইতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। ভার্জিনিয়া, ব্রাজিল আর সেন্ট লরেন্স উপত্যকায় শুরু হয়ে গেল বজ্রবিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি। মানিতোবায়ে বরফ গলে গিয়ে শুরু হল বন্যা। চিরতুষার গলতে শুরু করল পৃথিবীর সব ক'টা উঁচু পাহাড়ে। বরফ-গলা জল গাছ-পশু-মানুষ ভাসিয়ে নেমে এল সমতলভূমির দিকে নদীগুলোর দু'কূল ছাপিয়ে—প্রাণ নিয়ে ছুটল সমতলের মানুষ।

আর্জেন্টিনা থেকে দক্ষিণ আটলান্টিক উপকূল বরাবর জলোচ্ছ্বাস এত উঁচুতে ঠেলে উঠল, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। বহু জায়গায় প্রবল ঝড় ঠেলে নিয়ে গেল জলকে ভূখণ্ডের অনেক ভেতর পর্যন্ত—ডুবিয়ে দিল শহরের পর শহর। দারুণভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল রাত্রে। ফলে, সকালবেলার সূর্যকে মনে হল যেন নিছক একটা ছায়া। শুরু হল ভূমিকম্প। বেড়ে চলল পলকে পলকে। শেষকালে আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে মেরুবৃত্ত হয়ে কেপ হর্ন পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের প্রতিটি পাহাড়-পর্বতে ধস নামল, মাটি চৌচির হয়ে ফেটে গেল, বাড়িঘরদোর ধূলিসাৎ হল। কোটোপাক্সির পুরো পাশটা দুমড়ে-মুচড়ে যেন বিষম যন্ত্রণায় পিছলে যাওয়ার ফলে তোড়ে বেরিয়ে এল লাভাস্রোত, ঠেলে উঠল অনেক উঁচুতে এবং বিশাল অঞ্চল জুড়ে বেগে ধেয়ে গিয়ে একদিনেই পৌঁছে গেল খোলা সমুদ্রে।

নিবু নিবু অবস্থায় চাঁদ যখন উঁকি দিল আকাশে, আগন্তুক তারার দাপট তখন চলেছে গোটা প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলে। পেছনে টেনে আনছে ঝড়বিদ্যুৎকে। সেই সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠছে জলরাশি—ফুঁসে উঠে জলোচ্ছ্বাসের আকারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটার পর একটা দ্বীপে—মানুষশূন্য করে ছাড়ছে প্রতিটি দ্বীপকে। চোখধাঁধানো দ্যুতি যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, যখন গরমে চামড়া পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, যখন মনে হচ্ছে, লক্ষ চুল্লি জ্বলছে আকাশে-বাতাসে—তখন পঞ্চাশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস গজরাতে গজরাতে নারকীয় ক্ষুধা নিয়ে আছড়ে পড়ল এশিয়ার সুদীর্ঘ উপকূলের ওপর এবং অগ্নিনিঃশ্বাসের মতো ঝড়ের ঠেলায় ভীমবেগে ঢুকে পড়ল চীন দেশের সমতলভূমিতে। সূর্যের চাইতেও বিরাট আর জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তখন

আগন্তুক তারকা, সূর্যের চাইতেও লেলিহান এবং তপ্ত—মুহূর্তের জন্য প্রলয়ংকর সেই রূপ দেখল চীনের মানুষ। দেখল প্যাগোডা, মহীরুহ, রাস্তা, চাষের মাঠ থেকে আকাশের আতঙ্ক আকাশ পুড়িয়ে ধ্বংস করে চলেছে বিশাল চীন দেশকে—অন্য কোনও দেশে এত মানুষ নেই, যা আছে চীন দেশে। দেশসুদ্ধ মানুষের ঘুম উড়ে গেল চোখ থেকে। আকাশের বিভীষিকা ক্ষণেকের জন্যে দেখে আঁতকে উঠতেই-না-উঠতেই চাপা গজরানির শব্দে রক্ত জল হয়ে গেল প্রত্যেকের—এল প্রবল জলোচ্ছ্বাস। পালিয়ে যাবে কোথায়? উত্তাপে চামড়ায় ফোসকা পড়ছে, তপ্ত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেওয়ায় ফুসফুস জ্বলে যাচ্ছে, তারপরেই ওই কালান্তক জলোচ্ছ্বাস—পঞ্চাশ ফুট উঁচু। এল অতর্কিতে, মৃত্যু ঢেলে দিয়ে গেল আচম্বিতে। নিষ্প্রাণ হয়ে গেল চীন দেশ।

গনগনে অঙ্গারের মতো সাদা হয়ে গেল চীন দেশ, কিন্তু জাপান, জাভা আর পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোর ওপর ম্যাড়মেড়ে লাল আগুনের বলের মতো দেখা গেল বৃহৎ তারকাকে উন্মত্ত আগ্নেয়গিরিগুলোর ছাই, বাষ্প আর ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে দিয়ে। নতুন তারাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই এলাহি কাণ্ড আরম্ভ করে দিয়েছিল সব ক'টা আগ্নেয়গিরি একযোগে। মাথার ওপর লাভা, গরম গ্যাস আর ছাই—নিচে ফুঁসছে জল, মাটি কাঁপছে ভূমিকম্পে। দেখতে দেখতে গলে গেল হিমালয় আর তিব্বতের চিরতুষার। এক কোটি ধারায় ছেয়ে নেমে এল ব্রহ্মদেশ আর হিন্দুস্থানের ওপর। হাজারখানেক জায়গায় দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল ভারতের নিবিড় জঙ্গল। ধাবমান জলের মধ্যে দিয়েও দেখা গেল জায়গায় জায়গায় লেলিহান অগ্নিশিখা। রক্তের মতো লাল আগুন লক্ষ জিহ্বা মেলে নৃত্য করতে লাগল মহাপ্লাবনের মাঝে মাঝে। দিশেহারা মানুষ দৌড়াল নদীর তীর ছেড়ে একটাই দিকে—বাঁচবার শেষ ভরসা রয়েছে যেদিকে—সমুদ্রের দিকে।

এদিকে মুহুর্মুহু আকারে বেড়ে চলেছে প্রলয়-নক্ষত্র। আরও উত্তপ্ত, আরও উজ্জ্বল হচ্ছে পলকে পলকে। সেই সঙ্গে এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিবেগে। নিরক্ষীয় সমুদ্রে ধীর প্রশান্ত রোদ্দুর ঝিকমিক থাকে আবহমানকাল—কিন্তু নতুন তারা এগিয়ে আসার ফলে শান্ত জল হল অস্থির উত্তাল, বড় বড় কালো ঢেউ থেকে ফুঁসে উঠল তাল তাল বাষ্প, মাতাল ঝড়ের ঠেলায় পাক খেতে খেতে প্রেতাকারে সেই বাষ্পরাশি ধেয়ে গেল দিকে দিকে।

তারপরেই ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ইউরোপে যারা নিষ্পলকে চেয়ে ছিল তারার উদয়ের প্রতীক্ষায়, হঠাৎ তাদের মনে হয়েছিল, পৃথিবীর বোঁ বোঁ আবর্তন বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। হাজারে হাজারে যারা পালিয়েছিল ভেঙে পড়া বাড়ি, বন্যার প্রকোপ আর ধসের ধ্বংসলীলা এড়াতে, তারাও হতবাক

হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। নতুন তারা দিগন্ত ছাড়িয়ে দেখা দিচ্ছে না! কেন? কেটে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহ্য উৎকণ্ঠা আর বিমূঢ়তার মধ্যে দিয়ে। তারার উদয় কিন্তু ঘটল না। চেনা নক্ষত্রমণ্ডলীগুলো দেখা গেছে পরিষ্কার আকাশে—মাটি যদিও কাঁপছে থরথর করে ঘন ঘন ভূমিকম্পে—কিন্তু গেল কোথায় মহাকাশের আগন্তুক?

নির্দিষ্ট সময়ের দশ ঘণ্টা পরে আবির্ভাব ঘটল তার—সেই সঙ্গে সূর্যর। কালান্তক তারকার সাদা গোল বুকের ঠিক মাঝখানে দেখা গেল একটা কালো চাকতি।

এশিয়ার মাথায় থাকার সময়ে আকাশের গতিপথ থেকে সরে যাচ্ছিল তারকা। ভারতের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তীব্র আলো। সে রাতে সিন্ধু নদের মোহানা থেকে গঙ্গা নদীর মোহানা পর্যন্ত ভারতের বিস্তৃত সমতলভূমি ডুবে গিয়েছিল অগভীর জলে—চকচকে জলে ভূতুড়ে ছায়ার মতো নিজের প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলেছিল আকাশের আতঙ্ক। মন্দির আর প্রাসাদ, ঢিপি আর পাহাড় মাথা উঁচু করেছিল জল থেকে। কালো মানুষের ভিড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল মন্দির-মসজিদ-পাহাড়-টিলার শীর্ষদেশ। মিনার-গম্বুজ-স্মৃতিসৌধেও প্রাণ বাঁচাতে জড়ো হয়েছিল ভয়ার্ত মানুষ—কিন্তু প্রাণে বাঁচেনি কেউ—প্রচণ্ড উত্তাপ আর নিঃসীম আতঙ্কে মুহ্যমান অবস্থায় তলিয়ে গিয়েছিল চকচকে কালো জলে মিনার-গম্বুজ-স্মৃতিসৌধ একে একে ধসে পড়ার পর। হাহাকারে ভরে উঠেছিল ভারতের আকাশ-বাতাস। আচম্বিতে নারকীয় চুল্লির গনগনে দ্যুতির ওপর দিয়ে ভেসে গিয়েছিল যেন একটা হিমশীতল কালো ছায়া—সীমাহীন নৈরাশ্যব্যাপী পুরো তল্লাটটার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল হিমশীতল দমকা হাওয়া—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল মাথার ওপর। বাতাসে আগুনের হলকা কেন কমে এল, কেন হঠাৎ প্রখর দ্যুতি ঢেকে দিয়ে কালো ছায়া চকিতে ধেয়ে গেল দিগন্তব্যাপী জলরাশির ওপর দিয়ে—তা দেখার জন্যে বিভীষিকা-মুমূর্ষু মানুষগুলো ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েছিল আকাশপানে। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ঠিকই—কিন্তু দেখা গিয়েছিল কালো চাকতিটাকে। রাক্ষুসে তারকার ওপর আস্তে আস্তে ভেসে আসছে একটা কালো চাকতি। পৃথিবী আর তারকার মধ্যে ঢুকছে চাঁদ—মারণ-উত্তাপ বুক পেতে নিয়ে শীতল করে তুলছে পৃথিবীকে। শুরু হয়েছে নক্ষত্র-গ্রহণ! মঙ্গলময় ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করে সোল্লাসে দয়াময় বন্দনায় মুখর হয়েছিল দেশের মানুষ। পরক্ষণেই পূর্ব দিগন্তে টুপ করে লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল বরুণদেব। সূর্য, চন্দ্র আর তারকা একত্রে ধেয়ে গিয়েছিল গগনপথে।

ইউরোপে যখন এ দৃশ্য দেখা গেল, তখন সূর্যের অনেক কাছে চলে এসেছে আগন্তুক তারকা। সটান সূর্যের দিকেই ছুটছে নক্ষত্র—আস্তে আস্তে কমছে গতিবেগ—তারপর থেমেও গেল একসময়ে—সূর্য আর তারকা এক হয়ে গেল। মাথার ওপর খ-বিন্দুতে এসে। চাঁদ সরে এল তারকার বুক থেকে—গ্রহণের কাজ ফুরিয়েছে—

আকাশ ঝকঝকে হয়ে ওঠায় চাঁদকে আর দেখাও যাচ্ছে না। ব্যাপারটা বোঝা গেল এতক্ষণে। পৃথিবীর খুব কাছে এসেও কাছাকাছি থাকতে পারল না রাক্ষুসে তারকা। পৃথিবীর পাশাপাশি থেকে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করেও পৃথিবীর নাগাল ধরতে পারল না আকাশের আতঙ্ক। সূর্য তাকে টেনেছে। তাই সটান ধেয়ে যাচ্ছে সূর্যের জঠর লক্ষ্য করে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পৃথিবীর মানুষ।

মেঘ ঘনিয়ে এল তারপরেই। মুছে গেল আকাশের দৃশ্য। বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝিকিমিকি নতুন পোশাক দিয়ে মুড়ে দিল গোটা পৃথিবীকে। এমন বৃষ্টিপাত শুরু হল, যা পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। সেই সঙ্গে খেপা আগ্নেয়গিরিগুলোও অকস্মাৎ লাভা উদ্গিরণ বন্ধ করে শুরু করল কাদাবমি। জল সরে গেল ডোবা জায়গা থেকে, বেরিয়ে এল কাদাজমি, সেই সঙ্গে দেখা গেল রাশি রাশি মড়া—বাচ্চা, বুড়ো, যুবক-যুবতীর। ঠিক যেন ঝড়জলে ধোয়া সমুদ্রসৈকত। মানুষ আর পশুর মৃতদেহ আটকে রইল পৃথিবীজোড়া কর্দম ভূমিতে। দিনের পর দিন কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্প উড়ে গেল শুকিয়ে-আসা জমি থেকে, বিশাল খাত জেগে উঠল শুকনো কাদার বুকে। নক্ষত্রের আবির্ভাব এবং নিদারুণ উত্তাপের এই হল পরিণাম। এরই মধ্যে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে বারবার নাড়া দিয়ে চলল বিরামবিহীন ভূমিকম্প।

কিন্তু নক্ষত্র বিদায় নিতেই সাহস ফিরে পেয়েছিল পৃথিবীর মানুষ। একে একে ফিরে এল কাদায় বসে যাওয়া গোলাঘরে, পাঁকে ভরে যাওয়া চাষের মাঠে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরে নগরে। ঝড়জলের প্রকোপ এড়িয়ে টিকে গিয়েছিল যে ক'টা জাহাজ, বিমূঢ় অবস্থায় জল মেপে মেপে নতুন দিক্‌চিহ্ন ধরে ফিরে এল পরিচিত বন্দরগুলোয়। বাতাস কিন্তু গরম হয়ে রইল আগের চেয়ে, সূর্যও বড় হয়ে গিয়েছে মনে হল আগের চেয়ে—চাঁদের আয়তন কমে এসে ঠেকেছে যেন আগের আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে। দিনরাতের হিসেবও গেছে পালটে।

নতুন ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা দেখা দিল পৃথিবী জুড়ে। কালান্তক নক্ষত্র হাড়ে হাড়ে শিখিয়ে দিয়ে গেল, বিশ্বমৈত্রী একান্তই প্রয়োজন। এক ফুৎকারে অবসান ঘটতে চলেছিল মানুষ জাতটার--কী হবে অযথা রেষারেষি, দ্বন্দ্ব-কলহ নিয়ে? এসো সবাই, এক হও পৃথিবীর মানুষ। পালটে গেল আইন, বই, মেশিন আর মানুষের মনের চেহারা। পালটে গেল আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, বাফিন উপসাগরের উপকূলের চেহারা। শ্যামল সবুজ ভূমি দেখে চোখকেও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি অভিযাত্রী নাবিকরা। পৃথিবী আগের চেয়ে গরম হয়ে ওঠায় মানুষ জাতটা ছড়িয়ে পড়ল আরও উত্তরে আর দক্ষিণে—মেরু অঞ্চলে। বিশ্বশান্তি-মৈত্রী-সৌহার্দ এবং বিস্তৃত পতিত ভূখণ্ডে বসবাস—মহাকাশের আগন্তুক এই উপহারই দিয়ে গেল পৃথিবীকে।

মঙ্গল গ্রহের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতো নয় ঠিকই—বিপুল পার্থক্য এই দুই জগতের পণ্ডিতদের মধ্যে—কিন্তু সেখানেও আগ্রহ সঞ্চারিত হল পৃথিবীব্যাপী এই প্রলয় এবং তারপরেই অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। একজন তো লিখেই বসল এইভাবে—'মহাশূন্যের এই ভয়ংকর মিসাইলের বস্তুপিণ্ড আর উত্তাপের তুলনায় পৃথিবীর ক্ষতি খুব কমই হয়েছে বলতে হবে। সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে সূর্যের দিকে নিক্ষিপ্ত এই জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে রেহাই দিল সৌরপরিবারের তৃতীয় গ্রহকে। সমুদ্ররেখা তেমন কিছু পালটায়নি দেখা যাচ্ছে—শুধু যা সাদা বিরংটা (সম্ভবত জমাট জল) গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে দুই মেরুর চারপাশে।' এই লেখা থেকেই বোঝা যায়, কয়েক মিলিয়ন মাইল দূর থেকে পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয়কে কী চোখে দেখা হয়েছে এবং কী হলেও হতে পারত—কিন্তু হয়নি!

ম্যামথ যখন ছিল এই পৃথিবীতে, এ গল্প তখনকার গল্প। কীভাবে মানুষ প্রভাব বিস্তার করল পশুজগতের ওপর—এ গল্প সেই গল্প।

'The Man Who Could Work Miracles' প্রথম প্রকাশিত হয় 'Illustrated London News' পত্রিকায় জুলাই ১৮৯৮ সালে। 'Doubleday & McClure Co.' থেকে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'Tales of Space and Time' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। ১৯৩৭ সালে গল্পটি পরবর্ধিত আকারে Roland Young অভিনীত ছায়াছবি হিসাবে মুক্তি পায়।

অঘটনবাজ
(The Man Who Could Work Miracles)

ঈশ্বরদত্ত আশ্চর্য এই ক্ষমতা তার সহজাত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বিলক্ষণ। আমার তো মনে হয়, ক্ষমতাটা তার মধ্যে এসেছিল অকস্মাৎ। পয়লা নম্বরের নাস্তিক ছিল তিরিশে পা দেওয়ার আগে পর্যন্ত। অলৌকিক শক্তি যে আদৌ কারও থাকতে পারে, এ বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল না মোটেই। আকারে নেহাতই খর্বকায়, চোখ দুটো গনগনে বাদামি, বেজায় খাড়া লাল চুল, গোঁফজোড়া রীতিমতো পাকানো এবং দুই প্রান্তে যখন-তখন পাক দেওয়াটা তার অষ্টপ্রহরের মুদ্রাদোষ। নাম তার জর্জ ম্যাকহুইরটার ফোদারিনগে। এ নাম যার থাকে, তাকে আর যা-ই হোক, কোনও অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারের সঙ্গে জড়িত করা চলে না। পেশায় তো কেরানি। গলাবাজ তার্কিক। অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটা যে একেবারেই অসম্ভব, এই বিষয়টা বিষম গলাবাজি করে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই প্রথম মোলাকাত ঘটে গেল অলৌকিক ব্যাপারের সঙ্গেই। তর্ক চলছিল লং ড্রাগন পানশালায়। প্রতিপক্ষ টোডি বিমিসের 'তা যা বলেছ' শব্দগুচ্ছের একঘেয়ে কশাঘাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল মি. ফোদারিনগের।

এই দু'জন ছাড়াও পানশালায় সেদিন হাজির ছিল জনৈক ধূলিধূসরিত সাইকেল-আরোহী, বাড়িওয়ালা কক্স এবং লং ড্রাগন-এর সুরা পরিবেশন করে যে মেয়েটি—মিস মেব্রিজ। তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে গেলাস ধুয়ে যাচ্ছিল আপন মনে। অন্য দুই ব্যক্তি সকৌতুকে শুনছিল ফোদারিনগের নিষ্ফল গলাবাজি। মি. বিমিসেয় নিরুত্তাপ মন্তব্য এবং নিরুত্তেজ তর্ককৌশলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে অলৌকিক ব্যাপারটাকে প্রাঞ্জল করতে প্রয়াস পেয়েছিল মি. ফোদারিনগে। বলেছিল, 'জিনিসটা আগে ভালো করে বোঝ। মিরাক্‌ল হল এমনই সব উদ্ভট আজগুবি ব্যাপারস্যাপার, যা নিত্যনৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ব্যাপারস্যাপারের ঠিক উলটো—ইচ্ছাশক্তির জোরে যে অঘটন ঘটানো চলে—বিশেষ ইচ্ছাশক্তি না থাকলে যা ঘটানো যায় না।'
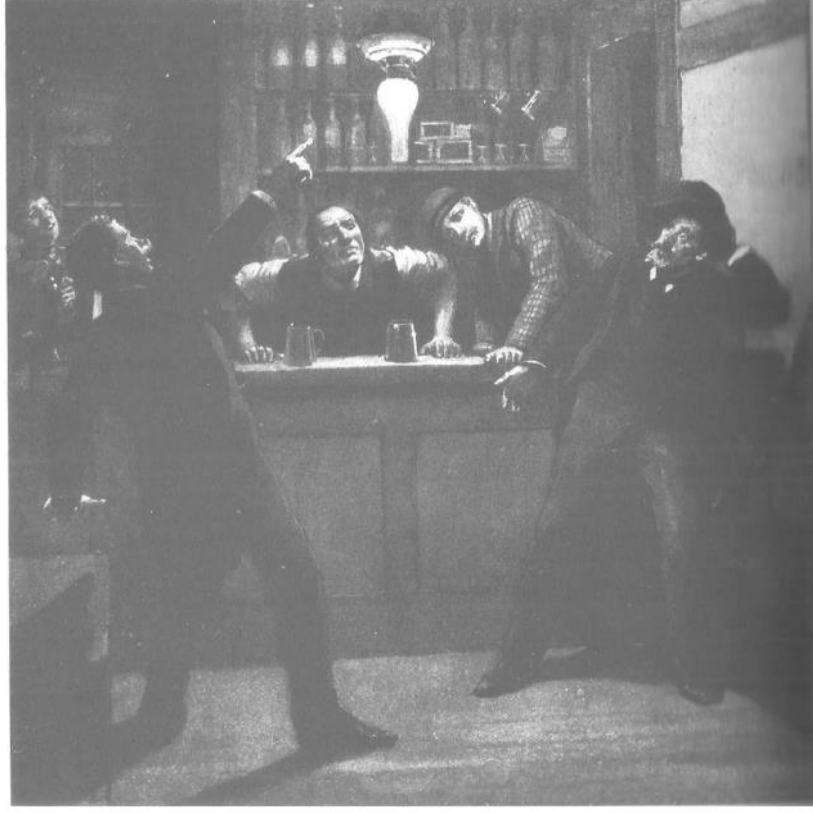
চিত্র ১৭.১ ওহে লম্ফ! উলটে যাও! শিখা নিচের দিকে থাকুক।

'তা যা বলেছ,' মি. বিমিস কুপোকাত করে দিয়েছিল তাকে আবার সেই মারাত্মক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগে।

সমর্থনের আশায় কাতর চোখে সাইকেল-আরোহীর পানে চেয়েছিল মি. ফোদারিনগে। সে ভদ্রলোক এতক্ষণ শুনেই যাচ্ছিল নীরবে। এবার সমর্থন জ্ঞাপন করল খুকখুক করে একটু কেশে এবং মি. বিমিসের পানে এক ঝলক তাকিয়ে। এসব ঝক্কিঝামেলায় নাক গলাতে মোটেই চায় না বলে, উদাসীন রয়ে গেল বাড়িওয়ালা। মি. বিমিস কিন্তু মাথা নেড়ে মির‍্যাক্‌ল সংজ্ঞা মেনে নিতেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল মি. ফোদারিনগে।

বললে বিষম উৎসাহে, 'যেমন ধর মির‍্যাক্‌ল ঘটানো যায় এইখানেই। ওই যে লম্ফটা দেখছ, ও লম্ফ কি শিখা নিচের দিকে করে কখনও জ্বলতে পারে? হ্যাঁ কি না, বলেই ফেল-না বিমিস।'

'তুমি তো বলেই দিলে—না, পারে না,' উদাসীন জবাব বিমিসের।

'আরে গেল যা! তোমার কী মনে হয়, সেটা তো বলবে।'

'না, পারে না।'

'তাহলে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করে আমিই হুকুম দিচ্ছি সোজা লম্ফকে উলটো হয়ে জ্বলতে।—ওহে লম্ফ! উলটে যাও! শিখা নিচের দিকে থাকুক—আছড়ে পড়ে ভেঙে যেয়ো না যেন!—এ কী!'

এই যে 'এ কী!' বিস্ময়োক্তি, এটা প্রত্যেকের গলা ফুঁড়ে তেড়েমেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই মুহূর্তে। কেন-না নিরেট বস্তুর জ্বলন্ত লম্ফ সহসা উলটে গিয়েছিল শূন্যে এবং মেঝের ওপর শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থেকে জ্বলন্ত ছিল নির্বিকারভাবে। প্রজ্বলন্ত শিখা সটান বিস্তৃত নিচের মেঝের দিকে! যেন অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার!

মি. ফোদারিনগে তখন কী করছে?

তর্জনী সামনে বাড়িয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছে কপালে। প্রবল চেষ্টায় যেন জড়ো করে রাখতে হচ্ছে ইচ্ছাশক্তিকে—তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটলেই আছড়ে পড়ে তুবড়ে যাবে গদ্যময় লং ড্রাগন দীপাধার। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেও শেষরক্ষা করতে পারবে না।

ফোদারিনগের ঠিক পাশে ছিল সাইকেল-আরোহী। বিপুল লম্ফ মেরে ছিটকে সরে গেল ঘরের অপর প্রান্তে। তিড়িংবিড়িং করে অল্পবিস্তর লম্ফ দিল প্রত্যেকেই। মিস মেব্রিজ ঘাড় ফিরিয়ে অলৌকিক দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেই এমন আঁ-আঁ-আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল যে, গোবরাট থেকে একটা বেড়াল ধড়াস করে পড়ে গেল মেঝেতে। লম্ফ দেওয়া দূরের কথা, এক চুলও নড়বার সাহস হল না শুধু ফোদারিনগের। নড়লেই যদি আছড়ে পড়ে অসম্ভব লম্ফ!

ঝাড়া তিনটে সেকেন্ড কাটল এইভাবে—থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে শূন্যে ঝুলে রইল লম্ফশিখা নিচের দিকে করে। ফোদারিনগে আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে। ইচ্ছাশক্তি একাগ্র করে রাখা কি চাট্টিখানি কথা! কাতরোক্তি বেরিয়ে এল কণ্ঠ চিরে।

এবং, তৎক্ষণাৎ পপাত ধরণিতলে হল অলৌকিক লম্ফ! দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। ঢং ঢং ঢং শব্দে কয়েকবার নেচে নিয়ে দপদপ করে শিখা নিবিয়ে।

গড়িয়ে গিয়ে স্তব্ধ হল ঘরের কোণে।

চিত্র ১৭.২ ঘরসুদ্ধ সবাই তাকে বেরিয়ে যেতে বলল।

ভাগ্যিস ধাতুর তৈরি তৈলাধার ছিল লম্ফে—তাই অগ্নিকাণ্ডটা ঘটল না। পুরো ঘরখানায় আগুন লেগে যেত, তৈলাধার যদি কাচের তৈরি হত। প্রথম কথা ফুটল মি. কক্সের কণ্ঠে। বিন্দুমাত্র বাগাড়ম্বর না করে ফোদারিনগে- কে আহাম্মক বলা হল কাটছাঁট ভাষায়। প্রতিবাদ করার মতো অবস্থা তখন নেই ফোদারিনগে বেচারির। বাঁইবাঁই করে ঘুরছে মাথা। ঘরসুদ্ধ লোক একমত হল তার হাতসাফাইয়ের কারবারে এবং বেরিয়ে যেতে বললে ঘর থেকে। এবংবিধ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারল না বিমূঢ় ফোদারিনগে।

বাড়ি ফিরল চোখ-মুখ লাল করে। কান গরম, মাথা ভোঁ ভোঁ। আসবার পথে দু'ধারে রাস্তার বাতিস্তম্ভগুলোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে এসেছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল চার্চ রো-স্থিত নিজস্ব খুদে কামরায় ঢোকবার পর। মোটামুটি সুস্থিত হয়ে ভাবতে বসল উদ্ভট ব্যাপারটা নিয়ে।

কোট আর বুট খুলে বিছানায় বসে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই নিয়ে সপ্তদশ সাফাই গাইল নিজের মনেই—'সত্যি সত্যিই তো চাইনি উলটে যাক হতচ্ছাড়া লম্ফ!'

কিন্তু উলটে তো গিয়েছিল মুখ দিয়ে কথাটা বার করার সঙ্গে সঙ্গে। কীভাবে যে ঘটল কাণ্ডটা, তা বিলক্ষণ ধোঁয়া ধোঁয়া ফোদারিনগের নিজের কাছেই। ইচ্ছাশক্তি

একাগ্র করার জন্যে খুব যে একটা কস্তাকস্তি করতে হয়েছিল মনের সঙ্গে, তা মোটেই নয়। মনের কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। ফট করে লম্ফ বেটাচ্ছেলে উলটে যেতেই ভীষণ দায়িত্বটা ধাঁ করে চেপে বসেছিল কাঁধে—ওলটানো অবস্থাতেই রেখে দিতে হবে হারামজাদাকে। কীভাবে—তা তো জানা ছিল না। তারপর যা যা ঘটে গেছে, তার কোনও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা ফোদারিনগের মগজে অন্তত আসছে না।

দেখাই যাক-না অঘটনটা আবার ঘটানো যায় কি না। নিষ্কল্প তর্জনী তুলে ধরেছিল ঘরের মোমবাতির দিকে। এলোমেলো মনটাকে বেঁধেছেঁদে, জড়ো করেছিল এক জায়গায়। কাজটা নেহাতই আহাম্মুকি, তা বুঝেও যাচাই করার লোভ সামলাতে পারেনি।

বলেছিল, 'বাপু হে, উঠে পড় তো শূন্যে।'

বলেই তো থ!

শূন্যে ভেসে উঠেছে মোমবাতি।

বেশ ভাসছিল নিরবলম্বভাবে। কিন্তু মি. ফোদারিনগে খাবি খেতেই ঘটল বিপত্তি। শূন্যাবস্থান পরিত্যাগ করে দড়াম করে আছড়ে পড়ল টেবিলে। অন্ধকার ঘরে কেবল দেখা গেল নিবে-যাওয়া পলতের দীপ্তি।

ক্ষণেকের জন্যে এক্কেবারে নট-নড়নচড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে তমিস্রার মধ্যে ভূতের মতো বসে ছিল মি. ফোদারিনগে।

তারপর পাঁজর-খালি-করা বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট হাতড়েছিল দেশলাইয়ের খোঁজে। পায়নি। হাতড়েছিল টয়লেট টেবিলে। সেখানেও পায়নি। তারপরেই খেয়াল হয়েছিল, মির‍্যাক্‌ল ঘটিয়ে দেশলাইও তো আনতে পারে হাতের মুঠোয়। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল বোকা-বোকা স্বরে, 'এসে যাক একটা দেশলাইয়ের কাঠি হাতের চেটোয়।'

টুপ করে কী যেন পড়েছিল হাতের চেটোয়। মুঠো পাকাতেই আঙুল চেপে বসেছিল একটা দেশলাইয়ের কাঠির ওপর।

বারকয়েক কাঠি জালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ফোদারিনগে বুঝেছিল, কাঠিটা সেফটি-ম্যাচ—তাই জ্বলছে না। ছুড়ে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ুত করে আবার একটা ইচ্ছে ঢুকে পড়েছিল মাথার মধ্যে। ইচ্ছাশক্তি দিয়েই তো জ্বালানো যায় কাঠিমহাশয়কে। তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করেছিল শক্তিটাকে—'কাঠি, জ্বল তো বাপু নিজে থেকে।' টয়লেট টেবিলের কাপড়ের ওপর দপ করে কাঠি জ্বলে উঠতেই ধড়ফড় করে তুলে নিয়েছিল ফোদারিনগে—ফলে, নিবে গিয়েছিল কাঠি।

সম্ভাবনার ক্ষেত্রটা তখন সম্প্রসারিত হয়েছিল মাথার মধ্যে। হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে বসিয়েছিল শামাদানে। বলেছিল, 'জ্বলে ওঠ তো বাপু

মোমবাতি!’ তখুনি দপ করে প্রজ্বলিত হয়েছিল মোমবাতির পলতে। সেই আলোয় ফোদারিনগে মশায় দেখেছিল, টয়লেট টেবিলের ঢাকনায় একটা ছোট্ট ফুটো-ধোঁয়া উঠছে ফুটোর কিনারা ঘিরে। ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মোমবাতির শিখায় দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল বিমূঢ় মানুষটা। অতঃপর আয়নায় দেখেছিল নিজের মুখের চেহারা এবং নিঃশব্দে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে গিয়েছিল নিজেরই প্রতিফলনের সঙ্গে।

প্রথম শব্দহীন প্রশ্নটা ছিল এই: ‘মির‍্যাক্‌ল কি একেই বলে?’

ধ্যানস্থ অবস্থায় এরপর এমনই আবোল-তাবোল প্রশ্নোত্তর চলেছিল নিজের সঙ্গে, যা রীতিমতো গোলমেলে—আরও গোল পাকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে। মোটের ওপর একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। যা কিছু ঘটছে, সবই তার নির্ভেজাল ইচ্ছাশক্তির জোরেই ঘটছে। প্রথম এক্সপেরিমেন্টগুলোয় অনেক অনর্থ ঘটানোর পর পরবর্তী পরীক্ষানিরীক্ষায় হুঁশিয়ার না হয়ে পারেনি। তবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এক তা কাগজ তুলেছিল শূন্যে, রং পালটেছিল এক গেলাস জলের প্রথমে গোলাপি, তারপর সবুজ। সৃষ্টি করেছিল একটা পুঁচকে গেঁড়ি এবং নিশ্চিহ্নও করেছিল অত্যাশ্চর্যভাবে। শূন্য থেকে একটা অত্যাশ্চর্য দাঁত-মাজা বুরুশ আনিয়েছিল নিজের ব্যবহারের জন্যে। এইসব করতে করতেই ঘড়িতে রাত একটা বাজতেই খেয়াল হয়েছিল, অত্যাশ্চর্যভাবে রোজকার কেরানিগিরির দফরফা হয়ে যেতে পারে পরের দিন, যদি-না এখুনি একটু ঘুমিয়ে নেয়। জামাকাপড় ছাড়তে গিয়ে শার্টটাকে মাথা গলিয়ে বার করার সময়ে হিমশিম খেতে খেতে হুকুম দিয়েছিল অজান্তেই —‘নিয়ে যাও আমাকে বিছানায়—’ বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল, দিব্যি লম্বমান রয়েছে খাটের ওপর। তারপর হুকুম দিয়েছিল, ‘এবার খোলা হয়ে যাক জামাকাপড়।’ পরক্ষণেই দিগম্বর অবস্থায় শীতে কাঁপতে কাঁপতে ধড়ফড় করে ঝেড়েছিল নয়া হুকুম, ‘আমার রাতের শার্ট এসে যাক গায়ে—না, না, খুব নরম মোলায়েম উলের রাত্রিবাস চাই। আঃ! কী আরাম! আসুক এবার আরামের ঘুম!...’

রোজ যে সময়ে ঘুম ভাঙে, পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল সেই সময়ে। গুম হয়ে খেয়ে গেল প্রাতরাশ। একটাই চিন্তা চরকিপাক দিচ্ছে মাথার মধ্যে। কাল রাতের উদ্ভট কাণ্ডকারখানাগুলো জলজ্যান্ত স্বপ্ন নয় তো? অনেকক্ষণ পরে ইচ্ছে হয়েছিল সাবধানে আরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করার। যেমন, তিনটে ডিম খেল ব্রেকফাস্টে। ল্যান্ডলেডির দেওয়া দুটো, তৃতীয়টা বানিয়ে নিল শূন্য থেকে। অলৌকিক হাঁসের ডিম। অনেক তাজা, অনেক সুস্বাদু ডিম পাড়া হল টেবিলে, সেদ্ধও হয়ে গেল টেবিলে এবং প্লেটে এসে পড়ল অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির দৌলতে। চাকুরিস্থলে গেল হন্তদন্ত হয়ে ভেতরের উত্তেজনাকে প্রাণপণে চেপে রেখে। সেই রাতেই ল্যান্ডলেডি

অবশ্য বিস্ময় প্রকাশ করেছিল, তৃতীয় ডিমটার খোলা টেবিলে এল কোত্থেকে, ভেবে পায়নি কিছুতেই।

অফিসের কাজ কিন্তু কিছু হয়নি সারাদিনে। তাতে কোনও অসুবিধেও হয়নি। সারাদিন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকবার পর দিনের শেষে শেষ দশ মিনিটে প্রয়োগ করেছিল বিচিত্র ইচ্ছাশক্তিকে। সারাদিনের স্তূপীকৃত কাজ সমাধা হয়ে গিয়েছিল ওই দশ মিনিটেই! দিনটা শুরু হয়েছিল অপরিসীম বিস্ময়বোধ দিয়ে—শেষ হল আত্যন্তিক উল্লাসবোধে। অতিমানুষ হওয়ার পরমোল্লাস! লং ড্রাগন পানশালা থেকে বিতাড়িত হওয়ার মূর্তিটা ওরই মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধতে লাগল মনের মধ্যে। ঘটনাটা সহকর্মীরাও শুনেছিল। তা-ই নিয়ে একটু-আধটু হাসিঠাট্টাও সহ্য করতে হল। ভঙ্গুর পদার্থ শূন্যে উত্তোলনের ব্যাপারে এখন থেকে সতর্ক থাকাই ভালো। তবে, ঈশ্বরপ্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতাটার অসীম সম্ভাবনা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে এনেছিল ফোদারিনগেকে। অন্যান্য ভেলকির ফাঁকে ফাঁকে বাড়িয়ে নিয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিও। যেমন, একজোড়া হীরকখচিত শার্টের বোতাম। শূন্য থেকে বোতামজোড়া আবির্ভূত হতে-না-হতেই সাত তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল শূন্যের মধ্যেই—একজন ছোকরা সহকর্মীকে টেবিলের দিকে আসতে দেখেই। হীরের বোতাম এল কোত্থেকে, এই নিয়ে জবাবদিহি করতে গিয়ে আবার না ফ্যাসাদে পড়তে হয়। অদ্ভুত ক্ষমতাটাকে রয়েসয়ে ভেবেচিন্তে হিসেব করে কাজে লাগানো দরকার। এমন কিছু কঠিন কৌশল অবশ্য নয়—সাইকেল চালানো শেখার মতোই। প্রথমদিকে একটু-আধটু দুর্ঘটনা ঘটেই—তারপর জল-ভাত। কিন্তু প্র্যাকটিস তো দরকার। সেটা লং ড্রাগন পানশালায় সম্ভব নয়। আবার কেলোর কীর্তি আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। তাই এল গ্যাস কারখানার পেছনে নিরিবিলি সরু গলিটায়—পাঁচজনের চোখের আড়ালে।

কিন্তু মৌলিকতা দেখাতে পারেনি নিরিবিলি প্র্যাকটিসেও। ইচ্ছাশক্তির বলে বলীয়ান হলেও, মানুষ হিসেবে তো ফোদারিনগে অতিশয় মামুলি টাইপের। একবার ভাবল, হাতের ছড়িটাকে বিষধর সাপ বানালে কেমন হয়? তারপর? এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে অলৌকিক সর্পমহাশয়কে বাগে রাখবে কে? অনর্থ ঘটিয়ে বসবে যে। তার চাইতে বরং ছড়িটাকে বলা যাক ফুলের গাছ হয়ে যেতে।

হুকুমটা মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই ফুটপাতের কিনারায় গজিয়ে উঠল ভারী সুন্দর ফুলের ঝোপ। ঠিক এই সময়ে কানে ভেসে এসেছিল ভারী বুটের শব্দ। সর্বনাশ! মির‍্যাক্‌লের জবাবদিহি করতে হলেই তো গেছে ফোদারিনগে! সাত তাড়াতাড়ি হুকুম দিয়েছিল ফুলের গাছকে—'দূর হ!'

চিত্র ১৭.৩ সাত তাড়াতাড়ি হুকুম দিয়েছিল ফুলের গাছকে—'দূর হ!'

বলা উচিত ছিল—'ছড়ি হ'! কিন্তু হুটোপাটি করতে গিয়ে বেমক্কা হুকুমটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে। বাস! সাঁই সাঁই করে ভীষণ গতিবেগে দূরে চলে গিয়েছিল ফুল-ধরা ছড়ি এবং ক্রুদ্ধ গালাগাল ভেসে এসেছিল দূর থেকে। চলমান ফুল-ছড়ি দমাস করে আছড়ে পড়েছে আগুয়ান পুরুষটার গায়ে। 'কে রে বেল্লিক! ছড়ি ছোড়ার এই কি জায়গা? থুতনিটা যে আর-একটু হলে খসে যেত!'

চিত্র ১৭.৪ পুলিশের ওপর হাঙ্গামা? ফাটকে ঢোকার শখ হয়েছে বুঝি?

'সরি', বলেই আরও ঘাবড়ে গিয়ে গোঁফে তা দিতে শুরু করেছিল ফোদারিনগে কনস্টেবল উইঞ্চকে আসতে দেখে।

ফোদারিনগেকে দেখেই চিনতে পেরেছিল উইঞ্চ। জখম থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে সে কী ঝাঁপাই! লং ড্রাগন পানশালায় লম্ফ তোবড়ানোর পর আবার কী নষ্টামি আরম্ভ হল অন্ধকার গলিতে? বলি, ব্যাপারটা কী? পুলিশের ওপর হাঙ্গামা? ফাটকে ঢোকার শখ হয়েছে বুঝি? চুপ কেন? অ্যাঁ?

আমতা আমতা করে বলতে গিয়েছিল ফোদারিনগে, মির‍্যাক্‌লের জন্যেই নাকি ঘটছে এইসব অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার। কিন্তু মুখ দিয়ে 'মির‍্যাক্‌ল' শব্দটা বেরতে-না-বেরতেই তেড়ে উঠেছিল কনস্টেবল উইঞ্চ।

সর্বনাশ! গুপ্ত রহস্য আর তো গুপ্ত থাকবে না! এখুনি শুরু হবে পুলিশি জেরা। নিজের ওপরেই বিষম রাগ হয়ে গিয়েছিল ফোদারিনগের। উইঞ্চের তড়পানিরও ইতি করা দরকার। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'কান ঝালাপালা করে দিলে দেখছি। মির‍্যাক্‌ল দেখতে চাও তো? বেশ তো, দেখে যাও একটু হাতসাফাইয়ের ভেলকি! হেডস যাও—এখুনি!'

বাস, ফুটপাতে আবার একা হয়ে গিয়েছিল ফোদারিনগে!

সে রাতে আর মির‍্যাক্‌ল ঘটায়নি অঘটন ঘটানোর আজব মানুষটা। ফুলে ফুলে ভরে-ওঠা ছড়িটার অবস্থা কী হল, তা নিয়েও আর মাথা ঘামায়নি। ফিরে এসেছিল শহরে। ভয়ে ভয়ে, এক্কেবারে ঠান্ডা মেরে। মুখে আর কথাটি নেই। নিঃশব্দে ঢুকেছিল নিজের শোবার ঘরে। তারপর শুরু হয়েছিল স্বগতোক্তি, 'জয় ভগবান! এ কী ক্ষমতা দিলে আমাকে! হুকুমের এত জোর? কল্পনাও করা যায় না! হেডস জায়গাটা কেমন, তা-ও তো ছাই জানি না।'

খাটে বসে পায়ের বুট খুলতে খুলতে এবং নিজের মনে বকবক করতে করতে শেষকালে কিন্তু বিলক্ষণ সুখীই হয়েছিল নচ্ছার কনস্টেবলটাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাচার করার সুখচিন্তায়। কীভাবে পাচার হল হতভাগা এবং তারপর কী কী ঘটবে, সেসব নিয়েও আর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করেনি। শুতে-না-শুতেই সে কী ঘুম! ঘুমের মধ্যে অবিশ্যি স্বপ্ন দেখেছিল উইঞ্চকে—রেগে তিনটে হয়ে এই মারে কি সেই মারে অবস্থায় তেড়ে আসছে—কিন্তু নাগাল ধরতে পারছে না ফোদারিনগের!

পরের দিন দুটো কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ শ্রবণ করল অঘটন ঘটনবাজ ফোদারিনগে। কে নাকি অতীব সুন্দর একটা গোলাপ ফুলের গাছ পুঁতে গেছে লুলাবরো রোডে বুড়ো গামশটের বাড়ির ঠিক সামনেই। আর, রলিং মিল পর্যন্ত নদীতে জাল ফেলা হচ্ছে কনস্টেবল উইঞ্চের মরদেহের সন্ধানে।

সেদিন বড়ই অন্যমনস্ক ছিল ফোদারিনগেমশায়। নতুন কোনও মির‍্যাক্‌ল ঘটায়নি। উইঞ্চের জন্যে বড় মন কেমন করছিল। তাই তার নিত্যব্যবহার্য দু'-একটা জিনিস আর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্যে সামান্য কিছু খাবারদাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল হুকুমের জোরে—তার বেশি কিছু নয়। মাথার মধ্যে হাজার চিন্তা ভোমরার মতো গুনগুন করে ঘুরপাক খাওয়া সত্ত্বেও দৈনিক কাজে ত্রুটি রাখেনি কোত্থাও। লোকে অবশ্য তা-ই নিয়েও হাসি-মশকরা করেছে। কী জ্বালা, কী জ্বালা! ফোদারিনগে কেন এত অন্যমনস্ক, কেন এত চুপচাপ—তা নিয়ে তোমাদের অত ইয়ারকি মারবার দরকারটা কী শুনি? ভাগ্য ভালো, উইঞ্চের চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল ফোদারিনগে—নইলে অনর্থর পর অনর্থ ঘটে যেত সেইদিনই। রেগেমেগে যদি কাউকে বলে বসত, 'গোল্লায় যাও, জাহান্নমে যাও!'—তাহলে কী কাণ্ডটা হত বলুন তো? নরক জায়গাটা নিশ্চয় খুব আহামরি নয়!
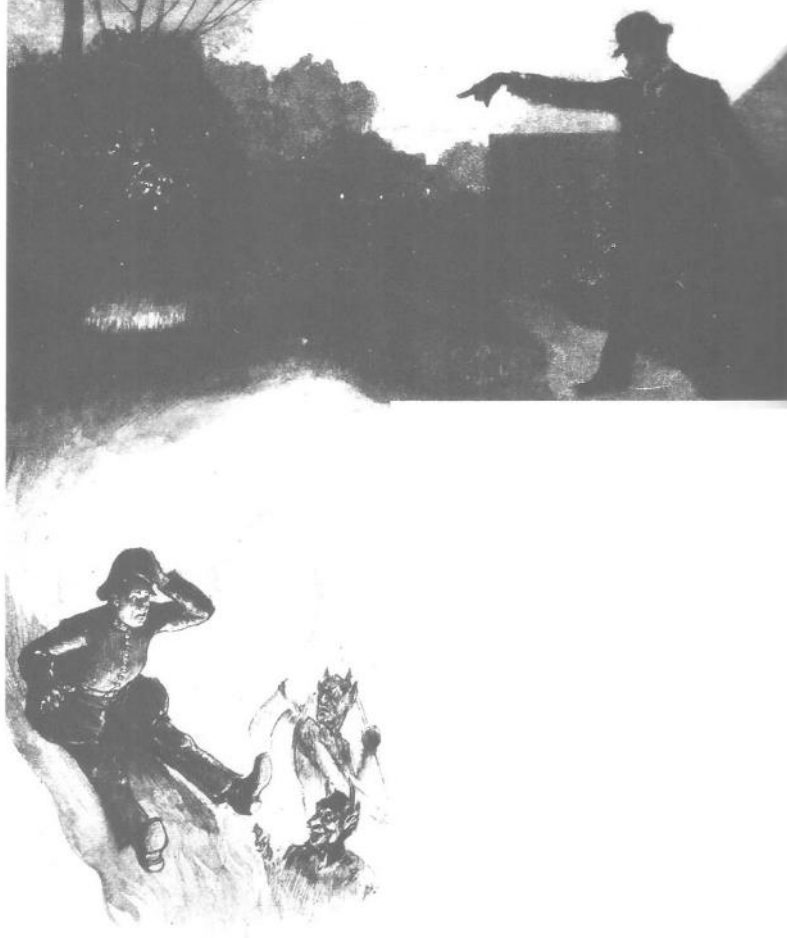
চিত্র ১৭.৫ 'গোল্লায় যাও, জাহান্নমে যাও!'

রোববার সন্ধ্যা নাগাদ গির্জাতে গেল ফোদারিনগে মনের জ্বালা জুড়াতে। কী আশ্চর্য! ঠিক সেইদিনই অলৌকিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বিশপমশাই। নাম তাঁর মি. মেডিগ। গুপ্তবিদ্যায় তাঁর আগ্রহ ছিল বরাবরই। আইনকানুন যেসব ব্যাপারকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে শাসনে রাখে, সেইসব ব্যাপার নিয়েই অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। কান খাড়া করে শুনে গেল ফোদারিনগে। গির্জাতে নিয়মিত সে আসে না। যেদিন এল, সেইদিনই কিনা মনের মতো বক্তৃতা! শুনে প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। ঈশ্বরদত্ত অলৌকিক ক্ষমতাটা সম্বন্ধে নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হল বিহ্বল মনের আকাশে। ঠিক করল, বক্তৃতা শেষ হলেই দেখা করবে মি. মেডিগের সঙ্গে।
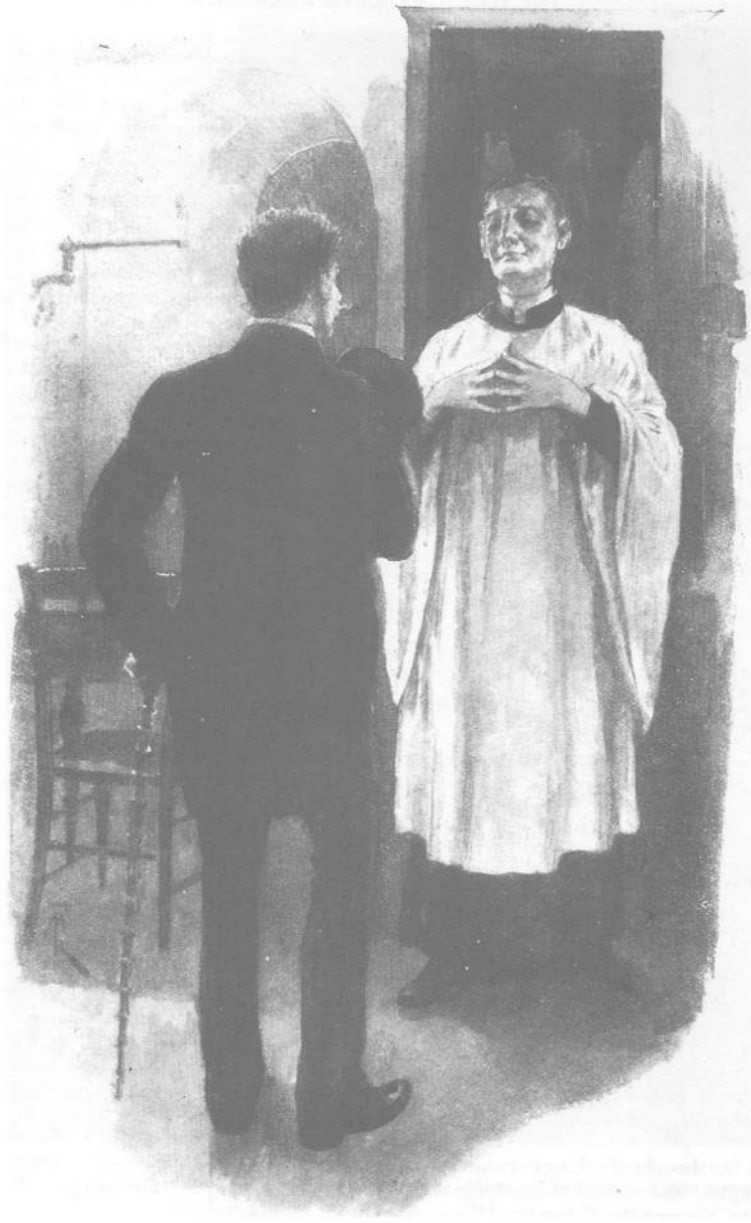
চিত্র ১৭.৬ —'বলুন তো, মির‍্যাক্‌ল সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?'

ফোদারিনগের নাস্তিকতা অবিদিত ছিল না শহরে। ভগবান-টগবান একেবারেই মানে না, ধর্ম জিনিসটা নিয়ে ফক্কুড়ি করে। এহেন ছোকরা হঠাৎ কথা বলতে চায় নিরিবিলিতে—শুনে বিলক্ষণ অবাক হয়েছিলেন মি. মেডিগ। তাই সঙ্গে সঙ্গে দেখা করেননি। হাতের কাজকর্ম সেরে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাইভেট কক্ষে। চুল্লির সামনে বসিয়ে নিজে দাঁড়ালেন দু'পা ফাঁক করে—খিলানের মতো ফাঁক-করা পদযুগলের ছায়া পড়ল বিপরীতদিকের দেওয়ালে। আত্মকাহিনি বলতে গিয়ে কিন্তু প্রথমদিকটায় লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল ফোদারিনগে। শুরু করবে কীভাবে, তা-ই

নিয়েই পড়েছিল মহাবিড়ম্বনায়। জানি না আদৌ বিশ্বাস করবেন কি না জাতীয় দু'-একটা বাক্য নিঃসরণের পর আচমকা শুধিয়েছিল মি. মেডিগকে—'বলুন তো, মির‍্যাক্‌ল সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?'

আচমকা প্রশ্ন শুনে জবাব দিতে একটু টালবাহানা করেছিলেন মি. মেডিগ। কিন্তু চেপে ধরেছিল ফোদারিগে—'নেহাতই সাধারণ মানুষ আমি, দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু আমার মতোই গোবেচারা একটা সত্তার ভেতরে যদি আচমকা ইচ্ছাশক্তি মাথাচাড়া দেয়, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, তখন আপনার কী মনে হবে বলুন তো?'

'অমন হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়,' কায়দা করে জবাব দিয়েছিলেন মি. মেডিগ।

টেবিলের ওপর তামাকের বয়েমটা দেখিয়ে বলেছিল ফোদারিনগে, 'হাতেনাতে দেখিয়ে দিতে চাই, একেই মির‍্যাক্‌ল বলে কি না। আধ মিনিট সবুর করুন—প্লিজ।'

বলে, কপাল কুঁচকে তাকিয়েছিল তাম্রকূট আধারের দিকে। আঙুল তুলে হুকুম দিয়েছিল বিড়বিড় করে, 'হও তো বাপু ভায়োলেট ফুল।'

তা-ই হয়েছিল তামাকের বয়েম। পরিবর্তনটা ঘটেছিল সহসা এবং দারুণভাবে চমকে দিয়েছিল মি. মেডিগকে। ফ্যালফ্যাল করে পর্যায়ক্রমে চেয়ে ছিলেন ফোদারিনগে এবং ফুলের তোড়ার পানে। মুখে একটা কথাও বলেননি। তারপর হেঁট হয়ে ঘ্রাণ নিয়েছিলেন ফুলের। টাটকা ফুল। যেন এখুনি তুলে আনা হয়েছে বাগান থেকে।

চেয়েছিলেন ফোদারিনগের দিকে—'কী করে করলেন বলুন তো?'

গোঁফে টান মেরে বলেছিল ফোদারিনগে, 'সেইটাই জানতে এসেছি। যা দেখলেন তা কি মির‍্যাক্‌ল, না ডাকিনীবিদ্যা? হুকুম দিয়ে অঘটন ঘটাতে পারি—দেখতেই পেলেন। কী মনে হয় আমাকে? প্রশ্ন সেইটাই—এসেছি জবাবটা জানতে।'

'খুবই অসাধারণ কাণ্ড।'

'অথচ দেখুন, এই সেদিনও এ ক্ষমতা আমার ছিল না। ইচ্ছে করলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারতাম না। গত হপ্তায় ছিলাম সাধারণ মানুষ—এখন হলাম অসাধারণ। আচমকা ক্ষমতাটা এসে গেছে ভেতরে। কোথাও একটা গোলমাল ঘটেছে, ইচ্ছাশক্তিটা হঠাৎ এমন জোরদার হয়ে উঠেছে।'

'এ ছাড়াও আরও কিছু করতে পারেন নাকি?'

'বলেন কী! যা খুশি তা-ই করতে পারি।' একটু ভাবতেই অনেকদিন আগে দেখা একটা ভোজবাজি মনে পড়ে গিয়েছিল ফোদারিনগের, তর্জনীশাসনে হুকুম দিয়েছিল ফুলের তোড়াকে—'মাছ হয়ে যাও—না, না, লাল মাছ ভরতি গামলা হয়ে যাও—কাচের গামলা। বাঃ, এই তো চাই! দেখলেন?'

'আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য! আপনি... আপনি...'

'যা ইচ্ছে বলব, ঠিক তা-ই হবে। দেখবেন?—ওহে মাছের গামলা, পায়রা হও তো বাপু!'

পরক্ষণেই ঘরময় উড়ে বেড়িয়েছিল একটা নীল রঙের পায়রা। গোঁত খেয়ে খেয়ে গায়ের ওপর আছড়ে পড়া পাশ কাটিয়ে গেছেন মি. মেডিগ। দেখে, আবার হুকুম ঝেড়েছিল ফোদারিনগে। পায়রা নিশ্চল হয়ে ভেসেছিল শূন্যে। আবার হুকুম দিতেই পায়রা ফিরে এসেছিল টেবিলে ফুলের তোড়া হয়ে। পরের হুকুমেই দেখা গিয়েছিল কোথায় ফুলের তোড়া—এ যে সেই তামাকের বয়েম—মি. মেডিগের অতিপ্রিয় নেশার বস্তু।

শেষের দিকের মির‍্যাক্‌লগুলো নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছিলেন মি. মেডিগ। তামাকের বয়েম পুনরাবির্ভূত হওয়ার পর দ্বিধাগ্রস্তভাবে তুলে নিয়ে পরখ করে ফের নামিয়ে রেখেছিলেন টেবিলে। 'বাঃ।' বিস্ময়োক্তি ছাড়া আর কোনও শব্দ নিঃসৃত হয়নি বদনগহ্বর থেকে। ফোদারিনগে তখন নিবেদন করেছিল লং ড্রাগন পানশালার লম্ফকাণ্ড থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ঘটনা। তৃতীয় ডিমের আবির্ভাব পর্যন্ত শুনেই হাত বাড়িয়ে মি. মেডিগ বাধা দিয়েছিলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে—'সম্ভব! সম্ভব! যদিও অসম্ভব। যদিও অবিশ্বাস্য! তবুও বলব, এসবই সম্ভব। কতকগুলো ভজঘট ব্যাপার অবশ্য থেকে যাচ্ছে, সমস্যার জট আরও বাড়ছে। যেমন, এ ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মধ্যে এতদিন কখনও দেখা যায়নি। মির‍্যাক্‌ল ঘটানোর ক্ষমতা পরমকারুণিক তাঁদেরই দেন, যাঁরা মানুষ হিসেবে আর পাঁচজনের মতো নয়। যেমন মহম্মদ, ভারতের যোগীরা, মাদাম ব্লাভাটস্কি, আরগিলের ডিউক। কদাচিৎ এই ক্ষমতা পায় অসাধারণ প্রকৃতির মানুষরাই—প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ভেতরে যে আরও গূঢ় নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে—তখনই বোঝা যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি চালিয়ে যান—চালিয়ে যান!'

চিত্র ১৭.৭ পরক্ষণেই ঘরময় উড়ে বেড়িয়েছিল একটা নীল রঙের পায়রা।

চালিয়েই গিয়েছিল ফোদারিনগে। উইঞ্চকে ক্যালিফোর্নিয়া পাচারের কাহিনি বর্ণনা করার পর বিষণ্ণ কণ্ঠে জানিয়েছিল, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইচ্ছাশক্তিটা প্রয়োগ করে ফেলায় ঘটেছে এই বিপত্তি। উইঞ্চকে সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায় অত তাড়াতাড়ি উড়িয়ে নিয়ে ফেলার আদৌ তার বাসনা ছিল না। কিন্তু এমন ঝাঁপাই জুড়েছিল সে, ঝোঁকের মাথায় কী বলতে কী বলে ফেলেছে। আসলে, কী বলা উচিত, আর কী বলা উচিত নয়—এই ব্যাপারটাই বারবার গুলিয়ে ফেলছে ফোদারিনগে। এই যেমন দেখা গেল মাছের গামলার ব্যাপারে। শুধু একখানা মাছ চেয়ে বসল, কিন্তু চাওয়া উচিত ছিল মাছের গামলা, শুধু গামলা নয়, কাচের হওয়া চাই! হুকুম দিতে-না-দিতে তা এত তাড়াতাড়ি ফলে যাচ্ছে যে, হুকুম ফিরিয়ে নেওয়ারও সময় পাওয়া যাচ্ছে না। উইঞ্চকে ফিরিয়ে আনাও তো এখন সম্ভব নয়। সে অবশ্য ফিরে আসতেই চাইছে। কয়েক ঘণ্টা অন্তর তা খেয়াল হতেই ফোদারিনগে নয়া হুকুম ছেড়ে তাকে ফিরিয়ে

দিচ্ছে পূর্বাবস্থায়, স্রেফ আত্মরক্ষার তাগিদে। উইঞ্চ অবশ্য তা বুঝতেও পারছে না। হয়তো প্রতিবার ট্রেনের টিকিট কাটার পয়সা জলে যাচ্ছে, বিরাট লোকসান হয়েই চলেছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করারও তো নেই ফোদারিনগের। ধাঁ করে এতটা পথ চক্ষের নিমেষে উড়ে যাওয়ার ফলে বাতাসের ঘষটানিতে হয়তো জামাকাপড় ঝলসে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার পুলিশ উঞ্চ আকৃতির উইঞ্চকে নিশ্চয় গারদে পুরে রেখেছে। সম্ভাবনাটা মনে হতেই ফোদারিনগে অবশ্য একপ্রস্থ জামাকাপড়ের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তিটাকে ঠিকমতো প্রয়োগ করা নিয়ে। হুটপাট কথা বলে ফেলায় এই যে ডাইনিদের মতো, অথবা অপরাধীদের মতো কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলছে ফোদারিনগে, এর জন্যে মরমে মরে রয়েছে সে।

শুনতে শুনতে ভয় ভেঙে গিয়েছিল মি. মেডিগের। অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ফোদারিনগেকে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, আশ্চর্য এই শক্তিকে ডাকিনীবিদ্যা বলা যায় না কোনওমতেই, অপরাধের গন্ধও নেই এর মধ্যে। খাঁটি মির‍্যাক্‌ল বলতে যা বোঝায়, এ হল তা-ই।

প্রশস্তি শুনেও বিষাদ কাটেনি ফোদারিনগের। উইঞ্চকে কোনওরকম ঝঞ্ঝাট না পাকিয়ে ফিরিয়ে আনা যায় কীভাবে, এই সমস্যাই তুলে ধরেছিল বারবার। মি. মেডিগ কিন্তু উইঞ্চ-সমস্যা নিয়ে তখনকার মতো মাথা ঘামাতে চাননি। ফোদারিনগের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষটাকে নিয়ে আগে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। আশ্চর্য এই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা দরকার। ক্ষমতাটা যে অপরিসীম, তা তো দেখাই যাচ্ছে। অনেক অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটানো যায় এই ক্ষমতা দিয়ে, আগে সেইগুলোই দেখা যাক। তারপরে এইভাবেই শুরু হয়ে গেল অবিশ্বাস্য কার্যপরম্পরা। শুরু হল গির্জার ঠিক পেছনেই মি. মেডিগের নিরিবিলি কক্ষে, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর রবিবার রাত্রে। মি. মেডিগ প্রেরণা এবং উৎসাহ জুগিয়ে গেলেন এবং ফোদারিনগে মির‍্যাক্‌ল-এর পর মির‍্যাক্‌ল ঘটিয়ে চলল। তারিখটার দিকে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে বিশেষভাবে। এই কাহিনির কিছু অংশ আপত্তিকর মনে হতে পারে তাঁদের কাছে। কাগজে কিছু কিছু বিবরণ বেরিয়েছিল, পড়েও থাকতে পারেন। যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মারাও হয়তো গিয়েছিলেন বছরখানেক আগে। কাহিনি পড়তে পড়তেই যে কোনও সুস্থ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক অথবা পাঠিকা বুঝতে পারবেন, ঘটনাগুলো দুর্ঘটনা হলেও অপ্রত্যাশিত নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। কাহিনিও শেষ হয়ে গেল, এমন ধারণাও করে বসবেন না দয়া করে। বরং বলা যেতে পারে, এই তো সবে জমে উঠল কাহিনি। দুই অলৌকিক ঘটনাবাজ পরমোৎসাহে নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে গোড়ার দিকে যেসব অলৌকিক ঘটনাগুলো

ঘটিয়েছিল, তা নিতান্তই মামুলি এবং বৈচিত্রহীন, ছোট ছোট মির‍্যাক্‌ল। থিয়োসফিস্টদের মির‍্যাক্‌লের মতোই অকিঞ্চিৎকর, শূন্য থেকে কাপ-ডিশ আনা অথবা বারান্দা সাজানোর জিনিসপত্র বানিয়ে নেওয়ার মধ্যে পিলে-চমকানো ব্যাপার না থাকলেও মি. মেডিগের পিলে চমকে গিয়েছিল প্রতিবারেই। ফোদারিনগে যতবারই উইঞ্চ-ঘটিত ব্যাপারটার সুচারু নিষ্পত্তি চেয়েছে, ততবারই বাধা দিয়ে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন মি. মেডিগ। ডজনখানেক এই ধরনের ছোটখাটো অলৌকিক ঘটনাবলি সংঘটিত করার পর একটা সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল মি. মেডিগের।

রাত তখন এগারোটা। অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ঠেলায় খাবার কথা একদম খেয়াল নেই। খেয়াল হল পেট চুঁইচুঁই করতেই। অথচ খাবার যার আনার কথা, সেই মহিলাটির টিকি দেখা যাচ্ছে না। দায়িত্বজ্ঞানহীনা, কাণ্ডজ্ঞানহীনা এই মহিলার ওপর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন মি. মেডিগ। বরাবরই কাজে ফাঁকি দিয়ে অভ্যস্ত। কিছুতেই বাগে আনতে পারেননি তিনি। খিদে মিটিয়ে দিয়েছিল ফোদারিনগে অতি সহজেই। অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপকতর প্রয়োগের সম্ভাবনাটা মাথায় এসে গিয়েছিল পেট চনমন করতেই। অর্ডার দিতেই শূন্য থেকে রাজসিক খানার পর খানা এসে গিয়েছিল টেবিলে। যার যেটা খেতে এবং পান করতে ভালো লাগে—ঠিক সেই সেই খাদ্য এবং পানীয় হাজির হতেই দু'জনেই বীরবিক্রমে সেসব আক্রমণ করেছিল সবার আগে। তারিয়ে তারিয়ে রসাস্বাদন করার পর আবার মগজ খুলে গিয়েছিল ফোদারিনগের। আরও ভালোভাবে অলৌকিক ক্ষমতাটাকে কাজে লাগানোর উৎকৃষ্ট একটা মতলব এসে ছিল মাথায়। প্রস্তাবটা শুনে তো প্রথমে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন মি. মেডিগের মতো পরমোৎসাহী পুরুষও। এ কাণ্ড যদি সম্ভব হয় তাহলে সমাজ-সংসারের ভোল ফিরিয়ে দেওয়া যাবে যে!—না হওয়ার কী আছে? জিদ ধরেছিল ফোদারিনগে, হুকুম দিয়েছিল নিজের ইচ্ছানুযায়ী।
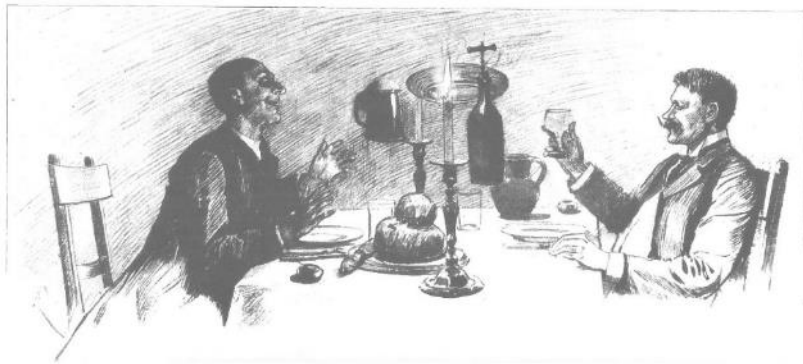
চিত্র ১৭.৮ অর্ডার দিতেই শূন্য থেকে রাজসিক খানা এসে গিয়েছিল টেবিলে।

বিচিত্র হুকুম নিঃসন্দেহে। হাউসকিপারের মতিগতি যাতে এখন থেকে পালটে যায়, ঘরকন্নায় নজর দেয়, কাণ্ডজ্ঞান যেন ফিরে আসে... ইত্যাদি... ইত্যাদি। হুকুমের ফোয়ারা ফুরানোর আগেই অদ্ভুত আওয়াজের পর আওয়াজ শোনা গিয়েছিল ওপরতলায়। ধড়মড়িয়ে দৌড়েছিলেন মি. মেডিগ। ফিরে এসে চোখ বড় বড় করে বলেছিলেন, 'আজব কাণ্ড! নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল মেয়েটা। ঘুমের মধ্যেই ইচ্ছাশক্তি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে! তোবা! তোবা!'

'না করার কী আছে?' প্রতিবাদের সুরে বলেছিল ফোদারিনগে—'জাগরণে-স্বপনে সবসময় কার্যকর হবেই আমার ইচ্ছাশক্তি।'

'ব্র্যান্ডি খেয়ে ঘুমাচ্ছিল মশায় নাক ডাকিয়ে। সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে ঘুমন্ত অবস্থাতেই। ঘুম থেকে উঠেই লুকানো এক বোতল ব্র্যান্ডি বার করে আছড়ে ভেঙেছে... এখন জ্বলছে অনুতাপে। তোবা! তোবা! তোবা!'

'এবার তাহলে উইঞ্চের ব্যাপারটা—'

'রাখুন আপনার উইঞ্চের ব্যাপার! আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ কী আশ্চর্য ক্ষমতা পেয়েছেন আপনি! সীমাহীন সম্ভাবনা... যতই দেখছি, ততই হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি। শুনবেন, আরও কী কী করা যায় আপনাকে দিয়ে?'

বলেই সম্ভবপর অলৌকিক ঘটনাবলির ফিরিস্তি শোনাতে শুরু করে দিয়েছিলেন মি. মেডিগ—উইঞ্চকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে আনার কথায় কানই দেননি। শুধু মুখে কথা নয়, হাতেনাতে কাজও আরম্ভ করে দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ—অবশ্যই ফোদারিনগে বেচারির সহযোগিতায়। শিকেয় তোলা রইল ফোদারিনগের আসল সমস্যা। দুই মূর্তিমান অত রাতে বেরিয়ে পড়েছিল শহরময় চরকিপাক দিয়ে শহরের ভোল ফেরানোর অসম্ভব দায়িত্ব নিয়ে। ঘটেছিল বিস্ময়কর পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। কনকনে শীতের রাতে নিথর চাঁদের নিপলক চাহনির নিচে দেখা গিয়েছিল দুই অলৌকিক ঘটনাবাজকে। হাত-মুখ নেড়ে বিষম ফুর্তিতে আটখানা হয়ে পরিবর্তনের প্ল্যান ঝেড়ে যাচ্ছেন মি. মেডিগ—প্ল্যানমাফিক অদ্ভুত অদ্ভুত ফরমাশ দিয়ে যাচ্ছে ফোদারিনগে। প্রথম প্রথম হুকুম দেওয়ার সময়ে যেটুকু দ্বিধা বা লজ্জা ছিল—এখন তা তিরোহিত হয়েছে। এখন রোমাঞ্চ-উল্লাসে মাথার চুল খাড়া হয়ে রয়েছে বললেই চলে। একরাতেই পার্লামেন্টারি ডিভিশনের সব ক'টা মাতালের মদ্যাসক্তির নিবারণ ঘটিয়েছিল এই দু'জনে এবং জলে রূপান্তরিত করেছিল সব ক'টা পানশালার বিয়ার আর অ্যালকোহল (এই বিষয়টিতে প্রবল আপত্তি করেছিল অবশ্য ফোদারিনগে—কিন্তু তুড়ি মেরে সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়েছিলেন মি. মেডিগ)। রেলপথের বিস্তর উন্নতিও ঘটিয়েছিল দুই নিশাচর। ফ্লিনডারের জলাভূমি থেকে বার

করে দিয়েছিল সমস্ত জল আর কাদা। ওয়ান ট্রি হিল-এর মাটির উৎকর্ষসাধনও করে ছিল দু'জনে। সেই সঙ্গে অদৃশ্য করেছিল পল্লি-পুরুতের ছিনেজোঁক আঁচিল। সাউথ ব্রিজের জখম জেটি মেরামতের মতলব নিয়ে হনহন করে যেতে যেতে রুদ্ধশ্বাসে মি. মেডিগ যখন বলছেন, 'কাল থেকে এ জায়গা চেনা যাবে না—পিলে চমকাবে প্রত্যেকেরই—কৃতজ্ঞতায় গদগদ থাকবে চিরটা কাল—' ঠিক তখনই ঢং-ঢং-ঢং করে রাত তিনটে বেজেছিল গির্জার ঘড়িতে।

থমকে গিয়েছিল ফোদারিনগে—'সর্বনাশ!' এখন যে বাড়ি না ফিরলেই নয়। সকাল আটটা বাজলেই তো শুরু হবে কাজের রুটিন। বাড়িউলি মিসেস উইমসও যা খাণ্ডারনি—'

অসীম শক্তির কৃপায় মি. মেডিগ তখন মিছরির মতোই মিষ্টি হয়ে গিয়েছিলেন। সুমিষ্ট বচনে উদাত্ত কণ্ঠে তাই বলেছিলেন, 'সে কী! এই তো কলির সন্ধে! সবে তো শুরু। দশের মঙ্গল করায় কত মজা পাচ্ছেন, সেটা বলুন? কাল ঘুম থেকে উঠে সবাই যখন দেখবে—'

'কিন্তু—'

আচমকা ফোদারিনগের বাহু খামচে ধরেছিলেন মি. মেডিগ। জ্বলজ্বল করে উঠেছিল দুই চক্ষু—'তাড়াতাড়ি কীসের ভায়া?' বলেই আঙুল তুলে মধ্যগগনের চাঁদ দেখিয়ে নিঃসরণ করেছিলেন একটাই শব্দ--'জোশুয়া!'

'জোশুয়া?' ফোদারিনগে তো ভ্যাবাচ্যাকা। মুশার উত্তরাধিকারী হিব্রু নায়ক জোশুয়ার কথা উঠছে কেন?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোশুয়া! থামান চাঁদকে!'

চোখ তুলে চাঁদের পানে চেয়েছিল ফোদারিনগে।

উত্তাল উচ্ছ্বাসে ক্ষণিক বিরতি দিয়ে বলেছিল শেষকালে, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'বাড়াবাড়ি আবার কীসের?' তেড়ে উঠেছিলেন মি. মেডিগ। চাঁদ থামে না ঠিকই। আপনি থামিয়ে দিন পৃথিবীর বনবন করে লাট্টুর মতো পাক খাওয়াটা। তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে সময়। ক্ষতি তো কারও করছি না।

'তা মন্দ বলেননি!' গোঁফে তা দিতে দিতে বলেছিল ফোদারিনগে। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। 'বেশ, তাহলে চেষ্টা করেই দেখা যাক।'

বলা বাহুল্য, হুকুমটা মামুলি হুকুম নয়। এত বড় হুকুম দিতে গেলে নিজেকে আগে তৈরি করা দরকার। এই মুহূর্তে ফোদারিনগের ইচ্ছাশক্তি অবশ্য ফ্যালনা নয়, তাহলেও পৃথিবীর আবর্তন স্তব্ধ করতে হলে পুরো ইচ্ছাশক্তিটাকে কথার হুকুমের মধ্যে জড়ো করা দরকার। তাই আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিল ফোদারিনগে।

কোটের বোতাম এঁটে নিয়ে ধরিত্রীকে উদ্দেশ্য করে সাধ্যমতো আত্মবিশ্বাস কণ্ঠস্বরে ঢেলে দিয়ে বলেছিল, 'ওহে পৃথিবী, বন্ধ কর আবর্তন।'

পরক্ষণেই, ধাঁ করে শূন্যপথে ডিগবাজি খেতে খেতে ছিটকে গিয়েছিল মিনিটে ডজন ডজন মাইল গতিবেগে। সেকেন্ডে অগণিত চক্রাবর্ত রচনা করা সত্ত্বেও চিন্তা করার মতো ক্ষমতাটা লোপ পায়নি ফোদারিনগের। চিন্তার মতো জিনিস আর আছে? কখনও তরল পিচের মতো ঘোলাটে থকথকে, আবার কখনও আলোর মতো ঝকঝকে চকিত। তাই একটা সেকেন্ডের মধ্যেই চিন্তাকার্য সমাপন করে নিয়ে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিল ফোদারিনগে এইভাবে—'সব ক'টা হাড় আস্ত অবস্থায় যেন নিরাপদে নামতে পারি। যা-ই ঘটুক-না কেন, আস্ত শরীরখানাকে দেখে-শুনে ভালো জায়গায় নামিয়ে দাও।'

মোক্ষম সময়েই ইচ্ছাশক্তি জাহির করেছিল ফোদারিনগে, আর এক পলক দেরি হলেই জ্বলে যেত নিজেই। বাতাসের মধ্যে দিয়ে অত জোরে ধেয়ে গেলে জামাকাপড় ঝলসে তো যাবেই। মুখ থেকে হুকুমটা খসতে-না-খসতেই হুড়ুম করে নেমে এসেছিল মোটামুটি ভদ্রস্থভাবেই ঢিপির আকারে রাখা সদ্য-খোঁড়া নরম মাটির ওপর। দমাস করে নামলেও চোট লাগেনি মোটেই, হুকুমই যে ছিল তা-ই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক পাশেই প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়েছিল একতাল ধাতু-ইট-কাঠ-পাথর, বস্তুপিণ্ডটার সঙ্গে অসাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে বাজার চত্বরের ঘড়ি-মিনারের। মাটিতে পড়েই ঠিকরে গিয়েছিল ফোদারিনগের মাথার ওপর দিয়ে এবং বোমার মতো ফেটে গিয়ে ইট-কাঠ-পাথর হয়ে ছিটকে গিয়েছিল দিকে দিকে। মস্ত একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর কোত্থেকে দড়াম করে এসে পড়ল একটা উড়ন্ত গোরু এবং নিমেষমধ্যে পিণ্ডি পাকিয়ে গেল ডিমের মতোই। দুমদাম ধড়াম-ধাম, আওয়াজের পর আওয়াজে ফোদারিনগের মাথা তখন বনবন করে ঘুরছে। জীবনে এমন প্রচণ্ড আছড়ে পড়ার শব্দপরম্পরা সে শোনেনি, একটা শব্দ কানের পরদা ফাটানোর উপক্রম করতে-না-করতেই আবার কান-ফাটানো শব্দ খাবলা মেরে নিচ্ছে যেন মগজখানাকেই। ভয়ংকর আওয়াজগুলোর ঢেউ চলে যাওয়ার পরেই এল ছোটখাটো ভাঙাচোরা আছড়ে পড়ার ক্রমশ ম্রিয়মাণ শব্দলহরি। আগাগোড়া অব্যাহত রইল কিন্তু প্রলয়ংকর ঝোড়ো হাওয়া, স্বর্গ-মর্ত জুড়ে তাণ্ডবনাচ নেচে বেড়াচ্ছে সেই মত্ত প্রভঞ্জন, ঝড় যে এত জোরালো হয়, ফোদারিনগে তা জানল সেই প্রথম। সে কী তেজ হাওয়ার। মাথা তুলে চারপাশে চোখ বোলাতেও পারছে না, মুন্ডুখানা ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে না যায়। বেশ কিছুক্ষণ এমনই ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় ছিল বেচারি, যে ভালো করে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারেনি। কোথায় আছে এবং কী ঘটছে, তা চোখ মেলে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। সংবিৎ ফেরার পর প্রথমেই খুলিতে হাত বুলিয়ে দেখে

নিয়েছিল, ধড়ে মুন্ডুটা এখনও আছে কি না। ফরফর করে চুল উড়ছে টের পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল অবশেষে, যাক, মাথাটা এখনও বেহাত হয়নি।

'লর্ড!' খাবি খেতে খেতে ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া ঝড়ের মধ্যে আর কোনও কথা ফোটেনি মুখে। তারপর অবশ্য আঁকুপাঁকু করতে করতে পাগলের মতো বকে গিয়েছিল নিজের মনে, 'ব্যাপারটা কী? ঝড় আর বাজ পড়ার আওয়াজে কান যে চৌচির হয়ে গেল! অথচ এক মিনিট আগেও কী মিষ্টিই না ছিল রাতটা, ফুটফুটে চাঁদের আলো! মেডিগের কথায় কান দিয়েই তো বাধিয়ে বসলাম ফ্যাসাদটা! উফ! হাওয়ার কী জোর রে বাবা! এ কী করে বসলাম নিরেট গাধার মতো! এখুনি যে পটোল তুলতে হবে সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্টে!...

'মেডিগটা গেল কোথায়?

'তুলকালাম কাণ্ডটাই বা ঘটল কেন?'

ঝড়ে কোট উড়ছে পতপত করে চোখের সামনে। তারই ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, দেখে নিল ফোদারিনগে। সত্যিই চারপাশে অত্যন্ত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে। দেখে-শুনে বিলকুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ফের নিজের মনেই বকর বকর করে চলে অঘটনবাজ ফোদারিনগে, 'আকাশটা তো দেখছি ঠিক জায়গাতেই আছে—এখনও খসে পড়েনি। কিন্তু বিকট-ভয়ানক এই ঝড় বেটাচ্ছেলে তেড়েফুঁড়ে আসছে কোন চুলো থেকে? ওই তো চাঁদ দেখা যাচ্ছে মাথার ওপর। আগে যেখানে ছিল—ঠিক সেইখানেই। দিনদুপুরের মতো আলোরও ঘাটতি নেই। ওইটুকুই কেবল আগের মতো—বাকি তো সবই ওলট-পালট—গাঁ-টা গেল কোন চুলোয়? কিছুই তো চোখে পড়ছে না—বিটকেল এই ঝড়খানাই বা এল কোন নরক থেকে? ঝড় ওঠার হুকুম তো আমি দিইনি।'

দু'পায়ে খাড়া হওয়ার চেষ্টা করেছিল ফোদারিনগে। অত কি সোজা? ঝড়ে মাথা মুড়িয়ে পরক্ষণেই আছড়ে ফেলেছিল মাটিতে। অগত্যা গোরু-ছাগলের মতো অতিকষ্টে, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কোনওমতে দেহ-উত্থান ঘটিয়েছিল ফোদারিনগে। কোটখানা তখনও পতপত করে উড়ছে মাথার ওপর দিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে অনেক কায়দা-কসরত করে দু'টি চালনা করেছিল আকাশপানে বিধুমুখী অভিমুখে। এবং, আবার স্বগতোক্তি জাগ্রত হয়েছিল বিমূঢ় কণ্ঠে, 'সাংঘাতিক একটা গোলমাল হয়ে গেছে কোথাও-না-কোথাও। কী সেই গোলমালটা, সেইটাই যে কচুপোড়া মাথায় আসছে না।'

যেদিকে দু'চোখ যায়, দেখা যাচ্ছে কেবল প্রলয়ংকর প্রভঞ্জনের দাপটে ধাবমান সাদা ধুলোর কুয়াশা। ঝড় যে এমন রক্ত জল-করা হুংকার ছাড়তে পারে, তা-ও কি ছাই জানা ছিল? এ কী সৃষ্টিছাড়া পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়ে-দেওয়া চেঁচানি! রক্ত

যে ঠান্ডা হয়ে গেল। সাদাটে ধুলোর ধাবমান পরদার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু পাকসাট-খাওয়া মৃত্তিকা স্তূপ আর লন্ডভন্ড ধ্বংসস্তূপ। গাছ নেই, বাড়ি নেই, চেনাজানা কোনও আকারই চোখে পড়ছে না, দিগন্তবিস্তৃত শুধু ধু ধু লন্ডভন্ডতা, বহু দূরে বিলীন হয়েছে ঘূর্ণ্যমান ধুলোস্তম্ভ আর জলস্তম্ভের নিচেকার রক্ত-জমানো নিরেট নিঃসীম তমিস্রার গভীরে। নারকীয় এই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডকারখানার ঠিক ওপরেই অট্টরোলে ফেটে পড়ছে বজ্র, চোখের স্নায়ু ঝলসে দিচ্ছে অতিতীব্র বিদুৎ। ঝড়ের বেগ কিন্তু বেড়েই চলেছে পলকে পলকে। খুব কাছেই পাটকাঠির মতো পটপট করে ভেঙে-যাওয়া একটা গাছ চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে—একটু আগেই যাচ্ছিল বিশাল মজবুত এল্‌ম মহীরুহ। তারও ওপাশে দলা-পাকানো একটা ইস্পাত-ফ্রেম ঠিকরে ঠিকরে উঠছে মাটি থেকে।

ব্যাপারটা অবশ্যই অস্বচ্ছ নয় আপনার কাছে। ফোদারিনগে তো কোটের বোতাম এঁটে নিয়ে দরাজ গলায় পৃথিবীর আবর্তন বন্ধ করার হুকুম দিয়েই খালাস, ভূপৃষ্ঠের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সঞ্চরমাণ বস্তুগুলোর অবস্থা যে কী হবে, অর্ডার দেওয়ার আগে সেই হিসেবটা মনে মনে কষে নিলেই তো এই মহাপ্রলয়টা ঘটত না। বসুন্ধরা এমনিতেই ভীষণ বেগে পাক খেয়ে চলেছে, ভগবানের লাট্টুও বলা যায়। নিরক্ষরেখা বরাবর ভূপৃষ্ঠের গতিবেগ ঘণ্টায় হাজার মাইলেরও বেশি। অক্ষাংশ অঞ্চলে তার অর্ধেকেরও বেশি। ফলে, সেকেন্ডে প্রায় ন'মাইল বেগে সামনের দিকে আচমকা ঠিকরে গেছেন মি. মেডিগ—সেই সঙ্গে গোটা গ্রামটা, ফোদারিনগে স্বয়ং এবং আশপাশের সবকিছুই। সেকেন্ডে ন'মাইল বেগে ধেয়ে যাওয়া মানেটা কী, তা অবশ্যই অজানা নয় আপনার কাছে, কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলারও ক্ষমতা নেই অত জোরে ছুটে যাওয়ার! আচমকা এই ভয়াবহ গতিবেগ অর্জন করে বসেছে অঘটনবাজ মানুষ দু'টি আশপাশের সবকিছু সমেত। আছড়ে পড়ছে বাড়িঘরদোর, মানুষ, পশুপাখি—পড়ছে আর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে! গড়িয়ে থেঁতলে পিণ্ডি পাকিয়ে নিমেষে নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মহাপ্রলয় বলে একেই। চোখ দিয়ে দেখে মন দিয়ে বোঝবারও সময় দিচ্ছে না।

চিত্র ১৭.৯ 'আকাশটা তো দেখছি ঠিক জায়গাতেই আছে—

বলা বাহুল্য, পরিস্থিতিটা মোটেই মনঃপূত হয়নি মি. ফোদারিনগের। মির‍্যাক্‌ল ঘটাতে গিয়ে মহাপ্রলয় ঘটানো হয়ে গেছে—এই চৈতন্যটা বড়ই পীড়াদায়ক হয়েছিল সেই মুহূর্তে। রুদ্র প্রকৃতির করাল রূপ হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিয়েছিল বললেই চলে এবং দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাবৎ মির‍্যাক্‌ল কাণ্ডকারখানা। ছ্যা ছ্যা! এই যদি মির‍্যাক্‌ল হয়, তাহলে সে মির‍্যাক্‌লের দরকারটা কী বাপ? কালো আলকাতরার মতো অন্ধকারে দৃষ্টিও আটকে যাচ্ছে—মওকা বুঝে রাশি রাশি মেঘ দঙ্গল বেঁধে ঢেকে দিয়েছে চাঁদের মুখ। কান আর সইতে পারছে না ক্রমবর্ধমান ঝড়ের

হুহুংকার। মেঘ আর ঝড়ে কুস্তি চলছে সমস্ত আকাশ জুড়ে, রণে ভঙ্গ দেওয়ার পাত্র নয় কেউই। পাঁক, জলের ছিটে আর ধুলোয় সর্বাঙ্গ ঢেকে যাচ্ছে কেন দেখবার জন্যে চোখে হাত ঢাকা দিয়ে সেইদিকে চোখ ফিরিয়েই আঁতকে উঠেছিল ফোদারিনগে।

দেখেছিল, বিশাল উঁচু একটা জলের পর্বত ভেঙে পড়তে চলেছে ঠিক তার মাথার ওপরেই!

চেঁচিয়ে উঠেছিল বিকট গলায় (যদিও প্রাকৃতিক শক্তিবর্গের সম্মিলিত হুংকারধ্বনির তুলনায় তা মনে হয়েছিল মিনমিনে ভাঙা স্বর)—'মেডিগ? কোথায় আপনি?'

জল প্রায় মাথার ওপর!

'থাম! থেমে যাও বলছি!'

থেমে গিয়েছিল ঝুলে-পড়া জলরাশি।

বজ্র আর বিদুৎকে ধমকে উঠেছিল ফোদারিনগে, 'দাঁড়াও-না বাপু, ইয়ারকিটা একটু বন্ধ রাখ—ভাববার সময়টা অন্তত দাও!'

থেমে গিয়েছিল বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎঝলক।

'কী করা যায় এখন? লর্ড! করবটা কী? মেডিগ যদি থাকত ধারেকাছে!'

'ঠিক হ্যায়,' বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল ফোদারিনগের—'এবার ভুল হবে না। ঠিক অর্ডারটাই দেওয়া যাক।'

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে, ঝোড়ো হাওয়ায় পিঠ দিয়ে মনে মনে ঝড়ের মতোই ভেবে নিয়েছিল আবার সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পন্থাটা।

বলেছিল, 'পেয়েছি!... চালাও! না-বলা পর্যন্ত আমার হুকুমমতো যেন আর কিছু না ঘটে!... লর্ড! আগে কেন মাথায় আসেনি বুদ্ধিটা?' ঝড়ের গোঙানি ছাপিয়ে ষাঁড়ের মতো গলাবাজি শুরু করেছিল ফোদারিনগে। ভয়াবহ ওই ঝড়ের আওয়াজকে কি চেঁচানি দিয়ে টেক্কা মারা যায়? নিজের কণ্ঠস্বরই শুনতে পায়নি অঘটনবাজ মানুষটা। তা-ই বলে ভাটাও পড়েনি গলাবাজিতে—'শোন হে, শোন, আমার হুকুমগুলো এবার কান খাড়া করে শুনে যাও! আর যেন ভুল হয় না এক চুলও। প্রথমেই বলে রাখি, আমার কথামতো সবকিছু ঘটে যাওয়ার পর, আমার এই অলক্ষুনে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর শক্তি যেন একেবারেই লোপ পায়, আর পাঁচজনের ইচ্ছাশক্তির মতোই যেন হয়ে যায় আমার ইচ্ছাশক্তি, এবং এই সমস্ত বিপজ্জনক মির‍্যাক্‌ল যেন পত্রপাঠ বন্ধ হয়ে যায়। জঘন্য মির‍্যাক্‌ল—দু'চক্ষের বালি। না ঘটালেই হত—আহাম্মুকি যা হবার তা হয়ে গেছে, আর নয়, ঢের হয়েছে। আমার দ্বিতীয় হুকুমটা এই: মির‍্যাক্‌ল শুরু হওয়ার আগে যেখানে যেভাবে ছিলাম, ঠিক সেইখানে, সেইভাবে ফিরে যেতে চাই। শুধু আমি নয়—হতচ্ছাড়া পাজির পা-ঝাড়া ওই লম্ফটা উলটে যাওয়ার আগে যেখানে

যে অবস্থায় যা কিছু ছিল—সমস্ত ঠিক সেই সেই জায়গায় সেই সেই অবস্থায় ফিরে যাক। বিরাট কাজ বুঝছি, কিন্তু এই তো শেষ। মাথায় ঢুকেছে? না, আর কোনও মির‍্যাক্‌লের দরকার নেই। ঠিক যা ছিল তা-ই হয়ে যাক। সবকিছুই আগের মতো হয়ে যাক। লং ড্রাগনে আধ পাঁইট গেলবার আগে যেমনটি ছিল—হুবহু সেইরকম। বাস, আর কোনও হুকুম নেই!'

বলে-টলে, নরম মাটির গাদায় দশ আঙুল গেঁথে ধরে, কষে চোখ বন্ধ করে ছিল ফোদারিনগে এবং চেঁচিয়ে উঠেছিল বাজখাঁই গলায়, 'চালাও!'

নিস্তব্ধ নিথর হয়ে গিয়েছিল বিশ্বচরাচর। থমথমে নৈঃশব্দ্য। ছুঁচ পড়লেও যেন ওইটুকু আওয়াজও শোনা যাবে—এমনি স্তব্ধতা। চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই ফোদারিনগে টের পেয়েছিল, দাঁড়িয়ে আছে সে দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া অবস্থায়।

কানে ভেসে এসেছিল উদাসীন কণ্ঠস্বর, 'তা যা বলেছ!'

চোখ খুলেছিল ফোদারিনগে।

দাঁড়িয়ে আছে লং ড্রাগন পানশালায়। মির‍্যাক্‌ল প্রসঙ্গ নিয়ে তুলকালাম কথা কাটাকাটি চলছে টোডি বিমিসের সঙ্গে। আবছা একটা অনুভূতি জাগ্রত রয়েছে মাথার মধ্যে—কী যেন চকিতে ধেয়ে গিয়েছে চেতনার ওপর দিয়ে। কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। মির‍্যাক্‌ল ঘটানোর ক্ষমতাটাই কেবল হারিয়েছে ফোদারিনগে—ফিরে পেয়েছে আর সবকিছুই। যা ছিল, তা-ই হয়ে গেছে। এ গল্প শুরু হওয়ার সময়ে ওর মন আর স্মৃতি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—এখনও রয়েছে সেখানেই। কাজেই যা কিছু বলা হল এইমাত্র এবং যা কিছু বলা হচ্ছে আজ পর্যন্ত, তার বিন্দুবিসর্গ ওর জানা নেই। তার চাইতেও বড় কথা, মির‍্যাক্‌ল জিনিসটাতে আজও ওর বিশ্বাস নেই তিলমাত্র।

'তা যা বলেছ,' বলে বাঁকা হেসে চেয়ে রইল টোডি বিমিস।

'জিনিসটা আগে ভালো করে বোঝ,' তেড়েমেড়ে বলেছিল ফোদারিনগে, 'মির‍্যাক্‌ল হল এমনই সব উদ্ভট আজগুবি ব্যাপারস্যাপার, যা নিত্যনৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ব্যাপারস্যাপারের ঠিক উলটো, ইচ্ছাশক্তির জোরে যে অঘটন ঘটানো চলে...।'
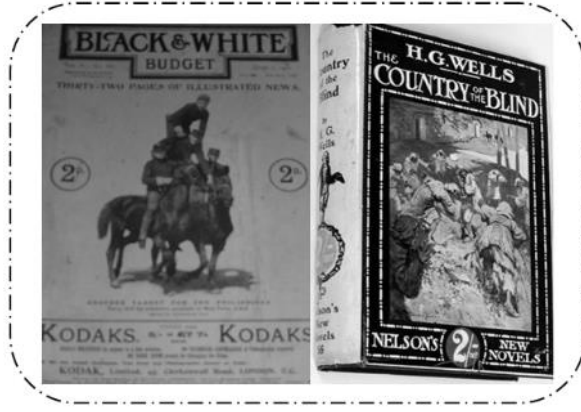
‘A Dream of Armageddon’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘Black and White’ পত্রিকায় জুন **১৯০১** সালে। পরে ‘Thomas Nelson and Sons’ থেকে **১৯১১** সালে প্রকাশিত ‘The Country of the Blind and Other Stories’ সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়।

জীবন্ত স্বপ্ন
(A Dream of Armageddon)

লোকটাকে দেখেছিলাম রাগবি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সাদা নিরক্ত মুখ। শ্লথ চরণ। কুলির দরকার, কিন্তু হেঁকে ডাকছে না কুলিকে। খুবই অসুস্থ মনে হয়েছিল। তাই চেয়েছিল একদৃষ্টে। পা টেনে টেনে এসে বসে পড়েছিল আমার পাশে। পাঁজর গুঁড়ো করে যেন বেরিয়ে এসেছিল দীর্ঘশ্বাসটা। গায়ের শালটা কোনওমতে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শূন্য চাহনি মেলে তাকিয়েছিল অন্যদিকে। একটু পরেই অস্বস্তি জাগ্রত হয়েছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আমার নিষ্পলক চাহনি তার ওপরেই নিবদ্ধ রয়েছে বুঝতে পেরে। বারেক তাকিয়েছিল আমার দিকে। পরক্ষণেই ফের চোখ মেলেছিল আমার ওপর।

বই পড়ে যাওয়ার ভান করেছিলাম আমি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বিড়ম্বনায় ফেলেছি, এই আশঙ্কায় আর তার দিকে তাকাইনি। অবাক হয়েছিলাম একটু পরেই। কী যেন সে বলছিল আমাকে।

‘কিছু বলছেন?’ জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

আঙুল তুলে আমার হাতের বইটা দেখিয়ে সে বলেছিল, ‘স্বপ্ন সংক্রান্ত বই, তা-ই না?’

‘নিশ্চয়,’ ‘ড্রিম স্টেটস’ নামটা তো প্রচ্ছদেই লেখা রয়েছে।

চুপ করে ছিল সে কিছুক্ষণ। যেন বলার মতো কথা খুঁজছে মনের মধ্যে। তারপর বলেছিল আত্মগত স্বরে, ‘কিন্তু ওরা তো কিছু বলবে না আপনাকে।’

মানে বুঝলাম না। তাই নীরব রইলাম।

সে বললে, ‘জানলে তো বলবে।’

খুঁটিয়ে দেখছিলাম তার মুখচ্ছবি। সে বলেছিল, ‘স্বপ্ন আছে বইকী—বিলক্ষণ আছে।’

এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করি না আমিও।

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে সে তখন বলেছিল, ‘স্বপ্ন দেখেন? মানে, জীবন্ত স্বপ্ন?’

বলেছিলাম, ‘স্বপ্নই দেখি কম। বছরে তিনটেও হয় কি না সন্দেহ।’

আবার চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সে। যেন কথা সাজাচ্ছে মনের মধ্যে।

তারপরেই প্রশ্ন করেছিল আচমকা, ‘স্মৃতি আর স্বপ্ন কি তালগোল পাকিয়ে যায়? স্বপ্ন আদৌ সত্যি বলে মনে হয় কখনও?’

‘কদাচিৎ। ক্ষণেকের জন্যে দ্বিধা জাগে মাঝেমধ্যে। সবারই তা-ই হয়।’

‘বইতে কী লিখছে?’

চিত্র ১৮.১ ‘স্বপ্ন সংক্রান্ত বই, তা-ই না?’

‘লিখছে, মনের মধ্যে গভীর চাপ পড়লে স্বপ্নে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। স্বপ্নের তীব্রতা থেকেই বিচার করে নেওয়া যায় স্বপ্নদৃশ্য সত্যি কি না। অনেক অনুমিতি আছে এ ব্যাপারে। জানেন নিশ্চয়।’

‘সামান্যই জানি। তবে সব ক’টা অনুমিতিই যে ভুল, সেটা জানি বেশ ভালো করেই।’

শীর্ণ হাত বাড়িয়ে জানলার ফিতে ধরে নাড়তে লাগল সে। দেখে, ফের তুলে নিলাম বইটা। অমনি সে ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে। বই পড়া আর হল না পরবর্তী প্রশ্নে।

‘ধারাবাহিক স্বপ্ন বলে কিছু আছে কি? এমন স্বপ্ন, যা চলে রাতের পর রাত?’

‘আছে বলেই তো মনে হয়। মানসিক রোগ সংক্রান্ত বহু বইতে এ ধরনের স্বপ্নের বৃত্তান্ত আছে।’

‘মানসিক রোগ! হয়তো তা-ই। মনই তো উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু আমি যা বলতে চাই,’ কথা থামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিজের অস্থিময় আঙুলের গাঁটের দিকে, ‘এ

ধরনের স্বপ্ন কি বারে বারে ফিরে আসে? সত্যিই কি এর নাম স্বপ্ন? অন্য কিছু নয় তো?'

ছিনেজোঁকের মতো কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্ঘাত দাবড়ানি দিয়ে বসতাম। সামলে নিলাম শূন্যগর্ভ চাহনি আর রক্তিম ঠোঁট দেখে। এ চাহনির অর্থ যারা বোঝবার, তারা বোঝে।

চুপ করে আছি দেখে সে বলেছিল, 'আপনার মতামতের জন্য তর্ক করছি ভাববেন না যেন। মরতে বসেছি এই স্বপ্নের জ্বালায়! তাই—'

'স্বপ্নের জ্বালায়?'

'জানি না তাকে স্বপ্ন বলবেন কি না। রাতের পর রাত চলছে এই উৎপাত। জীবন্ত স্বপ্ন। এত জীবন্ত যে, সেই তুলনায় রেললাইনের ধারে ওই ল্যাম্পপোস্টগুলোকেও মনে হয় অবাস্তব! তখন কিন্তু আর মনেই পড়ে না কে আমি... কী আমার কাজ...'

আটকে গেল কথা। একটু পরে—'এই এখনই ধরুন-না কেন...'

'সব স্বপ্নই একই, এই তো বলতে চান?' আমার প্রশ্ন।

'সব শেষ... সব শেষ।'

'মানে?'

'আমি মারা গেছি।'

'মারা গেছেন?'

'রাতের পর রাত জেগে উঠেছি এই পৃথিবীরই অন্য এক অঞ্চলে, অন্য এককালে—স্বপ্নের মধ্যে। রাতের পর রাত জাগরণ ঘটেছে অন্য এক জীবনধারার মধ্যে। রাতের পর রাত নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। তারপর একদিন সব শেষ হয়ে গেছে। খুন হয়ে গিয়েছি। স্বপ্ন বলতে এখন যা রয়েছে তা মড়ার স্বপ্ন। চিরমৃত্যু আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে। শেষ দৃশ্যটা—'

'মানে আপনার মৃত্যুর দৃশ্য?'

'হ্যাঁ, আমার মৃত্যুর দৃশ্য।'

'তারপর থেকে—'

'না, আর নেই। স্বপ্ন খতম হয়েছে সেইখানেই।'

বেশ বুঝলাম, উদ্ভট এই স্বপ্নকাহিনি আমাকে না শুনিয়ে ছাড়বে না লোকটা। হাতে অবশ্য সময় আছে পুরো একটা ঘণ্টা।

বলেছিলাম, 'অন্য এককালে জীবনযাপনের কথা কী বলছিলেন, বুঝলাম না। কাল মানে কী বলতে চাইছেন, অন্য একটা যুগ? অন্য শতাব্দী?'

'হ্যাঁ।'

'অতীতে?'

'না, না, সে যুগ আসবে।'

'তিন হাজার খ্রিস্টাব্দ কি?'

'কত খ্রিস্টাব্দ, তা তো বলতে পারব না। মনে ছিল স্বপ্নের মধ্যে জাগরণের সময়ে। এখন ভুলে গেছি। তা ছাড়া, সাল-শতককে ওরা খ্রিস্টাব্দের হিসেবেও প্রকাশ করে না। কী যেন বলে—' বলে, কপালে হাত রেখে মনে করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল সে—'নাঃ, একদম মনে পড়ছে না।'

ক্লিষ্ট হাসি ভেসে ওঠে ঠোঁটের কোণে। ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়েছিল, স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাকে শোনানোর আদৌ কোনও বাসনা হয়তো নেই। স্বপ্নের কথা যারা চেপে যায়, দু'চক্ষে তাদের দেখতে পারি না আমি। কিন্তু এ ব্যাপারটা মনে হচ্ছে সেরকম নয়। আমার সহযোগিতা দরকার। তাই বলেছিলাম, 'ধরুন—'

'জীবন্ত... প্রথম থেকেই। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে যায় নতুন এক জীবনের মধ্যে। তখন কিন্তু এই জীবনের কিছু মনে পড়ে না। অদ্ভুত, তা-ই না? মনে হয় যেন স্বপ্নের আয়ু যতক্ষণ, ততক্ষণ যা কিছু ঘটছে, তা-ই যথেষ্ট। স্বপ্নের জীবনের বাড়তি আর কোনও জীবন নিষ্প্রয়োজন। হয়তো, নাঃ, গোড়া থেকেই বলা যাক। দেখাই যাক-না, কতখানি মনে করতে পারি। হঠাৎ নিজেকে দেখি, একটা বাগানের মধ্যে বসে আছি, সামনে সমুদ্র। এর আগেকার কোনও ব্যাপারই মনে পড়ছে না। ঢুলছি। আচমকা তন্দ্রা ছুটে গেল। যেন স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই আধঘুম থেকে জেগে উঠলাম। কারণ আর কিছুই নয়। যে মেয়েটা বাতাস করছিল হাতপাখা দিয়ে, তার হাত আর চলছে না, গায়ে হাওয়া লাগছে না।'

'মেয়েটা?'

'হ্যাঁ, সেই মেয়েটা। কথার মাঝে কথা বলবেন না। সব ভুলে যাব।'

বলতে বলতে সে থমকে গেল আচমকা, 'পাগল ভাবছেন না তো?'

'না তো। স্বপ্ন দেখছিলেন। বলে যান, কী দেখছেন।'

'তন্দ্রা ছুটে গেল মেয়েটা বাতাস করা থামিয়েছে বলে। অবাক হচ্ছি না হঠাৎ এমন একটা জায়গায় নিজেকে দেখে। আচমকা সেখানে পৌঁছে গেছি বলেও মনে হচ্ছে না। ঘুম ভাঙল, ঠিক সেইখান থেকেই সহজভাবে শুরু হয়ে গেল জীবনের ধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর যা কিছু স্মৃতি, ভাবীকালের সেই জীবনে মিলিয়ে গেল মন থেকে তৎক্ষণাৎ। এ যুগের কোনও ছাপই রইল না চিন্তার মধ্যে। আমার এখানকার নাম কুপার, তা-ও মুছে গেল চেতনা থেকে। জেগে রইল কেবল সেই যুগে আমার যা নাম, যা সামাজিক অবস্থান—'

'কী নাম?'

'হেডন।'

'হেডন।—তারপর?'

'স্বপ্ন ছুটে যাওয়ার পর অনেক কথাই কিন্তু মনে নেই। ঘটনাগুলো পরপর ঠিকমতো মনে পড়ছে না। তখন কিন্তু জ্ঞান ছিল টনটনে... উদ্ভট মনে হচ্ছে না তো?'

'একেবারেই না। চালিয়ে যান। বাগানটা কীরকম বলুন।'

'বীথি বলা যায়—মামুলি বাগান নয়। সঠিক নামটা বলা সম্ভব নয়। দক্ষিণমুখো। ছোট্ট। ছায়াচ্ছন্ন। বারান্দার মাথার ওপর আধখানা চাঁদের মতো ফাঁক দিয়ে কেবল দেখা যাচ্ছে আকাশ, সমুদ্র। কোণে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটা। আমি বসে রয়েছি একটা ধাতুর তৈরি কৌচে—ডোরাকাটা গদির ওপর। বারান্দায় হেলান দিয়ে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটা। সূর্য উঠছে। আলো পড়েছে তার কানে আর গালে। ঢেউখেলানো চুল লুটিয়ে রয়েছে ভারী সুন্দর সাদা কাঁধে। পেছনে সূর্য থাকায় শীতল নীলাভ ছায়া লুটিয়ে রয়েছে সাদা কাঁধে। পোশাকের বর্ণনা দেওয়াটা একটু মুশকিল। জবরজং কিছু নয়—সহজ সুন্দর। উচ্ছল প্রপাতের মতোই ঢল নেমেছে যেন গা বেয়ে। এককথায় বলা যায়, তার সৌন্দর্য মনকে টানে—টানছিল আমাকেও। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। মাথা তুলেছিলাম। সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আমার পানে।

'আমার বয়স তিপ্পান্ন এই যুগে। আমার মা আছে, বোন আছে, বন্ধু আছে, স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের মুখের ছবি জ্বলজ্বল করছে মনের মধ্যে, কিন্তু সবচেয়ে বাস্তব মনে হচ্ছে এই মেয়েটার মুখের ছবি। স্মৃতির পটে ফুটিয়ে তুলতে পারি ইচ্ছে করলেই—ছবি এঁকেও ফেলতে পারি, এত স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও—'

স্তব্ধ হল বিচিত্র সহযাত্রী। আমি বাগড়া দিলাম না। চেয়ে রইলাম।

সে বললে, 'স্বপ্নে দেখা মুখ। তবুও তা সত্যি... অনেক বেশি সত্যি। সুন্দরী নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভয়ানক নিরুত্তাপ সৌন্দর্য নয়, এ সৌন্দর্যের উদ্দেশে অর্ঘ নিবেদন করতে মন চায়—তাপসিক রূপরাশি বতে যা বোঝায়, তা-ই। ধমনিতে কামনার তুফান তোলে না—রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় না। স্নিগ্ধ দ্যুতিবর্ষণ জুড়িয়ে দেয় হৃদয়-দহনকে, মিষ্টি ঠোঁটের নরম হাসি আর শান্ত গম্ভীর ধূসর চোখের চাহনি পেলব প্রলেপ দিয়ে যায় অস্থিরচিত্তে। তার ঘুরে দাঁড়ানো, তার ঘাড় বাঁকানো, তার বাহুভঙ্গিমা—সবকিছুর মধ্যেই এমন একটা সুকুমার ছন্দ—'

বলতে বলতে যেন কথা হারিয়ে ফেলল স্বপ্নকাতর মানুষটা। মাথা হেঁট করে বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথা তোলার পর মুখচ্ছবিতে দেখলাম পরম স্বস্তিবোধ। গল্পের

বাস্তবতায় যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে, গোপন করার প্রয়াসও নেই মুখের পরতে পরতে।

'জীবনের যা কিছু উচ্চাশা, সবই ছেড়ে এসেছি শুধু এই মেয়েটির জন্যে। পেয়েছি অনেক, চাওয়ারও রয়েছে অনেক কিছু—কিন্তু চাওয়া-পাওয়া সবই হেলায় ত্যাগ করেছি—শুধু এই পরমাসুন্দরীর জন্যে। উত্তর অঞ্চলের জনগণের শীর্ষে ছিলাম। ছিল প্রভাব, প্রতিপত্তি, যশ, অর্থ, বিপুল সম্পত্তি। ওই রূপসির পাশে নিষ্প্রভ, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ মনে হয়েছে জীবনের এতগুলো পাওয়া। তাকে নিয়ে চলে এসেছি রোদ্দুর ঝলমলে আনন্দ-উচ্ছল এই শহরে জীবনের শেষটুকু শান্তিতে কাটাতে। অনেক পরিকল্পনা ছিল, ছিল বিস্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষা—ছিটেফোঁটাও এখন আর নেই মনের মধ্যে। বাহুবলে আর বুদ্ধিবলে অর্জিত সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছি জীবনের গণ্ডি থেকে—শুধু এই মেয়েটিকে কাছে পাওয়ার জন্যে। তার ভালোবাসা পেয়েছি, পাব আমৃত্যু, সেই হোক আমার পরম বিত্ত, বাকি যা কিছু ঐশ্বর্য, মিলিয়ে যাক ধরণির ধুলায়, নশ্বর এই সংসারে অমর তো কেবল প্রেম... অক্ষয়, অব্যয়, অম্লান। আমার হৃদয় জুড়ে থাক কেবল সেই ভালোবাসা, বাকি সবকিছুই মনের মরীচিকা, মিথ্যে অহংকারের প্রাসাদ, যাক-না মিলিয়ে ভোরের কুয়াশার মতো। রাতের পর রাত এই ছিল আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, আত্যন্তিক যাচ্ঞা, নিষিদ্ধকে পাওয়ার উদগ্র বাসনা!

'কিন্তু কোনও পুরুষেই পারে না মনের এই আবেগ আর-এক পুরুষের মনে সঞ্চারিত করতে। এ যেন একটা রঙের আভাস, একটা রশ্মির ঝলক, আসে আর যায় চকিতে। উপলব্ধি করা যায় সত্তা দিয়ে, ব্যক্ত করা যায় না ভাষা দিয়ে। ধরা যায় না, কেবল টের পাওয়া যায় পরিবর্তনের পর পরিবর্তন পালটে দিয়ে যাচ্ছে দিগন্ত থেকে দিগন্তব্যাপী মনের আকাশকে।

'তাই তো আমি ত্যাগ করেছি ওদের সব্বাইকে, ফেলে এসেছি মহাসংকটের মধ্যে, সুরাহা কর গে নিজেরাই, যা পারে।'

ঝরনাধারার মতো হেঁয়ালির পর হেঁয়ালির আবির্ভাবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম আমি—'কাদের কথা বলছেন? কাদের ফেলে এলেন মহাসংকটের মধ্যে?'

'উত্তর অঞ্চলের মানুষ তারা। আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, আমার কথায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাকে চোখেও দেখেনি, কিন্তু তবুও তাদের চোখে আমি একটা বিরাট পুরুষ। অসীম আস্থা আমার ওপর। বিশাল এই দেশ জুড়ে ষড়যন্ত্র আর হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা আর উত্তেজনা চলছে বছরের পর বছর। রুখে দাঁড়িয়েছি আমি। ভয়ানক খেলা খেলে এসেছি বছরের পর বছর। অরাজকতা চরমে পৌঁছেছে একটা সংঘবদ্ধ দুষ্টচক্রের দাপটে। এদের বিরুদ্ধে

দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পেরেছে আমাকে ঘিরে। আমি তাদের শ্রদ্ধেয়, বরেণ্য, আস্থাভাজন নেতা। সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ আর বোকামির সুযোগ নিয়েছে এই দুষ্টচক্র, চোখধাঁধানো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা আর গালভরা কথাবার্তা দিয়ে ধোঁকা দিয়ে চলেছে বছরের পর বছর দেশের মানুষকে, রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটা। সে দেশের বর্ণময় পূর্ণ চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। অনেক জটিল, অনেক বক্র। স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু অনুপুঙ্খ চিত্র ধরা পড়েছিল আমার মনের আকাশে। কেউ বলে দেয়নি, করাল কুটিল এই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি আমি, কিন্তু আমি তা নিমেষে জেনেছিলাম তন্দ্রা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ঢুলুনির মধ্যেও ভাবছিলাম বলেই চোখ রগড়ে নিয়ে ভাবনার রেশ ধরে মনকে বুঝিয়েছিলাম, ভালোই করেছি হানাহানির ওই নোংরা পরিবেশ থেকে রোদ্দুর ঝলমলে এই শহরে সরে এসে, ওই তো দাঁড়িয়ে আমার মনের মানুষ, শুধু যাকে নিয়েই আমি সুখী হতে পারব শেষ জীবনটায়। প্রেম আর সৌন্দর্য, আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দের এই জগৎই প্রকৃত জগৎ, দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষময় নিরানন্দ জীবনের শেষে যত বিরাট প্রাপ্তিই থাকুক না, এর তুলনায় তা কিছুই নয়। মুগ্ধ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম আপন মনে, "সব ছেড়েও সব পেয়েছি শুধু তোমাকে পেয়ে।"

'আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে সে ডেকেছিল আমাকে—"এখানে এসো-না, দেখে যাও কী সুন্দর সূর্য উঠছে মন্টি সোলারোতে।"

'লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম ডাক শুনেই। দেখেছিলাম, সাদা চুনাপাথরের পাহাড় ঝলমল করছে ভোরের আলোয়। তার আগে অবশ্য মুগ্ধ হয়েছিলাম মেয়েটির সুন্দর কাঁধে আর গালে সকালের রোদের বিচিত্র খেলা দেখে। ক্যাপ্রিতে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই—'

'ক্যাপ্রি! মন্টি সোলারো!' সোল্লাসে বাধা দিয়েছিলাম আমি, 'আরে, আমি তো উঠেছি মন্টি সোলারোর পাহাড়ে। চুড়োয় বসে ভেরো ক্যাপ্রিও খেয়েছি। কাদার মতো ঘোলাটে, সিডার সুরার মতো তেজালো অদ্ভুত ভেরো ক্যাপ্রির স্বাদ তো ভোলবার নয়।'

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নিরক্তমুখ সহযাত্রী—'যাক, আপনি তাহলে দেখেছেন। আমি কিন্তু আজও জানি না কোথায় সেই ক্যাপ্রি দ্বীপ—যাইনি জীবনে। গোটা দ্বীপটা একটা বিরাট হোটেল। অজস্র ছোট ছোট ঘর চুনাপাথরের গা খুদে তৈরি। সমুদ্র থেকে অনেক উঁচুতে। এত বড় আর এত জটিল হোটেল এ যুগে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না—বলেও আপনাকে বোঝাতে পারব না। দ্বীপের একদিকে মাইলের পর মাইল ভাসমান হোটেল আর ভাসমান মঞ্চ—উড়ুক্কু যানের অবতরণ মঞ্চ। এ যুগে তার কিছুই দেখতে পাবেন না।

'আমরা দাঁড়িয়ে আছি অগুনতি ঘরের একটা ঘরে। অন্তরিপের শেষ প্রান্তে। দেখা যাচ্ছে পূর্বদিক আর পশ্চিমদিক। পূর্বে রয়েছে একটা বিশাল খাড়াই পর্বত—হাজারখানেক ফুট উঁচু তো বটেই। ধূসর রং—নিরুত্তাপ শীতল। একটা দিক কেবল সোনালি হয়ে রয়েছে সকালের রোদ পড়ায়। পর্বতের ওদিকে দেখা যাচ্ছে সাইরেন দ্বীপপুঞ্জ—বিলীয়মান উপকূলরেখা। পশ্চিমে চোখ ফেরালে দেখা যায় ছোট্ট একটা উপসাগর। এখনও ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে বালুকাময় সৈকতে। ছায়াগর্ভ থেকে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে সোলারো পর্বত। সোনা-রোদে সোনালি চুড়ো। পেছনে সাদা চাঁদ। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত বহুরঙা সমুদ্রে ভাসছে পালতোলা নৌকো—অজস্র।

'পূর্বদিকের নৌকোগুলো তখনও ধূসর কিন্তু স্পষ্ট—পশ্চিমদিকেরগুলো যেন সোনা দিয়ে তৈরি—জ্বলছে ছোট ছোট আগুনের শিখার মতো। আমাদের ঠিক নিচেই একটা পাথরের খিলানের মধ্যে দিয়ে সবুজ আর সাদা ফেনা ছড়িয়ে বেরিয়ে আসছে একটা পাল আর দাঁড়ওয়ালা লম্বাটে নিচু জাহাজ।'

'ফ্যারাগ্লিওনি,' বাধা না দিয়ে পারলাম না। 'পাথরের খিলানটার নাম ফ্যারাগ্লিওনি। ডুবতে বসেছিলাম ওই সবুজ আর সাদা ফেনার মধ্যে—'

সায় দিলে নিরক্তমুখ লোকটা—'হ্যাঁ, ঠিক নামই বলেছেন। ফ্যারাগ্লিওনি। মেয়েটার মুখে শুনেছি। একটা গল্পও বলেছিল। গল্পটা... গল্পটা...' রগ টিপে কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে—'নাঃ, মনে পড়ছে না।'

'যাক গে, প্রথম স্বপ্নকাহিনিটাই বরং বলা যাক। কিচ্ছু ভুলিনি। ফিসফিস করে কথা বলছিলাম দু'জনে—আমি আর সেই মেয়েটা। ঘরে আর কেউ ছিল না। তবুও কথা বলছিলাম গলা নামিয়ে। কারণটা আর কিছুই না—কাছাকাছি হয়েও যেন মনকে মেলে ধরার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'খিদে পেল একটু পরেই। অদ্ভুত একটা অলিন্দ পেরিয়ে পৌঁছালাম প্রাতরাশ খাওয়ার বিরাট ঘরে। অদ্ভুত অলিন্দ এই কারণে যে, সেখানকার মেঝে দিয়ে হাঁটতে হয় না—শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—মেঝে গড়িয়ে যায় আপনা থেকে।

'প্রাতরাশ ঘরে উপচে পড়ছে আনন্দ আর হাসি। বাজছে তারের বাজনা। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে ফোয়ারা থেকে। টেবিলে বসে হাসিভরা মুখে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম রকমারি খাবার নিয়ে। তাই খেয়াল করিনি, অদূরে টেবিলে বসে একটি লোক একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে।

'খাওয়া শেষ করে গেলাম নাচের ঘরে। সে ঘরের বর্ণনা দিই কীভাবে, ভেবে পাচ্ছি না। বিরাট ঘর। এ যুগের বিরাটতম প্রাসাদের চেয়েও বিরাট সেই একখানা হলঘর। অনেক উঁচুতে মাথার ওপরে রয়েছে প্রস্তর-বীথি—ক্যাপ্রির তোরণ। বড় বড় থাম থেকে মেরুজ্যোতির মতো অজস্র ধারায় ঝুলছে সোনার সুতো। অজস্র সুন্দর

প্রস্তরমূর্তি, অদ্ভুত ড্রাগন, সূক্ষ্ম জটিল কিম্ভূতকিমাকার স্ট্যাচুর গা থেকে ঠিকরে পড়ছে বিচিত্র আলো। দিনের আলোও ম্লান হয়ে যাচ্ছে ঘরের কৃত্রিম আলোকপ্রভায়। হাজার হাজার নরনারী পাশ দিয়ে যেতে যেতে সসম্ভ্রমে দেখছে আমাকে আর আমার পাশের মহিলাকে। আমাকে সবাই চেনে, শ্রদ্ধা করে। নাম-যশ-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে প্রমোদ-দ্বীপে চলে এসেছি শুধু এই রূপসির সঙ্গকামনায়—এইটুকুই কেবল এরা জানে। সবটুকু জানে না—অথবা বিভিন্ন রটনাই কেবল শুনেছে—তবুও আমার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে চিড় খায়নি এতটুকু।

'হাজার হাজার নাচিয়ে আশ্চর্য রঙিন ডিজাইনের পোশাক পরে গোল হয়ে নাচছে মূর্তিগুলো ঘিরে। হাজার হাজার নরনারী খোশগল্প করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, অথবা পানাহারে হাসি-মশকরায় উল্লোল করে তুলেছে নাচের ঘর। হাজার হাজার যুবক-যুবতী দল বেঁধে হাসতে হাসতে ঢুকছে ঘরে—হুল্লোড় করে বেরিয়ে যাছে ঘর থেকে। বাজছে অদ্ভুত সুরেলা বাজনা—এ যুগের কোনও বাজনদার মন-ভরিয়ে-তোলা সেই সুরের ইন্দ্রজাল কল্পনাও করতে পারবে না। সে ঘরে কেবল হাসি আর গান, সুর আর নাচ, আনন্দ আর উল্লাস ছাড়া আর কিছু নেই।

'আমরা হাত ধরাধরি করে নাচলাম। নাচিয়েরা দু'পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলে। প্রগল্‌ভতা নেই আমার সুন্দরী সঙ্গিনীর নাচের ছন্দে। আছে শুধু অতলান্ত গভীরতা—শান্ত মিষ্টি হাসি আর চাহনির মধ্যে আছে আরও অনেক কিছু, যা শুধু উপলব্ধি করা যায় হৃদয় দিয়ে।

'হলঘরে আসবার সময়ে লক্ষ করেছিলাম অদূরে টেবিলে আসীন লোকটাকে। নির্নিমেষে চেয়ে ছিল আমার পানে। চোখে চোখ রাখিনি।

'নাচ শেষ করে যখন সঙ্গিনীকে নিয়ে বসেছি নিরালায়—সেই লোকটা আমার বাহু স্পর্শ করে জানালে, কথা আছে। এখানে নয়, নিরিবিলিতে।

'আমি বলেছিলাম, "যা বলবার, এঁর সামনেই বলা হোক। বলুন কী চান?"

'লোকটি তখন বলেছিল, উত্তর অঞ্চলে আমার নেতৃত্ব নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছে। দল যে ভেঙে যেতে বসেছে দ্বিতীয় নেতা এভ্‌সহ্যামের অবিচক্ষণতায়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলেছে ঝোঁকের মাথায়। বুদ্ধির সূক্ষ্মতা তার কোনওকালেই নেই। এই আশঙ্কাটাই করেছিল সবাই—আমাকে ছাড়তে চায়নি এই কারণেই।

চিত্র ১৮.২ পূর্বে রয়েছে একটা বিশাল খাড়াই পর্বত

'শুনতে শুনতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়েছিল মাথার মধ্যে। সাংগঠনিক ক্ষমতা যে আমার শিরা-উপশিরায়—নতুন করে দলের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের নেশায় তাই চনমন করে উঠেছিলাম।

'তারপরেই চোখ পড়েছিল সঙ্গিনীর নীরব মুখের দিকে। আমি তো জানি, এখন উত্তর অঞ্চলে ফিরে যাওয়া মানেই বিচ্ছেদ—

'লোকটা জানত, আমার মনে এ দ্বিধা আসবেই। তাই নতুন করে কথার জাল বিছিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিল—

'কিন্তু আমি আর কথা বাড়াতে দিইনি। বিদায় জানিয়েছিলাম।

'যাবার সময়ে সে শুধু একটা কথাই বলে গেল—"যুদ্ধ।"

‘নীরবে বসে রইলাম দু’জনে। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী বললে, “যুদ্ধ যদি লাগে, তোমার তো ফিরে যাওয়াই উচিত। দল ভেঙে যেতে বসেছে—”

‘বুঝিয়ে বলেছিলাম, যুদ্ধ লাগছে শুধু এভ্‌সহ্যামের হঠকারিতার জন্য। এটা যদি বুঝে থাকে দলের আর সবাই, এভ্‌সহ্যামকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তারাই করুক-না কেন। আমার যাওয়ার দরকার নেই।

‘এরপর গেলাম সমুদ্রস্নানে। স্নান শেষে ফিরে এলাম ঘরে—সে আর আমি। ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ যেন বেহালার তারে টংকার জাগল—তন্দ্রা ছুটে গেল। দেখলাম, লিভারপুলে নিজের খাটে শুয়ে আছি, এই যুগে।

‘বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেবলই মনে হয়েছিল, স্বপ্ন নয়—যা কিছু ঘটে গেল, সব সত্যি। দাড়ি কামাতে কামাতে, স্নান করতে করতে কেবলই ভেবেছি, এভ্‌সহ্যামের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য অ্যামি কেন সুন্দরী সাহচর্য ছেড়ে ফিরে যাব উত্তরাঞ্চলে? স্বপ্ন দেখার পর এভাবে কেউ কিন্তু ভাবে না। বিশেষ করে আমার পক্ষে এমন ভাবাটা নিতান্তই হাস্যকর। কারণ, পেশায় আমি আইনজীবী। অথচ, ঘুরে-ফিরে স্বপ্নদৃশ্য মনে পড়ছে নিখুঁতভাবে। এমনকী, টেবিলের ওপর রাখা আমার স্ত্রী-র একখানা বইয়ের প্রচ্ছদে সোনালি বর্ডার দেখে মনের মধ্যে ভেসে উঠল নাচের ঘরের থাম থেকে মেরুজ্যোতির মতো ঝুলে-থাকা সোনার সুতোগুলোর দৃশ্য। এত সুস্পষ্টভাবে স্বপ্নদৃশ্য কেউ কি মনে করতে পারে?

মাথা নেড়ে বললাম, ‘না, পারে না।’

লিভারপুলের নামী আইনবিদ আমি। মক্কেলদের ভিড়েও কিছুতেই ভুলতে পারিনি, আজ থেকে হাজার দুয়েক পরে এক প্রেমিকার সাহচর্য উন্মনা করে রেখেছে আমাকে—দু’হাজার বছর পরে আমার সন্তানসন্ততিদের হঠকারিতা নিয়ে বিচলিত রয়েছি সারাদিন। নেতৃত্ব আর সাংগঠনিক শক্তি যার সহজাত, অবিচক্ষণ নেতার অদূরদর্শিতায় সে উতলা রয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে। সেইদিনই একটা নিরানব্বই বছরের বিল্ডিং লিজ নিয়ে দারুণ কথাকাটি হয়ে গেল মক্কেলের সঙ্গে। মাথা গরম হয়ে যাওয়ার ফলেই বোধহয় স্বপ্নটা আর দেখেনি। পরের রাতেও ফিরে আসেনি জীবন্ত স্বপ্নদৃশ্য। ভাবলাম বুঝি, স্বপ্নই দেখেছি তাহলে। নিতান্তই অলীক ব্যাপার। সত্যতা বা বাস্তবতার নামগন্ধও নেই। তারপরেই আবার আবির্ভাব ঘটল আশ্চর্য স্বপ্নের।
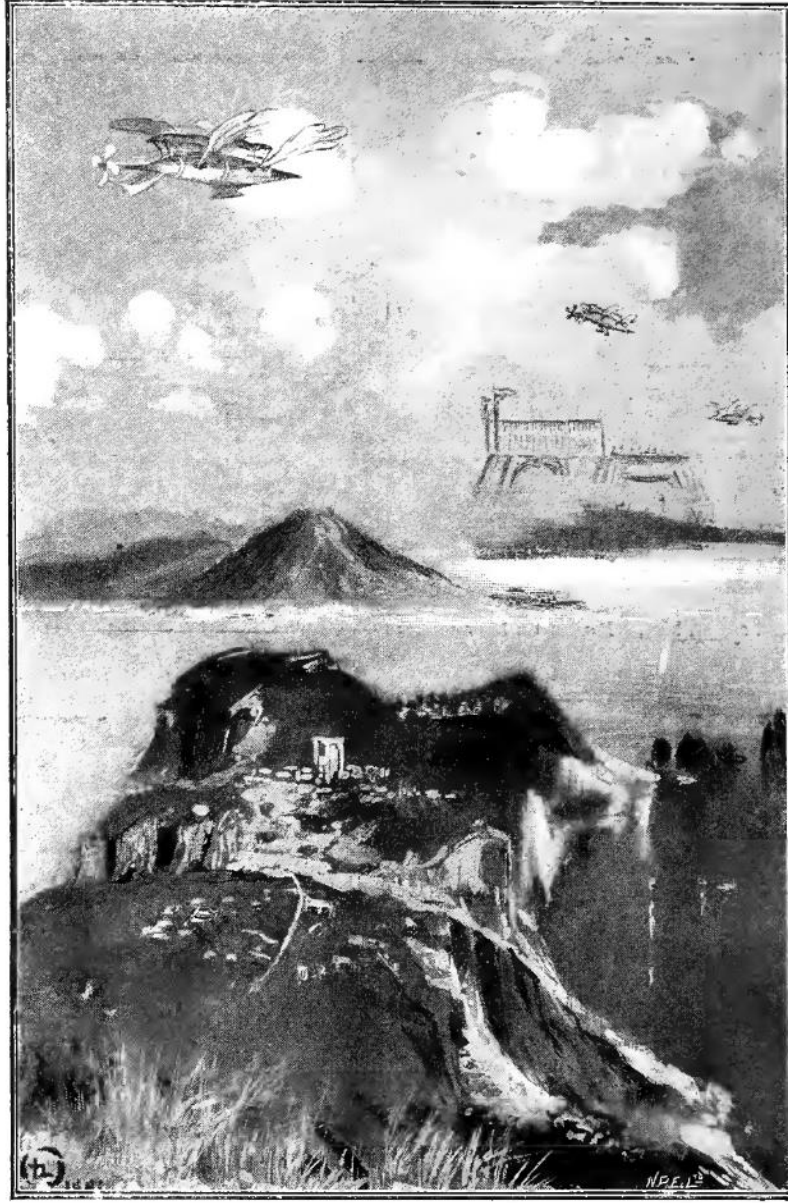
চিত্র ১৮.৩ সামনেই ভিসুভিয়াসের চুড়ো থেকে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে

'এবার এল চার রাত্রি পর। এই চার দিন চার রাত স্বপ্নদৃশ্যও ফুরিয়েছে, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওর মধ্যে। স্বপ্নে জাগরণের ঠিক পরেই আমি গুম হয়ে বসে ছিলাম সেইসবের ভাবনায়, চমক ভাঙল সুন্দরী সঙ্গিনীর গলা শুনে। ডাকছে আমার নাম ধরে।

'দেখলাম, দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছি প্রমোদ-শহরের বাইরে, এসে পড়েছি মন্টি সোলারোর চুড়োর কাছে, দূরে দেখা যাচ্ছে উপসাগর। তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। অনেক দূরে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে সোনালি কুয়াশার মধ্যে ইশচিয়া, পাহাড়ের বুকে নেপল্‌স, সামনেই ভিসুভিয়াসের চুড়ো থেকে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে, দেখা যাচ্ছে টোরি অ্যান্নুজিয়াটা আর ক্যাস্টেলামারের ধ্বংসস্তূপ।'

চকিতে বললাম, ‘ক্যাপ্রি গেছেন নিশ্চয়?’

‘গেছি—স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নের মধ্যেই দেখেছি উপসাগরে ভাসমান প্রাসাদের পর প্রাসাদ, নোঙর-বাঁধা অবস্থায়। উত্তরদিকে দেখেছি এরোপ্লেন নামবার ভাসমান মঞ্চের পর মঞ্চ, বিকেল হলেই প্রমোদসন্ধানীরা হাজারে হাজারে এসে নামছে এরোপ্লেনে করে।

‘এইসব দেখছি আর ভাবছি, কেন এভ্‌সহ্যামের নির্বুদ্ধিতার নিরশন ঘটাতে উত্তরাঞ্চলে যাব আমি। আমিও মানুষ—আমারও সুখের প্রত্যাশা আছে। আমাকে যারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ডাকছে আমাকে। আমার স্বার্থ আমি দেখব না কেন? মানুষের মতো বাঁচার অধিকার তো আমার আছে।

‘চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল এরোপ্লেনের গর্জনে। চারখানা বিশালকায় অদ্ভুতদর্শন যুদ্ধবিমান খেলা দেখাচ্ছে শূন্যে। এভ্‌সহ্যামের নির্বুদ্ধিতার অন্যতম নিদর্শন। চিরকালই ও এইরকম। চমক লাগিয়ে লোকের মন কেড়ে নেয়। বুদ্ধির কুশলতা নেই বলে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। বিমান মহড়া দেখিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে নিজেকে শক্তিমান করে তোলার এই প্রয়াসে গা জ্বলে গেল আমার। যুদ্ধবিমানগুলো তৈরি হয়েছিল অনেকদিন আগে—যুদ্ধে কখনও নামেনি। অস্ত্রবিশারদদের তৈরি বহু বিধ্বংসী অস্ত্রই এখন গাদায় পড়ে। সাধারণ মানুষ পাট চুকিয়ে দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের। নির্বোধ এভ্‌সহ্যাম তা সত্ত্বেও শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে আকাশে-বাতাসে। ওর গর্ব খর্ব করতে পারি আমি এখুনি। উত্তরের মানুষ আমাকে ছাড়া কাউকে নেতা বলে মানে না। পূর্বের আর দক্ষিণের মানুষের কাছে উত্তরের মানুষ বলতে কেবল আমিই। সবাইকে একজোট করতে পারি আমি চক্ষের নিমেষে। কিন্তু কেন করব? কেন আমার মনের মানুষকে ছেড়ে নিরর্থক এই দ্বন্দ্ব রাজনীতির মধ্যে ছুটে যাব?

‘যার জন্যে যেতে চাই না, সে কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে রাতের পর রাত আমাকে বুঝিয়েছে—ফিরে যেতে বলেছে উত্তরে, বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের লোকের স্বার্থে।

‘কথাগুলো মনে পড়তেই কীরকম যেন হয়ে গেলাম। দু’হাতে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নেমে এলাম পাহাড়ের গা বেয়ে। যারা আমাকে চেনে, তারা অবাক হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। ভ্রুক্ষেপ করিনি আমি। পেছনে শুনলাম উড়ুক্কু যুদ্ধ-যন্ত্রযানের প্রচণ্ড ধাতব শব্দ।

‘দেখতে কীরকম মেশিনগুলো?’ প্রশ্ন করেছিলাম কৌতূহলী হয়ে।

‘বর্শার ফলার মতো—ডান্ডাটা কেবল নেই। গোলা বেরয় পেছনের ডান্ডার জায়গা থেকে—সামনের ফলাটা ঢুঁ মারার জন্যে। গতিবেগ প্রচণ্ড। উড়ন্ত গাছের পাতা বলা যায়।’

‘কী দিয়ে তৈরি?’

‘লোহা নয়।’

‘অ্যালুমিনিয়াম?’

‘তা-ও নয়। খুব মামুলি একটা ধাতু—তামা-পিতলের মতো সব জায়গায় পাওয়া যায়। নামটা... নামটা...।’ আবার রগ টিপে ধরে মনে করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলে নিরক্তমুখ সলিসিটর—‘নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ছে না।’

‘যা-ই হোক, ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগটা ছেড়ে দিলাম কীভাবে, এবার তা শুনুন। হাঁটতে হাঁটতে দু’জনে যখন ফিরে এলাম প্রমোদ-শহরে, তখন আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। ছাদে বেড়াতে বেড়াতে চোখের জলে সঙ্গিনী আমাকে বারবার মিনতি করেছিল উত্তরে ফিরে যেতে। নইলে যে যুদ্ধ লাগবেই, দেশে দেশে জমিয়ে রাখা অস্ত্রের ভাঁড়ার খালি হবেই—পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি নিজেও তা জানি বইকী। দক্ষিণের নেতারা একজোট হয়ে এভ্‌সহ্যামের ধাপ্পাবাজির উচিত জবাব দিয়েছে গরম গরম ভাষায়। তামাম এশিয়া, সব ক’টা মহাসাগর থমথম করছে আসন্ন শেষ বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে। ঘন ঘন হুঁশিয়ারি যাচ্ছে ইথার আর তারের মধ্যে দিয়ে—সাজ-সাজ রব উঠেছে সারা পৃথিবীতে।

‘কিন্তু আমি যাব না—কিছুতেই না। কথায় আমার সঙ্গে সে পারেনি। বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কেন আমি যাব না। যদি তার মৃত্যু হয়, আমারও মৃত্যু হোক তৎক্ষণাৎ।

‘ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগটা হাতছাড়া করলাম এইভাবেই।’

‘তারপর গেছে তিনটে সপ্তাহ—স্বপ্নে জাগরণ ঘটতে লাগল ঘন ঘন। এই তিনটে হপ্তার প্রায় প্রতিরাত্রে স্বপ্নই আমার একমাত্র জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চাইতেও বেশি কষ্ট গেছে, যে রাতগুলো স্বপ্নহীন অবস্থায় কেটেছে। ছটফট করেছি বিছানায় শুয়ে, অভিশপ্ত এই জীবনে, আমার জীবন্ত স্বপ্নের জীবনে তখন কিন্তু সময় বয়ে চলেছে ঘটনার পর ঘটনার মধ্যে দিয়ে, ভয়াবহ ঘটনাপরম্পরার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারিনি, বিষম উদ্‌বেগে বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি যে কী কষ্টে, তা শুধু আমিই জানি।

ভাবনার মধ্যে কিছুক্ষণ তলিয়ে রইল সলিসিটর।

তারপর বললে, ‘রাতের বেলায় স্বপ্নের মধ্যে জাগরণের মুহূর্তে যা যা ঘটেছে, সব আপনাকে খুঁটিয়ে বলে যেতে পারি, প্রতিটি ব্যাপার মনে পড়ছে, কিন্তু দিনের বেলায় কী যে ঘটেছে, কিছুতেই তা মনে করতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, বিদ্রোহী থেকেছে স্মৃতি বরাবর—’

ঝুঁকে পড়ে দু’হাত জড়ো করে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ অবস্থায় বসে রইল নিরক্তমুখ মানুষটা।

‘তারপর কী হল বলুন,’ জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

‘হারিকেন ঝড়ের মতো যুদ্ধ ফেটে পড়ল পৃথিবীময়।’

অবর্ণনীয় এক দৃশ্যের পানে যেন চেয়ে রইল সে বিস্ফারিত চোখের শূন্য চাহনি মেলে।

‘বলুন?’ তাড়া লাগিয়েছিলাম আমি।

আত্মগত সুরে সে বললে, ‘অবাস্তবতার ঈষৎ ছোঁয়াকেই লোকে বলে দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আমি যা দেখেছি, তা দুঃস্বপ্ন নয়... না, না, তা দুঃস্বপ্ন নয়... কিছুতেই নয়!’

আবার নীরবতা। ভয় হল, কাহিনির শেষের অংশে নিশ্চয় বীভৎস ঘটনাপরম্পরার জন্যেই মুখ খুলতে চাইছে না নিরক্তমুখ সহযাত্রী। আমিও আর তাড়া না লাগিয়ে চাবি এঁটে রইলাম মুখে। অচিরেই অবশ্য শুরু হয়ে গেল স্বগতোক্তি।

‘পালিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। ভেবেছিলাম, যুদ্ধের আওতার বাইরে থাকবে ক্যাপ্রি। কিন্তু দু’রাত যেতেই যুদ্ধ-পাগল হয়ে উঠল গোটা দ্বীপটা। খেপে গেল দ্বীপের প্রতিটি মানুষ। উৎকট গলাবাজিতে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হল বললেই চলে। প্রতিটি পুরুষ, প্রতিটি নারীর বুকে ঝুলতে দেখলাম এভ্‌সহ্যামের ব্যাজ। ব্যাজ না-পরার জন্যে আমার সঙ্গিনীর ওপরেই ঝাঁজিয়ে উঠল এক মহিলা। বুঝলাম, আমার সময় খতম হয়ে গেছে। ব্যাজের দাম এখন অনেক বেশি—আমার চেয়ে। মানুষের গাদাগাদি, কানের কাছে যুদ্ধ-সংগীতের উন্মত্ত অট্টরোল—কাঁহাতক আর সওয়া যায়।
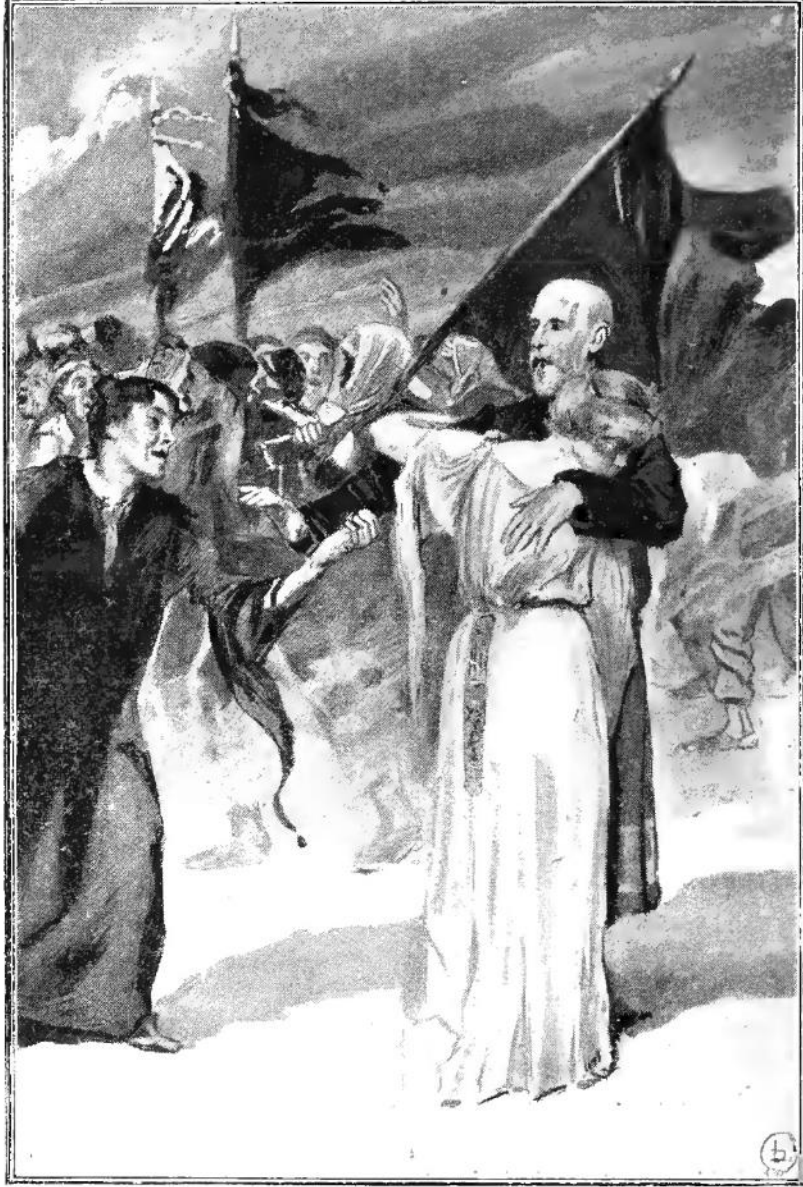
চিত্র ১৮.৪ খেপে গেল দ্বীপের প্রতিটি মানুষ।

সঙ্গিনীকে নিয়ে ফিরে এলাম নিজের ছোট্ট ঘরে। অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হয়েও মুখ খুলতে পারলাম না। যে সুযোগ হারিয়েছি, আর তো তা ফিরে আসবে না। নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগলাম ছোট্ট বন্দিশালায়। রক্তহীন সাদা মুখে নীরবে শুধু চেয়ে রইল আমার সঙ্গিনী। ঝগড়া করতেও পিছপা হতাম না, যদি এ অবস্থার জন্যে সামান্যতম দোষারোপও শুনতে হত সেই সময়ে।

'খানদানি চালচলনের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না আমার মধ্যে। প্রস্তর কারাগারে পায়চারি করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর দেখেছি, কালো সমুদ্রের ওপর দিয়ে আলোর ঝলক ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণের আকাশে—মিলিয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে।

‘বারংবার বলেছিলাম—আর নয়, এবার পালাতে হবে। এ যুদ্ধে আমার কোনও ভূমিকা নেই—থাকবেও না। শান্তি যখন নেই এ দ্বীপে, চল, তখন চলে যাই।

‘পরের দিন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের খপ্পর থেকে পলায়ন করেছিলাম দু’জনে। দূরে... দূরে অনেক দূরে।

‘কত দূরে?’

জবাব নেই।

‘কদ্দিন লেগেছিল পালাতে?’

সে নিরুত্তর। মুখ সাদা। হাত মুষ্টিবদ্ধ। আমার কৌতূহল তাকে আর স্পর্শও করছে না।

‘পালিয়ে গেলেন কোথায়?’

‘কখন?’

‘ক্যাপ্রি থেকে বেরিয়ে?’

‘দক্ষিণ-পশ্চিমে। নৌকোয় করে।’

‘এরোপ্লেন নিলেন না কেন?’

‘সব এরোপ্লেনই তখন যুদ্ধ-পাগলদের হাতে।’

আর প্রশ্ন করা সমীচীন বোধ করলাম না। একটু পরে সে যেন নিজের মনের সঙ্গেই তর্ক চালিয়ে গেল আত্মগত সুরে।

‘কেন এই যুদ্ধ? কেন এই রক্তক্ষয়? কেন জীবন নিয়ে হানাহানি? ভালোভাবে জীবনটাকে উপভোগ করব বলেই তো সরে এসেছিলাম যুদ্ধ থেকে—ভালোবেসে বাঁচতে চেয়েছিলাম, ঢলঢলে দুটো চোখের মধ্যে নতুন জীবনের ছবি দেখেছিলাম, সুন্দর একটা মুখের মধ্যে জীবনের আহ্বান স্পন্দিত হতে দেখেছিলাম। কিন্তু তার বদলে কী পেলাম? যুদ্ধ আর মৃত্যু!’

‘স্বপ্ন ছাড়া তো কিছু না।’
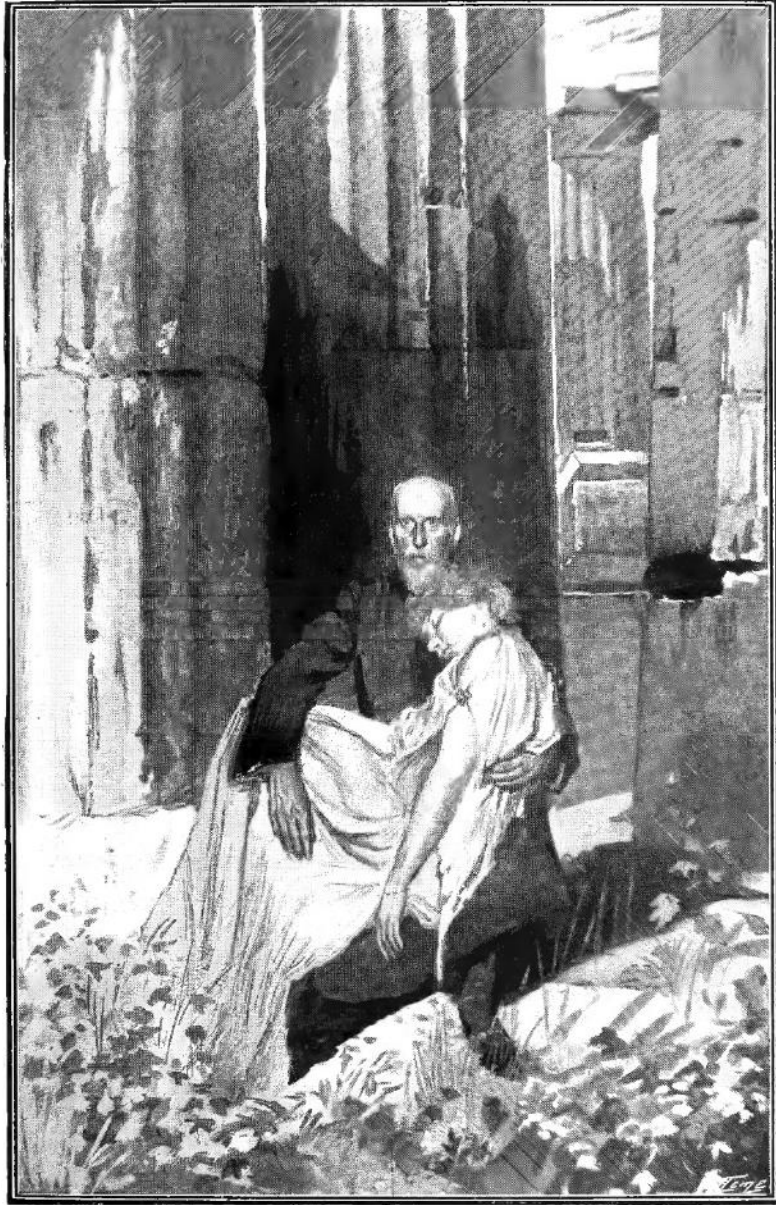
চিত্র ১৮.৫ এইভাবেই কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না।

'স্বপ্ন!' দপ করে জ্বলে উঠেছিল সে—'এখনও বলবেন এর নাম স্বপ্ন!'

সেই প্রথম দেখলাম, প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটল যেন তার মধ্যে। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে শূন্যে তুলে ফের নামিয়ে নিল হাঁটুর ওপর। চোখ ফিরিয়ে নিলে আমার দিক থেকে। বাকি কথাগুলো বলে গেল অন্যদিকেই চেয়ে।

'প্রেতচ্ছায়ার মতোই অনেক বাসনা-কামনা ঘিরে রয়েছে আমাদের। প্রেতচ্ছায়ার মধ্যে প্রেতচ্ছায়ার মতোই এগিয়ে চলেছি আমরা দিনের পর দিন। আলো আর ছায়ার মতো বাস্তবতা আর অবাস্তবতার দোলায় দুলে যাচ্ছি নিরন্তর। একটা বিষয় কিন্তু স্বপ্ন নয় মোটেই, কখনও নয়। যা আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আর সবকিছুই তুচ্ছ, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর এই কেন্দ্রবিন্দুর কাছে। সব মিথ্যে, সব ফাঁকা!

কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আমার সঙ্গিনী, যাকে আমি ভালোবাসি, আমার স্বপ্নের সেই সঙ্গিনী, যাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। মারা গেছি দু'জনেই!

'স্বপ্ন! যে স্বপ্ন একটা জীবন্ত মানুষের দিবস-রজনির প্রতিটি মুহূর্তে বিষম যাতনায় ভরিয়ে রাখে, তাকে কি স্বপ্ন বলা যায়? স্বপ্নের শোকের যন্ত্রণা জাগরণে একজনকে এইভাবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে? তবুও বলবেন এর নাম স্বপ্ন?

'সঙ্গিনী নিহত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছিল, পালিয়ে বেঁচে যাব। নৌকোয় যাওয়ার সময়ে দেখেছিলাম যুদ্ধসাজে সজ্জিত ক্যাপ্রিকে। সাদা পাথরের অজস্র জানলা আর তরুবীথি-সমারোহ দেখে তখনও শান্তির নিকুঞ্জ বলেই মনে হয়েছিল দ্বীপটাকে। তারপরে চোখে পড়েছিল বিরাট বিরাট হাতিয়ার। উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে দেখেছিলাম বর্শাফলকের আকারে ধাবমান বিমানশ্রেণির ছুটোছুটি। এভ্‌সহ্যাম নিশ্চেষ্ট নেই—ধেয়ে যাচ্ছে পূর্বে। পূর্বের বিমান ধেয়ে যাচ্ছে উত্তরে। দক্ষিণ থেকেও আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান। বিশালকায় পাখির দঙ্গল পঙ্গপালের মতো ছেয়ে ফেলেছে আকাশকে। যুদ্ধে মেতেছে সারা পৃথিবী।

'ডাঙায় পায়ে হেঁটে যেতে গিয়ে বাধা পেয়েছি পদে পদে। পকেটে অর্থ নেই—আমার পরিচয়েরও আর কোনও দাম নেই। সঙ্গিনীর নিগ্রহ-সম্ভাবনায় কারও কাছে দাক্ষিণ্যপ্রত্যাশীও হইনি। ঘন ঘন কামান নির্ঘোষ শুনেছি দক্ষিণ-পশ্চিমে। চোরের মতো গা ঢেকে আমরা এগিয়েছি শুধু উত্তরদিকে। পথকষ্ট ক্লান্ত করেছে সঙ্গিনীকে, কষ্ট কাকে বলে, জীবনে সে জানেনি, তবুও মুখ ফুটে কখনও তা ব্যক্ত করেনি। খিদের জ্বালা মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। ছিন্ন পোশাকে ধুলোয় আর নোংরায় আমাদের চেহারা পর্যন্ত পালটে গেছে। পালাচ্ছে চাষিরাও। ধরা পড়ছে সৈন্যদের হাতে, চালান করছে সেনাশিবিরে। মতলব ছিল, আবার একটা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ভাসব, কিন্তু তা আর হল না। যুদ্ধ গিলে নিল আমাদের দু'জনকেই।
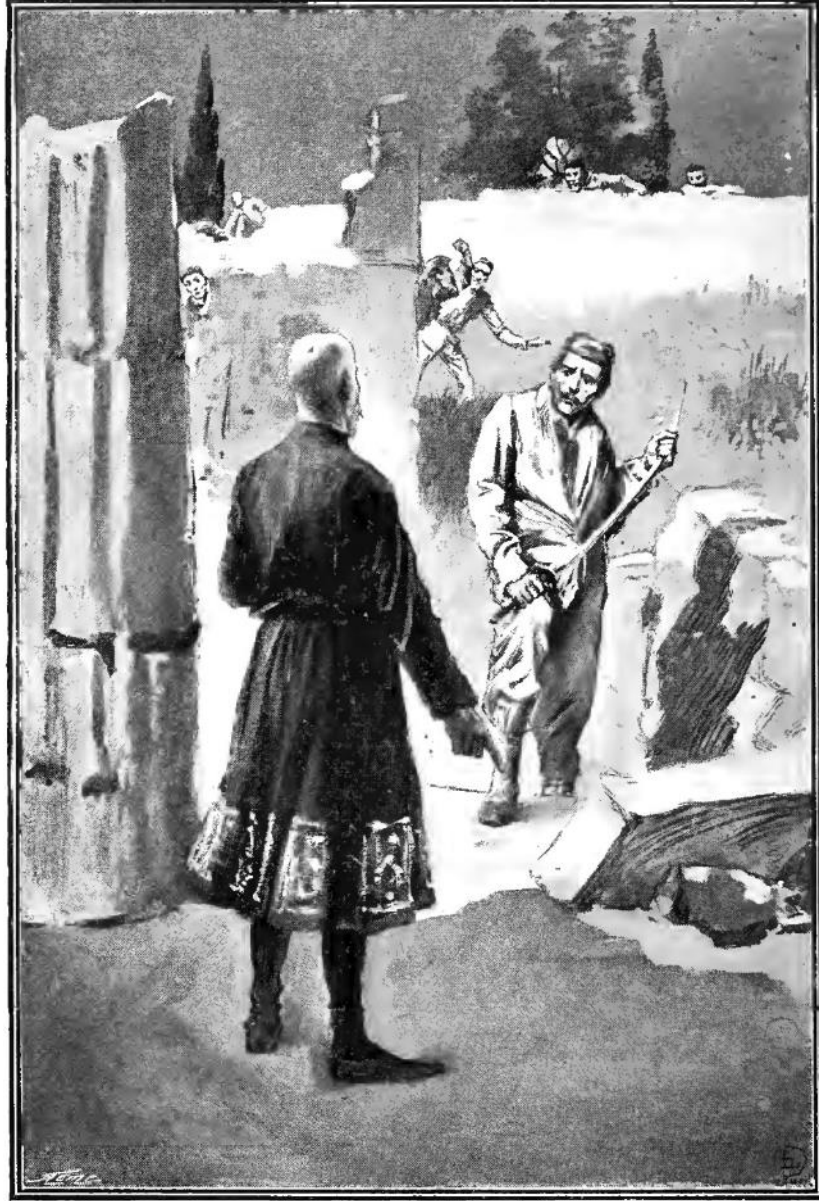
চিত্র ১৮.৬ একজন তলোয়ারধারীর হাত চেপে ধরতেই—

'বেশ বুঝেছিলাম, দু'দল সৈন্যের মাঝে পড়ে গিয়েছি। লড়াইয়ের ঠিক মাঝখানে। ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। শুনছি কামান নির্ঘোষ। সেসব কামান এ যুগের কামানের চেয়েও অনেক বেশি বিধ্বংসী, সে যুগের যুদ্ধবিমানদের ক্ষমতা যে কদ্দূর, সে হিসেবও কেউ রাখে না, তৈরি হওয়ার পর থেকে কোনও দিন কাজে তো লাগেনি...

'আমার সঙ্গিনী কাঁদছিল। আমি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পথকষ্ট আর সইতে পারছে না—কাঁদুক। একটু আগে মিনতি করেছিল। আমি রাজি হইনি। যুদ্ধে আমি নেই—থাকবও না। অনুতাপ? একেবারে নেই। মৃত্যু? আসুক-না।

‘মাথার ওপর ফাটল একটা গোলা। দূরে কয়েকটা বিমান জ্বলতে জ্বলতে ফেটে গেল শূন্যে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সঙ্গিনী উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে। তারপরেই মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

‘কাছে গেলাম। হৃৎপিণ্ড এ ফোঁড়-ও ফোঁড় হয়ে গেছে গোলার টুকরোয়।

‘তারপর?’

‘পাঁজাকোলা করে তাকে বয়ে আনলাম কতকগুলো পুরানো মন্দিরের মাঝে একটা চত্বরে—কবরখানা বলেই মনে হল। পাথরের ওপর তাকে শুইয়ে পাশে বসে রইলাম পাথরের মতো। টিকটিকি আর গিরগিটি ছুটোছুটি করতে লাগল আশপাশে।

‘এইভাবেই কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। স্বপ্ন থেকে ফিরে এসে দেখেছিলাম, বসে রয়েছি অফিসঘরে। কীভাবে যে ঘুম থেকে উঠে জামাকাপড় পালটে অফিসে এসেছি, কিচ্ছু মনে নেই। চিঠিপত্র দেখে গেছি যন্ত্রের মতো—কী লেখা ছিল কাগজপত্তরে—তা-ও মনে নেই।

‘আবার যখন ফিরে গেলাম স্বপ্নের মধ্যে—দেখেছিলাম, একদল সৈন্য এগিয়ে যাচ্ছে মন্দির চত্বরের দিকে—আমি বসে আছি বাইরে। বাধা দিয়েছিলাম। আমার ভাষা তারা বোঝেনি। আমিও তাদের ভাষা বুঝিনি। একজন তলোয়ারধারীর হাত চেপে ধরতেই—

‘তলোয়ারটা আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার বুকে।

‘না। কোনও যন্ত্রণা অনুভব করিনি। অপরিসীম বিস্ময়বোধে শুধু আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।’

লন্ডন এসে গেছে। ল্যাম্পপোস্টের পর ল্যাম্পপোস্ট সাঁত সাঁত করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গোধূলির রক্তাভা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গতি কমে আসছে ট্রেনের।

‘আর স্বপ্ন দেখেননি?’ প্রশ্ন করেছিলাম বিষম উৎকণ্ঠায়।

‘দেখেছি। শুধুই দুঃস্বপ্ন। মন্দিরের ওদিকে রয়েছে আমার সঙ্গিনী। কাছে যেতে পারছি না কিছুতেই।’

কুলির হাঁক শুনলাম বাইরে।

অনুবাদক: আরমাগেডন—বাইবেলে, বিশেষ করে বুক অব রিভিলেশন-এ শেষের দৃশ্য, শুভ বনাম অশুভ শক্তির চূড়ান্ত লড়াই। এ লড়াই হবে বিচার দিবসের আগে। নামের মধ্যে সম্ভবত মেগিডো পাহাড়ের উল্লেখ আছে। বহু প্রাচীন যুদ্ধের ক্ষেত্র ছিল বলে লোকপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ প্রতীক হিসাবে মেগিডো পাহাড় বিখ্যাত।
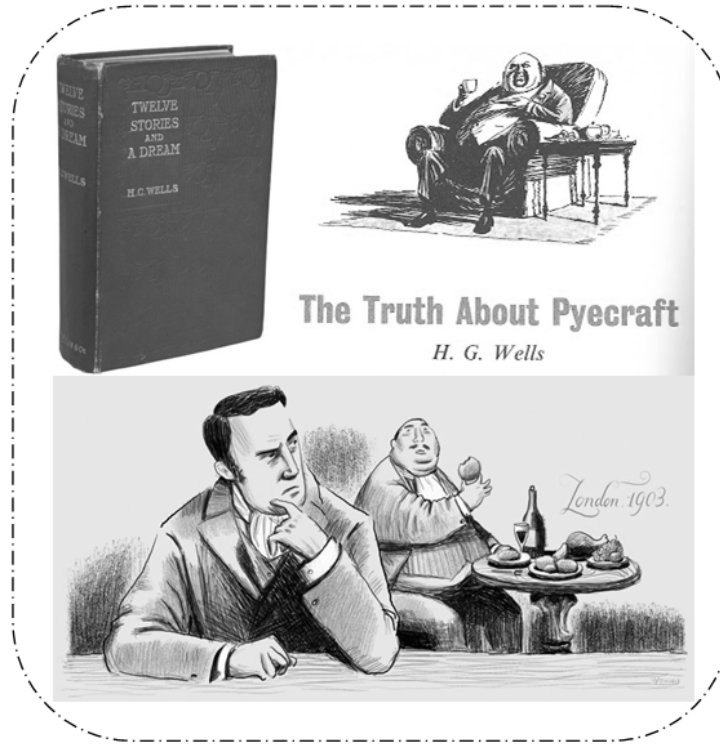
‘The Truth About Pyecraft’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘Strand Magazine’ পত্রিকায় এপ্রিল ১৯০৩ সালে। পরে ‘Macmillan and Co.’ থেকে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত ‘Twelve Stories and a Dream’ সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। পরবর্তী কালে এটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত ‘Alfred Hitchcock’s Ghostly Gallery’ সংকলনটিতে স্থান পায়।

পাইক্র্যাফ্‌ট প্রহেলিকা
(The Truth About Pyecraft)

পাইক্র্যাফ্‌ট বসত আমার কাছ থেকে প্রায় বারো গজ দূরে। কিন্তু ঠায় চেয়ে থাকত আমার দিকে, দু'চোখে অসীম মিনতি নিয়ে। নিছক মিনতি বলব না, তার সঙ্গে মিশে থাকত একটু সন্দেহ।

এত সন্দেহ? কোনও কথাই তো কাউকে বলিনি এদ্দিন। বলবার হলে অনেক আগেই বলতাম। বললেই বা কে বিশ্বাস করছে?

বেচারি পাইক্র্যাফ্‌ট। যেন একটা জেলির পিপে। লন্ডনের সবচাইতে ধুসকো মোটকা মানুষ!

চুল্লির ধারে বসে কেক গিলছে, গিলছেই। আর আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে। চোখে সেই নীরব মিনতি, কাউকে বলো না, ভায়া!

বলতাম না, যদি-না ওর চোখের কোণে আমার সততার ওপর সন্দেহের ছায়াপাত দেখা যেত। পাইক্র্যাফ্‌ট, এই জন্যেই সব কথা বলব সবাইকে। অনেক সাহায্য করেছি তোমাকে, অথচ তোমার জন্যেই আজ আমার ক্লাব-জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই তোমার সামনেই এই টেবিলে বসে লিখে যাচ্ছি তোমার গুপ্তকথা।

এত খাওয়াই বা কেন? খাওয়ার কি আর শেষ নেই? গিলেই যাচ্ছ কোঁত কোঁত করে!

যাক গে, এবার অবসান ঘটুক পাইক্র্যাফ্‌ট প্রহেলিকার!

চিত্র **১৯.১** শুরু হয়ে গেল নিজের মোটা হওয়া নিয়ে ধানাইপানাই।

পাইক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে প্রথম পরিচয় এই ধূমপানকক্ষেই। একে তো অল্প বয়স, তার ওপর নতুন সদস্য, কাজেই একটু নার্ভাস ছিলাম। পাইক্র্যাফ্‌ট তা লক্ষ করেই হেলেদুলে ভারী গতরখানা টেনে এনে ধপাস করে বসে পড়েছিল আমার গা ঘেঁষে। হুস-হুস কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলার পর ইয়া মোটা একখানা চুরুট বার করে ধরিয়ে নিয়েছিল দেশলাই জ্বেলে। তারপর কথা শুরু হয়েছিল আমার সঙ্গে। কী কথা তা সঠিক মনে নেই। তবে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো যে একেবারেই বাজে, এই জাতীয় কিছু বলেই মনে আছে। পাশ দিয়ে যত ওয়েটার গেছে, তাদের প্রত্যেককে ডেকে বলেছে একই কথা, অতি রদ্দিমার্কা দেশলাই। ঘষতে ঘষতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

খ্যানখেনে সরু গলায় অসভ্য দেশলাই-প্রসঙ্গ দিয়েই পাইক্র্যাফ্‌ট গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়েছিল আমার সঙ্গে।

হাবিজাবি অনেক বিষয় নিয়ে ভ্যাড়ভ্যাড় করে বকতে বকতে অবশেষে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করেছিল খেলাধুলো সম্বন্ধে। আমার চেহারাটা একটু পাতলা, রোগাই বলা চলে; গায়ের রংটাও কালচে, ঠাকুমার মা হিন্দু বলেই হয়তো, কিন্তু সে জন্যে লজ্জা পাই না মোটেই। কিন্তু আমার গায়ের রং দেখে ধমনির হিন্দু রক্ত সম্বন্ধে কেউ ইঙ্গিত করুক, এটাও চাই না মোটেই। তাই যখন পাইক্র্যাফ্‌ট ফট করে বলে বসল,

নিশ্চয় ক্রিকেট খেলি আমি, কেন-না চেহারাটা বেশ পাতলা, গায়ের রংও কালচে, খাইও নিশ্চয় কম, পাইক্র্যাফ্‌টের মতোই (সব মোটা মানুষের মতো ওরও বিশ্বাস, স্রেফ না খেয়েই নাকি মোটা হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন), ব্যায়ামও করি কম নাকি ওর মতোই—তখন থেকেই মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল পাইক্র্যাফ্‌টের ওপর।

তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল নিজের মোটা হওয়া নিয়ে ধানাইপানাই। মোটা হওয়ার ব্যাপারে কী কী করেছে এবং কী কী করতে চায়। পাঁচজনে কী কী উপদেশ দিয়েছে তার মোটা হওয়ার ব্যাপারে এবং মোটা যারা হয়েছে, তারাই বা কী কী করেছে তাদের মোটা হওয়ার ব্যাপারে, পুষ্টিকর খাবারদাবার বন্ধ করলেই ল্যাটা চুকে যায় না, আসলে দরকার খাদ্যনিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত ওষুধপত্র। মাথা ধরে গেল যাচ্ছেতাই মোটা মোটা কথাবার্তায়।

ক্লাব-জীবনে এ ধরনের অত্যাচার এক-আধদিন সওয়া যায়। কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌ট অত্যাচার চালিয়ে গেল দিনের পর দিন। ওর জন্যে ধূমপানকক্ষে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম না। যেখানেই থাকি-না কেন, ঠিক হেলেদুলে ভারী গতরখানা নিয়ে আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ত এবং শুরু হয়ে যেত একই বিষয়ের চর্বিতচর্বণ। প্রথম থেকেই একটা জিনিস আঁচ করেছিলাম। ওর বিষম বিপদের সুরাহা নাকি আমার মধ্যে দিয়েই হতে পারে—একমাত্র সুযোগ বাড়িয়ে দিতে পারি কেবল আমিই—এইরকম একটা ধারণা ঘুরঘুর করছে ওর মগজে। গায়ে পড়ে তাই এত আলাপ জমানোর চেষ্টা।

শেষ পর্যন্ত তো একদিন বলেই ফেলল, পশ্চিমি ওষুধপত্রের নাকি কোনও ক্ষমতাই নেই চর্বি কমানোর—শরীর হালকা করার। পারে কেবল প্রাচ্যের মানুষরা। আর সামলাতে পারিনি নিজেকে। তেড়েমেড়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার ঠাকুমার মা যে ভারতবর্ষের মেয়ে, এ খবরটা দিয়েছে কে? প্যাটিসন?

'হ্যাঁ,' মিনমিন করে বলেছিল পাইক্র্যাফ্‌ট। ঘুরিয়ে বলেছিল অবিশ্যি। জানি কথাটা মিথ্যে। প্যাটিসন পাঁচন খেয়েছিল নিজের ঝুঁকিতে।

বলেছিলাম ঝাঁজের সঙ্গে, 'আমার ঠাকুমার মা অনেকরকম পাঁচনের ফর্মুলা দিয়ে গেছে আমাদের ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বিপজ্জনক ব্যাপার। আনাড়ির হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই। পইপই করে বারণ করে গেছে বাবা—'

'পরখ করে দেখেছিলেন বুঝি?' যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, এমনি সুরে বলেছিল পাইক্র্যাফ্‌ট।

'একবারই করেছিল—একটা পাঁচনের।'

'এমন কোনও পাঁচন কি নেই, যা খেলে—'

'বিদঘুটে পুঁথিগুলোয় যা লেখা আছে, তা পড়েই ভয় ধরে যায়। অদ্ভুত, উদ্ভট সব ব্যাপার ঘটতে পারে। খাওয়া তো দূরের কথা—নাকে গন্ধ পেলেও—'

কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌টকে আর কি আটকানো যায়? ভেবেছিলাম, ওইটুকু বলেই ওর উৎসাহ নিবিয়ে দেওয়া যাবে। ঘটল ঠিক তার উলটো। উৎসাহটা গেল বেড়ে। জান কয়লা করে ছাড়ল আমার। প্যাটিসন যে পাঁচনটা গিলেছিল, তার মধ্যে ক্ষতিকর কিছু ছিল না। অন্যান্য পাঁচনের ফর্মুলাতেও দোষের কিছু নেই বলেই জানি। কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌টকে অত কথা বলতে যাব কেন? পাঁচন খাওয়ার মধ্যে ঝুঁকি আছে বললেই ঘ্যানর ঘ্যানর করে এক গানই গেয়ে গেছে—ঝুঁকি নিতে সে রাজি আছে।

মোট কথা, অতিষ্ঠ করে ছাড়ল আমাকে পাইক্র্যাফ্‌ট হারামজাদা। বিদঘুটে পাঁচনগুলোর মধ্যে বিষ-টিশ যদি কিছু থাকে...

ভাবতেই চনমন করে উঠেছিল মনটা। মোটকা পাইক্র্যাফ্‌টকে বিষ-পাঁচন গিলিয়ে দিলে কেমন হয়?

সেই দিনই রাত্রে অদ্ভুতদর্শন অদ্ভুতগন্ধী চন্দন কাঠের বাক্সটা বার করলাম সিন্দুকের ভেতর থেকে। ভেতরকার খসখসে চামড়াগুলো দেখলাম উলটে-পালটে। যে ভদ্রলোক ফর্মুলা লিখে দিয়েছিলেন ঠাকুমার মা-কে, তাঁর বাতিক ছিল নানা ধরনের পশুচর্ম সংগ্রহের। গোটা গোটা অক্ষরে এইসব চামড়ার ওপরেই ঠেসে লিখে গেছেন অজস্র ফর্মুলা। আমাদের ফ্যামিলির অনেকেই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যুক্ত থাকায় বংশানুক্রমে কাজ চলার মতো হিন্দুস্তানি ভাষায় দখল আছে প্রত্যেকেরই। তা সত্ত্বেও কয়েকটা ফর্মুলা এক্কেবারে পড়তেই পারলাম না এবং কোনওটাই খুব সহজবোধ্য ঠেকল না। এরই মধ্যে একটায় নাক গলাতে পারলাম কোনওমতে এবং সেইটা নিয়েই বসে পড়লাম সিন্দুকের পাশে।

পরের দিন পাইক্র্যাফ্‌টকে চামড়াখানা দেখাতেই ছিনিয়ে নেয় আর কী—ঝাঁ করে সরিয়ে নিয়েছিলাম নাগালের বাইরে।

বলেছিলাম, 'দেখ বাপু, অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করেছি—যদ্দূর বুঝেছি, মনে হয়, এই পাঁচন খেলেই তোমার ওজন কমবে। তুমি তো ওজনটাই কমাতে চাও—তা-ই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' সে কী উৎসাহ পাইক্র্যাফ্‌টের।

আমি বলেছিলাম, 'আমার পরামর্শ যদি নাও, তাহলে বলব, এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে যেয়ো না। প্রথমত, পাঁচনের ফর্মুলার মানেটা পুরোপুরি বুঝেছি বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, আমার মায়ের দিকের পূর্বপুরুষরা বড়ই সৃষ্টিছাড়া টাইপের মানুষ ছিলেন। বুঝেছ, কী বলতে চাইছি?'

'চেষ্টা করেই দেখা যাক-না।'

বুঝলাম গোঁ ছাড়বার পাত্র নয় মোটকা পাইক্র্যাফ্‌ট। কী আর করা যায়, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জানতে চেয়েছিলাম, রোগা হয়ে যাওয়ার পর নিজের চেহারাখানা কীরকম দাঁড়াবে, সে ব্যাপারটা কি ভাবা হয়েছে? কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌টকে তখন যুক্তি দিয়ে বোঝায় কার সাধ্যি। নিরুপায় হয়ে ছোট্ট চামড়াখানা ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, খবরদার, আর যেন নিজের মোটা বপু সম্বন্ধে মোটা মোটা কথা শোনাতে আমাকে না আসে।

শেষকালে বলেছিলাম, 'পাঁচনটা কিন্তু সুবিধের নয় বলে রাখছি। জঘন্য।'

'হোক গে,' বলে চামড়াখানা উলটে-পালটে দেখেই খাবি খেয়েছিল হিন্দুস্তানি হরফ দেখে! ইংরেজি তো নয়!

শেষ পর্যন্ত তরজমা করে শোনাতে হয়েছিল আমাকেই। তারপর গেছে পনেরোটা দিন। এই পনেরো দিনে যতবার আমার কাছে ঘেঁষতে এসেছে সে, ততবারই দূর থেকে হাত নেড়ে বলেছি আরও দূরে সরে পড়তে। কিন্তু পরে পনেরোটা দিন যাওয়ার পরেও দেখেছি, মোটা রয়েছে আগের মতোই।

পনেরো দিন পর আর দূরে আটকে রাখা যায়নি পাইক্র্যাফ্‌টকে। শুরু হয়েছিল নাকিকান্না। নিশ্চয় কোথাও গোলমাল হয়েছে। পাঁচনে কাজ হচ্ছে না কেন?

ফর্মুলাটা চাইতেই পকেট বুক থেকে বার করে দিয়েছিল পাইক্র্যাফ্‌ট।

উপাদানগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, 'ডিমটা ফেটিয়ে নিয়েছিলে?'

'না তো। দরকার ছিল কী?'

'সেটা কি বলতে হবে? ঠাকুমার মা ঠিক যেভাবে পাঁচন তৈরি করতে বলেছে, সেইভাবেই করতে হবে। সামান্য হেরফের থেকেই মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। র‍্যাট্‌ল সাপের বিষটা টাটকা ছিল তো?'

'র‍্যাট্‌ল সাপের বিষ জোগাড় করেছিলাম জ্যামরাকসের কাছ থেকে। দামটা—'

'সেটা তোমার ব্যাপার। শেষ উপাদানটা—'

'ওটার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে—'

'বুঝেছি। এই ফর্মুলায় চলবে না। একই পাঁচনের আরও কয়েকটা ফর্মুলা লেখা রয়েছে দেখছি। তা-ই থেকেই আর-একটা লিখে দিচ্ছি। বানানটা দেখছি জঘন্য—আমার বিদ্যেয় কুলাচ্ছে না। ভালো কথা, কুকুর মানে খুব সম্ভব নেড়িকুত্তা!'

এরপর ঝাড়া একটা মাস ধরে দেখেছি একই রকম মোটা শরীর নিয়ে ভীষণ উদ্‌বেগে ক্লাবময় চক্কর মারছে পাইক্র্যাফ্‌ট। চুক্তিভঙ্গ করেনি একবারও। দু'-একবার শুধু দূর থেকেই মাথা নেড়েছে হতাশভাবে। একদিন পোশাক-ঘরে আমাকে একলা পেয়েই যেই বলেছে, 'তোমার ঠাকুমার মা—,' অমনি এক দাবড়ানি দিয়ে আমি

বলেছি, ‘খবরদার, কোনও কথা বলবে না আমার ঠাকুমার মা সম্বন্ধে।’ বাস, এক্কেবারে ঠান্ডা মেরে গেছে পাইক্র্যাফ্‌ট।

চিত্র ১৯.২ পাঁচনটা কিন্তু সুবিধের নয় বলে রাখছি। জঘন্য।

ভেবেছিলাম, বুঝি আর ঘাঁটাতে আসবে না আমাকে। একদিন দেখলাম, তিনজন নতুন সদস্যকে জ্বালিয়ে মারছে নিজের মোটা চেহারার কথা শুনিয়ে। নতুন ফর্মুলার সন্ধানে আছে নিশ্চয়। তারপরেই বলা নেই, নেই দুম করে পেলাম তার টেলিগ্রাম।

‘ঈশ্বরের দোহাই, এখুনি এসো।—পাইক্র্যাফ্‌ট।’

যাক, ওষুধ তাহলে ধরেছে। পাঁচনে কাজ হয়েছে। ঠাকুমার মায়ের ইজ্জত রক্ষে পেয়েছে। মনের আনন্দে দশ রকমের পদ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেলাম দুপুরের খাওয়া। কফি খাওয়ার পর চুরুটটা শেষ না করেই রওনা হলাম পাইক্র্যাফ্‌টের বাড়ির দিকে। ঠিকানা জোগাড় করেছিলাম ক্লাব থেকে। ও থাকে ব্লুমসবুরির একটা বাড়ির ওপরতলায়। সদর দরজায় পাইক্র্যাফ্‌ট কোথায় আছে জিজ্ঞেস করতেই শুনলাম, নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে, দু’দিন তার টিকি দেখা যায়নি। ও যে তলায় থাকে, সেই তলার চাতালে পৌঁছাতেই উদ্‌বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসেছিল এক মহিলা।

আমার নাম শুনেই বলেছিল, পাইক্র্যাফ্‌ট বলেই রেখেছে, আমি পৌঁছালেই যেন ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু...

শেষ কথাটা ভেঙেছিল ভীষণ একটা গুপ্তকথা বলার ভঙ্গিমায় ফিসফিস করে, ‘স্যার, উনি তো ঘরে তালা দিয়ে রেখেছেন ভেতর থেকে।’

‘তালা দিয়ে রেখেছে ভেতর থেকে?

‘গতকাল সকাল থেকে ঘর বন্ধ ভেতর থেকে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না। অনবরত গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন যেন কাকে।’

‘ওই দরজাটা তো?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

‘ব্যাপারটা কী?’

‘কিস্‌সু বুঝছি না। খালি খাবার চাইছেন। কত খাবারই তো এনে দিলাম, তবুও... ভীষণ কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে!’

দরজার ওদিক থেকে ভেসে এল সরু খ্যানখেনে গলার চিৎকার—‘ফর্ম্যালিন নাকি?’

‘পাইক্র্যাফ্‌ট?’ বলেই দমাদম ঘুসি মেরেছিলাম দরজায়।

‘তোমার পাশে যে রয়েছে, দূর হতে বল ওকে।’

তা-ই বললাম।

তারপরেই শুনলাম দরজার ওপর একটা অদ্ভুত খড়্‌মড়্‌ খচমচ আওয়াজ। অন্ধকারে কে যেন দরজার হাতল হাতড়াচ্ছে, ধরতে পারছে না। সেই সঙ্গে পাইক্র্যাফ্‌টের গজগজানি—শুয়োরের ঘোঁত ঘোঁত শব্দের সঙ্গে যার আশ্চর্য মিল আছে। বলেছিলাম, ‘খামকা দেরি করছ কেন? আর কেউ নেই এখানে।’ তবুও খুলল না দরজা। বেশ কিছুক্ষণ গেল এইভাবে। তারপরেই শুনলাম দরজার চাবি ঘোরানোর শব্দ, সেই সঙ্গে পাইক্র্যাফ্‌টের কণ্ঠস্বর, ‘এসো ভেতরে।’

চিত্র ১৯.৩ গ্যাস ভরতি বেলুনের মতো ফুলে উঠে সেঁটে রয়েছে কার্নিশের কোণে।

হাতল ঘুরিয়ে খুললাম দরজা, কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌টকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম না।

না, পাইক্র্যাফ্‌ট নেই ঘরের মধ্যে।

এরকমভাবে আমার পিলে জীবনে চমকায়নি—সেই মুহূর্তে যেমন চমকে ছিল। ঘরের মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। বই আর লেখবার সরঞ্জামের ওপর খাবার প্লেট-ডিশ গড়াগড়ি যাচ্ছে, খানকয়েক চেয়ার উলটে পড়ে রয়েছে, কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌ট গেল কোথায়?

'ঠিক আছে হে, ঠিক আছে। দরজাটা আগে বন্ধ কর।' পাইক্র্যাফ্‌টের ঝাঁজালো কণ্ঠস্বর।

আঁতকেই উঠেছিলাম।

তারপরেই আবিষ্কার করেছিলাম তাকে, সশরীরে।

ঘরের কোণে কার্নিশের কাছে দরজার ঠিক মাথায় আটকে রয়েছে কড়িকাঠের সঙ্গে—কে যেন আঠা দিয়ে তাকে আটকে রেখেছে সেখানে। মুখখানা রাগে আর উদ্‌বেগে থমথম করছে, হাঁপাচ্ছে হুসহাস করে আর হাত-পা ছুড়ছে পাগলের মতো, 'দরজাটা... দরজাটা বন্ধ কর আহাম্মক কোথাকার! মেয়েছেলেটা যদি ঢুকে পড়ে ভেতরে...'

দরজা বন্ধ করে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তার নিচে, চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলাম কড়িকাঠে আটকানো শূকরপ্রতিম বপুখানার পানে।

বলেছিলাম, 'পাইক্র্যাফ্‌ট, এ আবার কী খেলা? পড়ে গেলে যে ঘাড়খানা ভেঙে যাবে।'

'ভাঙলে তো বাঁচি,' সে কী তেজ গলায়।

'এই বয়স আর এই ওজন নিয়ে এ ধরনের ছেলেমানুষি জিমন্যাস্টিক দেখাতে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'নিকুচি করেছে তোমার ঠাকুমার মায়ের। তার জন্যেই...'

'সাবধান!'

'কথাটা শোনই-না!'

'তার আগে বল দিকি, কড়িকাঠে আটকে আছ কীসের আঠায়?

বলে ফেলেই বুঝলাম, আঠা নয়, আঠা নয়—কোনও আঠার জোরেই পাইক্র্যাফ্‌ট আটকে নেই কড়িকাঠে, গ্যাস ভরতি বেলুনের মতো ফুলে উঠে সেঁটে রয়েছে কার্নিশের কোণে। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে দেওয়াল খামচে ধরে নিচের দিকে নামবার চেষ্টা করতে করতে পাইক্র্যাফ্‌ট বলেছিল, 'যত নষ্টের মূল ওই প্রেসক্রিপশনটা। তোমার ঠাকুমার মা...'

'খবরদার!' হেঁকে উঠেছিলাম আমি।

দাবড়ানি খেয়ে একটা বাঁধানো ফ্রেম অন্যমনস্কভাবে চেপে ধরেছিল পাইক্র্যাফ্‌ট, ফ্রেম ভেঙে রয়ে গেল হাতে, ছবি আছড়ে পড়ে খানখান হয়ে গেল মেঝেতে, সাঁ করে ফের শূন্যে উঠে গিয়ে ধাঁই করে কড়িকাঠে ধাক্কা খেয়ে রবারের বলের মতো নেচে নেচে উঠল পাইক্র্যাফ্‌ট। গতরখানার উঁচু উঁচু জায়গায় সাদা হয়ে রয়েছে কেন, বুঝলাম এতক্ষণে। চুনকাম মেখে কি খোলতাই চেহারাখানিই হয়েছে। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয় এত মেহনত এবং ধকল সত্ত্বেও। হুঁশিয়ার হয়ে একটু একটু করে চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে নেমে এল ম্যান্টল ধরে।

দৃশ্যটা বাস্তবিকই অপূর্ব! অসাধারণ! ওইরকম বিশাল, চর্বি-থসথসে, সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত একখানা গতর যদি মাথা নিচের দিকে করে কড়িকাঠ থেকে মেঝের দিকে দেওয়াল বেয়ে নিম্নগামী হয়, তাহলে কি দৃশ্যটা মনে রাখবার মতো হয় না?

'ফর্ম্যালিন, প্রেসক্রিপশনটা দারুণ কাজে লেগেছে।'

'কীভাবে পাইক্র্যাফ্‌ট?'

'ওজন হারিয়েছি—এক্কেবারে।'

এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা।

'কী সর্বনাশ! পাইক্র্যাফ্‌ট, তোমার মনের ইচ্ছেটা ছিল চর্বি কমানোর, মুখে কিন্তু আগাগোড়া বলে গেছ, ওজন কমাতে চাও।'

কেন জানি না, দারুণ খুশিতে ডগমগ হয়েছিলাম পাইক্র্যাফ্‌টের এহেন পরিস্থিতিতে। সেই মুহূর্তে বড় ভালোও লেগেছিল ওকে। হাত বাড়িয়ে ধরে টেনেহিঁচড়ে নামিয়েও এনেছিলাম। পা দু'খানা ছুড়ে পা রাখবার জায়গা পেতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গিয়েছিল বেচারি। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, ঠিক যেন ঝোড়ো বাতাসে নিশান উড়ছে পতপত করে। আঙুল দিয়ে মেহগনি কাঠের ভারী টেবিলটা দেখিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল অপরূপ নাটকের নায়ক, 'ওর তলায়... ওর তলায় ঢুকিয়ে দাও—আটকে রেখে দেবে—'

তা-ই দিয়েছিলাম। বন্দি বেলুনের মতোই সাঁই করে টেবিলের তলায় আটকে গিয়েছিল ফুলো গতরখানা। মেঝের কার্পেটে পরম আয়েশে বসে জেরা চালিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আগে অবশ্য একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়েছিলাম মৌজ করে।

তারপর জিজ্ঞেস করেছিলাম খুশি খুশি গলায়—'এবার বল, কীভাবে এ হাল হল তোমার।'

'পাঁচনটা খাওয়ার পরেই।'

'খেতে কীরকম?'

'জঘন্য!'

জঘন্য তো বটেই। সব ক'টা পাঁচনের স্বাদই তাই। গুণাগুণ যা-ই থাক-না কেন, ঠাকুমার মায়ের কোনও পাঁচনই আমার কাছে রুচিকর নয়।

'প্রথমে এক চুমক খেয়েছিলাম, খুব সামান্য।'

'তারপর?'

'বেশ হালকা হালকা লাগছিল নিজেকে। ঘণ্টাখানেক বাদে বেশ তাজা তাজা। তাই ঠিক করলাম, এক ঢোকেই মেরে দেব সবটা।'

'বল কী?

'নাক টিপে গিলেছিলাম অবশ্য। তারপর থেকেই হালকা হতে হতে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।' এই পর্যন্ত মিনমিন করে বলে হঠাৎ ঝাঁ করে তেড়ে উঠল আমার ওপর, 'ফর্ম্যালিন, কী করি এখন বল তো?'

'একটা কাজ কখনওই করবে না। বাইরে বেরবে না। বেরলেই শূন্যে উড়ে যাবে,' হস্তসঞ্চালনে দেখিয়েছিলাম উড়ে যাওয়ার দৃশ্য।

'পাঁচনের কাজ নিশ্চয় মিলিয়ে যাবে আস্তে আস্তে?'

'সে গুড়ে বালি,' খুব জোরে মাথা নেড়ে নাকচ করে দিয়েছিলাম সম্ভাবনাটা। তৎক্ষণাৎ এক পশলা ঝাঁজালো তেজালো রসালো গালাগাল বৃষ্টি হয়ে গেল আমার ওপর। আমার চোদ্দোপুরুষের পিণ্ডি চটকানোর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে আদ্যশ্রাদ্ধ করা হল আমার ঠাকুমার মা বেচারির। এমতাবস্থায় ওর মতো মোটকা হোঁতকা অশিষ্ট মানুষের পক্ষে এবংবিধ আচরণ খুবই স্বাভাবিক। তাই আমি গায়ে মাখলাম না। শুধু বললাম, 'আমি তো তোমায় সাধিনি, তুমি নিজেই—'

বলে, উঠে বসলাম ওই হাতলওয়ালা চেয়ারে। বিপদে যে বন্ধু পাশে দাঁড়ায়, সে-ই প্রকৃত বন্ধু। উপদেশ-টুপদেশ দিলাম কিছুক্ষণ। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, এ অবস্থার জন্যে দায়ী পাইক্র্যাফ্‌ট নিজেই। অতখানি পাঁচন ঢক করে গিলে ফেলা উচিত হয়নি। কোঁত কোঁত করে গেলার স্বভাব ওর চিরকালই। এই বিষয়টা নিয়ে ঘোর মতান্তর ঘটল দু'জনের মধ্যে।

গাঁক গাঁক চিৎকার শুনে আর মারদাঙ্গা মূর্তি দেখে ঠিক করলাম, শিক্ষাদানের এ প্রসঙ্গটা মুলতুবি থাক আপাতত। যুক্তি দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিলাম, মহাপাপ সে করেছে শ্রুতিকটু পদের পরিবর্তে কোমলতর পদের প্রয়োগ করে। বলা উচিত ছিল চর্বি, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে বলে বলেছিল ওজন। কাজটা অত্যন্ত গর্হিত। ফল পেয়েছে হাতে হাতে—

প্রসঙ্গটা অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হলাম পাইক্র্যাফ্‌টের প্রবল বাধাদানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব দোষই সে মানছে। মহাপাপ সে করেছে, অস্বীকার তো করছে না। কিন্তু এখন করণীয়টা কী?

নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলা ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না, বুঝিয়ে বলেছিলাম আমি। সমস্যা সমাধানের সত্যিকারের আলোচনাটা শুরু হয়েছিল তখনই, এবং বেশ মনে রাখবার মতো আলোচনা। বলেছিলাম, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কড়িকাঠে হাঁটাটা এমন কিছু অসুবিধাজনক হবে না কিছুদিনের চেষ্টার পর—

'ঘুমাতে তো পারছি না,' গোঙিয়ে উঠেছিল পাইক্র্যাফ্‌ট।

সেটা কি একটা বিরাট সমস্যা? ধীরেসুস্থে সে সমস্যারও সমাধান করে দিয়েছিলাম আমি। কড়িকাঠে একটা তারের জাল লাগিয়ে নিলেই হল। বিছানার

লেপ-তোশক ফিতে দিয়ে লাগানো থাকবে কড়িকাঠের জালে। কম্বল, চাদর বোতাম দিয়ে লাগানো থাকবে পাশে পাশে। ঘরকন্না দেখার ভার রয়েছে যে মেয়েছেলেটার ওপর, তাকেই শুধু সব কথা খুলে বলতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ গজর গজর করার পর রাজি না হয়ে পারেনি পাইক্র্যাফ্‌ট। যথাসময়ে জিনিসপত্র এসে পৌঁছেছিল ঘরের মধ্যে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই। উলটো বিছানাপত্র নিয়ে তিলমাত্র উলটো-পালটা কৌতূহল না-দেখানোটা বিলক্ষণ উপভোগ্য হয়েছিল কিন্তু অন্তত আমার কাছে। লাইব্রেরি থেকে মইটা এনে রাখা যাবে'খন বসবার এই ঘরে। খাবারদাবার সমস্ত রাখা হবে বুকশেল্‌ফের ওপরে। হাত বাড়িয়ে খেয়ে নিলেই হল। খুশিমতো মেঝেতে নেমে আসার মৌলিক পদ্ধতিটাও বাতলে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর। খুবই সোজা কায়দা, খোলা বুকশেল্‌ফে ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়ার দশম সংস্করণটা রেখে দিলেই হল। হাত বাড়িয়ে খান দুয়েক খণ্ড টেনে নিলেই আস্তে আস্তে নেমে আসবে নিচে। আরও অভিনব একটা ব্যাপারে মতৈক্য ঘটল দু'জনের মধ্যে। ঘরের ধার বরাবর অনেকগুলো লোহার আঁকশি লাগানো থাকবে। আঁকশি আঁকড়ে ধরে ঘরের নিচের দিক দিয়ে যত্রতত্র গমন করা যাবে। বুদ্ধিটা মন্দ বলা যায় কি?

এই ধরনের বুদ্ধির পর বুদ্ধি গজিয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে ফটাফট করে। বেশ চনমনে বোধ করছিলাম বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে। উদ্যোগী হয়ে আমিই ঘরকন্না দেখার মেয়েছেলেটাকে ডেকে এনেছিলাম, পাইক্র্যাফ্‌টের গুপ্ত রহস্য ফাঁস করেছিলাম, এবং মূলত আমিই ওলটানো বিছানা কড়িকাঠে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কী, পুরো দুটো দিন কাটিয়েছিলাম ওর ফ্ল্যাটে। স্ক্রু-ড্রাইভার বাগিয়ে অনেক অভিনব আয়োজন সমাপন করেছিলাম আমিই। তার টেনে ঘণ্টা রেখেছিলাম ওর হাতের কাছে, সব ক'টা ইলেকট্রিক লাইট লাগিয়েছিলাম উলটো করে। এই ধরনের বহুবিধ বিচিত্র ব্যবস্থা সবই করেছিলাম নিজের হাতে এবং পরমোৎসাহে। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এতই সুখপ্রদ হয়ে উঠেছিল যে, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কড়িকাঠ থেকে দরজার পাশ দিয়ে বিশালকায় টিকটিকির মতো নেমে আসছে ধুসকো পাইক্র্যাফ্‌ট, আঁকশি ধরে ধরে যাচ্ছে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে... কিন্তু ছায়া মাড়াতে পারছে না ক্লাবের... জীবনে আর পারবেও না! অহো! অহো!

তারপরেই কুড়ুল মেরে বসলাম নিজেরই পায়ে। দায়ী এই উর্বর মগজটা। ভুরভুর করে গজিয়ে যাচ্ছিল বুদ্ধির পর বুদ্ধি—শেষকালে সুড়ুত করে এসে গেল এমন একটা বুদ্ধি, যে সর্বনাশ হয়ে গেল আমার নিজেরই।

বসেছিলাম বসবার ঘরে। আগুনের ধারে ওরই চেয়ারে বসে ওরই হুইস্কি পান করছিলাম মৌজ করে। পাইক্র্যাফ্‌ট লেপটে ছিল ওর অতিপ্রিয় কার্নিশের কোণে—হাতে হাতুড়ি নিয়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে তুরস্ক দেশের একটা কার্পেট বসাচ্ছিল কড়িকাঠে। বুদ্ধিটা মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তেই। চিৎকার করে উঠেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে—পাইক্র্যাফ্‌ট! এত ঝামেলার তো কোনও দরকারই দেখছি না।'

আইডিয়াটার পুরো প্রতিক্রিয়া ধারণা করে নেওয়ার আগেই গাঁক গাঁক করে তা ব্যক্ত করে ফেলেছিলাম স্বমুখে—'সিসের অন্তর্বাস!' বাস, ক্ষতি যা হবার হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

পাইক্র্যাফ্‌টের চোখে জল এসে গিয়েছিল শুধু ওই দুটি শব্দ শুনেই—'তাহলে বলছ, আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে—'

চমকপ্রদ আইডিয়াটা গরগর করে বলে গিয়েছিলাম নিজের ক্ষতি কতখানি হতে পারে তা না ভেবেই—'সিসের চাদর কেনো পাইক্র্যাফ্‌ট। চাকা চাকা করে কেটে নিয়ে সেলাই করে নাও গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, পায়জামায়। পায়ে পর সিসের সুকতলা দেওয়া বুটজুতো। হাতে নাও নিরেট সিসে ভরতি থলি। বাস, আর কী চাই! বন্দিদশা ঘুচবে, আবার টো টো করে যেখানে খুশি টহল দিতে পারবে—'

বলতে বলতে আরও প্রীতিপদ একটা আইডিয়া ফুরুক করে ঠেলে উঠেছিল মগজের বুদ্ধিকোষ থেকে, 'জাহাজডুবি হলেও আর তোমাকে মরার ভয় করতে হবে না, পাইক্র্যাফ্‌ট। কিছু বোঝা বা জামাকাপড় ফেলে দিলেই হল—দরকারমতো মালপত্র হাতে নিয়ে হু-উ-উ-স করে ভেসে উঠবে ডোবা জাহাজ থেকে জলের ওপর—ঠিকরে যাবে শূন্যে!' বিষম উত্তেজনায় হাতুড়িটা খসে পড়েছিল পাইক্র্যাফ্‌টের হাত থেকে—আমার মাথা ঘেঁষে।

চিত্র ১৯.৪ হাতে হাতুড়ি নিয়ে পেরেক ঠুকে ঠুকে তুরস্ক দেশের একটা কার্পেট বসাচ্ছিল কড়িকাঠে।

'ফর্ম্যালিন! আবার তো তাহলে ক্লাবে যাওয়া যাবে।'

শুনেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! উৎসাহ নিবে গেল দপ করে। খাবি খেতে খেতে সায় দিয়েছিলাম এইভাবে, 'তা-ও তো বটে! তা-ও তো বটে!'

হ্যাঁ, ক্লাবে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে পাইক্র্যাফ্‌ট। ওই তো ওই টেবিলে বসে কোঁত কোঁত করে গিলে যাচ্ছে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। জুলজুল করে তাকিয়ে আছে আমার পানে। চোখে সেই নীরব মিনতি—'বলো না ভায়া, বলো না কাউকে। কড়িকাঠে হেঁটেছি কেউ যদি শুনে ফেলে, ঢি ঢি পড়ে যাবে যে।'

পড়ুক। ওর ওই গেলা দেখে ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারছে না যে তিলমাত্র ওজন নেই অত বড় গতরখানার—হালকা... হালকা... বাতাসের মতোই হালকা চর্বির ওই বিশাল পাহাড়টার। তাই জানুক সকলে, কী কুক্ষণেই শেষ বুদ্ধিটা বাতলে ফেলেছিলাম আমি। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন একখানা প্লেট নিয়ে চোখ নামিয়ে গোগ্রাসে গিলছে পাইক্র্যাফ্‌ট, এই ফাঁকে পাশের দরজাটা পেরিয়ে যাওয়া যাবে না?
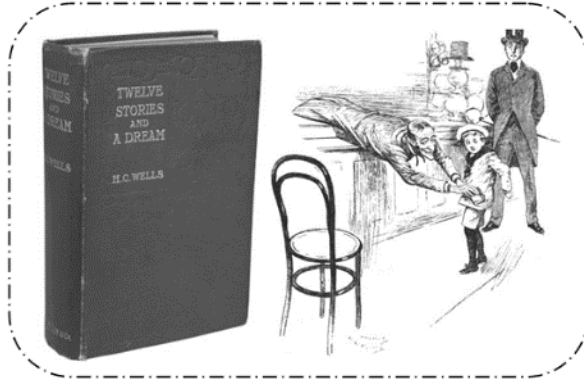
'The Magic Shop' প্রথম প্রকাশিত হয় 'Strand Magazine' পত্রিকায় জুন **১৯০৩** সালে। পরে 'Macmillan and Co.' থেকে **১৯০৩** সালে প্রকাশিত 'Twelve Stories and a Dream' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়।

জাদু বিপণি
(The Magic Shop)

দূর থেকে বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম ম্যাজিকের দোকানটা। সামনে দিয়েও গেছি কয়েকবার। দেখেছি কাচের শোকেসে লোভনীয় জাদুসামগ্রী। ম্যাজিক বল, ম্যাজিক মুরগি, বিচিত্র শঙ্কু, হরবোলা পুতুল, ম্যাজিক ঝুড়ি, ম্যাজিক তাস। দেখেই গিয়েছি এই ধরনের হরেক রকমের জিনিস—ঢোকার ইচ্ছে হয়নি কখনও। কিন্তু না ঢুকে পারলাম না সেইদিন—যেদিন আমার আঙুল ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিপ টেনে নিয়ে গেল দোকানটার সামনে, একটার পর একটা জিনিস দেখাতে দেখাতে বুঝিয়ে দিলে, উপায় নেই, ঢুকতেই হবে ভেতরে। সত্যি কথা বলতে কী, দোকানটা যে রিজেন্ট স্ট্রিটেই আছে, তা-ও তো মাথায় আসেনি কখনও, রয়েছে মুরগির ছানা আর ছবির দোকানের ঠিক মাঝখানে। আমার কিন্তু বরাবরই মনে হয়েছে, এ দোকান যেন দেখেছি সার্কাসে, অথবা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মোড়ে, অথবা হলবর্নে। রাস্তার ওপরেই, কিন্তু ভেতরে ঢোকার পথটা কখনও পাওয়া যায়নি। মরীচিকার মতো দোকানের অবস্থান যেন ধাঁধা সৃষ্টি করে গেছে এতটা কাল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওই তো সেই দোকান! জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনেই, বিস্তর জাদুসামগ্রী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ভেতরে এসো! ভেতরে এসো! আঙুল তুলে একটার পর একটা জিনিস দেখতে দেখতে শেষকালে কাচের ওপর আঙুলের বাজনা পর্যন্ত শুনিয়ে দিলে জিপ।

ঠকঠক করে কাচে আঙুল ঠুকে একটা আজব ডিম দেখিয়েছিল, অদ্ভুত ক্ষমতা এই ডিমের, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যখন-তখন। বলেছিল, 'জান বাবা, বড়লোক যদি হতাম, তাহলে আমিই কিনে ফেলতাম। আর ওই যে ওইটা দেখছ—' ঠকঠক ঠকঠক শব্দে আঙুল ঠুকে এবার দেখিয়েছিল একটা কাঁদিয়ে শিশুকে, দেখতে অবিকল মানুষের শিশুর মতোই, পুতুল বলে মনেই হয় না, 'ওটাও কিনতাম।' রহস্যময় এইসব ম্যাজিকের জিনিসপত্রের পাশে রাখা কার্ডটার দিকেও শেষ পর্যন্ত

আঙুল তুলে দেখিয়েছিল জিপ। কার্ডে লেখা ‘যে কোনও একটা জিনিস কিনে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের মুন্ডুগুলো ঘুরিয়ে দাও।’

জিপের মুখে তখন খই ফুটছে, ‘ওই যে শঙ্কুগুলো দেখছ-না বাবা, ওর নিচে জিনিস রাখলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। বইতে পড়েছি।’ তারপরেই—

‘আধ পেনিটা দেখেছ? ফুস করে মিলিয়ে যায় বাতাসে।’

জিপ হয়েছে ওর মায়ের মতোই। শিক্ষাদীক্ষাই আলাদা। দোকানে ঢোকার নামও করেনি। আমাকে জ্বালিয়েও মারেনি। নিজের অজান্তেই কেবল আমার আঙুলটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে ভেতরে ঢোকবার দরজার সামনে। ইচ্ছেটা স্পষ্ট করে তুলেই শান্ত হয়েছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একটা ম্যাজিক বোতলের দিকে। বড় হলে, অনেক টাকার মালিক হলে নাকি ওটাও কিনবে।

আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘এখুনি যদি কিনে ফেলিস, তাহলে কী করবি?’

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জিপের চোখ-মুখ, ‘জেসিকে দেখাব।’

দরজার হাতলে হাত রেখে আমি তখন বলেছিলাম, ‘তোর জন্মদিনের তো এখনও একশো দিনেরও বেশি দেরি রে।’

জবাব দেয়নি জিপ। আমার আঙুলের ওপর মুঠোর চাপটা কেবল বেড়েছিল। তাই ঢুকতেই হয়েছিল দোকানে।

দোকানটা মামুলি দোকান নয় মোটেই। ম্যাজিকের দোকান বলেই জিপ যেসব খেলা দেখলে আনন্দে নেচে উঠত, সেসব খেলা একটাও নেই। তা সত্ত্বেও বোবা মেরে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আজব বস্তুগুলোর দিকে।

দোকানে আলোর বাড়াবাড়ি তেমন নেই—পর্যাপ্ত আলোও নেই। ছোট্ট সংকীর্ণ ঘর। দরজা বন্ধ করে দিতেই দরজার ঘণ্টায় পিং পিং আওয়াজটা একনাগাড়ে বেজেই চলল পেছনে। কেউ নেই আশপাশে। বাপ-বেটায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কিম্ভূতকিমাকার জিনিসগুলো। কাউন্টারের তলার দিকে দেখলাম একটা কাঠের মণ্ড দিয়ে তৈরি গম্ভীরবদন শান্তচক্ষু বাঘ, নিয়মিত ছন্দে নেড়ে চলেছে বিরাট মাথা। দেখলাম বেশ কয়েকটা ক্রিস্টাল বর্তুল, ম্যাজিক তাস ধরে থাকা একটা চৈনিক হাত, বিভিন্ন আকার এবং আয়তনের বেশ কিছু ম্যাজিক মাছের স্ফটিক পাত্র, একটা কদাকার ম্যাজিক টুপি, ভেতরকার স্প্রিং পর্যন্ত চোখে পড়ছে। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে ম্যাজিক আয়না, বেশ কয়েকটা। কোনওটায় প্রতিফলিত চেহারা লম্বা আর রোগাটে হয়, কোনওটায় হয় বেঁটে আর মোটা। দেখছি আর হাসছি দু’জনে, এমন সময়ে দোকানে ঢুকল নিশ্চয় দোকানদার নিজেই।

চিত্র ২০.১ ‘বলুন কী দেখাব?’

ঢুকল, মানে কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু এমন আচমকা এসে দাঁড়াল সামনে যে মনে হল, ছোট্ট ওই দোকানঘরে এতক্ষণ তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। থাকলে দোকানে ঢুকেই কি তাকে দেখতে পেতাম না? ওইটুকু তো ঘর রে বাপু।

লোকটার চেহারা মনে রাখবার মতো। বিচিত্র বলতে যা বোঝায়, তা-ই। নোংরা। গায়ের রং কালচে। একটা কান আরেকটা কানের চেয়ে বেশি লম্বা। থুতনি তো নয়, যেন বুটজুতোর ডগা, মোটা চামড়ার টুপি পরানো।

কাউন্টারের ওপরকার কাচের বাক্সে লম্বা লম্বা দশখানা আঙুল মেলে ধরে, বললে সে আচমকা, ‘বলুন কী দেখাব?’ ওই গলা শুনেই তো বুঝলাম, দোকানদার রয়েছে দোকানেই, কিন্তু এতক্ষণ তাকে দেখা যায়নি মোটেই।

‘খানকয়েক সোজা ধরনের ম্যাজিকের জিনিস চাই ছেলেটার জন্যে,’ বলেছিলাম আমি।

'হাতসাফাইয়ের ম্যাজিক, না কলের ম্যাজিক? ঘরোয়া ম্যাজিক, না—'

'মজা পাওয়ার মতো যা হয় কিছু হলেই চলবে।'

'হু-উ-উম্!' বলে তো খচমচ করে মাথা চুলকে নিলে দোকানদার, যেন কত ভাবনাতেই না পড়েছে। তারপরেই চোখের সামনেই আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে থেকে টেনে বার করল কিনা একটা কাচের বল! নাকের ডগার সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে ভিজে ভিজে গলায়, 'এইরকম মজার জিনিস হলে চলবে কি?'

তৈরি ছিলাম না এ ধরনের ম্যাজিকের জন্যে—যদিও হাতসাফাইয়ের এ ম্যাজিক আমি যে কতবার দেখেছি এর আগে, তার ঠিক নেই। সব ম্যাজিশিয়ানই রপ্ত করে এই ধরনের হস্তকৌশল, কিন্তু এ দোকানে কায়দাটা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না মোটেই। অট্টহেসে তাই বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ধরনের হলেই চলবে।'

যন্ত্রচালিতের মতো স্ফটিক বর্তুলকে হস্তগত করার মানসে হাত বাড়িয়েই কিন্তু বোকা বনে গিয়েছিল জিপ বেচারি। কোথায় কাচের বল? হাত তো ফাঁকা!

মুচকি হেসে বলেছিল কিম্ভূত দোকানদার, 'পকেটে দেখ খোকা, পেয়ে যাবে।'

সত্যিই তো! জিপের পকেট থেকে বেরল আশ্চর্য বলটা!

'দাম কত?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

বিনয়ের অবতার হয়ে তখুনি বলেছিল দোকানদার, 'আরে ছি ছি! কাচের বলের দাম আমরা নিই না, ওটা ফ্রি! পাচ্ছিও তো ফ্রি!' বলতে বলতে আর-একখানা কাচের বল বার করেছিল নিজের কনুই থেকে। পরক্ষণেই তৃতীয় বলটাকে টেনে আনল কাঁধ থেকে। পাশাপাশি তিনটে বল সাজিয়ে রাখল কাচের কাউন্টারে। সীমাহীন শ্রদ্ধায় বলগুলোর দিকে জিপ তাকিয়ে আছে দেখে একগাল হেসে বলেছিল দোকানদার, 'নিয়ে যাও খোকা, এটাই বা বাদ যায় কেন? বলতে বলতে চতুর্থ বলটা টেনে বার করেছিল নিজের বদন গহ্বর থেকে।'

চকিতে আমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নিলে জিপ চোখে চোখে, মুখে একটি কথাও না বলে। তারপর নিবিড় নৈঃশব্দ্যকে তিলমাত্র ব্যাহত না করে বল চারখানা সরিয়ে রাখল একপাশে, ফের শক্ত করে চেপে ধরল আমার আঙুল এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল পরবর্তী ম্যাজিক দেখার জন্যে।

নৈঃশব্দ্য ভাঙল দোকানদার নিজেই। বললে, 'ছোটখাটো কায়দা-টায়দাগুলো দেখাই এইভাবেই।'

হাসলাম। যেন ঠাট্টা শুনে মজা পেয়েছি, এইরকম একখানা ভাব করলাম।

বললাম, 'পাইকারি দোকানের চাইতে সস্তাও বটে।'

'একরকম তা-ই বটে। শেষমেশ দাম কিন্তু দিতেই হয়। তবে আগুন-দাম নয়, অনেকের যা ধারণা... বড়সড়ো ম্যাজিক, রোজকার খাবারদাবার আর অন্যান্য যা

কিছু দরকার, সবই পাই ওই টুপির ভেতর থেকে... খাঁটি ম্যাজিকের দোকান বলতে যা বোঝায়, সেরকম দোকান অবশ্য কোথাও পাবেন না, পাইকারি দোকান তো নেই-ই... ঢোকবার সময়ে খেয়াল করেননি বোধহয় সাইনবোর্ডে লেখা আছে, খাঁটি ম্যাজিকের জিনিস পাবেন এখানে।' বলতে বলতে একটা বিজনেস কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিল দোকানদার, 'এক্কেবারে খাঁটি জিনিস, স্যার, লোক ঠকানোর কারবার এখানে হয় না।'

আহা, রগুড়ে লোক তো! রঙ্গরসিকতায় বিলক্ষণ পোক্ত।

জিপের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অমায়িক হাসি হাসল লোকটা, মূর্তিমান শিষ্টাচার বললেই চলে। বললে, 'খোকা, বড় ভালো ছেলে তুমি।'

জিপ যে সত্যিই ভালো ছেলে, এ তথ্যটাও লোকটা জেনে বসে আছে দেখে অবাক হয়েছিলাম বিলক্ষণ। বাড়িতেও ব্যাপারটা গোপন রেখেছি নিছক নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে। জিপের কানে যেন না যায়। কিন্তু এ লোকটা...

জিপ কিন্তু তিলমাত্র সপ্রতিভ হল না। উচ্ছ্বাস প্রকাশও করল না। নিরেট নীরবতায় ঢেকে রেখে দিল নিজেকে। পলকহীন চক্ষু নিবদ্ধ রইল অদ্ভুত দোকানের বিচিত্র দোকানদারের ওপর।

'ভালো ছেলেরাই শুধু এ দোকানের চৌকাঠ পেরতে পারে—আর কেউ না।'

কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তার উদাহরণস্বরূপ সহসা দোকানের বাইরে ছিঁচকাঁদুনে বায়না শুনলাম বালক-কণ্ঠে। ঘ্যানঘ্যান করছে বাবার কাছে। অচিরেই দেখা গেল তাকে কাচের মধ্যে দিয়ে। চকোলেট খাওয়া গোবদা চেহারা, নিরক্ত সাদাটে মুখ, চাই-চাই ভাব চোখে-মুখে—নিজের কথা ছাড়া যেন দুনিয়ায় আর কারও কথা ভাবে না। বাবা বেচারি সামলাতে পারছে না ছোঁড়াটাকে। তিতিবিরক্ত হয়ে বলছে, 'এডওয়ার্ড, দোকান তো দেখছি বন্ধ।'

'সে কী, দরজা তো খোলাই রয়েছে,' বলেছিলাম আমি।

'না, বন্ধ রয়েছে,' নির্বিকারভাবে বলেছিল দোকানদার।

কর্ণপাত না করে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলাম দরজা খুলে দিতে। কিন্তু পারিনি। দরজা সত্যিই বন্ধ রয়েছে। খোলে কার সাধ্যি। নাছোড়বান্দা ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়াটাকে টানতে টানতে বিব্রত বাবা সরে যেতেই কাউন্টারে এসে বলেছিলাম, 'আশ্চর্য তো! দরজা বন্ধ হয়ে গেল কীভাবে?'

চিত্র ২০.২ 'পকেটেই পেয়ে যাবে।'

'ম্যাজিকের জোরে!' বলেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে যেন উড়িয়ে দিয়েছিল জাদুকর দোকানদার। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল আমার! কেন-না, আঙুলের ডগা থেকে নিঃশব্দে ছিটকে গিয়েছিল অনেকগুলো রংবেরঙের তারা। ঠিক যেন রংমশাল! তারাবাজির খেলা! ঝলমলে তারাগুলো ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গিয়েছিল কোণের অন্ধকারে।

আমি তো হতভম্ব। কিন্তু দোকানদারের ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। জিপের দিকে তাকিয়ে বলেছিল আপন-করে-নেওয়া সুরে—'খোকা, দোকানে ঢোকবার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে বলছিলে-না, বন্ধুবান্ধবদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার ম্যাজিক কিনবে বড় হয়ে?'

'বলছিলামই তো।'

'পকেটেই পেয়ে যাবে।'

বলেই, কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিপের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিশিয়ানদের মামুলি কায়দায় ম্যাজিক বাক্স বার করে এনেছিল অদ্ভুত মানুষটা। তখনই লক্ষ করেছিলাম আশ্চর্য রকমের ঢেঙা তার আকৃতি। মানুষ যে এমন গাছের

মতো লম্বা হতে পারে, জানা ছিল না। কাউন্টারের ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকার সময়েও বুঝতে পারিনি। পুরো কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল হিলহিলে লম্বা দেহটা!

চক্ষুস্থির হতে তখনও বাকি আমার। ম্যাজিক বাক্স টেনে বার করেই শূন্যকে লক্ষ্য করে হাঁক দিয়েছিল সৃষ্টিছাড়া দোকানদার, 'কাগজ।' বলেই, স্প্রিং বার-করা টুপিটার ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল একটা প্যাকিং কাগজ। 'দড়ি', বলতেই, দেখি, দড়ির বাক্স হয়ে গিয়েছে দোকানদারের মুখবিবর। টানছে তো টানছেই—দড়ি যেন আর ফুরাচ্ছে না। বাক্স বাঁধা হয়ে যেতেই দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে দিলে এবং বেশ মনে হল যেন কোঁত করে গিলেই ফেলল দড়ির বাক্স। তারপরেই একটা মোমবাতি ধরল একটা হরবোলা ডামি পুতুলের নাকের ডগায়। পিলে চমকে উঠেছিল দপ করে মোমবাতির শিখা ধরে ওঠায়। তারপরেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল যখন দেখলাম, নিজের একটা আঙুল নির্বিকারভাবে মোমবাতির শিখায় পোড়াচ্ছে দোকানদার! সর্বনাশ! এ তো আঙুল নয়—গালা! লাল গালা! গালা গলে গিয়ে টপটপ করে পড়ছে দড়ির গিঁটের ওপর। প্যাকেট সিল করে দিয়েই জিপকে বলেছিল আজব দোকানদার, 'এবার তো চাই অদৃশ্য-হওয়া ডিম, তা-ই না?' কথাটা বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে খপ করে আমার বুকপকেট থেকে একটা ডিম বার করে প্যাক করে ফেলেছিল কাগজে। এরপরেই আবির্ভূত হল কাঁদুনে বাচ্চা—সেটাও বেরল আমারই কোটের ভেতরের পকেট থেকে। প্রতিটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিলাম জিপের হাতে। একটা কথাও না বলে প্যাকেটগুলো আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা—আমার মতো এমনভাবে আকাশ থেকে পড়ার ভাব দেখায়নি আঁতকে ওঠার মতো অত ম্যাজিক দেখেও। চোখ দুটোতেই অবশ্য ফুটে উঠেছিল মনের কথা—ম্যাজিক! ম্যাজিক! এই হল গিয়ে খাঁটি ম্যাজিক!

আচমকা ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। নরম নরম কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মাথার ওপর টুপির মধ্যে? টুকুস টুকুস করে লাফ দিচ্ছে তো দিচ্ছেই?

ধাঁ করে টুপি খুলতেই ফরফর করে উড়ে নেমে এসেছিল একটা পায়রা—খড়মড় করে ঢুকে গিয়েছিল কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি বাঘটার পাশে রাখা কার্ডবোর্ড বাক্সের মধ্যে। 'ছি ছি ছি!' বলতে বলতে মহা আড়ম্বরে টুপিখানা নিজের হাতে নিয়েছিল দোকানদার, 'কাণ্ডজ্ঞান দেখেছেন? ডিম পাড়বার আর জায়গা পেল না!'

চিত্র ২০.৩ আচমকা ভীষণ চমকে উঠেছিলাম।

আরে সর্বনাশ! টুপি ঝাড়তেই যে খান তিনেক ডিম বেরিয়ে এল দোকানদারের হাতের চেটোয়। তার পরেও বেরল একটা মার্বেল গুলি, একটা ঘড়ি, আধ ডজন সেই কাচের বল আর দোমড়ানো কাগজের ডেলা। শেষোক্ত বস্তুটার যেন শেষ নেই। বেরচ্ছে তো বেরচ্ছেই। পর্বতপ্রমাণ কাগজের স্তূপের আড়ালে শেষ পর্যন্ত দোকানদারকে আর দেখতেও পেলাম না। বকবকানিই কেবল শুনে গেলাম। 'কী আশ্চর্য! টুপির মধ্যে এত জিনিস! তাহলেই দেখুন, ইচ্ছে করলে কত কী-ই না লুকিয়ে রাখা যায় জামা-প্যান্ট-টুপির মধ্যে... আরে... আরে... শেষ কি নেই!'

আচমকা স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর। যেন গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে পিন ঠিকরে গেল ইটের ঠোক্করে।

আর কোনও কথা নেই।

কাগজের খসখসানিও নেই।

থমথমে নীরবতা।

'টুপির কাজ শেষ হল?' জানতে চেয়েছিলাম গলাখাঁকারি দিয়ে। জবাব নেই।

দৃষ্টিবিনিময় করেছিলাম আমি আর জিপ। বিদঘুটে আয়নাগুলোয় দেখেছিলাম বাপ-বেটার বিদঘুটে প্রতিবিম্ব—দু'জনেরই চোখ বড় বড়।

জিপ কিন্তু রীতিমতো গম্ভীর। শান্ত। নির্বিকার।

হেঁকে বলেছিলাম আমি, 'এবার যাওয়া যাক। ও মশাই, দাম কত হল?'

সাড়া নেই।

গলা চড়িয়েছিলাম, 'দয়া করে ক্যাশ মেমোটা এবার দিন।'

তাচ্ছিল্যের নাসিকাধ্বনি যেন শুনলাম কাগজের ডাঁইয়ের আড়ালে?

জিপকে বলেছিলাম, 'চল্ তো দেখি কাউন্টারের ওদিকে—নিশ্চয় লুকিয়ে আছে—মজা করছে।'

বাঘটা কিন্তু সমানে মাথা দুলিয়েই যাচ্ছিল এত কাণ্ডের মধ্যে। তার পাশ দিয়ে গেলাম কাউন্টারের ভেতরে। কী দেখলাম জানেন? কাউকে না! মেঝের ওপর কেবল পড়ে রয়েছে আমার টুপিটা। পাশেই বসে একটা খরগোশ। ম্যাজিশিয়ানদের খরগোশদের মতোই বোকা-বোকা চেহারা। কিন্তু ভাবখানা যেন বড় কঠিন সমস্যায় পড়েছে—ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না। আমি টুপি তুলে নিতেই তিন লাফ মেরে চলে গেল চোখের বাইরে।

'বাবা!' ফিসফিস করে বলেছিল জিপ।

'কী রে?'

'কী সুন্দর দোকান বাবা, খু-উ-উ-ব ভালো লাগছে।'

'ভালো তো আমারও লাগছে রে।' মনে মনেই বলেছিলাম আমি, 'আরও ভালো লাগত, যদি কাউন্টারটা হঠাৎ নিজে থেকেই লম্বা হয়ে না গিয়ে দরজার পাল্লাটা এঁটে ধরত।' মুখে কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করলাম না, পাছে জিপের নজর সেদিকে গিয়ে পড়ে। অদ্ভুত কাণ্ডটা ওর না দেখাই ভালো।

জিপের নজর তখন অবশ্য খরগোশটার দিকে। লাফাতে লাফাতে পাশ দিয়ে সরে পড়বার মতলবে রয়েছে। জিপ কি অত সহজে ছাড়ে? আদুরে গলায় বললে, 'এই পুসি, জিপকে একটা ম্যাজিক দেখাবি না?' পুসির বয়ে গেছে ম্যাজিক দেখাতে! টুকুস টুকুস করে লাফ দিয়ে সুড়ুত করে গলে গেল পাশের একটা দরজা দিয়ে।

অবাক কাণ্ড! এ দরজা তো একটু আগেও চোখে পড়েনি আমার! হলফ করে বলতে পারি, ছোট্ট ঘরখানায় এ দরজা ছিল না। এল কোত্থেকে?

আচমকা ঈষৎ ফাঁক হয়ে-থাকা পাল্লাটা খুলে গেল দু'হাট হয়ে—নিঃশব্দে বিটকেল হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল দোকানদার স্বয়ং—যার একটা কান আর-একটা কানের চেয়ে বেশি লম্বা। হাসিটা দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল আমার। কেন-না, এ হাসি নিছক আমুদে হাসি নয়, সেই সঙ্গে মিশে আছে যেন একটু বেপরোয়া ভাব—

যেন আমাকে তোয়াক্কা না করার ভাব—ম্যাজিক জিনিসটার প্রতি আমার অবিশ্বাসী মনোভাবটাকে যেন নস্যাৎ করার মনোভাব। বিচ্ছিরি হাসিটা ঠোঁটের কোণে বিচ্ছিরিভাবে দুলিয়ে রেখেই বলেছিল রহস্যময় জাদুকর, 'স্যার, শোরুমটা দেখতে চান তো?' এমন মসৃণভাবে প্রস্তাবটা রাখল সামনে যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। আঙুলের ওপর জিপের টান অনুভব করলাম—হঠাৎ-আবির্ভূত দরজার দিকে টানছে আমাকে। দৃষ্টি ফেরালাম ভূতুড়ে কাউন্টারটার দিকে—পরক্ষণেই চোখাচোখি হয়ে গেল দোকানদারের সঙ্গে। ম্যাজিক জিনিসটা ততক্ষণই মজাদার থাকে, যতক্ষণ তা খাঁটি জাদুবিদ্যা না হয়ে যায়। এখানে যেন বড় বেশি অলৌকিক খেলা দেখে ফেলছি। গা শিরশির করছিল সেই কারণেই। তাই বলেছিলাম, 'হাতে বেশি সময় নেই।' কিন্তু মুখের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দেখি, কীভাবে জানি না, চৌকাঠ পেরিয়ে পৌঁছে গেছি শোরুমের মধ্যে।

আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করতে করতে দোকানদার তখন পরম আয়েশে ঘষছে নিজের দু'হাত। হাত তো নয়, যেন রবার দিয়ে তৈরি।

আঙুল-টাঙুলগুলোয় গাঁট-ফাঁটের বালাই নেই বললেই চলে। কথা বলছে যেন মিছরির রসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, 'বিলকুল খাঁটি ম্যাজিকের জিনিসপত্র, স্যার—নকলি মাল এখানে একটাও নেই।'

হারামজাদা! মনে মনেই বলেছিলাম আমি। কিন্তু মুখে তা ব্যক্ত করা সমীচীন নয়। ওই জাতীয় কোনও শব্দ মুখ দিয়ে বার করার আগেই অবশ্য কোটের হাতা ধরে কে যেন টানাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল। চোখ নামিয়েই দেখেছিলাম, একটা লেজওয়ালা লাল রঙের বিটলে বামন-দৈত্য টানাটানি করছে আমার কোটের হাতা ধরে! দোকানদার ধরে রয়েছে তার লম্বা লেজটা। টেনে নিয়ে আনতে চাইছে নিজের দিকে, বিটলে দৈত্যের মহা আপত্তি তাতে—কামড়ে দিতে যাচ্ছে দোকানদারের হাত। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ বা ভয়ডর নেই আশ্চর্য দোকানদারের। চোখের পলক ফেলার আগে অদ্ভুত কায়দায় লেজ ধরে লাল দৈত্যকে টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে কাউন্টারের পেছনে—খুব স্বাভাবিকভাবেই অবশ্য। মুখের চামড়ায় সামান্যতম বিকৃতি বা কুঞ্চন দেখা গেল না—যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার অবস্থা কিন্তু তখন শোচনীয়!

নিশ্চয় রবারের তৈরি দৈত্য। নাড়ালেই কিলবিল করে উঠেছে—চকিত দেখায় মনে হয়েছে জ্যান্ত দৈত্য। চক্ষুভ্রম সৃষ্টি করাই তো জাদুকরের মুনশিয়ানা। মনকে এইভাবে প্রবোধ দিলেও কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকেছিল গলার কাছে!

ঢোক গিলে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম লাল দৈত্যের অন্তর্ধান ঘটতেই। লোকটার হাবভাব মোটেই ভালো লাগেনি। এই ধরনের কুৎসিত কদাকার গা-

ঘিনঘিনে নচ্ছার প্রাণীদের ঘাঁটাঘাঁটি যারা করে, তাদের দেখলেই যেমন গা শিরশির করে ওঠে, আমার সারা গা তখন শিরশির করছে ঠিক সেইভাবে। তাকিয়েছিলাম জিপের দিকে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম ওর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা দেখে। একদৃষ্টে দেখছে একটা ম্যাজিক ঘোড়া, দুলন্ত ঘোড়া। বিতিকিচ্ছিরি দৈত্যটাকে চোখে পড়েনি জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। চোখের ইঙ্গিতে জিপকে দেখিয়ে আর অন্তর্হিত লাল দৈত্যের দিকে ইশারা করে খাটো গলায় বলেছিলাম দোকানদারকে, 'আশা করি এই ধরনের সৃষ্টিছাড়া জিনিস আর নেই আপনার হেপাজতে?'

আরও রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল পাজির পা-ঝাড়া দোকানদারের চোখে-মুখে। খাটো গলাতেই বলেছিল বিষম বিস্ময় প্রকাশ করে, 'সে কী! ও জিনিস তো এ দোকানের নয়! বাইরে থেকে এসে পড়েছে—আপনিই এনেছেন হয়তো জামা-প্যান্টের মধ্যে।' পরের কথাটা নিক্ষিপ্ত হল জিপের উদ্দেশে, 'খোকা, মনের মতো আর কী দেখতে চাও বল দিকি?'

অনেক কিছুই তো দেখতে চায় জিপ—এ দোকানের সবই তো দেখছি ওর মনের মতোই। প্রশ্নটা শুনেই সসম্ভ্রমে তাকিয়েছিল নচ্ছার দোকানদারের দিকে—দু'চোখে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম ম্যাজিকের ব্যাপারে লোকটার ওপর অপরিসীম আস্থা। বলেছিল সশ্রদ্ধ সুরে, 'ওটা কি ম্যাজিক তলোয়ার?'

'খেলনা ম্যাজিক তলোয়ার। বাঁকে না, ভাঙে না, আঙুল কেটেও যায় না। এ তলোয়ার যার কাছে থাকে, আঠারো বছরের নিচে যে কোনও শত্রুকে সে হারিয়ে দিতে পারে তলোয়ার যুদ্ধে। যেমন সাইজ, তেমন দাম। আধ ক্রাউন থেকে সাড়ে সাত পেনি পর্যন্ত। আর এই যে কার্ডের তৈরি ফুল সেট বর্ম দেখছ, এগুলো বাচ্চা নাইট-যোদ্ধাদের খুবই দরকার। এই ঢাল নিয়ে তলোয়ার যুদ্ধে নামলে শত্রুর তলোয়ার গায়ে লাগবে না, এই চটি পায়ে গলালে বিদ্যুৎবেগে শত্রুকে হারিয়ে দেবে, এই শিরস্ত্রাণ মাথায় পরলে কার সাধ্যি তোমার মাথায় তলোয়ারের কোপ মারে।'

শুনে যেন দম আটকে এল জিপের—'বাবা!'

অর্থাৎ এমন জিনিস না কিনলেই নয়। দাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু আমার কোনও কথাতেই কান দেয়নি দোকানদার। জিপকে বেশ কবজায় এনে ফেলেছে ততক্ষণে; জিপ আমার আঙুল ছেড়ে তার আঙুল খামচে ধরে শোরুম ভরতি অজস্র বিদঘুটে জিনিসপত্রের আশপাশ দিয়ে দিব্যি ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। জিপকে ফেরানোর সাধ্যি তখন আমারও নেই। দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। একটু ঈর্ষাও হয়েছিল। জিপ এত সহজে আমার আঙুল ছেড়ে আর-একজনের আঙুল ধরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াবে, ভাবতেও পারিনি। লোকটার অনেক গুণ আছে মানছি, ছেলেপুলে তো বটেই, তাদের বাবাদের মনেও চমক সৃষ্টি করতে

পারে, চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়ার মতো নকল সামগ্রীও বানাতে ওস্তাদ, তা-ও মানছি, তবুও—

কথা না বাড়িয়ে অগত্যা ওদের পেছনেই লেগে ছিলাম আঠার মতো। বিশেষ করে নজর রেখেছিলাম হাতসাফাইয়ের জাদুকরটার ওপর। জিপ আনন্দ পাচ্ছে, এটাই বড় কথা। সময় হলেই বাপ-বেটায় বেরিয়ে পড়ব দোকানের বাইরে।

শেষ নেই যেন শোরুমের। টানা লম্বা প্রদর্শনী মঞ্চের পর প্রদর্শনী মঞ্চ। জাদুসামগ্রীর বীথি বলা যায়। ম্যাজিক গ্যালারি, থাম, তাক আর কাউন্টার যেন আর ফুরাচ্ছে না। একটা খিলেন শেষ হয় তো আরম্ভ হয় আর-একটা। একটা ডিপার্টমেন্টের শেষে পৌঁছাতেই দেখি ধনুকাকৃতি নতুন খিলেনের তলায় আর-একটা ডিপার্টমেন্ট। অদ্ভুত বিটকেল কিম্ভূতকিমাকার সহকারীরা প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে থাম, তাক আর কাউন্টারের আড়াল থেকে। এরকম কিম্ভূতদর্শন সহকারীর দল জীবনে দেখিনি মশায়। সারি সারি বিচিত্র দর্পণে নিজের রকমারি প্রতিবিম্ব দেখছি আর চমকে চমকে উঠছি। পরদার বাহারই বা কতরকম। ধাঁধা সৃষ্টি করে চলেছে বিরামবিহীনভাবে। চোখের ধাঁধা থেকে মনের ধাঁধা। শেষ পর্যন্ত পরদা আর আয়নার গোলকধাঁধায় বনবন করে মাথা ঘুরতে লাগল আমার। কোন দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম আশ্চর্য এই শোরুমের ভেতরে, কোনদিকে যে তা আছে, সে হিসেবও হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জিপকে ম্যাজিক ট্রেন দেখিয়েছিল দোকানদার। ম্যাজিকই বটে। বাষ্পে চলে না সে ট্রেন, ঘড়িযন্ত্রের মতো দম দেওয়ার কারবারও নেই। সিগন্যালগুলো যেখানে যা দরকার, কেবল বসিয়ে দিলেই হল, কু-ঝিকঝিক করে গড়িয়ে চলবে জাদু রেলগাড়ি। তারপরেই জিপকে দেখানো হল ভীষণ দামি বাক্স ভরতি সৈনিক। জ্যান্ত সৈন্যরা গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে আসবে বাইরে ডালাটা খুলে ধরে একটা দাঁত-ভাঙা মন্ত্র বললেই। একবার শুনেই সে মন্ত্র মনে রাখার মতো কান আমার নেই। কিন্তু জিপ পেয়েছে ওর মায়ের মতো ধারালো কান। নিমেষে আওড়ে গেল ভজকট মন্ত্রটা। পিঠ চাপড়ে দিয়ে দোকানদার সৈন্যদের দুমদাম করে ছুড়ে ঢুকিয়ে দিলে বাক্সের মধ্যে এবং গোটা বাক্সটা তুলে দিলে জিপের হাতে। 'খোকা, এবার তোমার পালা। জাগাও সৈন্যদের,' দোকানদারের মুখ থেকে কথাটা খসতে-না-খসতেই মন্ত্র আওড়ে জ্যান্ত সৈন্যদের বাক্সের বাইরে বার করে এনেছিল জিপ।

'নেবে নাকি?' দোকানদারের প্রশ্ন।

জবাবটা দিয়েছিলাম আমি, 'নেব বইকী, কিন্তু পুরো দাম নিতে হবে আপনাকে। চুম্বকটাও দিয়ে দেবেন সেই সঙ্গে—'

‘কী যে বলেন!’ বলেই দুমদাম করে সৈন্যদের আবার বাক্সের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে ডালা বন্ধ করে গোটা বাক্সটাকে শূন্যে দুলিয়ে নিতেই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল আমার। শূন্যপথেই বাদামি কাগজে প্যাকিং হয়ে গেছে বাক্স, সুতো দিয়ে বাঁধাও হয়ে গেছে, এমনকী লেবেলের ওপর জিপের পুরো নাম-ঠিকানা পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে!

আমার ছানাবড়া চক্ষু দেখে সে কী হাসি দোকানদারের।

বলেছিল হাসতে হাসতেই, ‘খাঁটি ম্যাজিক, স্যার। ভেজালের কারবার নেই এ দোকানে।’

বিড়বিড় করে বলেছিলাম, ‘এত খাঁটি ম্যাজিক আমার রুচিতে সয় না।’

কথাটা বললাম যাকে লক্ষ্য করে, সে কিন্তু ততক্ষণে জিপকে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাজিকের কায়দা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রতিটা ম্যাজিকই অদ্ভুত, তার চাইতেও অদ্ভুত হাতসাফাইয়ের কায়দা। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে দোকানদার, গাম্ভীরি চালে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছে জিপ।

যতখানি সম্ভব এড়িয়ে চলছিলাম। কিন্তু কানে ছিপি দিয়ে তো থাকা যায় না। ম্যাজিক দোকানদার যখন যে জাদু-শব্দ উচ্চারণ করছে, চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে হুবহু সেই ঢঙে সেই উচ্চারণে তার পুনরাবৃত্তি শুনছি কচি গলায়! কান সেদিকে থাকলেও মন সরে গিয়েছিল অন্যদিকে। শোরুমের বিশালতা এবং মজাদার পরিবেশ সম্বন্ধে আগেই বলেছি। মজা এখানে সর্বত্র। এমনকী কড়িকাঠ, মেঝে, পরদাগুলোতেও। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা চেয়ারগুলোর মধ্যেও রয়েছে মজা, শুধুই মজা। কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছিল, যখনই চেয়ারের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেছি, তখনই যেন চেয়ারগুলো আপনা থেকেই নড়েচড়ে জায়গা বদল করে নিচ্ছিল। নিঃশব্দে চলেছে এই খেলা আমার দু’পাশে, আমার পেছনে। সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিন্তু আর কোনও চেয়ারকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিনি। এ ধরনের অদ্ভুত মজা মোটেই ভালো লাগেনি আমার। ঘরের ওপরকার কার্নিশে দেখেছিলাম এমন একটা কিলবিলে সর্পিল নকশা, যা আমার রুচি মেনে নিতে পারেনি কোনওমতেই। তার চাইতে বিদঘুটে, সর্পিল হল, কার্নিশ থেকে ঝোলানো সারি সারি কিম্ভূতকিমাকার মুখোশগুলো—নিছক প্লাস্টারে কি অমন ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব?

আচমকা আকৃষ্ট হয়েছিলাম অদ্ভুতদর্শন এক সহকারীর বিটকেল কার্যকলাপ দেখে। স্তূপাকার খেলনার আড়ালে থাকায় সে নিশ্চয় দেখেনি আমাকে, আমি দেখতে পেয়েছিলাম তার শরীরের তিন-চতুর্থাংশ। একটা থামে হেলান দিয়ে অলসভাবে খেলা করছিল নিজের নাকখানাকে নিয়ে অত্যন্ত বীভৎসভাবে! ‘নেই কাজ তো খই ভাজ’ ভাব নিয়ে সময়-কাটানো ঢঙে নিজের গোদা মোটকা নাকখানাকে হঠাৎ

দূরবিনের মতো লম্বা করে ফেলেও ক্ষান্ত হয়নি। আরও মজা করার জন্যে ক্রমশ সরু করে ফেলেছিল নাকের ডগা। দেখতে দেখতে লাল রঙে ছোপানো চাবুকের মতো ইয়া লম্বা একখানা নাক সপাং সপাং করে বাতাস আছড়ে গিয়েছিল নিজের খেয়ালে। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যে এমন দৃশ্য দেখা যায় না! থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চাবুকের মতো হাঁকড়ে চলেছে হিলহিলে লম্বা নাক। কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!

দেখেই তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল আমার। ত্রস্তে তাকিয়েছিলাম জিপের দিকে—ভয়ানক এই অবসর বিনোদন যেন সে বেচারির চোখে না পড়ে। দেখলাম, একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর মতো সে ফিসফিস করে কথা বলছে দোকানদারের সঙ্গে। দোকানদারও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাতে একটা পেল্লায় ড্রাম।

চোখাচোখি হতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছিল জিপ, 'লুকোচুরি খেলা, বাবা! লুকোচুরি খেলা!'

বাধা দেওয়ার আগেই মাথার ওপর দিয়ে ড্রামখানা গলিয়ে দিয়েছিল দোকানদার।

সঙ্গে সঙ্গে দাবড়ানি দিয়েছিলাম তারস্বরে, 'ও কী হচ্ছে? ভয় দেখাচ্ছেন কেন ছেলেটাকে? তুলুন—এখুনি তুলুন!'

দ্বিরুক্তি না করে অসম কর্ণের দোকানদার তুলে নিয়েছিল ড্রাম—ঘুরিয়ে ধরেছিল আমার দিকে। শূন্য ড্রাম। টুলও শূন্য! মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেছে আমার পুত্র!...

চিত্র ২০.৪ থামে হেলান দিয়ে অলসভাবে খেলা করছিল নিজের নাকখানাকে নিয়ে

অদৃশ্যলোক থেকে অশুভশক্তি যদি হাত বাড়িয়ে কারও হৃৎপিণ্ড খামচে ধরে অকস্মাৎ, তখন তার মনের যা অবস্থা হয়—আমারও হল তা-ই। নিজস্ব সত্তা বলে যেন আর কিছুই রইল না। কাঠ হয়ে গেলাম। ধড়ফড় করতেও ভুলে গেলাম। রাগ বা ভয় কোনও বোধশক্তিই আর রইল না।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দেঁতো হাসি-হাসা দোকানদারের সামনে গিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিলাম টুলখানা।

বললাম দাঁতে দাঁত পিষে, 'কোথায় গেল আমার ছেলে?'

দু'হাতে শূন্য ড্রামখানা আমার দিকে ফিরিয়ে বললে সে, 'দেখতেই পাচ্ছেন, লোক-ঠকানো কারবার আমরা করি না—'

হাত বাড়িয়েছিলাম কাঁধখানা খামচে ধরব বলে। কিন্তু সাঁত করে পিছলে গেল সে নাগালের বাইরে। আবার তেড়ে গেলাম কাঁধ খামচানোর জন্যে। বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে গিয়ে সে একটা দরজা খুলে ধরল সটকান দেওয়ার মতলবে। চিলের মতো

চেঁচিয়ে উঠেছিলাম পেছন থেকে, 'দাঁড়ান... দাঁড়ান বলছি!' বলেই ক্ষিপ্তের মতো ধেয়ে গিয়েছিলাম তাকে ধরতে—গিয়ে পড়লাম নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে।

ধপ করে একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। কে যেন সশব্দে আছড়ে পড়েছে আমার গায়ের ওপর।

বিমূঢ় অবস্থায় শুনেছিলাম তার ক্ষমা প্রার্থনা—'মাপ করবেন। দেখতে পাইনি। '

দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছি রিজেন্ট স্ট্রিটে। ধাক্কা লেগেছে একজন ভদ্রবেশী শ্রমিকের সঙ্গে। গজখানেক দূরে হতচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে জিপ। আমাকে দেখেই কাষ্ঠ হেসে এসে দাঁড়াল পাশে।

বগলে রয়েছে চারখানা প্যাকেট!

ঝকঝকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে মুঠোয় চেপে ধরেছিল আমার একখানা আঙুল। ফ্যালফ্যাল করে আমি কিন্তু তখন ইতিউতি চেয়ে দেখছি। কই, ম্যাজিক দোকানের দরজা তো দেখা যাচ্ছে না! দোকানের চিহ্নও তো কোথাও নেই! ছবির দোকানটা আছে, মুরগিছানার দোকানটা কাছে—ম্যাজিকের দোকানটা গেল কোথায়?

মাথার মধ্যে এইরকম লন্ডভন্ড অবস্থায় একটাই করণীয় ছিল—ফুটপাতের কিনারায় গিয়ে ছাতা তুলে হাঁক দিলাম একটা ছ্যাকড়া গাড়িকে। জিপকে ধরে তুলে দিলাম গাড়ির মধ্যে। অতি কষ্টে মনে করলাম নিজের বাড়ির ঠিকানা, তারপর উঠে বসলাম জিপের পাশে। কোটের পকেটে কী যেন একটা ঠেলে রয়েছে দেখে হাত ঢোকাতেই পেলাম একটা কাচের বল। টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম রাস্তায়।

জিপ শুধু দেখল, কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারিনি।

তারপর জিপ বলেছিল বিষম উচ্ছ্বাসে, 'বাবা, দোকান বটে—খাঁটি ম্যাজিক!'

ধুত্তোর ম্যাজিক! ছেলেটার গায়ে আঁচড় লেগেছে কি না, মনটা ঠিকঠাক আছে কি না, আগে তো সেইটা দেখি। সন্ধানী চোখে দেখেও গোলমাল কোথাও দেখলাম না। ছেলে আমার ঠিকই আছে, বরং বেশ ফুর্তিতেই আছে—বৈকালিক প্রমোদ উপভোগ করেছে মনপ্রাণ দিয়ে। বগলে রয়েছে চার-চারখানা প্যাকেট।

কিন্তু কী আছে প্যাকেটের মধ্যে?

মুখে বলেছিলাম, 'ছোটদের রোজ রোজ যেতে নেই এ ধরনের দোকানে।'

চুপ করে রইল জিপ। নিরুচ্ছ্বাস, নিরুত্তাপ। যা ওর স্বভাব। হু-হু করে উঠেছিল মনটা। সেই মুহূর্তে ওর মা যা করত, আমিও তা-ই করেছিলাম। হঠাৎ হেঁট হয়ে চুমু খেয়েছিলাম ওর কপালে। হাজার হোক, ছেলেটা তো মজা পেয়েছে, আমি না-ই বা পেলাম!

প্যাকেটগুলো পরে খোলার পর আশ্বস্ত হয়েছিলাম পুরোপুরি। তিনটে বাক্সের মধ্যে সিসের সৈন্য। মামুলি খেলনা। কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে। এত সুন্দর যে, জ্যান্ত সৈন্য না পাওয়ার দুঃখ ভুলে গিয়েছিল জিপ। চতুর্থ বাক্সটায় ছিল কিন্তু একটা জ্যান্ত বেড়ালছানা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি খিদে। মেজাজি নয় মোটেই।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম প্যাকেট চারটের জিনিসপত্র দেখে। তারপরেও অবশ্য মন না চাইলেও আপনা থেকেই পা চলে যেত ওর খেলাঘরের দিকে, ঘুরঘুর করতাম আশপাশে...

এ ঘটনা ঘটেছিল ছ'মাস আগে। এই ছ'মাসের মধ্যে উদ্ভট কিছু না ঘটায় মনের মধ্যে আর কোনও অস্বস্তি বোধ করিনি। সব বেড়ালছানার মধ্যে অল্পবিস্তর ম্যাজিক থাকে, ব্যতিক্রম দেখিনি এই বেড়ালছানার ক্ষেত্রেও। ম্যাজিকের নামগন্ধ পাইনি তিন বাক্স সিসের সৈন্যদের মধ্যে। খেলনা হিসেবে অতুলনীয়।

কিন্তু হুঁশিয়ার ছিলাম জিপকে নিয়ে। বুদ্ধিমান বাপ-মা মাত্রই ছেলেকে চোখে চোখে রাখে এমতাবস্থায়—

একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'জিপ, ধর্ তোর সৈন্যগুলো জ্যান্ত হয়ে গিয়ে যদি কুচকাওয়াজ করতে আরম্ভ করে দেয়, কী করবি তখন?'

'করেই তো, ডালাটা খোলবার আগে শুধু ফুসমন্তরটা বলে দিই,' সরলভাবে বলেছিল জিপ।

'বাস? সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় কুচকাওয়াজ?'

'নইলে কি এত ভালোবাসতাম?'

চমকে ওঠাটা স্বাভাবিক। উঠেওছিলাম।

তারপর বেশ কয়েকবার জানান না দিয়ে হুট করে ঢুকে পড়েছিলাম ওর খেলাঘরে। দেখেছিলাম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যরা। কিন্তু ম্যাজিক আচরণ কারও মধ্যে দেখিনি ক্ষণেকের জন্যেও।

টাকাকড়ির ব্যাপারটা এবার বলা যাক। দেনা মিটিয়ে দেওয়ার বদভ্যেসটা আমার মজ্জাগত। ম্যাজিক দোকানের খোঁজে রিজেন্ট স্ট্রিটে বহুবার হানা দিয়েছি, হতাশ হয়েছি প্রতিবারেই। তবে, দোকানদার যখন জিপের নাম-ঠিকানা জেনে বসে আছে, তখন আশা আছে, একদিন-না-একদিন বিলটা পৌঁছাবেই, দামটাও মিটিয়ে দেব। টাকাকড়ির ব্যাপারটা তাই ছেড়ে দিয়েছি ম্যাজিশিয়ান মহাশয়ের মর্জির ওপর।
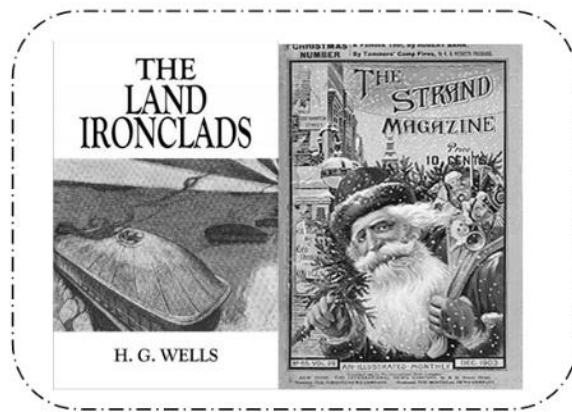
'The Land Ironclads' প্রথম প্রকাশিত হয় 'Strand Magazine' পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে। এই গল্পেই প্রথম সাঁজোয়া গাড়ির আবির্ভাব হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ট্যাঙ্ক ব্যাবহারের প্রায় ১৩ বছর আগে।

লোহার কচ্ছপ
(The Land Ironclads)

(১)

রণ-সাংবাদিকের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে, চোখে দূরবিন লাগিয়ে শত্রুব্যূহের অলস প্রশান্তি দেখে খুশিতে ফেটে পড়ল তরুণ লেফটেন্যান্ট।

এক মাস হতে চলল—একই দৃশ্য দেখে দেখে চোখ পচে গেছে দু'জনেরই। যুদ্ধ ঘোষণার পর বেশ ভালোই লেগেছিল সাংবাদিকমশায়ের। চুটিয়ে প্রতিবেদন লেখা যাবে রণক্ষেত্র থেকে—দারুণ লড়াইয়ের রক্ত গরম-করা রিপোর্ট।

কিন্তু কোথায় লড়াই? বীরবিক্রমে রাজধানী দখল করতে যাওয়ার সময়ে যা একটু বাধা দিয়েছিল শত্রুপক্ষ, ঘোড়সওয়ার আর সাইকেলবাহিনী খুব খানিকটা লম্ফঝম্প করেছিল হানাদারবাহিনীর সামনে। কিন্তু পেছিয়ে গিয়েছিল—তেমন একটা লড়াইয়ের মধ্যে যায়নি বলেই হতাহতও খুব বেশি হয়নি।

তারপরেই সারি সারি ট্রেঞ্চের মধ্যে সেই থেকে বসে আছে তো বসেই আছে। রাজধানী রক্ষে করছে এইভাবে!

দূর! দূর! এর নাম লড়াই? কোথায় দুমদাম করে রাইফেল ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসবে, কামান গর্জনে প্রান্তর কাঁপিয়ে ছাড়বে, বেয়নেট ঝলসে উঠবে, ঘোড়ার পায়ে ধুলো উড়বে, বারুদের ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাবে—তবেই না লড়াই।

কিন্তু তা তো নয়! সারি সারি ট্রেঞ্চ কেটে ভেতরে ঢুকে বসে আছে ইঁদুরের মতো। রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই ভাবছে, ভোর হলেই বুঝি তেড়ে আসবে বিউগল বাজিয়ে—কিন্তু তার কোনও লক্ষণই নেই।
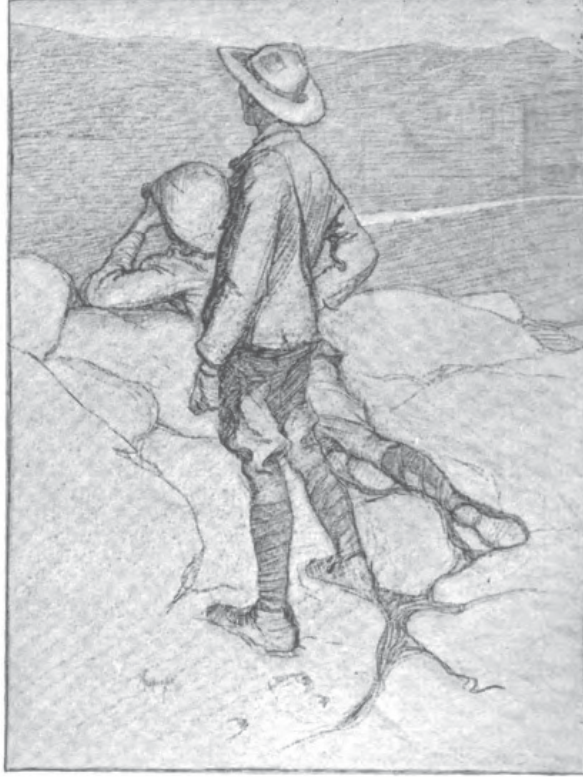
চিত্র ২১.১ 'কই দেখি?' দূরবিনটা টেনে নিয়ে
অজানা বস্তুটাকে অন্বেষণ করে সাংবাদিক।

আজ রাতের মতোই প্রতিরাতে দেখা গেছে কেবল সঞ্চরমাণ লণ্ঠন, ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ড, আগুন ঘিরে বসে আড্ডায় মশগুল কিছু লোক। কাঠখোট্টা দুঁদে সৈন্যদের মতো তাদের চেহারাও নয়।

লেফটেন্যান্টও তা-ই বলেছিল সাংবাদিককে। লড়বার ক্ষমতা থাকলে তো লড়বে? যুদ্ধবাজ তো কেউই নয়। কেউ কলম-পেষা কেরানি, কেউ লেখক, কেউ কারখানার শ্রমিক, কেউ শান্তিপ্রিয় সভ্য নাগরিক। রোদে পোড়া চামড়া, কটমটে চাউনি, তাগড়াই গোঁফ—কারওই নেই। খাঁটি সৈন্যের এইসবই তো লক্ষণ—যেমন রয়েছে তাদের সৈন্যদের মধ্যে। দেখলেও বুক দুরদুর করে ওঠে।

'তাহলে আর কেন ওদের আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকবেন? ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়?' জানতে চেয়েছিল রণ-সাংবাদিক।

'মুশকিল তো সেইখানেই', মুচকি হেসে বলেছিল তরুণ লেফটেন্যান্ট—'রক্ত তেতে না উঠলে একদল কেরানি, কুলি আর শহুরের ওপর কি খামকা ঝাঁপিয়ে পড়া যায়?'

তা-ই বলে কি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এমনিভাবে বসে থাকতে হবে? প্রতিরাতেই আশ্বাস দিয়ে চলেছে তরুণ লেফটেন্যান্ট—ভোর হোক, নিশ্চয় তেড়ে আসবে—এরাও মার-মার করে তেড়ে গিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

হঠাৎ চমকে ওঠে তরুণ লেফটেন্যাট—'ও কী?'
চমকে ওঠে সাংবাদিকও—'কী হল?'
'গাছের সারির মাথায় কালোমতো কী যেন দেখলাম?'
'কই দেখি?' দূরবিনটা টেনে নিয়ে অজানা বস্তুটাকে অন্বেষণ করে সাংবাদিক।
কিন্তু বৃথাই। নিকষ আঁধারের মধ্যে সঞ্চরমাণ লণ্ঠন আর শান্তিপ্রিয় যুদ্ধ-অরুচি কিছু লোক ছাড়া কাউকে দেখা যায় না।
'চোখের ভুল।'
'উঁহু, বিরাট ছায়ার মতো কী যেন দুলে উঠল ওই গাছগুলোর মাথায়।'
চোখের ভুল যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। মিত্রপক্ষের কামান গর্জে উঠল—গোলা ছুটে গেল বিশেষ গাছগুলোকে লক্ষ্য করে।
পুঞ্জীভূত ছায়া-দানবকে দেখেছে তারাও।
কিন্তু সত্যিই কি সেটা দানব?
রহস্যের সমাধান ঘটল একটু পরেই পরেই—চক্ষুস্থির হয়ে গেল প্রতিটি দুঁদে সৈন্যের।

(২)

তরুণ লেফটেন্যান্ট খুব বড়াই করেছিল তার আগে। রণপরিচালনা যদি তার হাতে থাকত, তাহলে ভোরের অপেক্ষায় বসে থাকত না। হা-রে-রে-রে করে তেড়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারেই দখল করত একটার পর একটা ট্রেঞ্চ।
কিন্তু ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম।
যে ট্রেঞ্চগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'হ্যাকবোন্স হাট', লড়াই শুরু হল ঠিক তার উলটোদিকে। সেদিকের জমি উঁচুনিচু নয়, দিব্যি চেটালো—বহু দূর বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ বললেই চলে—টিকটিকিরও লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই। সদ্য ঘুম-ভাঙা মিত্রপক্ষ সেই দৃশ্য দেখে তো হেসেই খুন। সত্যিই ডাহা আনাড়ি বটে শত্রুপক্ষ!
আনাড়ি তো বটেই। যুদ্ধ কাকে বলে জানেই না! কিন্তু এইরকম একখানা হাস্যকর প্রমাণও যে আশা করা যায়নি।
রণ-সাংবাদিক তো হতভম্ব! স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না এই দৃশ্য। রণক্ষেত্রের আর্টিস্টমশায় তখন চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে সবে জুতোর ফিতে বাঁধছে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে। ভাবল বুঝি, ঘুমের ঘোর এখনও যায়নি। তাই এমন
উদ্ভট দৃশ্য দেখতে হচ্ছে।

ফাঁকা মাঠে তেড়ে আসছে শত্রুসৈন্য! এখনই তো মিত্রপক্ষের কামান-বন্দুক ঝড় বইয়ে দেবে—প্রাণে বেঁচে ফিরে যেতে হবে না একজনকেও! নাঃ, মাথায় এক বালতি জল ঢালা দরকার, তবে যদি চোখের ভ্রান্তি কাটে।

কিন্তু হড়হড় করে ঠান্ডা কনকনে জল ঢালার পরেও শোনা গেল অদ্ভুত একটা শব্দলহরি। যেন টিনের ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে হাজার দশেক গোরুর গাড়ি!

মেশিনগান নিশ্চয়।

এক পায়ে জুতোর ফিতে বেঁধে, আরেক পায়ে তিড়িক তিড়িক করে লাফাতে লাফাতে ঘড়ি দেখল রণ-শিল্পী—রাত আড়াইটে।

আক্রমণ করার এই কি সময়? যুদ্ধবিদ্যা জানা নেই তো—তাই ভেবেছে, আচমকা রাতবিরেতে তেড়ে এসে চমকে দেবে হানাদারদের।

কিন্তু এরাও তো পাকা লড়াইবাজ। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলেও তৈরি হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে-ওদিকে দেখা যাচ্ছে ছুটন্ত লণ্ঠন—ট্রেঞ্চের দিকে দৌড়াচ্ছে সৈন্যরা।

তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল রণ-সাংবাদিক—পেছন পেছন তাড়াহুড়ো করে বেরতে গিয়ে তাঁবুর দড়িতে পা আটকে মুখ থুবড়ে পড়ল বেচারি আর্টিস্টমশায়।

শত্রুরা তখন এলোপাথাড়ি সার্চলাইট ফেলছে। খুব একটা বীরত্ব দেখানো হচ্ছে যেন—মিত্রপক্ষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে ভেবেছে নাকি?

চোখ ধাঁধিয়েই গেল অবশ্য দু'জনের। আর-একটু হলেই পা ভাঙত সামনের খানায় পড়ে।

একটু এগতেই আচম্বিতে যেন একটা প্রচণ্ড রেল-দুর্ঘটনা ঘটল মাথার ওপর—সেইরকমই ভীষণ আওয়াজ। শ্র্যাপনেল গোলা ফেটেছে মাথার ওপর—শিলাবৃষ্টির মতো গুলি ছুটে যাচ্ছে চারদিকে।

ডাইনে-বাঁয়ে সে কী হট্টগোল! গুলি চলছে দমাদম শব্দে—কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। প্রথম প্রথম এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণের পর নিয়মের মধ্যে এসে গেল ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গর ছুটে যাওয়া। শত্রুপক্ষ বোধহয় পুরো বাহিনী নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ফলটা হবে চূড়ান্ত—হয় হেরে ভূত হবে, নয় জিতে যাবে।

প্রথমদিকের সেই কানের পরদা-ফাটানো শব্দপরম্পরা কিন্তু কমে এল একটু একটু করে, ব্যাপার কী? মিত্রপক্ষ সাবাড় হয়ে গেল নাকি এর মধ্যেই?

মাইল দুয়েক দূরে মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে শত্রুপক্ষের কামান—পূর্ব আর পশ্চিমে থেকে থেকে ধমক দিচ্ছে দু'-একটা রাইফেল। প্রহেলিকার সমাধান করার আগেই আচমকা সার্চলাইটের প্রখর আলো এসে পড়ল দু'জনের ওপর। সেই আলোয় দেখা

গেল সামনের দৃশ্য—অনেক দূর পর্যন্ত। পাগলের মতো ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ছুটছে সৈন্যরা—একজন দু'হাত মাথায় ওপর ছুড়ে আছড়ে পড়ল ধড়াস করে—আর নড়ল না। তার পেছনেই দেখা গেল বিশালকায় চকচকে কালো একটা বস্তু—তারও পেছনে প্রশান্ত সাদা চক্ষু মেলে সার্চলাইটটা নিরীক্ষণ করে চলেছে যুদ্ধ-পাগল দুনিয়াটাকে।

চিত্র ২১.২ আচমকা সার্চলাইটের প্রখর আলো এসে পড়ল

পরক্ষণেই একটা শ্র্যাপনেল গোলা ফাটল মাথার ওপর। আবার শিলাবৃষ্টির মতো বুলেট ঝরে পড়ল চারপাশে। মুখ গুঁজড়ে আছড়ে পড়ল সাংবাদিক আর শিল্পী।

পড়ল একটা ট্রেঞ্চের মধ্যেই। রুদ্ধশ্বাসে শুধায় সাংবাদিক, 'ব্যাপারটা কী? আমাদের লোকজন তো গুলি খেয়ে মরছে দেখছি।'

'গুলি তো করছে ওই কালো জিনিসটা। ঠিক যেন একটা কেল্লা। প্রথম ট্রেঞ্চ থেকে শ'দুই গজ দূর থেকে যা গুলি চালাচ্ছে... নিরেট পাথরের বাড়ি যেন, অথবা দানবের থালার ঢাকনা।'

আহা রে, উপমার কী ছিরি!

যা-ই হোক, বিদঘুটে কিন্তু ভয়ংকর বস্তুটাকে তাহলে তো খুঁটিয়ে দেখা দরকার। প্রাণটা বেঘোরে যেতে পারে ঠিকই—কিন্তু সাংবাদিকদের কর্তব্য করতে গেলে প্রাণের মায়া করলে চলে কি?

তাই ট্রেঞ্চ থেকে উঁকি দিতেই দু'দিক থেকে দুটো সার্চলাইটের তীব্র আলোকবন্যার মধ্যে সুস্পষ্ট দেখা গেল আগুয়ান বিভীষিকাকে।

দুঃস্বপ্ন নাকি?

বিচিত্র বস্তুটাকে একটা সুবৃহৎ পোকা বলা চলে। লোহার বর্ম-আবৃত কীট। তেরচাভাবে এগচ্ছে প্রথম সারির ট্রেঞ্চের দিকে। পাশের দিকে সারি সারি গোলাকার গবাক্ষ। গুলি ছুটে আসছে তাদের মধ্যে থেকে। অবিশ্রান্ত গুলি আছড়ে পড়ছে বর্মের ওপর—কিন্তু বৃথাই। টিনের চালায় আছড়ে পড়লে যেরকম ঝনঝন টংটং আওয়াজ শোনা যায়—শুধু সেই আওয়াজই হচ্ছে—প্রত্যেকটা গুলিই ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে বর্মে লেগে।

সরে গেল সার্চলাইটের আলো। আবার নিশ্ছিদ্র তমিস্রা। কিন্তু গোলন্দাজদের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, অদ্ভুত বিকট বস্তুটা এগিয়ে আসছে অবিচল গতিবেগে।

জিনিসটা আদতে কী, তা-ই নিয়ে একটু আলোচনা করতে গিয়েই আচমকা আর্টিস্টমশায়ের মুখে এসে পড়ল এক ঝাপটা ধুলো।

উড়ুক্কু বুলেট উড়িয়ে নিয়ে গেল এক চাকলা মাটি—তারই ধুলো!

আর-একটু হলেই উড়ে যেত খুলিটা। চট করে মাথা নামিয়ে নিল দু'জনেই। গুঁড়ি মেরে সরে এল পেছনের ট্রেঞ্চে। সেখানে তখন জোর গুলতানি চলেছে হতভম্ব সৈন্যদের মধ্যে। মহাকায় বস্তুটার স্বরূপ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ঠিকই, সামনের সারির সৈন্যসামন্তও এতক্ষণে পরলোকের টিকিট কেটে বসেছে নিশ্চয়—কিন্তু এখুনি তো ভোরের আলো ফুটবে। তখন একহাত নেওয়া যাবে বাছাধনদের।

'বাছাধনদের মানে? দেখলাম তো একটাই,' জানতে চায় সাংবাদিক।

'লাইনবন্দি আসছে—পোকার মতো গুটিগুটি—আসুক না—আমরাও তৈরি!'

চিত্র ২১.৩ দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চের মাটির পাঁচিলের আড়ালে বসে রাইফেলধারীরা সমানে গুলিবর্ষণ করে চলেছে আগুয়ান লৌহবর্মাবৃতদের দিকে।

এখনও তড়পানি? 'বাছাধন' যাদের বলা হল, তাদের একটিকে দেখেই তো চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে সাংবাদিকের। আসছে নাকি লাইন দিয়ে। মোট ক'টা?

একগাল চকোলেট চেবাতে চেবাতে আবার উঁকি দিয়েছিল সাংবাদিক। অন্ধকার এখনও আছে বটে, কিন্তু একটু ফিকে হয়ে এসেছে। তরল অন্ধকারে শত্রু-দানবদের দেখা যাচ্ছে সারি সারি। চোদ্দো-পনেরোটা তো বটেই—একটা থেকে আর-একটার ব্যবধান তিনশো গজ। বদখত আকারের অতিকায় দানবরা প্রথম সারির ট্রেঞ্চ পেরিয়ে এসে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ করছে যেখানে সৈন্যরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে—ঠিক সেইদিকেই।

অন্ধকার আরও ফিকে হয়ে আসছে। দূরবিনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রথম সারির ট্রেঞ্চে মড়া আর আধমড়া ছাড়া কেউ নেই। দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চের মাটির পাঁচিলের আড়ালে বসে রাইফেলধারীরা সমানে গুলিবর্ষণ করে চলেছে আগুয়ান লৌহবর্মাবৃতদের দিকে। সামনের দিক থেকে চম্পট দিয়েছে সৈন্যরা—সরে গেছে ডাইনে আর বাঁয়ে। গুলি ছুটে যাচ্ছে—ওই দু'দিক থেকেই।

কাঠখোট্টা একজন করপোরাল দূরবিনটা ছিনিয়ে নিল সাংবাদিকের হাত থেকে। আজব লড়াই-দৃশ্য দেখে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল দেঁতো হাসি হেসে, 'বাছাধনরা আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ পেরিয়ে এগুতেই পারবে না—আমাদের সৈন্যরা ওই ট্রেঞ্চ দিয়েই তো পিছু হটছে। একটু পরেই হাল ছেড়ে দিয়ে যেই পেছন ফিরবে, অমনি দমাদম গুলি চলবে পেছন থেকে।'

গতিক কিন্তু সুবিধার মনে হল না সাংবাদিকের কাছে।

দিনের আলো ফুটছে একটু একটু করে। মেঘ উঠে যাচ্ছে, সোনালি রোদের আভা দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে স্থলচর বর্মদেহীদের। ঢালু জায়গায় কাত হয়ে রয়েছে একটা। লম্বায় আশি থেকে একশো ফুট তো বটেই। খাড়াই পাশটা মাটি থেকে ফুট দশেক পর্যন্ত বেশ মসৃণ—তারপরেই কচ্ছপের ঢাকনির মতো নকশাকাটা বর্ম দিয়ে ঢাকা ওপরের দিকটা। লম্বা মনে হলেও আসলে তা সারি সারি গোলাকার গবাক্ষ—রাইফেলের নয়, টেলিস্কোপের টিউব বেরিয়ে আছে অগুনতি পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে। কোনওটা নকল। কিন্তু এমন গায়ে গায়ে বসানো যে আসল-নকলে তফাত ধরে কার সাধ্যি। প্রায় আড়াইশো গজ দূরে এহেন বিকটাকৃতি বিদঘুটে লৌহদানব একটা ট্রেঞ্চ পেরিয়ে আসছে বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে। ট্রেঞ্চটা এখন শূন্য। লৌহদানবের আসার পথের দু'পাশে কিন্তু স্তূপীকৃত মৃতদেহ—বুলেটবিদ্ধ নিশ্চয়। যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সে পথে দেখা যাচ্ছে ফুটকি ফুটকি দাগ—বালির ওপর দিয়ে কাঁকড়া চলে গেলে যেরকম দাগ পড়ে—প্রায় সেইরকম।

ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে উঠে আসছে অজানা আতঙ্ক।

কানের কাছে শোনা গেল সেই কাঠগোঁয়াড় করপোরালের আত্মম্ভরিতা—'ভেতরে বসে যারা চালাচ্ছে, তাদের এইবার দেখে নেব।'

নির্বোধ! মনে মনেই বলে সাংবাদিক।

প্রথম সারির ট্রেঞ্চ হাতছাড়া হয়ে গেল—এবার পালা দ্বিতীয় আর তৃতীয় সারির ট্রেঞ্চের।

আচমকা হাঁকার দিয়ে ওঠে করপোরাল। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে রাইফেলবর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায় দু'পাশে! বৃষ্টির মতো গুলি গিয়ে পড়ছে যার ওপর, সে কিন্তু এগিয়ে আসছে নির্বিকারভাবে। দানব... দানব... সাক্ষাৎ দানব! তপ্ত সিসের বুলেট তো নয় যেন লোহার চামড়ায় ছিটকে যাচ্ছে শিলাবৃষ্টি। ফট—ফট—ফট শব্দে এগচ্ছে তো এগচ্ছেই—পেছনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে বেরচ্ছে বাষ্প। শামুক যেমন পিঠ কুঁজো করে নেয় এগনোর সময়ে, পিঠটা কুঁজো করে রয়েছে সেইভাবে। তুলে ধরেছে পরনের ঘাগরা—দেখা যাচ্ছে পা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ... সারি সারি পা! মোটা মোটা খাটো পা... গুলি আর বোতামে আচ্ছন্ন অজস্র পা। চ্যাপটা, চওড়া—হাতির পা অথবা শুঁয়োপোকার পায়ের মতন। ঘাগরাটা আর-একটু তুলতেই চোখ কপালে উঠে গেল সাংবাদিকমশায়ের!

পা-গুলো ঝুলছে যেন চাকার গা থেকে!

দূরবিন কষে ভালো করে দেখল সাংবাদিক। না, চোখের ভুল নয়।

এই জিনিস যদি গুটুর গুটুর করে হেঁটে যায় ওয়েস্টমিনস্টারে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট বরাবর, তখন যা কাণ্ড ঘটবে, কল্পনা করতেই চুল খাড়া হয়ে যায় সাংবাদিকের।

কানের পাশে রাইফেল চালাচ্ছিল যে মহাবীর সৈনিকটি, অচম্বিতে একটা বুলেট উড়িয়ে নিয়ে গেল তার করোটি—ওদিকে ট্রেঞ্চের এপারে অনেকখানি উঠে এসেছে ভীমদর্শন বিভীষিকা।

বীরত্ব দেখাচ্ছিল যে, গুলিটি অত দূর থেকে নিক্ষিপ্ত হল যেন ঠিক তার মাথার খুলি লক্ষ্য করেই।

দেখেই বীরত্ব উবে গেল অনেকের। ভয়ের চোটে মাথা নামিয়ে নিল বেশ কয়েকজন—গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখল বাকি ক'জন মরিয়া সৈনিক।

তাতে বয়ে গেল করাল দৈত্যের। বিশাল বপু ট্রেঞ্চের পাড়ে তুলে নিতে লাগল আস্তে আস্তে—সিসের বুলেটগুলো যেন সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে গায়ে—ভাবখানা এইরকম।

উঠে এসেছে সামনের দিকটা—পেছনের পা-গুলো যেন পাড় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অচিরেই জমি কামড়ে দাঁড়িয়ে গেল খুদে বেঁটেখাটো পা-গুলো।

আস্তে আস্তে শম্বুকগতিতে পেরিয়ে এল ট্রেঞ্চ—পুরো দেহটা উঠে এল এপারে।

দাঁড়াল ক্ষণেকের জন্যে। ক্ষণিক বিরতি। সেই ফাঁকে সামলেসুমলে নিল ঘাগরা। মানে, মাটির খুব কাছেই নেমে এল ঘাগরা। রক্ত হিম-করা 'টুট্ টুট্' আওয়াজ করেই আচমকা ঘণ্টায় প্রায় ছ'মাইল বেগে ঢাল বেয়ে উঠে এল সাংবাদিক যেখানে চক্ষু স্থির করে বসে রয়েছে—সেইদিকে।

এরপরেও গুলিবর্ষণ চলেছিল কিছুক্ষণ। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল বন্দুকবাজরা। বুদ্ধিমানের মতো সাংবাদিকমশায়ও আর্টিস্টকে টানতে টানতে পালিয়ে এল মূর্তিমান যমদূতের সামনে থেকে।

ছুটল পাগলের মতো। আর্টিস্টমশায় যে আর কাছে নেই, সে খেয়ালও রইল। ক্ষণেকের জন্যে দেখেছিল যেন ডজনখানেক অতিকায় আরশোলা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিপুল সৈন্যবাহিনীকে। তারপরেই টিলার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সেই দৃশ্য। শুধু দেখল, সংকীর্ণ পথ বেয়ে হড়োহুড়ি করে পালাচ্ছে বীরপুংগবরা। এক-আধজন ওরই মাঝে দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'-একবার রাইফেল ছুড়েই আবার ঠেলাঠেলি করে

দৌড়াচ্ছে সামনে। যেতে যেতেই শুনল, দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চও নাকি হাতছাড়া হয়ে গেছে একটিমাত্র দানবের আবির্ভাবে!

ঠিক এই সময়ে পাশের লোকটি হাত-পা ছুড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে! দানবের গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়েছে এদিকেও!
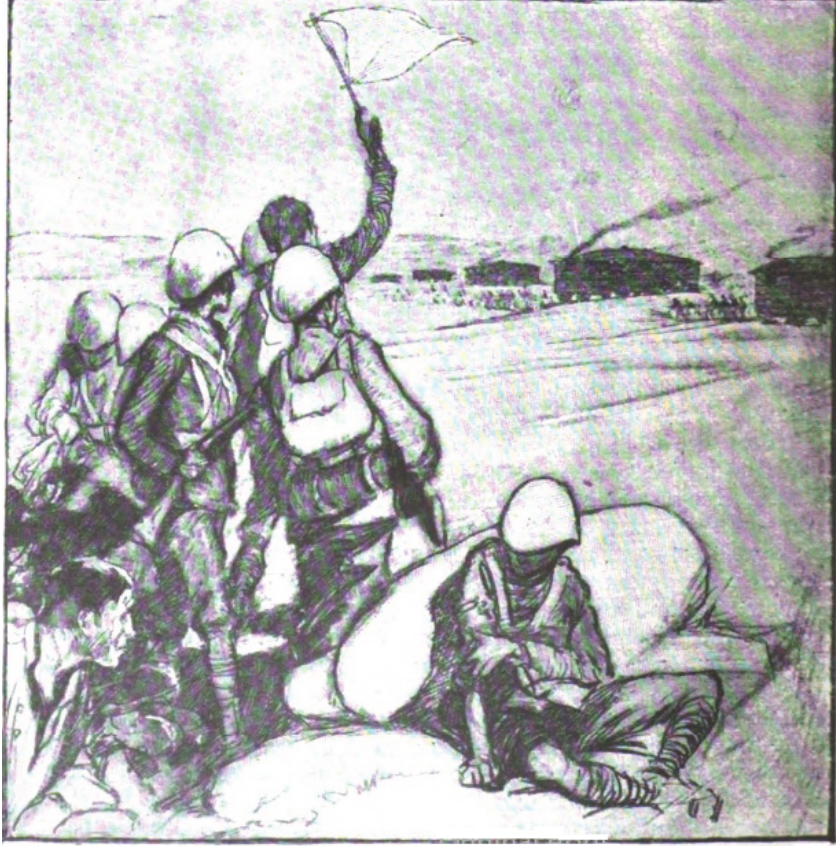
চিত্র ২১.৪ ডজনখানেক অতিকায় আরশোলা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিপুল সৈন্যবাহিনীকে।

ক্ষিপ্তের মতো ছুটল সাংবাদিক—কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, কর্তব্যবিস্মৃত হয়ে, মারপিট করে এগিয়ে চলল দানবের খপ্পরের বাইরে—নিরাপদ অঞ্চলের দিকে। অনেকখানি পথ এইভাবে এসে দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল সাংবাদিক।

রাত বিদায় নিয়েছে—দিনের আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। ধূসর আকাশ আর ধূসর নেই—গাঢ় নীল। মেষলোমের মতো সামান্য মেঘ ভাসছে হেথায় সেথায়। সমুজ্জ্বল ধরণিতলে কিন্তু চলছে প্রলয়ংকর কাণ্ডকারখানা। উত্তরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ। কামান-টামান ছেড়েই পালাচ্ছে। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে চৌদ্দটা লোহার কচ্ছপকে। মানুষের গতিবেগেই তাড়িয়ে আনছে পলায়মান বীরপুরুষদের—থেকে থেকে গর্জে উঠছে রাইফেল—নির্ভুল লক্ষ্যে ধরাশায়ী করছে এক-একজনকে। লোহার কচ্ছপ তিরিশ ফুট চওড়া ট্রেঞ্চ পেরিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। লোহার কচ্ছপ—কিন্তু আকারে

দানবিক এবং ছুটছে মানুষের গতিবেগে। কামানের গোলা আর রাইফেলের বুলেটকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে নিষ্ঠাসহকারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে বিরামবিহীনভাবে। মেশিন! মানুষকে পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে মেশিন!

ভোর সাড়ে চারটে। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ শেষ।

উত্তরে দেখা দিয়েছে শত্রুপক্ষের সাইকেলবাহিনী। তিলমাত্র হুটোপাটি নেই। ধীরগতিতে ঘেরাও করে ফেলছে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের।

যুদ্ধ শেষ! মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে।

মাত্র তিনশো গজ দূরে একটা লৌহবর্মদেহীকে তেরচাভাবে তারই দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই পাঁইপাঁই করে দৌড়াল সাংবাদিক! দাঁড়িয়ে গেল পরক্ষণেই মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ শুনে—শব্দ আসছে বাঁদিক থেকে। দেখাই যাক-না দৃশ্যটা।

(৩)

লৌহবর্মদেহীরা চড়াও না-হওয়া পর্যন্ত বন্দুক নিয়ে আর কারদানি দেখাতে যায়নি মিত্রপক্ষ। গুলি চালাবে কাদের ওপর? নিজেদেরই হতাহত সৈন্যদের ওপর? দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চও তো হাতছাড়া। স্থলচর লৌহবর্মদেহীদের অগ্রগতি এখন আগের চাইতের দ্রুততর। বাধা তেমন নেই। বাধা যেখানে, নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ ঘটছে ঠিক সেইখানেই। পলায়মান পদাতিকবাহিনী নিয়ে নতুন রণকৌশলের কথা ভাবতে লাগল মিত্রপক্ষের জেনারেল। মতলবটা ঠিক করতে হবে আধ ঘণ্টার মধ্যেই। এর মধ্যে চলুক কামান আর বন্দুকবর্ষণ—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেল, তা দায়সারা গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রুখে দাঁড়িয়েছিল তিনটে গোলন্দাজবাহিনী। সাজসরঞ্জামসহ কামান নিয়ে বীরদর্পে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করে গিয়েছিল আগুয়ান লৌহদানবকে লক্ষ্য করে। বাঁদিকে এগিয়ে আসছিল তিনটে কালো মেশিন—ডানদিকে একটা। বাঁদিকের তিনটে মেশিনের ওপর গোলা আছড়ে পড়ছিল অবিশ্রান্ত ধারায়—কিন্তু মেশিন তিনটে কামান-টামানের দিকে তেড়ে না গিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেখান থেকে কামান যারা চালাচ্ছে, তাদেরকে গুলিবর্ষণের আওতায় আনা যায়। তারপরেই পাশের দিক থেকে মাঝে মাঝে ছুটে আসছিল একটা বুলেট—কামানে যে হাত দিতে যাচ্ছে, ঠিক তারই মাথার খুলি লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল সেদিককার গোলন্দাজবাহিনী। বেশ কিছু কামান থেকে কোনও গোলাবর্ষণই ঘটল না।

চিত্র ২১.৫ সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে
দৌড়াল সাংবাদিক সাহেব।

ডানদিকের একটি মেশিন সহসা টানা লম্বা পাশের দিকটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল কামানবাহিনীর দিকে, তারপর শুরু হল নির্ভুল গুলিবর্ষণ। মাত্র চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে বিশাল কালো দৈত্য ভলকে ভলকে উগরে গেল অগ্নিঝলক—প্রতিটি বুলেট ধরাশায়ী করছে এক-একজন গোলন্দাজ- কে।

বিস্ফারিত চোখে অপূর্ব সেই যুদ্ধদৃশ্য দেখে প্রথমটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রণ-সাংবাদিক মশায়। তারপরেই যখন দেখল, মরা আর আধমরার স্তূপে মাত্র জনা ছয়েক গোলন্দাজ দাঁড়িয়ে, হাড়ে হাড়ে বুঝল খেল খতম! যুদ্ধ শেষ!

আত্মসমর্পণ করাটা কি ঠিক হবে? ভাবল রণ-সাংবাদিক। ধরা দিলে প্রতিবেদন আর পাঠানো যাবে না। পালানোই যাক বরং!

সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল সাংবাদিক সাহেব ঘোড়ার সন্ধানে।

(৪)

স্থলচর লৌহবর্মদেহীরা নাকি তেমন অজেয় ছিল না—ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল অনেক—পরবর্তীকালে এই ধরনের মতামত শোনা গিয়েছিল কর্তৃপক্ষমহলে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবের সেই দিনটিতে তাদের ক্ষমতা যে কতখানি ধ্বংসাত্মক হতে পারে, তা মহাশ্মশান সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

দীর্ঘ, সরু তাদের বপু। আগাগোড়া অত্যন্ত মজবুত ইস্পাত ফ্রেমে ঢাকা ইঞ্জিন। তলায় আটজোড়া পা ঝুলছে খাঁজকাটা চাকা থেকে। একটিমাত্র মূল অক্ষরেখার দু'দিকে যাতে এই আটজোড়া পা যেদিকে খুশি চালানো যায়—সেইভাবে লাগানো অ্যাক্সেল বা দণ্ড—চাকা আর পা ঝুলছে এই আটটি অ্যাক্সেল থেকে। মাটির অবস্থা যা-ই থাকুক-না কেন, বন্ধুর অথবা চেটালো—আটজোড়া পা সব অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে সক্ষম। টিলায় ওঠার সময়ে কিছু পা রেখেছে পেছনের গর্তে, কিছু পা সামনের ঢালু জমিতে। কখনও কাত হয়ে থেকেছে গর্তে পড়েও—কিন্তু ভারসাম্য হারায়নি একবারও: ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিন চালিয়েছে ক্যাপটেনের হুকুমে। ক্যাপটেন সারি সারি পোর্টহোল দিয়ে নজর রেখেছে চারদিকে। ওপরদিকের বারো ইঞ্চি পুরু লোহার চাদরের ঘাগরা ওঠানো-নামানো যায় ইচ্ছেমতো। পুরো বর্মদেহীকে ঘিরে রেখে দিয়েছে এই মজবুত লোহার পাত। ছোট গবাক্ষগুলো ছিল ঘাগরার দিকে। পুরো মেশিনটাকে সুরক্ষিত রেখেছিল এই ঘাগরা। ঘাগরার ওপরে ছিল একটা কনিং-টাওয়ার—যে জিনিসটা থাকে যুদ্ধজাহাজে—অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো এইখানেই দাঁড়িয়ে জাহাজ পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ—দুটো কাজই একসঙ্গে চালায় ক্যাপটেন। কালো বর্মাবৃতদের কনিং-টাওয়ার ইচ্ছেমতো ওঠাতে-নামাতে পারত ক্যাপটেন। মাঝের একটা লোহার ঢাকনির মধ্যে দিয়ে উঠে আসত কনিং-টাওয়ার, পোর্টহোল সমেত আবার নেমে যেত নিচে। আজব মেশিনের সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে ঝুলন্ত চেয়ারের মতো ঝুলছিল সারি সারি ক্ষুদ্র কক্ষ—অদ্ভুত গড়নের কক্ষ—রাইফেলধারীরা নিশ্চিন্ত নিরাপদে বসে ছিল সেখানে। রাইফেলগুলো অবশ্য হানাদারবাহিনীর রাইফেলের মতো মামুলি নয়—বিশেষ ধরনের।

চিত্র ২১.৬ একটা কম্পাস হাতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেলধারী।

প্রতিটি রাইফেলই অটোমেটিক। কার্তুজ বেরিয়ে যাচ্ছে, খালি জায়গায় নতুন কার্তুজ চলে আসছে কার্তুজমালা থেকে আপনা হতেই—হাত দিয়ে ভরতে হচ্ছে না—কার্তুজের স্টক শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অটোমেটিক রাইফেল তাই গুলিবর্ষণ করে চলেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করার জন্যেও রাইফেলধারীকে চোখের ব্যবহার করতে হচ্ছে না। ক্যামেরার ছবি ভাসছে যেন চোখের সামনে। দুটো আড়াআড়ি লাইন রয়েছে সেই ছবির মাঝে। লাইন দুটো যেখানে কাটাকুটি করেছে, ঠিক সেই বিন্দুটিতে যে ছবিটি এসে পড়ছে, অটোমেটিক রাইফেলের গুলি ছুটে যাচ্ছে নির্ভুল লক্ষ্যে সেইদিকেই। মৌলিকতা আছে বটে দর্শনব্যবস্থায়। নকশা-আঁকিয়ে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের কম্পাসের মতো অথচ রীতিমতো জটিল একটা কম্পাস হাতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেলধারী। যে মানুষটাকে মারতে চায়, মোটামুটি তার উচ্চতায় খুলছে আর বন্ধ করছে কম্পাসখানা। কম্পাস খুলে গেলেই খুলে যাচ্ছে ক্যামেরা ভিউ—বন্ধ করলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দর্শনব্যবস্থা। কুয়াশার জন্যে দৃশ্য যাতে ঝাপসা না দেখায়, তার ব্যবস্থাও আছে আবহাওয়া বিশারদদের তারের বাজনার মতো একটা যন্ত্র দিয়ে—লৌহবর্মদেহী অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

দর্শনযন্ত্রও সাময়িকভাবে স্থানবদল করে সুস্পষ্ট দৃশ্য ফুটিয়ে তুলছে ক্যামরা ভিউতে। গাঢ় আঁধারে ভরা কক্ষে দাঁড়িয়ে সামনের সমুজ্জ্বল এই ছবির ওপর নজর রেখেছে রাইফেলধারী। দূরত্ব বিচারের জন্য এক হাতে রয়েছে কম্পাস, আর এক হাত রয়েছে দরজার হাতলের মতো একটা গোল মুণ্ডির ওপর। মুণ্ডি ঠেলে দিলেই দুলে উঠছে রাইফেল—চঞ্চল হয়ে উঠছে সামনের ছবি। যে মানুষটার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বলে ঠিক করে ফেলেছে রাইফেলধারী, তাকে কাটাকুটি লাইনের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে এনে ফেলেই টিপে দিচ্ছে মুণ্ডির মাঝখানে ছোট্ট একটা বোতাম। অনেকটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টেপার মতো। কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে মুণ্ডিটা ঈষৎ সরিয়ে মানুষটার উচ্চতায় কম্পাস ছোটবড় করে নিয়ে আবার টিপে দিচ্ছে বোতামটা—দ্বিতীয়বারে গুলি আর ফসকাচ্ছে না।

স্থলচর লৌহবর্মধারীর দুর্ভেদ্য আবরণের গায়ে রয়েছে তিন সারি গোলাকার গবাক্ষ। প্রত্যেকটা পোর্টহোলেই দেখা যাচ্ছে রাইফেলের নল আর দর্শনযন্ত্র। দৈবাৎ ক্যামেরা-বাক্সে দাঁড়িয়ে রাইফেলধারী 'ধুত্তোর!' বলে জখম হওয়া যন্ত্র নামিয়ে নিয়ে মেরামত করে নিচ্ছে, অথবা বেশি জখম হলে নতুন যন্ত্র বসিয়ে দিচ্ছে।

সারি সারি এই ক্যামেরা-কেবিনগুলো কিন্তু ঝুলছে মূল অ্যাক্সেলের বাইরে—ঘুরন্ত চাকা থেকে ঝুলন্ত হাতির পায়ের মতো, মাটিতে একেবারেই ঠেকছে না। কেবিনের পেছনে রয়েছে একটা টানা লম্বা অলিন্দ—দানবটার সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত। বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতিতে ঠাসা রয়েছে এই করিডর। দানব মেশিনের জঠর বলতে একটাই—কলকবজায় ঠাসা বিরাট উদর। বেশ কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার চালাচ্ছে কলকবজা। ঠিক মাঝখানে, কনিং-টাওয়ারের তলায় ক্যাপটেন দাঁড়িয়ে আছে একটা মইয়ের গোড়ায়। মই বেয়ে উঠে যেতে পারে কনিং-টাওয়ারে যে কোনও মুহূর্তে। যাচ্ছেও। একটা চাকা ঘোরালেই কনিং-টাওয়ার উঠে যাচ্ছে ওপরে—সেই সঙ্গে ক্যাপটেন। তখন তার কোমর পর্যন্তই কেবল দেখতে পাচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা। দু'টিমাত্র বৈদ্যুতিক আলো রয়েছে করিডরে—প্রতিটি যন্ত্রপাতি কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট। তেল আর পেট্রোলের গন্ধে কটু বাতাস। বাইরের খোলামেলা দুনিয়া থেকে সহসা এই বদ্ধ পরিসরে আবির্ভূত হলে সাংবাদিকমশায়ের মনে হত, বুঝি বা এসে পড়েছে অন্য কোনও জগতে।

লড়াইয়ের দুটো দিকই কিন্তু খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে ক্যাপটেন। কুয়াশায় আবছা ভোরের রোদে ঝকমকে শিশির-ছাওয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে কনিং-টাওয়ারের মাথা উঁচিয়ে। ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা, প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে হতভম্ব সৈন্যরা। আছড়ে পড়ছে কাতারে কাতারে। ভেঙেচুরে কাত হয়ে রয়েছে কামান আর বন্দুক, বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবন্দিরা। অপরূপ এই দৃশ্য দেখেই মাথা নামিয়ে নিয়ে

ইশারায় হুকুম দিচ্ছে ক্যাপটেন। কখনও অর্ধেক গতিবেগে যেতে, কখনও সিকি গতিবেগ গড়িয়ে যেতে, কখনও ডানদিকে আধাআধি ঘুরে যেতে—এইরকম অজস্র হুকুম শুধু হাত আর মুখের ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছে ম্যাড়মেড়ে আলোয় আলোকিত ইঞ্জিনকক্ষের তেলগন্ধী গোধূলি আলোয়। দু'পাশে রয়েছে দুটো কথা বলার নল। মাঝে মাঝে মাউথপিসে মুখ লাগিয়ে অদ্ভুত যন্ত্রযানের দু'প্রান্তের সহযোগীদের জানিয়ে দিচ্ছে, কখন কোন বন্দুকধারীদের ওপর পুরোদমে আক্রমণ চালাতে হবে, অথবা ডানদিকের ট্রেঞ্চটাকে কীভাবে শ'খানেক গজ দূর থেকে কাটিয়ে যেতে হবে। বয়সে সে নেহাতই তরুণ। রোদে পোড়া নয় মোটেই। আকৃতি আর ভাবসাব দেখে মনে হয় না কোনওকালে ট্রেনিং পেয়েছে রাজকীয় নৌবহরে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বেশ সতর্ক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং শান্ত। শুধু ক্যাপটেনই নয়—রাইফেলধারী আর ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যেকেই ধীরস্থির মস্তিষ্কে তন্ময় হয়ে রয়েছে যে যার কাজ নিয়ে। শৌর্যবীর্য দেখাতে গেলে নাকি ক্ষিপ্তের মতো আচরণ করতে হয়, রক্তবহা নালির ওপর অত্যধিক চাপ দিতে হয়। হুটোপাটি করে চারপাশ গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু অদ্ভুত এই যন্ত্রযানের ভেতরকার কোনও মানুষটিই এই ধরনের বিকট পাগলামি আর উৎকট বীরত্ব দেখাচ্ছে না।

চিত্র ২১.৭ আকৃতি আর ভাবসাব দেখে মনে হয় না কোনওকালে ট্রেনিং পেয়েছে রাজকীয় নৌবহরে।

উলটে অসীম অনুকম্পা থমথম করছে প্রত্যেকের অন্তরে। যাদেরকে মারতে হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে—অনুকম্পা হচ্ছে তাদের জন্যে। বুদ্ধিহীন পাশব শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে ওই যে জোয়ানরা একে একে লুটিয়ে পড়ছে গুলিবিদ্ধ হয়ে, ওরাও তো এদেরই মতো নওজোয়ান। কিন্তু মেশিন বানিয়ে লড়বার মতো বুদ্ধি নেই কারওই। কল্পনার অভাব থাকলে যা হয় আর কী। ক্যাপটেনও মনে মনে ভাবছে, 'আহা রে, লড়তেই যদি এলি, মাথা খাটিয়ে মানুষের মতো লড়লি না কেন? এ যে নিরেট গর্দভের মতো লড়াই।' অনুকম্পার সঙ্গে তাই মিশে যাচ্ছে তাচ্ছিল্য। সেই সঙ্গে অনুতাপ। মানুষ মারার এই অভিনব যন্ত্র বানানোর জন্য অনুতাপ। যুদ্ধ নামক এই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা না ঘটালেই কি চলত না? এই নরমেধ যজ্ঞটা তো তাহলে এড়িয়ে যাওয়া যেত।

ওদিকে দক্ষ কেরানিদের মতো যান্ত্রিক নিষ্ঠায় মুণ্ডি ঘুরিয়ে বোতাম টিপে চলেছে রাইফেলধারীরা...

তিন নম্বর স্থলচর লৌহবর্মদেহীর ক্যাপটেন গোলন্দাজবাহিনীকে বন্দি করে ফেলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যন্ত্রযানকে। কনিং-টাওয়ার থেকে বিজয়গৌরবে দেখছে, সাইকেলবাহিনী ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে যুদ্ধবন্দিদের ঘিরে ফেলতে।

চোখে পড়ল জেনারেলের সংকেত। কোন যন্ত্রযানকে কোথায় দাঁড়াতে হবে, কী করতে হবে—সেই সংকেত দিয়ে যাচ্ছে জেনারেল। ছোট্ট দুঃসংবাদটাও জানল সেই সংকেত থেকে। দশ নম্বর যন্ত্রযান জখম হয়ে পড়ে আছে। তবে মেরামত করে নেওয়া যাবে।

মই বেয়ে এসে খবরটা দিলে ইঞ্জিনিয়ারদের। একটা যন্ত্রযান কুপোকাত হয়েছে সাময়িকভাবে, কিন্তু দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বাকি তেরোটা। যুদ্ধ জয়ের সমাপ্তি টানবে এই তেরোটাই।

দূর থেকে সারি সারি তেরোটা যন্ত্রযানের মাথায় বিজয়সূচক পতাকা আন্দোলন দেখতে পেল সাংবাদিক—অভিনন্দন জানাচ্ছে পরস্পরকে। ভোরের সোনালি রোদে সোনার মতো চকচকে করছে কালান্তক যমদূতের মতো যন্ত্রযানদের গা-গুলো।

(৫)

দৌড়াতে দৌড়াতে পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল বেচারি সাংবাদিকের। ঘোড়া একটা জুটিয়েছিল, কিন্তু কিছু দূর টগবগিয়ে যাওয়ার পর গুলি খেয়ে এমন ল্যাংচাতে লাগল যে, রিভলভারের গুলিতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল সাংবাদিক। পেছন ফিরে দেখছিল, সাইকেলে চেপে শহরবাসীরা বন্দি করছে সৈন্যদের নেহাতই আনাড়িভাবে। ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে অপটু হাতে। ওই মাঝে সাইকেল আরোহীদের

দিকে বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে যারা এগচ্ছে, চলমান মেশিন নিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণে কুপোকাত হচ্ছে তারা।
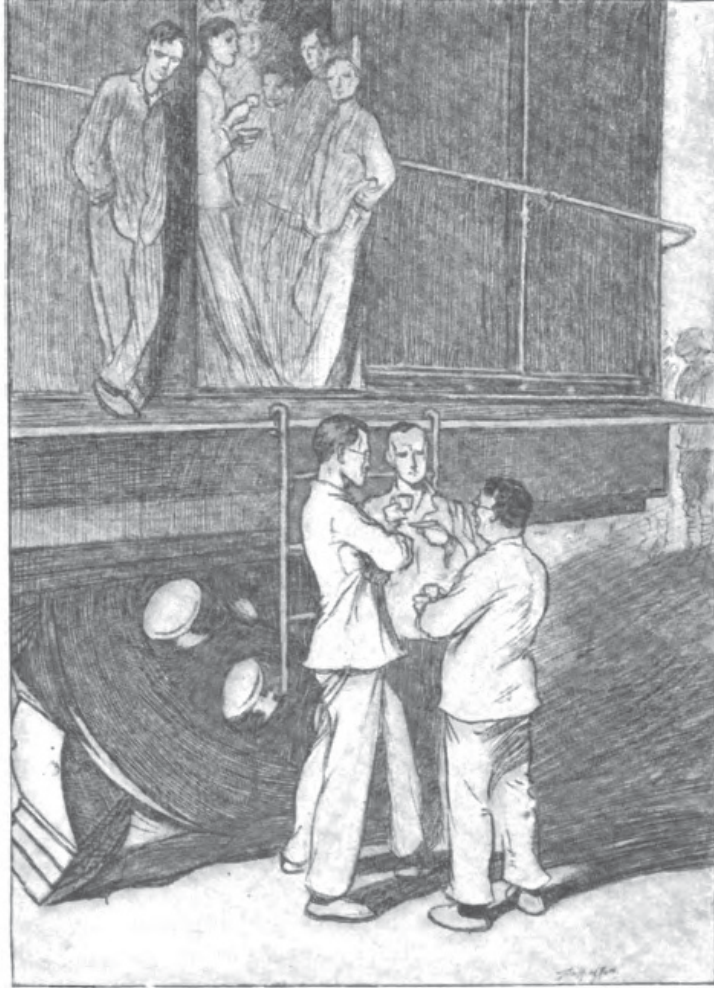
চিত্র ২১.৮ মেশিনের তলায় পিষ্ট মানবতা!

অতএব আত্মসমর্পণ করাই ভালো। পকেট থেকে সাদা রুমালও বার করেছিল সাংবাদিক। তারপরে কানে ভেসে এল অশ্বারোহীদের খটাখট শব্দ। ছুটে যাচ্ছে নদীর ওপর সাঁকোর দিকে। রুমালখানা পকেটে পুরে পেছন পেছন দৌড়েছিল সাংবাদিকমশায়। কিন্তু দূর থেকেই দু'-দুটো লৌহদানবকে সাঁকোর দু'পাশে হিমশীতল দেহে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ের চোটে হিম হয়ে এল হাত-পা। প্রশান্ত ভঙ্গিমায় সাঁকো পাহারা দিচ্ছে দু'-দুটো মেশিন—এদিকে দু'মাইলের মধ্যে আসে কার সাধ্যি? পুরো মিত্রপক্ষকে ঘিরে ফেলেছে চৌদ্দটা লোহার কচ্ছপ—নিখুঁত নৈপুণ্যে।

অতএব আত্মসমর্পণই করতে হল। সার বেঁধে সৈন্যরা চলেছে অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে এই কর্মটিই সম্পাদন করতে। গজগজ করছে তা সত্ত্বেও—ছ্যা ছ্যা,

এই কি লড়াই! চলমান বন্দুক নিয়ে মেশিনে চেপে লড়াই! হাতাহাতি লড়াইয়ের মুরদ নেই—

একজন বলে উঠেছিল, 'মেশিন বানিয়ে নিলেই হত।'

'কী!' বীরদর্পে রুখে উঠল সেই কাঠখোট্টা করপোরাল—'কামারগিরি করব আমি?'

খবরটার শিরোনমাটা তৎক্ষণাৎ মাথায় এসে গেল সাংবাদিকের—'মানুষ বনাম কামারগিরি!'

মেশিনের তলায় পিষ্ট মানবতা!

মেশিনগুলোর মধ্যে নীল পাজামা পরে জনা ছয়েক তরুণ তখন হৃষ্টচিত্তে কফি আর বিস্কুট খেতে খেতে মেশিনের জয়গানই করছে।

সুতরাং, জয় হোক বিজ্ঞানের!

অনুবাদকের কথা: গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯০৩** সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে ব্রিটিশ বাহিনী **১৯১৬** সালে 'সোম্‌মি'-তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ডাঙার লড়াইয়ে মূল ভূমিকা নিয়েছিল ট্যাঙ্ক-বাহিনী। সুতরাং গল্পটিকে সার্থক কল্পবিজ্ঞান বলা যায়। **১৯০৩** সালে যা ছিল আজগুবি, **১৯১৬** সালে তা-ই হল বিস্ময়।
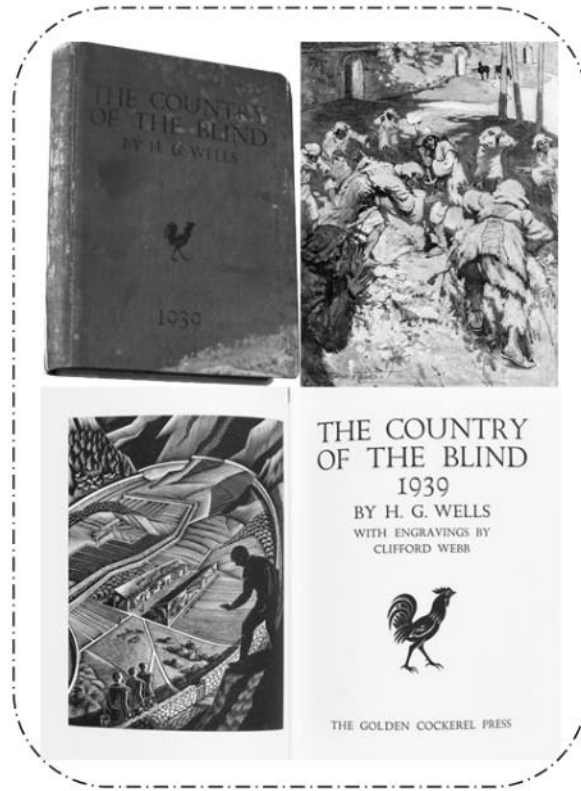
‘The Country of the Blind’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘Strand Magazine’ পত্রিকায় এপ্রিল ১৯০৪ সালে। পরে ‘Thomas Nelson and Sons’ থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত ‘The Country of the Blind and Other Stories’ সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। পরে ওয়েলস গল্পটি মার্জনা করেন এবং ১৯৩৯ সালে নতুন করে ‘Golden Cockerel Press’ থেকে বের করেন।

অন্ধ যে দেশে সকলেই
(The Country of the Blind)

রহস্যময় পার্বত্য উপত্যকায় আছে অন্ধদের দেশ। আশ্চর্য সেই দেশে অন্ধ প্রত্যেকেই। চক্ষুষ্মানের ঠাঁই নেই সেখানে। লোমহর্ষক এই কাহিনি শোনা গিয়েছিল একজনেরই মখে, দৈবাৎ পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে পৌঁছেছিল সেই দেশে, চক্ষুরত্ন সম্বল করে পালিয়ে এসেছিল কোনওমতে।

অনেক... অনেক দূরের পথ সেই পার্বত্য উপত্যকা। শিমবোরাজো থেকে সাড়ে তিনশো মাইলেরও বেশি, কোটোপাক্সির তুষার-ছাওয়া অঞ্চল থেকে শ'খানেক মাইল তো বটেই। ইকুয়েডর্স অ্যান্ডিজের ধু ধু ঊষর অঞ্চলে রয়েছে সেই অবিশ্বাস্য দেশ—যে দেশে অন্ধ সকলেই।

বহু বছর আগে কিন্তু পাহাড়-পর্বত টপকে, গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যেত সেই উপত্যকায়। অত্যাচারী স্পেনীয় শাসকের খপ্পর থেকে পালিয়ে কয়েকটি পেরুভিয়ান দোআঁশলা পরিবার পৌঁছেছিল সেখানে।

তারপরেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হল মিনডোবাম্বায়, সতেরো দিন নিশীথ রজনিতে আবৃত রইল কুইটো, জল ফুটতে লাগল য়াগুয়াচিতে, গুয়ায়াকুইল দিয়ে ভেসে গেল অগুনতি মরা মাছ। প্রশান্ত মহাসাগরের পাহাড়ি ঢাল বরাবর ধস, অকস্মাৎ জলপ্লাবন, আরাউকা শিখরের ধসন বজ্রধনির মধ্যে দিয়ে চিরতরে রুদ্ধ করে দিলে অন্ধদের দেশে প্রবেশের যাবতীয় পথ। দুনিয়া যখন এইভাবে প্রকম্পিত, তার আগেই একজন... শুধু একজন ছিটকে এসেছিল বহির্জগতে... রহস্যময় পার্বত্য উপত্যকায় থেকে গিয়েছিল তার স্ত্রী আর ছেলে। বাইরের দুনিয়ায় নতুন করে সে জীবন শুরু করে। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে অচিরেই, অন্ধত্ব ছিনিয়ে নেয় চোখের দৃষ্টি, খনি অঞ্চলে অসীম শাস্তিভোগের পর একদিন রওনা হয় পরলোকের পথে। কিন্তু যে কাহিনি সে শুনিয়ে গিয়েছিল, তা আজও কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে অ্যান্ডিজের করডিলারাসে।

দক্ষিণ আমেরিকায় উটের মতো একরকম জন্তু দেখা যায়। কিন্তু উটের চাইতে ছোট এবং পিঠে কুঁজ নেই। নাম, লাম্যা। শৈশবে এই লাম্যার পিঠে মালপত্র সমেত তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুদূরের সেই উপত্যকায়। নয়নাভিরাম সেই উপত্যকায় মানুষ যা পেলে সুখী হয়, শান্তি পায়, তার সবই আছে। আছে গাছে গাছে ফল, সুপেয় জল, কৃষিক্ষেত্র, মনোরম আবহাওয়া, উর্বর বাদামি মৃত্তিকা, তুষার পর্বতের গায়ে নিবিড় অরণ্য। তিনদিকে ধূসর সবুজ পাহাড় উঠে গেছে যেন আকাশ অবধি—চিরতুষারে ঢাকা তাদের কিরীট। হিমবাহ নদী কিন্তু উপত্যকায় না এসে বয়ে যায় পাহাড়ের অন্যদিকের ঢাল বরাবর। মাঝে মাঝে বরফের চাঙড় খসে পড়ে উপত্যকায়। বৃষ্টি হয় না সেখানে, তুষারপাতও ঘটে না। স্থির পাহাড়ি ঝরনার জলে বারো মাস সবুজ থাকে চাষের জমি, প্রান্তর, তৃণভূমি। মানুষজনের কোনও চাহিদা অপূরণ থাকে না সেখানে, সুখী সেখানকার প্রতিটি পশুপক্ষী।

কিন্তু অতৃপ্তি ছিল কেবল একটি ব্যাপারে। দেবতার উপাসনা মন্দির ছিল না একটিও। তাই যখন অব্যাখ্যাত সংক্রমণে দৃষ্টিশক্তি হারাতে লাগল একে একে অনেকেই, এমনকী দৃষ্টিহীন হয়ে ভূমিষ্ঠ হল বহু নবজাতক, তখন একজন—শুধু একজনই—মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ছিটকে এসেছিল অভিশপ্ত অথচ অপরূপ সেই উপত্যকা থেকে। সে সময়ে সংক্রমণ কী বস্তু তা কেউ বুঝত না। দৃষ্টিহীনতার কারণ নিশ্চয় দেবতার অভিশাপ—বদ্ধমূল এই ধারণা নিয়ে সে চলে এসেছিল একখণ্ড রুপোর বাট পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে। কোথায় পেয়েছিল এই রজতখণ্ড, তা কিন্তু অনভিজ্ঞ মিথ্যুকের মতো বর্ণনা করতে গিয়ে কৌতূহলই জাগ্রত করেছিল প্রত্যেকের অন্তরে। মূল্যবান এই ধাতু নিশ্চয় অঢেল পাওয়া যায় সেখানে—কিন্তু মুদ্রার অথবা অলংকারের প্রয়োজন নেই বলে হেলায় পড়ে থাকে। ক্ষীণদৃষ্টি, রৌদ্রদগ্ধ, শীর্ণকায় যুবকটি সাগ্রহে পুরুতদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, দেবতার অধিষ্ঠান যেন ঘটে অভিশপ্ত উপত্যকায়। নইলে যে অন্ধ হয়ে যাবে সকলেই।

কিংবদন্তির শুরু সেই থেকেই। বহু দূরে... সুদূর উপত্যকায় বসবাস করে অন্ধ মানুষের একটা প্রজাতি।

আজও শোনা যায় সেই কিংবদন্তি।

পর্বতবেষ্টিত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, মুষ্টিমেয় মানুষগুলির মধ্যে কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বিচিত্র ব্যাধি। প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রবীণরা, ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে এসেছিল নবীনরা, দৃষ্টিহীন হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল শিশুরা।
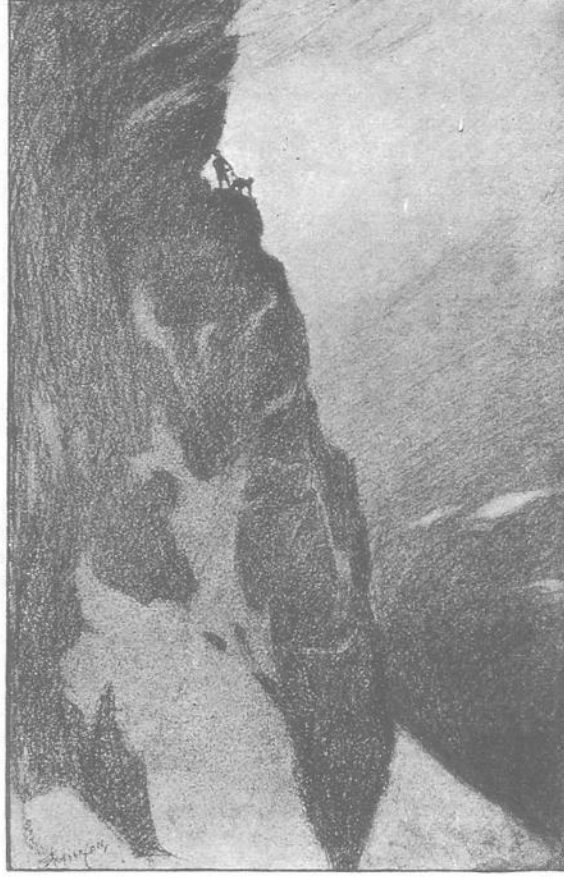
চিত্র ২২.১ পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া মানুষটা কিন্তু মরেনি।

জীবনের ধারা কিন্তু বয়ে গিয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। যেখানে কাঁটাঝোপ নেই, কীটপতঙ্গের উপদ্রব নেই, হিংস্র শ্বাপদের হামলা নেই—যেখানে শান্ত-প্রকৃতি লাম্যা বিচরণ করে দলে দলে, সমীরণ বয় মৃদুমন্দ বেগে, ঝরনা ঝরে পড়ে অবিরাম, অন্ধ হয়েও সেখানে কারও জীবনে যতি পড়েনি। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে হতে লোপ পেয়েছিল এত ধীরে যে, ক্ষতিটাকে ক্ষতি বলে কেউ মনেও করেনি। অল্প দৃষ্টি নিয়েও সর্বত্র বিচরণ করে নখদর্পণে রেখেছিল পুরো উপত্যকাকে। তারপর যখন একেবারেই লোপ পেল দৃষ্টিশক্তি, বহাল তবিয়তে টিকে গেল পুরো প্রজাতিটা। পাথরের উনুনে আগুনও জ্বালাত চোখ না থাকা সত্ত্বেও। শিক্ষাদীক্ষা ছিল না বললেই চলে। অক্ষরপরিচয় ঘটেনি কোনওদিনই। স্পেনীয় সভ্যতার ছিটেফোঁটা, সুপ্রাচীন পেরু সংস্কৃতি আর লুপ্ত দর্শন—এই ছিল তাদের একমাত্র কৃষ্টি। অতিবাহিত হয়েছিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বিস্মৃত হয়েছিল অনেক কিছুই, উদ্ভাবনও করেছিল অনেক কিছু, অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বহির্জগতের বর্ণোজ্জ্বল সংস্কৃতি। কিন্তু নিটোল ছিল স্বাস্থ্য, অফুরন্ত ছিল দৈহিক শক্তি—হারিয়েছিল কেবল চক্ষু প্রত্যঙ্গ। পুরানো দিনের কাহিনি মুছে গিয়েছিল এক প্রজন্মে। এইভাবেই কেটে গিয়েছিল পরপর পনেরোটি প্রজন্ম—রজতখণ্ড বুকে নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ অন্বেষণে উপত্যকার বাইরে

গিয়েছিল যে যুবকটি, সে কিন্তু আর ফিরে আসেনি। দীর্ঘ পনেরোটি প্রজন্মের পর তার কথাও কারও স্মৃতিপটে বিরাজমান থাকার কথা নয়। তারপর আশ্চর্য সেই উপত্যকায় বাইরের দুনিয়া থেকে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল যে মানুষটি, নাম তার নানেজ। এ কাহিনি শুনেছি তারই মুখে।

কুইটোর কাছে একটা গ্রামনিবাসী পর্বতারোহী সে। বই-পড়া বিদ্যে ছাড়াও সমুদ্রপথে দেখেছে এই পৃথিবীটাকে। ইংরেজদের একটি পর্বত অভিযাত্রীদলে তার ঠাঁই হয়েছিল তিনজন সুইস পথপ্রদর্শক অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ইকুয়েডরে এসেছিল তারা পর্বতারোহণের অভিপ্রায়ে। বিশেষ একটি উচ্চশিখর জয় করতে গিয়ে একদিন নিখোঁজ হয় নানেজ। তুষার-ছাওয়া শিখরের কিছু নিচেই তাঁবু পেতে অনেক হাঁকডাক এবং বাঁশি বাজিয়েও আর তার সাড়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিবরণ প্রায় বারোবার প্রকাশিত হয়েছে। পয়েন্টারের বিবরণটাই সবচেয়ে নাটকীয় এবং বিশদ।

বিনিদ্র রজনি যাপনের পর সকালবেলা তারা দেখেছিল পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার বহু চিহ্ন। নিশ্চয় আর্ত-চিৎকার করেছিল নানেজ গড়িয়ে পড়ার সময়। কিন্তু কেউ তা শোনেনি—এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। অথবা হয়তো গলা ফাটিয়ে চেঁচাবার সুযোগও পায়নি। পা পিছলে পড়েছে পাহাড়ের পূর্বদিকে—যেদিকটার কোনও খবরই রাখে না অভিযাত্রীরা। তুষারের বুক কেটে লাঙল চষার মতো পতনচিহ্ন অতিশয় সুস্পষ্ট, বুক-কাঁপানো খাড়াই ঢাল বেয়ে সটান গড়িয়ে গেছে বলেই চেঁচাবার ফুরসতও পায়নি। তারপর আর কিছুই চোখে পড়েনি। অনেক, অনেক নিচে দেখা গেছে কেবল সারি সারি মহীরুহ। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো, একটা বদ্ধ উপত্যকা ঘিরে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে এক নিবিড় অরণ্য, অন্ধদের হারিয়ে-যাওয়া দেশ। অভিযাত্রীরা কিন্তু জানত না, এই সেই কিংবদন্তির দেশ, অন্ধদের উপত্যকা। এরকম উপত্যকা আরও রয়েছে দুর্গম এই পাহাড়ি অঞ্চলে। দুর্ঘটনাটা কিন্তু তাদের নার্ভাস করে দেয়। বিকেলের দিকে অভিযান মুলতুবি রেখে নেমে আসে পাহাড় থেকে। তারপরেই যুদ্ধে যেতে হয় পয়েন্টারকে। আজও পার্সকোটোপেটল শিখর কেউ জয় করতে পারেননি। আজও শিখরের ঠিক নিচেই পয়েন্টারের ঘাঁটি তুষারাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

পাহাড় থেকে পড়ে-যাওয়া মানুষটা কিন্তু মরেনি—প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল স্রেফ আয়ু ছিল বলে।

হাজার ফুট গড়িয়ে এসেছিল চক্ষের নিমেষে। তার পরেও হাজারখানেক ফুট পিছলে গিয়েছিল পতনের বেগে আরও খাড়াই ঢাল বেয়ে। তুষার সেখানে আরও পুরু। পাকসাট খেতে খেতে আচমকা এইভাবে গড়িয়ে পড়ার ফলে মাথা ঘুরে গিয়েছিল, চৈতন্য লোপ পেয়েছিল, কিন্তু একটা হাড়ও ভাঙেনি নরম তুষার গদির

ওপর পিছলে যাওয়ার দরুন—খাড়াই ঢাল আর ততটা খাড়াই থাকেনি—আস্তে আস্তে মন্দীভূত হয়েছে পতনের বেগ, নরম তুষারস্তূপে আলতোভাবে আছড়ে পড়ায় বেঁচে যায় প্রাণটা। জ্ঞান ফিরে আসার পর মনে হয়েছিল, বুঝি বা অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছে কোমল শয্যায়। কিন্তু অচিরেই পর্বতারোহীর উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল পরিস্থিতির গুরুত্ব। তুষার-গদির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল আকাশের অগুনতি তারার পানে চেয়ে। হাড়গোড় একটাও ভাঙেনি। শুধু যা কোটের সব ক'টা বোতাম ছিঁড়ে গেছে। পকেট থেকে ছুরিটাও পড়ে গেছে। থুতনির সঙ্গে বাঁধা টুপিটাও নিপাত্তা। একটু একটু করে মনে পড়েছিল, পাথর খুঁজছিল আস্তানা বানাবে বলে। পা পিছলেছে তখনই। বরফ-কুঠারও ছিটকে গেছে হাত থেকে।
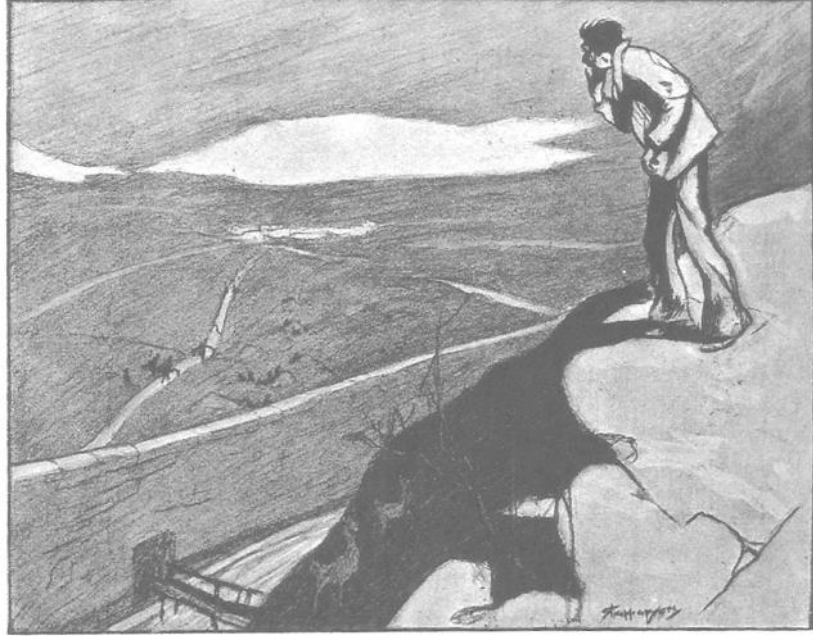
চিত্র ২২.২ পায়ের তলায় কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট ঝোপ।

তখন চাঁদ উঠেছে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের ঢাল দেখে বুঝেছিল, আচমকা পা পিছলে গিয়ে সটান নেমে আসার ফলেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল, চেঁচাতেও পারেনি।

পায়ের তলায় কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট ঝোপ। তুষারস্তূপ থেকে পা টিপে টিপে নেমে গিয়েছিল সেখানে। ফ্লাস্কের জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল একটা গোলাকার স্খলিত শিলার পাশে।

ঘুম ভেঙেছিল পাখির গানে। ঐকতান শোনা যাচ্ছে মাথার ওপর।

খাড়াই পাহাড়ের পর পাহাড় উঠে গেছে যেন আকাশ পর্যন্ত। পূর্ব আর পশ্চিমে প্রাচীরের মতো পাহাড়। রৌদ্রালোকে প্রদীপ্ত।

পায়ের তলায় ঢাল বেয়ে কিন্তু নামা যায়। চিমনির মতো একটা ফাঁক বরাবর ঝরনার জল গড়িয়ে যাচ্ছে। সন্তর্পণে সেইখান দিয়ে কিছুটা নেমে আসার পর বহু দূরে উপত্যকার মধ্যে দেখেছিল কয়েকটা প্রস্তর-কুটির।

জঙ্গল পড়েছিল নামবার পথে। পেরিয়ে এসেছিল হুঁশিয়ার চরণে।

দুপুর নাগাদ পৌঁছেছিল গিরিবর্ত্মের তলদেশে। পাহাড়ি ঝরনার জল পান করে, একটু জিরিয়ে নিয়ে রওনা হয়েছিল প্রস্তর-কুটিরগুলোর দিকে।

পুরো উপত্যকাটাই মনে হয়েছিল কেমন যেন অদ্ভুত। বাড়িগুলোর চেহারাও সৃষ্টিছাড়া। বিভিন্ন রঙের পাথর দিয়ে তৈরি। কখনও ধূসর পাথর, কখনও উজ্জ্বল। অত্যন্ত বেমানানভাবে অজস্র রঙের পাথর দিয়ে প্রস্তর-কুটির নির্মাণ করেছে যারা, তারা যেন চোখের ব্যবহার করতেও জানে না। অন্ধ নাকি? অন্ধ শব্দটা সেই প্রথম তার মাথায় এসেছিল শুধু এই বর্ণবৈষম্য দেখে।

অথচ বৈষম্য নেই আর কোথাও। নিখুঁত পারিপাট্য বিরাজমান সর্বত্র। বহু উঁচুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাম্যার দল। পাহাড়ি ঝরনার জল সঞ্চিত হচ্ছে একটা বিশাল উঁচু প্রাচীরের মতো পরিখায়। জ্যামিতিক ছকে সাজানো বিস্তর কৃষিক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা রয়েছে এই পরিখা থেকে। নিয়মিত ব্যবধানে বহু পাথর বাঁধাই পথ বেরিয়েছে মূল পরিখা থেকে। একটা চওড়া নালা নেমে এসেছে, নালার দু'পাশে বুকসমান উঁচু পাঁচিল। কুটিরগুলোও নিয়মিত ব্যবধানে নির্মিত পথের দু'পাশে, পথটিও আশ্চর্যভাবে পরিষ্কার। পাহাড়ি গ্রামের কুটির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, এখানে তা নয়।

আরও একটু নেমে এসেছিল নানেজ। উপত্যকা ঘিরে-থাকা পাঁচিল আর পরিখার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল, নালার বাড়তি জল জলপ্রপাতের আকারে ঝরে পড়ছে উপত্যকার এক প্রান্তে একটা গভীর খাদের মধ্যে। পুরো উপত্যকার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে নালাটা, প্রতিটি জমিতে জলসিঞ্চনের অপূর্ব ব্যবস্থা দেখে অবাক না হয়ে পারেনি। দূরে স্তূপীকৃত ঘাসের ওপর যেন দিবানিদ্রা দিচ্ছে কয়েকজন নারী এবং পুরুষ। প্রান্তরের অপরদিকে কুটিরগুলোর সামনে খেলা করছে কয়েকটি শিশু। কাছেই, উঁচু পাঁচিল বরাবর পথ বেয়ে কুটির সারির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তিনজন পুরুষ। জলপাত্র বয়ে নিয়ে চলেছে জোয়ালের ওপর। খুব কাছে রয়েছে বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। পায়ের বুটও লাম্যার চামড়ায় তৈরি। কান আর কাঁধ-ঢাকা টুপি রয়েছে মাথায়। চলেছে একজনের পেছনে আর-একজন। যাচ্ছে আর হাই তুলছে, যেন সারারাত কেউ ঘুমায়নি। হাবভাব দেখে সম্ভ্রমবোধ জাগে,

সমৃদ্ধির ছাপ যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মনে সাহস পায় নানেজ। আরও একটু এগিয়ে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়েছিল তারস্বরে। প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল নিবিড় প্রশান্তির নিকেতন সেই উপত্যকা।
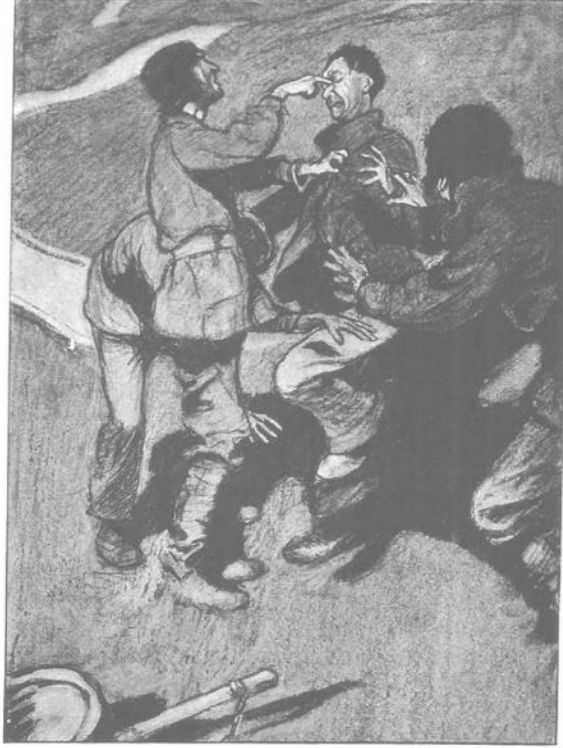
চিত্র ২২.৩ পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখছিল তিনজনে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে-ছিল লোক তিনটে। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনেক চেষ্টা করেছিল নানেজ। কিন্তু তিনজনের কেউই যেন তাকে দেখতে পায়নি। এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়েছে অন্ধের মতো। তারপর ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে সাড়া দিয়ে-ছিল জোর গলায়।

'অন্ধ নাকি?' ফের মনে মনে বলেছিল নানেজ।

বেশ কিছুক্ষণ চেঁচা- মেচি করার পর রেগে- মেগে পাথর থেকে নেমে এসেছিল নানেজ। ছোট্ট স্রোতস্বিনীটা পেরিয়ে এসেছিল সাঁকোর ওপর দিয়ে। পাঁচিলের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকেছিল ভেতরে। গটগট করে এগিয়ে গিয়েছিল লোক তিনটের দিকে। তিনজনেই যে অন্ধ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই ছিল না মনে। অনেকদিন ধরেই শুনে আসছিল, অন্ধদের দেশ আছে দুর্গম পাহাড়ের কোলে। তখন মনে হয়েছিল অলীক উপকথা। বিশ্বাস করতে মন চায়নি। এখন তো স্বচক্ষে দেখছে সেই দেশ। অন্ধদের দেশে মস্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসেছিল নানেজকে। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল দুই চক্ষুর অধিকারী মানুষটা চক্ষুহীন তিনজনের দিকে।

নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজন তার দিকে কান পেতে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কানই যেন তাদের চোখ। কান দিয়ে শুনে বুঝেছিল ওই পায়ের আওয়াজ তাদের একেবারেই অচেনা। তাই ভয় পেয়েছিল। পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজনে। কাছ থেকে নানেজ দেখছিল। চোখের পাতা তাদের বন্ধ, অক্ষিকোটরে যেন চোখ ঢুকে রয়েছে, চক্ষুগোলক যেন হারিয়ে গেছে কোটরের মধ্যে। আতঙ্ক পরিস্ফুট তিনজনেরই মুখের পরতে পরতে।

ফিসফিস করে দুর্বোধ্য স্পেনীয় ভাষায় বলেছিল একজন, 'প্রেত অথবা মানুষ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে—'

নানেজের প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু তখন যৌবনের সুগভীর আত্মপ্রত্যয়। মাথার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে চারণগীত—'একচক্ষুও যেন রাজা অন্ধদের সেই দেশে।' দৃষ্টিহীনদের আশ্চর্য দেশের অত্যাশ্চর্য সমস্ত গল্পই হুটোপুটি জুড়েছে মাথার মধ্যে।

'একচক্ষুও যেন রাজা অন্ধদের সেই দেশে।'

রাজার মতোই তাই বীরোচিত পদক্ষেপে, বুক উঁচিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় অগ্রসর হয়েছিল নানেজ। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তিন চক্ষুহীনকে নিজের চক্ষুরত্নের পূর্ণ ব্যবহার করে।

ফিসফিস করে তিনজনের একজন বলে উঠেছিল, 'পেড্রো, কোত্থেকে এল বল তো?'

'পাহাড়ের ওপার থেকে।'

'পাহাড়ের ওপার থেকে' বলেছিল নানেজ। 'এমন একটা দেশ থেকে, যে দেশের সবাই দেখতে পায়। বাগোটার কাছে আছে সেই দেশ, আছে হাজার হাজার মানুষ, বিরাট শহর, দৃষ্টি দিয়েও তার শেষ দেখা যায় না।'

'দৃষ্টি?' বিড়বিড় করে উঠেছিল পেড্রো, 'দেখা?'

নিম্নস্বরে বলেছিল দ্বিতীয় অন্ধ, 'পাহাড়ের বাইরে থেকে এসেছে।'

নানেজ তখন খুঁটিয়ে দেখছিল তিনজনের পোশাক। অদ্ভুত ফ্যাশনের পোশাক। তিনজনের তিনরকম। সেলাই আর কাটছাঁটও তিনরকম।

চমকে উঠেছিল পরক্ষণেই। সামনে বিস্তৃত দু'হাতের দশ আঙুল বাড়িয়ে একযোগে তিন অন্ধ এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে। ঝটিতি নাগালের বাইরে সরে এসেছিল নানেজ, কিন্তু পালাতে পারেনি। পায়ের শব্দ শুনে ঠিক সেইদিকেই ছুটে গিয়ে নানেজকে কষে চেপে ধরেছিল তিনজনে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখে নিয়ে সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিল একজন, 'হুঁশিয়ার!'

নানেজের চোখে আঙুল পড়তেই আঁতকে উঠেছিল অন্ধ মানুষটা। চোখের পাতা পড়ছে, চোখ নড়ছে! অদ্ভুত ব্যাপার তো! আবার হাত বুলিয়ে দেখেছিল পা থেকে

মাথা পর্যন্ত। পেড্রো নামধারী অন্ধ বলেছিল, 'কোরিয়া, এ তো আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া জীব! মাথার চুল লাম্যার মতো কড়া!'

'শুধু চুল নয়, গালও পাথরের মতো কর্কশ,' নানেজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল কোরিয়া, 'হাতও ভিজে ভিজে। পাহাড় থেকে এসেছে তো, পাহাড়ের মতোই নোংরা। পরে পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে'খন।'

কথা চলছে, কিন্তু নানেজকে কেউ ছাড়ছে না, শক্ত মুঠিতে এমনভাবে ধরে রেখেছে যে পালানোর ক্ষমতাও নেই। ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে বুঝেছিল, চোখ না থাকতে পারে, এদের গায়ে জোর আছে বিলক্ষণ।

পেড্রো বলেছিল, 'ওহে, তুমি তো কথাও বল, মানুষ নিশ্চয়?'

'মানুষ তো বটেই, তোমাদেরই মতো মানুষ। তফাত শুধু এক জায়গায়—তোমাদের চোখ নেই—আমার চোখ আছে—দেখবার ক্ষমতা আছে।'

'দেখবার ক্ষমতা!' পেড্রো বিমূঢ়।

'হ্যাঁ, তোমরা যে দেশের মানুষ, আমি এসেছি সে দেশের বাইরে থেকে। সে দেশ হিমবাহ পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, অনেক দূরে, সূর্যের কাছাকাছি। সেখান থেকে সমুদ্র মোটে বারো দিনের পথ।'

বৃথাই বকে গিয়েছিল নানেজ। দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে কিস্‌সু বোঝাতে পারেনি অন্ধদের। উলটে নানেজকে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রবীণদের কাছে, তখন কবলমুক্ত হতে গিয়েছিল গায়ের জোরে। টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও মনে হয়? সে কি অন্ধ? রীতিমতো চক্ষুষ্মান। নিজেই পথ দেখে যেতে পারবে।

কিন্তু চোখ থাকা সত্ত্বেও হুমড়ি খেয়ে পড়ায় সহানুভূতিসচক মন্তব্য করেছিল একজন, 'বেচারা! বিচিত্র প্রাণীটার অনুভূতিগুলোও ভোঁতা, ত্রুটিপূর্ণ। নইলে এইভাবে হোঁচট খায়? কথাবার্তাও অসংলগ্ন, অর্থহীন প্রলাপ। হাত ধরে নিয়ে চল হে, নইলে মুখ থুবড়ে পড়বে।'

বেদম হাসি পেয়েছিল নানেজের। আর বাধা দেয়নি। লাভ কী? দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান যাদের নিতান্তই অপ্রতুল, তাদের সঙ্গে চোখ নিয়ে কথা বলাটাও আহাম্মুকি। পরে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া যাবে'খন।

অন্ধ তিনজনে হাঁকার দিয়ে সজাগ করে দিয়েছিল সবাইকে। আজব চিড়িয়া এসেছে তাদের দেশে, বাচ্চাকাচ্চারা যেন তার সান্নিধ্যে আঁতকে না ওঠে। নানেজের কানে ভেসে এসেছিল বহু ব্যক্তির চেঁচামেচি, দেখেছিল, গ্রামের মধ্যিখানের পথে জড়ো হচ্ছে কাতারে কাতারে মানুষ। কাছাকাছি হতেই ছেঁকে ধরেছিল নানেজকে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝতে চেয়েছিল আজব চিড়িয়াটা কী ধরনের। কেউ কেউ ভয়ে কাছে আসেনি। কিন্তু কান খাড়া করে শুনেছে নানেজের প্রতিটি কথা। ওর

চড়া, কর্কশ কণ্ঠস্বর যে মোটেই শ্রুতিমধুর নয়, অন্ধদের সংবেদনশীল কর্ণকুহরে অত্যাচার সৃষ্টি করে চলেছে—মুখের ভাব দেখে তা অনুমান করেছে নানেজ। শুধু কানের পরদা নয়, অন্ধ মানুষদের সবকিছুই কোমল এবং তীব্র মাত্রায় অনুভূতিসচেতন। হাত নরম, মুখের ভাবও স্নিগ্ধ সুন্দর। কয়েকজনকে দেখতে মিষ্টি ফুলের মতোই। শুধু যা চোখ নেই কারওই, চোখের গর্তে অক্ষিগোলক হারিয়ে গেছে চিরতরে। পথপ্রদর্শক অন্ধ তিনজন আগাগোড়া আগলে রেখেছিল তাকে, নানেজ যেন তাদেরই একার সম্পত্তি, পাহাড় থেকে খসে-পড়া বিচিত্র জীবটার একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

নানেজ বোঝাতে চেয়েছে, তার দেশ বাগোটা নামক জায়গায়, অনেক দূরে, পাহাড়ের ওপারে।

কিন্তু বাগোটা নামটাই যে তাদের কাছে নতুন। রঙ্গপ্রিয় একটা বাচ্চা বলে উঠেছে, অদ্ভুত মানুষটার নাম নাকি বাগোটা, আধো আধো বুলি ফুটেছে মুখে, তাই ভালো করে কথাও বলতে পারছে না। ফোড়ন দিয়েছে পেড্রো। নানেজের সবকিছুই নাকি কচি খোকার মতো। নির্ভুল পদক্ষেপে হাঁটতেও শেখেনি। নইলে আসবার সময়ে দু’-দু’বার হোঁচট খায়?

ধৈর্য ফুরিয়ে আসছিল নানেজের। স্নায়ুর ওপর এই ধরনের ধকল যাবে, আগে ভাবেনি। নারী-পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চা প্রত্যেকেই তাকে অদ্ভুত জীব মনে করছে, হাসছে, টিটকিরি দিচ্ছে।

তারপর তাকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল প্রবীণদের আস্তানায়। গাঢ় আঁধারে ভরা একটা ঘরে, এক হাত দূরেও চোখ চলে না। এক কোণে ম্যাড়ম্যাড় করে জ্বলছে একটা আগুন। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল নানেজ। পড়বার সময়ে বাতাস আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হাত লেগেছিল একজনের মুখে, অন্ধকারে তাকে দেখা যায়নি, কিন্তু রাগে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। পেছন থেকে ভয় ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে পেড্রো বলেছিল, নতুন জীবটার সবকিছুই এখনও অপরিণত। হাঁটে টলে টলে, কথা বলে আধো আধো।

রেগেমেগে প্রতিবাদ করেছিল নানেজ। অন্ধকারে দেখা যায় না বলেই সে হোঁচট খেয়েছে, অত চেপে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। ছেড়ে দিলেই তো হয়। ঘর ভরতি অন্ধরা শলাপরামর্শ করে নিয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছিল নানেজের গা থেকে।

যার সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল নানেজ, বয়সে সে বৃদ্ধ। অচিরেই শোনা গিয়েছিল তার কণ্ঠস্বর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গিয়েছিল নানেজকে। নানেজ ধীরস্থিরভাবে বলেছিল তার কাহিনি। বহির্জগতের বিস্ময়, বিশাল দুনিয়া, অনন্ত আকাশ, সুউচ্চ পর্বত, দিগন্তব্যাপী সমুদ্র, সে যা দেখেছে দু’চোখ ভরে, সব জ্ঞানই

উজাড় করে দিয়েছিল বৃদ্ধের সামনে। আরও অনেক বয়োবৃদ্ধ বসে ছিল অন্ধকারময় সেই প্রকোষ্ঠে। দিনের আলো ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছিল প্রবেশপথে। জানলা নেই দেওয়ালে। আসবার সময়ে অদ্ভুত এই ব্যাপারটাও লক্ষ করেছিল নানেজ। সারি সারি নির্মিত কুটিরের কোনওটাতেই বাতায়নের বালাই নেই।
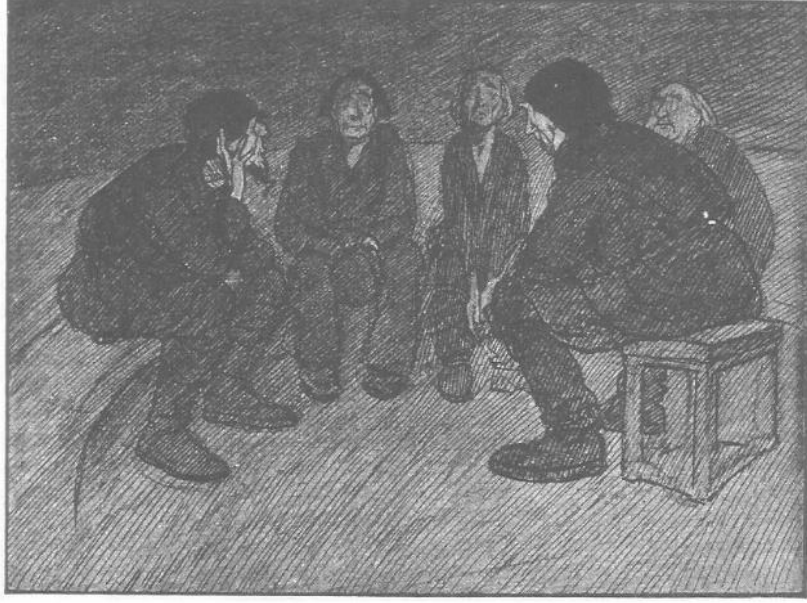
চিত্র ২২.৪ আরও অনেক বয়োবৃদ্ধ বসে ছিল অন্ধকারময় সেই প্রকোষ্ঠে।

বিস্ময়ভরা এই বিরাট পৃথিবীর কোনও বিস্ময়ই কিন্তু অন্তর স্পর্শ করেনি বৃদ্ধ অন্ধদের। চোদ্দো প্রজন্ম ধরে তারা যা জেনেছে, শিখেছে, বুঝেছে, নানেজের কথামালার সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। তাই বিশ্বাস করেনি একবর্ণও। চোখ আর দৃষ্টি তাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। কান আর আঙুলের ডগা অতিশয় অনুভূতিসচেতন। নানেজের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাই শিশু ঠাউরেছিল নানেজকে। অপরিণত মস্তিষ্ক আর অপ্রতুল জ্ঞান নিয়ে যখন এসেই পড়েছে জ্ঞানবৃদ্ধ অন্ধদের সামনে, তখন জ্ঞানদান করে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই দেশ আগে ছিল একটা পার্বত্য খোঁদলের মধ্যে। এই তাদের পৃথিবী। এর বাইরে আর কিছু নেই। প্রথম যারা এসেছিল এই নিরালা অঞ্চলে, স্পর্শ অনুভূতি ছিল না তাদের। তারপর জাগ্রত হল আশ্চর্য সেই অনুভূতি। জীবন আর ধর্ম সম্বন্ধে শিখল অনেক কিছুই। এখন এখানকার আকাশে গান গেয়ে বেড়ায় পরিরা, মাঠে চরে বেড়ায় লাম্যারা। লাম্যারা তাদের বশ মেনেছে, পরিদের কিন্তু স্পর্শও করা যায় না, শুধু কান পেতে শোনা যায়, তারা আছে, তারা আছে। শুনে হতভম্ব হয়ে

গিয়েছিল নানেজ। পরি? পরক্ষণেই বুঝেছিল, পাখিদের কথা বলা হচ্ছে। পাখিরাই এদের কাছে পরি!

প্রবীণতম অন্ধ দিনরাতের অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল নানেজকে। অন্ধদের কাছে দিন মানে উষ্ণ সময়, রাত্রি মানে শীতল সময়। দু'ভাগে ভাগ করা দু'টিমাত্র সময় ছাড়া দিনরাতের মাধুর্য তাদের অজানা। উষ্ণ সময়ে তারা ঘুমায়। শীতল সময়ে কাজ করে। এখন ঘুমানোর সময়, নানেজ কি ঘুমাবে? ঘুমাতে হয় কী করে, জানে তো? কথাবার্তা যার অসংলগ্ন, চলতে গেলে হোঁচট খায়, ঘুমাতে হয় কী করে, তা কি শিখিয়ে দিতে হবে?

নানেজ যেন কচি খোকা, দোলনার শিশু। অসীম সহানুভূতি ঝরে পড়েছিল বৃদ্ধদের কণ্ঠে।

নানেজ বলেছিল, ঘুমাতে সে জানে। ঘুমাবেও। তার আগে চাই খাবার। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

খাবার এনে দিয়েছিল অন্ধরা। নিরালায় বসে পেট ভরে খেয়েছিল নানেজ। কখনও হেসেছে, মজা পেয়েছে, আবার রাগও হয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভেবেছে তাকে। শিশুর মতোই নাকি মনবুদ্ধি, কথাবার্তা, চলাফেরা পেকে ওঠেনি। নির্বোধ কোথাকার! রাজা হতে যে এসেছে অন্ধদের দেশে, তার সম্বন্ধে কী চমৎকার ধারণা! সময় আসুক, বুদ্ধি আর জ্ঞান কাকে বলে, হাতেনাতে দেখিয়ে দেবে। হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়বে।

অন্ধদের দেশে সবাই যখন ঘুমাচ্ছে, নানেজ তখন জেগে বসে। সাত-পাঁচ ভাবছে আর নানান ফন্দি আঁটছে। ভাবতে ভাবতেই বিকেল গড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল।

সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দেখে মনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল নানেজের, তুষার প্রান্তর আর হিমবাহের ওপর গোধূলির বর্ণসুষমা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। বিপুল আবেগে প্রণত হয়েছিল ঈশ্বরের উদ্দেশে, যার আশীর্বাদে এই চক্ষুরত্ন ব্যবহার করে মহান সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছে সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

গ্রাম থেকে একজন অন্ধ হাঁক দিয়ে ডেকেছিল তাকে।

একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারেনি নানেজ। তার যে চোখ আছে এবং আশ্চর্য এই প্রত্যঙ্গটার ক্ষমতা কতখানি, তা সমঝে দেওয়ার এই তো সুযোগ। হেসে উঠে বলেছিল, 'এই তো আমি।'

'কাছে এসো।'

ইচ্ছে করেই রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পা দিয়েছিল নানেজ—যাতে শব্দ না করে এগিয়ে গিয়ে চমকে দেওয়া যায় মূঢ় অন্ধটাকে।

ধমক খেয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ঘাসে পা দেওয়া হচ্ছে কেন? রাস্তা থাকতে ঘাসের ওপর যায় তো খোকাখুকুরা? বুদ্ধিশুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি কি একেবারেই নেই?

অট্টহেসে জবাব দিয়েছিল নানেজ, 'চোখ তো আছে, তোমাদের মতো অন্ধ নই।'

অবাক হয়ে গিয়েছিল দৃষ্টিহীন গ্রামবাসী। চোখ আর অন্ধ, এ দুটো শব্দ তার জানা নেই। বাচালতা আর প্রলাপ বকা যেন বন্ধ করে আগন্তুক। এখনও অনেক জানবার আছে এই দুনিয়ায়। আস্তে আস্তে সব শিখিয়ে নেওয়া যাবে।

সে কী হাসি নানেজের, 'তাহলে একটা গান শোনাই শোন... একচক্ষুও জেনো রাজা অন্ধদের সেই দেশে।'

আবার ধমক খেতে হয়েছিল গান শোনাতে গিয়ে। অন্ধ আবার কী? অন্ধ বলে কোনও শব্দ আছে নাকি?

এইভাবেই গেল চারটে দিন, চারটে রাত। অন্ধদের দেশে রাজা হওয়ার বাসনা তিরোহিত হল একটু একটু করে। পয়লা নম্বরের অপদার্থ এই বিচিত্র জীবটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে গেল অন্ধরা। দৃষ্টিশক্তি তাদের নেই ঠিকই, কিন্তু আছে আশ্চর্য প্রখর শ্রবণশক্তি আর ঘ্রাণশক্তি। দূর থেকেই হৃৎস্পন্দন শুনে আর গায়ের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, কে আসছে এগিয়ে, আর কে যাচ্ছে দূরে। লাম্যারা নির্ভয়ে নেমে আসে পর্বত থেকে—জুগিয়ে যায় খাদ্য, পরিধেয় এবং দুগ্ধ। চাষবাস করে নিখুঁতভাবে। জমি কর্ষণ করে সুচারুভাবে। পথঘাট মসৃণ—উঁচুনিচু নেই কোথাও। মেহনত করে রাতে—ঘুমায় দিনে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তো পেয়ে যাচ্ছে অল্পায়াসেই। বাড়তি সময়টুকু কাটায় গানবাজনা নিয়ে। অবসর বিনোদনের আয়োজনে ত্রুটি নেই কোথাও। সরল গ্রাম্য জীবন। জটিলতাবিহীন ধর্মভীরু মানুষ। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী। ছেলেপুলে-বউ নিয়ে সুখের সংসার।

চক্ষুরত্নের ব্যবহার তাই তাদের বোঝাতে পারেনি নানেজ। তিতিবিরক্ত হয়ে বিদ্রোহী হল একদিন।

জোর করে জ্ঞান দিতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। অন্ধদের ধারণা ছিল, লাম্যারা যেখানে বিচরণ করে—পৃথিবীর শেষ সেইখানেই। মাথার ওপর আছে পাথুরে ছাদ। সূর্য, চন্দ্র, তারা, মহাকাশ, মেঘ—কিস্‌সু নেই।

নানেজের মুখে উলটো কথা শুনে তারা ভাবলে, নানেজ তাদের মন্দ শেখাচ্ছে। অধার্মিকের মতো এ জাতীয় কথাবার্তা তারা শুনতে চায় না। প্রথম প্রথম কান পেতে শুনত নানেজের কথা। শুনত এই পৃথিবীর সীমাহীন বিশালতা আর অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা। কিন্তু চোখ যাদের নেই, তাদের কাছে এসব কথা দুষ্ট কথা ছাড়া কিছুই নয়। তাই আরম্ভ হল বকাঝকা। তা সত্ত্বেও দমেনি নানেজ। চোখ না-থাকার কত অসুবিধে, বুঝিয়ে দেবার জন্যে একদিন বলেছিল, 'পেড্রো আসছে সতেরো নম্বর

রাস্তা দিয়ে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি।' পেড্রো কিন্তু সতেরো নম্বর রাস্তা ছেড়ে আড়াআড়িভাবে চলে গেল অন্য রাস্তায়, কাছে এল না। শুরু হল টিটকিরি। পরে যখন শুনল পেড্রো, রেগে আগুন হল নানেজের ওপর। কুশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে গাঁয়ের মানুষদের, নানেজ তাই শত্রু হয়ে উঠল তাদের কাছে।

তবুও হাল ছাড়েনি নানেজ। রাজা হওয়ার বাসনা উগ্রতর হয়ে উঠেছিল রক্তের মধ্যে। মাঠের মধ্যে গিয়ে অন্ধদের চক্ষুরত্নের ক্ষমতা বোঝাতে চেয়েছিল। হাসি-মশকরা শুনে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বুঝিয়ে যখন কিছু হল না, বলপ্রয়োগে রাজা হবে ঠিক করেছিল। একটা কোদাল কুড়িয়ে তেড়ে মারতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল।

অন্ধকে তো এভাবে মারা যায় না!
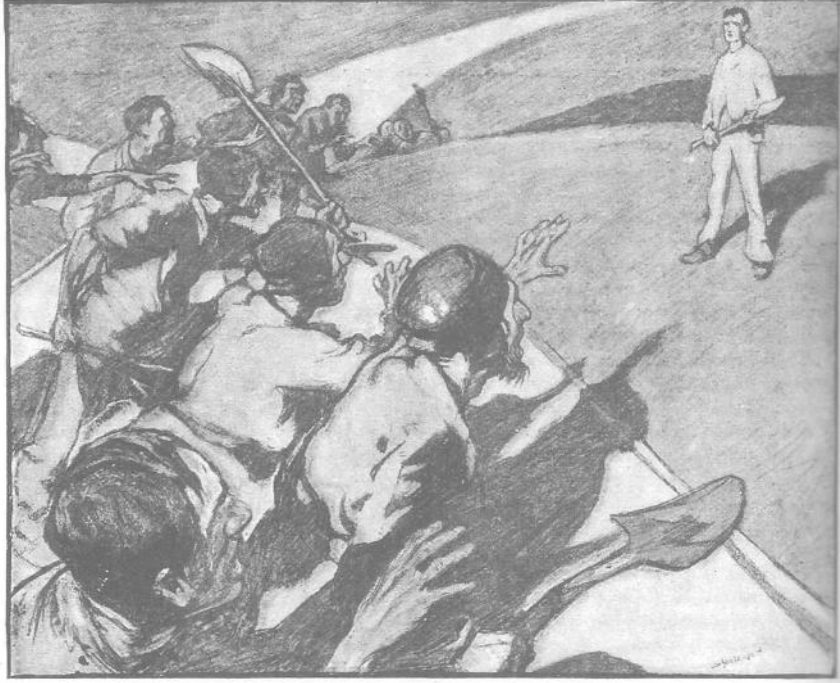
চিত্র ২২.৫ গাঁ থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছিল অন্ধরা কোদাল আর শাবল নিয়ে।

নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অন্ধরা। টের পেয়েছিল, কোদাল কুড়িয়ে নিয়েছে নানেজ! হুকুমের স্বরে বলেছিল কোদাল ফেলে দিতে। শোনেনি নানেজ। গাঁ থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছিল অন্ধরা কোদাল আর শাবল নিয়ে। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলেছিল তাকে বাতাসের গন্ধ শুঁকে। মাড়িয়ে-চলা ঘাসের ওপর পা ফেলে ফেলে নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিল ধীরগতিতে। রাগতস্বরে ফের বলেছিল কোদাল ফেলে দিতে। নানেজ শোনেনি। ভয় পেয়েছিল সেই প্রথম। চোখ নেই, অথচ পায়ে দলা

ঘাস আর বাতাসে গায়ের গন্ধ শুঁকে অন্ধরা তাকে ঘিরে ফেলেছে কোদাল-শাবল হাতে। রাজা হওয়া তো দূরের কথা, এখন পালাতে পারলে বাঁচে। একজনকে মরিয়া হয়ে শাবল দিয়ে এক ঘা কষিয়ে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়েছিল পাঁচিলের কাছে। কিন্তু মসৃণ আস্তরণ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অদূরে ছিল একটা ছোট্ট দরজা। দরজা পেরিয়ে সাঁকো, তারপর পাহাড়। লাম্যাদের বিচরণ স্থল। সেইখানেই পালিয়েছে নানেজ। দু'দিন দু'রাত খাবার জোটাতে পারেনি। রাজা হওয়ার সাধ ফুরিয়েছে এইভাবেই।

অবশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে নেমে এসেছে অন্ধদের মধ্যে। হ্যাঁ, সে অন্যায় করেছে। চোখ বলে কোনও প্রত্যঙ্গ নেই। দৃষ্টিশক্তি অবান্তর কথা। মাথার ওপর পাথুরে ছাদ ছাড়া আর কিস্‌সু নেই, আকাশ, নক্ষত্র, মেঘ, সব বাজে কথা। ভুল করেছে সে। ক্ষমা চায়। বড় খিদে পেয়েছে। খাবার চায়।

ক্ষমা পেয়েছিল সহিষ্ণু অন্ধদের কাছে। বেত্রাঘাত আর অন্ধকার ঘরে বন্দি—এই শাস্তিভোগের পর আর পাঁচজনের মতোই সরাসরি কুলির মতো খাটতে হয়েছে মাঠেঘাটে। তার মতো নির্বোধ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এর চাইতে বড় কাজ দিতে চায়নি অন্ধরা। অসুস্থ হয়েছিল, সেবা পেয়েছে। প্রবীণরা এসে জ্ঞান দিয়েছে—মনের বিভ্রান্তি ঘোচাতে চেয়েছে।

আস্তে আস্তে অন্ধদের মধ্যে ভিড়ে গেছে নানেজ। ইয়াকুবের গোলাম হয়ে সারারাত খেটেছে খেতে। ইয়াকুব লোকটা ভালো, না রেগে গেলে। তার ছোট মেয়ে মেদিনা-সারোতে কিন্তু দিদিদের মতো দেখতে নয়। সুঠাম মুখশ্রী। চোখ অক্ষিকোটরে ঢোকানো নয়। চোখের পাতাও নড়ে। যেন ইচ্ছে করলেই দৃষ্টিশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কণ্ঠস্বর মোলায়েম নয়। অন্ধদের কাছে এইসব কারণেই সে সুন্দরী নয়। যার চোখ ঠেলে থাকে, চামড়া রুক্ষ, স্বর কানে বাজে—তার কি বর জোটে?

নানেজের কিন্তু পছন্দ হয়েছিল তাকে এইসব কারণেই। আড়ালে পেলেই তাকে শোনাত বহির্জগতের কথা, এই সুন্দর বিশ্বের বর্ণসুষমার কথা। কান পেতে একমনে শুনত সে। তারপর একদিন বিয়ের কথা উঠতেই বেঁকে বসল তার দিদিরা। এমনকী গাঁয়ের যুবকরাও। মেদিনা-সারোতে অসুন্দরী—তা-ই বলে কি একটা জরদ্‌গবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিকৃত প্রজন্মের সূচনা করতে হবে? রক্ত অশুচি করতে হবে? কক্ষনো না। একজন তো মেরেই বসল নানেজকে। নানেজ পালটা মার দিয়ে শুইয়ে দিলে তাকে।

এবং সেই প্রথম হাতেনাতে দেখিয়ে দিলে, হাতাহাতি মারপিটে চোখ কত কাজে লাগে।

তারপর থেকে কেউ আর তার গায়ে হাত দেয়নি। মেদিনা-সারোতে কিন্তু কেঁদে পড়েছিল বাবার কাছে। মেয়ের কান্নায় গলে গিয়ে গাঁয়ের প্রবীণদের পরামর্শ নিতে গিয়েছিল ইয়াকুব। ভেবেচিন্তে একজন বয়োবৃদ্ধ শুনিয়েছিল আশার বাণী। নানেজকে তাদের মতো করে নেওয়া যাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে। ওর মাথার গোলমাল ঘটছে চোখ নামক ঠেলে বেরিয়ে থাকা ওই অদ্ভুত রোগগ্রস্ত প্রত্যঙ্গটা থেকে। মগজে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে ওই জিনিসটা। যত উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি ওইখান থেকেই। অস্ত্রোপচার করে জিনিসটাকে বাদ দিলেই নানেজ সুস্থ হয়ে উঠবে, ইয়াকুবের জামাই হতে পারবে।

কিন্তু বেঁকে বসেছিল নানেজ। বাকি জীবনটা এই অন্ধদের দেশেই তাকে থাকতে হবে ঠিকই, রাজার মতো নয়, ক্রীতদাসের মতো। কিন্তু চক্ষুর বিসর্জন দিয়ে কারও জামাই হতে সে রাজি নয়।

নিঃশব্দে কেঁদেছিল মেদিনা-সারোতে। নানেজের কল্পকাহিনি শুনতে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে তার সঙ্গ। তাহলে কেন রাজি হচ্ছে না? সামান্য একটু ব্যথা পাবে বই তো নয়, তারপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অশ্রুসিক্ত মিষ্টি মুখখানার পানে অনিমেষে চেয়ে থেকে অবশেষে রাজি হয়েছিল নানেজ!

অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ আগে মহা উদ্যমে অন্ধরা তাকে শিক্ষাদান করে গেল, পরিমার্জনা এবং পরিশোধনের বিস্তর আয়োজন করল, গোলামি আর নিকৃষ্ট সত্তাটাকে উন্নততর করে অন্ধদের পর্যায়ে তাকে নিয়ে আসার জন্যে কোনও প্রয়াসই বাকি রাখল না। নানেজের চোখ থেকে ঘুম উড়ে গিয়েছিল। দিবাভাগের অরুণ-কিরণদীপ্ত অন্ধ-নিকেতনে যখন দৃষ্টিহীনরা সুষুপ্ত, নানেজ তখন নিবিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন থেকে বিমর্ষচিত্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করেছে লক্ষ্যহীনভাবে। উভয়সংকটের দুশ্চিন্তা বহু বিষধর সরীসৃপের মতো তার শিরায়-ধমনিতে বিচরণ করেছে, তাকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতায় দুর্দান্ত সে চিরকালই, কিন্তু অন্ধ-আলয়ে আজ সে নিতান্তই অসহায়। পর্বতারোহীর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলেই মৃত্যুকে পরোয়া করেনি কোনওদিনই, অকুতোভয় মানুষটার ধারেকাছেও তাই মৃত্যু তার করাল ছায়া ফেলতে সাহসী হয়নি। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতিতে পড়েছে, তার চাইতে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনও অনেক বরণীয়। অথচ সম্মতি দিয়েছে চক্ষুরত্ন উৎপাটনের। কাজের প্রহর শেষ হলেই বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে বর্ণময় শিখরে শিখরে জীবনের সুবর্ণশোভা মেলে ধরে তপনদেবের আবির্ভাব ঘটতেই আরও মুষড়ে পড়ল নানেজ। আজই শেষ দিন। ঈশ্বরের দেওয়া ঐন্দ্রজালিকের ক্ষমতাসম্পন্ন এই চক্ষু প্রত্যঙ্গটিকে বিসর্জন দিতে হবে আজকে, নিশুতি রাতে। মেদিনা-সারোতের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে কোমল কণ্ঠে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে গেছে নানেজকে। ক্ষণিকের যন্ত্রণাবোধের পরেই নানেজ পাবে চিরশান্তি, মগজের অহরহ যন্ত্রণা মিলিয়ে যাবে চিরতরে, অচিন্ত্যপূর্ব প্রশান্তিতে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে নানেজ।

নিমেষহীন নয়নে নয়ন-প্রসাদে বঞ্চিত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে বিদায় জানিয়েছে নানেজ। অসীম করুণায় আর্দ্র হয়েছে চিত্ত।

বিদায় জানিয়েছে দুই করতল মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে। বলেছে স্নেহক্ষরিত স্বরে, 'বিদায়।'

নিঃশব্দে সরে গিয়েছে দূর হতে দূরে। পায়ের শব্দ কান পেতে শুনেছে মেদিনা-সারোতে। ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসছে কিন্তু দৃঢ় পদধ্বনি। পদধ্বনির মধ্যে জাগ্রত হয়েছে এমন একটা ছন্দ, যা যাত্রার আগে ধরা পড়েনি মেদিনা-সারোতের আতীক্ষ্ণ শ্রবণযন্ত্রে। তাই অকস্মাৎ প্রবল আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

নানেজ চেয়েছিল, জনশব্দহীন নিরালা কোনও তৃণভূমিতে গিয়ে নিবিষ্ট থাকবে অন্তরের অন্তঃস্থলের দুঃসহ চিন্তায়। যে আবেগ প্রবল বন্যার মতো উৎসারিত হচ্ছে মনের গহনতম অঞ্চল থেকে, তাকে আর বাঁধ দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না। ঘাস, সবুজ প্রান্তরের নার্সিসাস পুষ্পের পাশে একলা বসে থাকবে চক্ষু বিসর্জনের সময় আগত না-হওয়া পর্যন্ত। যেতে যেতে বিহ্বলভাবে দু'চোখ তুলে তাকিয়েছিল অজস্র বর্ণে প্রদীপ্ত ভোরের আকাশের দিকে। দেখেছিল, উষাদেবী যেন সোনার বর্ম পরে নেমে আসছে কাঞ্চন-সোপান বেয়ে।

ওই তো স্বর্গ! ওই তো দেবতাদের আলয়! মহান ওই সৌন্দর্য দেখে অকস্মাৎ তার মনে হয়েছিল, অপরূপ এই দৃশ্যের তুলনায় অন্ধদের এই নিকেতন একটা বদ্ধ বিবর ছাড়া কিছুই নয়—পাপাত্মা-পরিবেষ্টিত হয়ে এই পাপপুরীতে, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রসাদবঞ্চিত এই অন্ধ মানুষদের দেশে অন্ধত্ব অর্জন করে তাকেও কি সরে আসতে হবে স্বর্গের কাছ থেকে? এমনকী স্বর্গদৃশ্যও মুছে দিতে হবে চিরতরে চোখের সামনে থেকে?

পুষ্পসমৃদ্ধ কানন থেকে ফিরে যাবে—এইটাই মনস্থ করেছিল কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু সহসা আকাশ আর উচ্চ পর্বতালয়ের অজস্র বর্ণদীপ্ত সুষমা অবসান ঘটাল উভয়সংকটে অস্থির চিত্তবিক্ষেপের। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সম্মুখে। প্রাচীরের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে আরোহণ করতে লাগল পাহাড় বেয়ে, সম্মোহিতের মতো কিন্তু আগাগোড়া চেয়ে রইল চিত্ত-অবশকারী অনিন্দ্যসুন্দর তপন-প্রদীপ্ত তুষার আর বরফের পানে।

চিত্র ২২.৬ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে বিদায় জানিয়েছে নানেজ।

অনন্ত সৌন্দর্য দেখে তিরোহিত হল তার অন্তরের বিষাদের যবনিকা। অশুচি জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার নীরব আহ্বান সে উপলব্ধি করেছে, হৃদয়ের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়েছে পরম কারুণিকের অমোঘ আহ্বান—শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে পেশিতন্ত্রীতে। জাগরূক হচ্ছে কল্পনা—উন্মোচিত হচ্ছে স্মৃতির আধার। মনে পড়ছে ফেলে-আসা বাগোটাকে। যেখানে দিনের আলো সগর্বে কর্মচঞ্চল রাখে চক্ষুষ্মানদের, নিশীথের রোমাঞ্চ নিদ্রিত করে কর্মক্লান্ত মানুষকে। বিস্তর প্রাসাদ, অট্টালিকা, নিকেতন আছে যেখানে, আছে পথ, যানবাহন। আরও দূরে আছে দিগন্তব্যাপী সুনীল জলধি। নদীপথে দিনের দিন বহু অ্যাডভেঞ্চারের পর পৌঁছানো যায় সীমাহীন সেই জলরাশির উত্তাল তরঙ্গশীর্ষে—শুরু হয় বৃহত্তর দুঃসাহসিকতা—জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে, মত্ত প্রভঞ্জনের সঙ্গে লড়াই করে টহল দিয়ে আসা যায় বিশাল ভূগোলকটিকে।
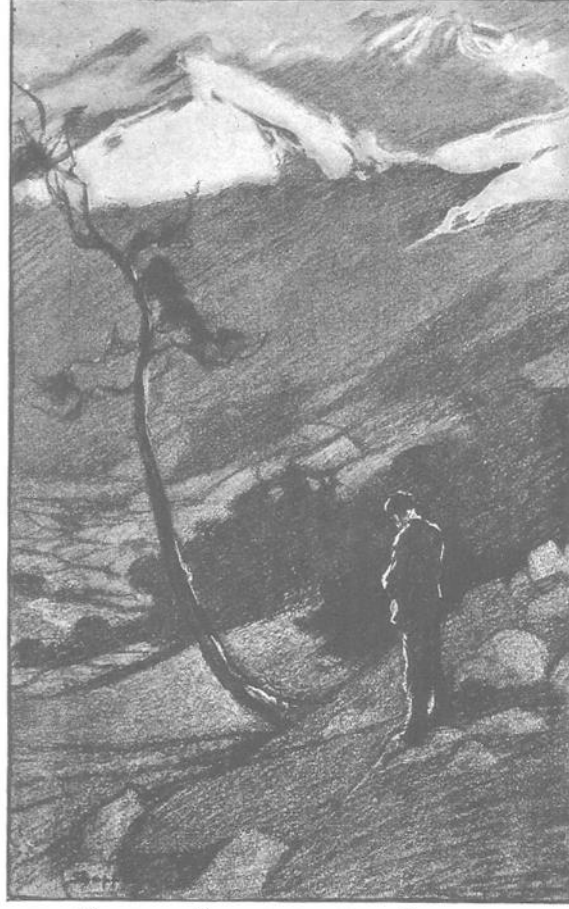
চিত্র ২২.৭ ফিরে তাকাল গ্রামের দিকে।

আশ্চর্য উদার বিশাল সেই দুনিয়ার সামনে যবনিকা তো ওই পর্বত প্রাচীর। অতীব খাড়াই দুর্গম এবং দুরারোহ।

চোখ কুঁচকে আসে নানেজের। নির্নিমেষে চেয়ে থাকে প্রদীপ্ত পর্বতশিখরগুলোর দিকে।

চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে কি? দু'পাহাড়ের ফাঁকে ওই খাঁজের খোঁচা খোঁচা পাথরে পা দিয়ে সন্তর্পণে উঠে যাওয়া কষ্টকর হতে পারে, অসম্ভব নয়। অচিরেই পৌঁছে যাবে পাইন অরণ্যে। চাতালের মতো পাথরে ওই যে কিনারাটা দেখা যাচ্ছে, ওখান দিয়ে উঠে যাবে আরও উঁচুতে গিরিবর্ত্মের মাথার দিকে। তারপর নিশ্চয় ভাগ্য সহায় হবে। প্রকৃতি তাকে ডাক দিয়েছে—প্রকৃতিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তুষাররেখার নিচেই ওই চিমনি দিয়ে উঠবে আরও ঊর্ধ্বে—একটা চিমনিপথ দুরারোহ হলে আরও একটা খুঁজে নেবে। তার চোখ আছে, চোখ মেলে সে পথের বাধা দূর করতে পারবে না? একসময়ে নিশ্চয় পৌঁছে যাবে অম্বর-আলোকিত তুষারলোকে—ধু ধু শূন্যতার মধ্যে পাবে মুক্তির স্বাদ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নতুন পথ...

ফিরে তাকালে গ্রামের দিকে। চেয়ে রইল চোখের পাতা না ফেলে।

মনে পড়ল মেদিনা-সারোতের কথা। বহু দূরে অস্পষ্ট বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে তার নিষ্কম্প মূর্তি।

চোখ ফেরালে পর্বত প্রাচীরের দিকে—দিনের আলোর ঢল নামছে প্রাচীর বেয়ে।

তনু-মন সংহত করে শুরু হল পর্বতারোহণ।

সূর্যাস্ত। নানেজ আর পাহাড় বেয়ে উঠছে না। নিশ্চুপ দেহে শুয়ে আছে। অধরপ্রান্তে অসীম প্রশান্তির নিবিড় হাস্যরেখা। পোশাক যদিও শতচ্ছিন্ন, হাত-পা রক্তারক্তি, সারা গায়ে কালশিটের নীল বর্ণ, তা সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদের অনাবিল প্রশান্ত হাসিতে সমুজ্জ্বল মুখ।

এত উঁচু থেকে অন্ধদের গ্রামটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা গভীর বিবর। মাইলখানেক নিচে একটা বদ্ধ উপত্যকা। গোধূলির অস্পষ্টতা গ্রাস করছে অভিশপ্ত উপত্যকাকে একটু একটু করে। মাথার ওপরে শিখরগুলোয় অগ্নিদেবের রোশনাই যেন খুশির পেখম মেলে ধরেছে। হাতের কাছেই ঝলমল করছে আরও অপরূপ সৌন্দর্য। সবুজ খনিজ মিশেছে ধূসর খনিজে। ক্রিস্টালের চমক-দ্যুতি চোখ ঝলসে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। বিশাল খাদগুলোর মধ্যে অসীম রহস্যময়তার মধ্যে নীলাভ আর বেগুনি আভা। তমিস্রার ক্রীড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপর পরমানন্দে হাসছে আলোকময় আকাশ।

এই তো স্বর্গ। অন্ধদের দেশে রাজা হওয়ার বাসনা আর তার নেই।

রাত ঘনীভূত হল। নিবিড় তমিস্রায় গা এলিয়ে শুয়ে শীতল নক্ষত্ররাজির পানে নির্নিমেষে চেয়ে রইল নানেজ...

'The Empire of the Ants' প্রথম প্রকাশিত হয় পত্রিকায় এপ্রিল ১৯০৫ সালে। আগস্ট ১৯২৬ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories' পত্রিকায়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'The Empire of the Ants and Other Stories' সংকলনটিতে গল্পটি স্থান পায়। ১৯৭৭ সালের 'Empire of the Ants' সিনেমাটি এই গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

পিপীলিকা-সাম্রাজ্য
(The Empire of the Ants)

(১)

মহাসমস্যায় পড়েছেন ক্যাপটেন গেরিলো।

হুকুম এসেছে গানবোট 'বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট'-কে নিয়ে যেতে হবে বাদামায়। পিঁপড়েরা মড়ক শুরু করেছে—লড়তে হবে তাদের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দারা সৈন্য-সাহায্য চায়।

হুকুমটা শুনে অব্দি ক্যাপটেনের ঘোর সন্দেহ হয়েছে, নিশ্চয় তাঁকে অপদস্থ করার চক্রান্ত এঁটেছে কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি তাঁর পদোন্নতি ঘটেছে এমন প্রক্রিয়ায়, যা ন্যায়সংগত মোটেই নয়। ক্যাপটেনের রোমান্টিক চোখের চাহনিতে মুগ্ধ হয়ে বিশেষ এক মহিলা এমন কলকাঠি নেড়েছিলেন যে, পদোন্নতি কেউ আটকাতে পারেনি। তবে, দু'-দুটো দৈনিকে তা-ই নিয়ে বেশ টিটকিরি শোনা গেছে।

ক্যাপটেন গেরিলো জাতে পর্তুগিজ। আদবকায়দা আর নিয়মশৃঙ্খলার পরম ভক্ত। তাই মনের কথাটা পাঁচজনের কাছে ব্যক্ত করতে পারেননি। সমপর্যায়ের মানুষ না হলে কি প্রাণ খুলে কথা বলা যায়?

এমন একজনকে অবশেষে পাওয়া গেল গানবোটে। নাম তাঁর হলরয়েড—ল্যাঙ্কাশায়ার ইঞ্জিনিয়ার। চাপা বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেললেন তাঁর কাছে। এ কী উদ্ভট কাণ্ড? মানুষ বনাম পিঁপড়ে? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? পিঁপড়ে আসে পিলপিল করে,

মানুষের তাতে বয়ে গেল। খামকা লড়তে যাবে কেন?

ইঞ্জিনিয়ারমশায় জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি তো শুনেছি, এই পিঁপড়েরা পিলপিল করে আসে বটে, কিন্তু চলে যায় না। সাম্বো বলছিল—'

'সাম্বো নয়—জাম্বো। দোআঁশলা।'

‘সাম্বো’, ইঞ্জিনিয়ারের জিবের জড়তা সত্যিই অদ্ভুত। ধরিয়ে দিলেও সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না। ‘সাম্বো বলছিল, পিঁপড়েরা কিন্তু যাচ্ছে না—পিলপিল করে পালাচ্ছে মানুষরাই।’

চিত্র ২৩.১ ডেকে ধূমপানরত ক্যাপটেন গেরিলো এবং হলরয়েড

রাগের চোটে অনর্গল ধূমপান করে গেলেন ক্যাপটেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, ‘অসম্ভব। পিঁপড়ে মড়ক ছড়ায়—তার পেছনে থাকে ভগবানের হাত। পিঁপড়েরা নিমিত্তমাত্র। ত্রিনিদাদে খুদে পিঁপড়েরা এইরকম মহামারী ডেকে এনেছিল। কমলা গাছ আর আম গাছের পাতা মুখে করে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে বাড়ির মধ্যেও হামলা করে পিঁপড়েরা—লড়াকু পিঁপড়ে—আরশোলা, মাছি, উকুন মেরে বাড়ি সাফ করে দিয়ে চলে যায়। ভালোই করে।’

‘সাম্বো বলছিল, এই পিঁপড়েরা একেবারেই অন্য ধরনের।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সিগারেট নিয়ে তন্ময় হলেন ক্যাপটেন। মুখ খুললেন কিছুক্ষণ পরে, ‘গোল্লায় যাক পিঁপড়ে। আমি তার কী করব? লড়ব কামান-বন্দুক নিয়ে? যত্তসব।’

বিকেল নাগাদ কিন্তু পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে নেমে গেলেন তীরে। অনেক বয়েম আর বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন গানবোটে।

ডেকে বসে রইলেন হলরয়েড। ব্রাজিলের মহাবনের দৃশ্য বাস্তবিকই অপরূপ। সিগারেট টানতে টানতে পড়ন্ত বিকালের ঠান্ডা বাতাসে দু’চোখ দিয়ে উপভোগ করলেন সেই দৃশ্য। ছ’দিন হল অ্যামাজন দিয়ে চলেছে গানবোট। সমুদ্র থেকে চলে

এসেছে কয়েকশো মাইল দূরে। পূর্ব আর পশ্চিমের দিক্‌রেখা কিন্তু সমুদ্রের মতোই। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে প্রায় নেড়া একটা বালির চড়া দ্বীপ—সামান্য কিছু আগাছা ছাড়া কিছুই নেই সেই দ্বীপে। কাদা-ঘোলা খরস্রোতা জলে ভেসে যাচ্ছে গাছের গুঁড়ির পাশে কুমির—পাখি উড়ছে জলের ওপর। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে আলেমকুর শহরের একটিমাত্র গির্জে—সাহারা মরুভূমির মাঝে যেন একটিমাত্র ছ'পেনি মুদ্রা। উদ্দাম সবুজ বনানীর মাঝে আর কোনও লোকালয়ের চিহ্ন নেই। মানুষ যে কত নগণ্য প্রকৃতির এই বিশালতার মধ্যে, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করছেন ইঞ্জিনিয়ার। বয়সে তরুণ। শিক্ষাদীক্ষা ইংল্যান্ডে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এসেছেন এই প্রথম। এই ছ'দিনে দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতির মতোই এক-আধবার দর্শনলাভ ঘটেছে মানুষ নামক প্রাণীটার। একদিন দেখেছেন একটা ক্যানো, আর একদিন বহু দূরের একটা স্টেশন, তারপর থেকে মানুষের টিকিও আর দেখেননি। বিশাল এই ভূখণ্ডে মানুষ যে একটা দুষ্প্রাপ্য জন্তু এবং পাত্তা পাচ্ছে না মোটেই, এই ধারণাটাই শেকড় গেড়ে বসেছে মনের মধ্যে।

যত দিন যায়, ততই ধারণাটা বদ্ধমূল হতে থাকে। কামানবাজ কমান্ডারের কাছ থেকে স্প্যানিশ ভাষা রপ্ত করছেন অসীম ধৈর্য সহকারে। ইংরেজিতে কথা বলার মতো লোক আছে একজনই—একটা নিগ্রো ছোকরা—চুল্লিতে কয়লা দেওয়া তার কাজ। ভুল ইংরেজি বললেও কথাবার্তা চালিয়ে নেওয়া যায় কোনওমতে। সেকেন্ড কমান্ডার দা কুন্‌হা জাতে পর্তুগিজ। ফরাসি ভাষা জানে—কিন্তু অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে। আবহাওয়া সম্পর্কে সৌজন্যমূলক দু'-একটা বাক্যবিনিময় ছাড়া আর কথা হয় না। কাজেই প্রাণ খুলে বলার লোক ওই একজনই—ক্যাপটেন গেরিলো।

আবহাওয়াও অতি যাচ্ছেতাই। আশ্চর্য এই নবীন দুনিয়ার আবহাওয়াও এমন আশ্চর্য হবে, কে জানত। দিনেরাতে সমান গরম। বাতাস তো নয়, যেন গরম বাষ্প। পচা গাছ-পাতার গন্ধে ভরপুর। কুমির, অদ্ভুত পাখি, নানা রকমের পতঙ্গ আর আকাশের মাছি, গুবরেপোকা, পিঁপড়ে, সাপ আর বাঁদররা পর্যন্ত যেন বিস্মিত ভয়াবহ এই আবহাওয়ায় মনুষ্য নামক সুখী প্রাণীর আবির্ভাব দেখে। কী গরম! কী গরম! গায়ে পোশাক রাখা যায় না, খুলে ফেলাও যায় না—রোদ্দুরে চামড়া ঝলসে যায়। রাত্রে এক ধরনের মশা এসে কামড়ায় গায়ে পোশাক না থাকলে। দিনের বেলায় ডেকে উঠলে চোখ ধাঁধিয়ে যায় জ্বলন্ত সূর্যের কিরণে—যেন দম আটকে আসতে থাকে। দিনের বেলাতেও পোকামাকড়ের সে কী উৎপাত। এক ধরনের ধড়িবাজ মাছি এসে কামড়ায় গোড়ালি আর কবজিতে।

ক্যাপটেন গেরিলোর সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারি। বান্ধবীদের গল্প ছাড়া আর কোনও কথা নেই তাঁর মুখে। মাঝে মাঝে তাঁরই উৎসাহে কুমির শিকার করে

কিছুটা সময় কাটানো গেছে। বনের মধ্যে লোকালয় দেখে নেমে গিয়ে ক্রিয়ল মেয়েদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ নাচানাচিও হয়েছে। এ ছাড়া এই ছ'দিনে আর কোনও বৈচিত্র নেই।

ক্যাপটেন গেরিলো কিন্তু পিঁপড়ে সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝেই গানবোট থামিয়ে নেমে যাচ্ছেন এবং একটু একটু করে এই বিচিত্র অভিযানে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

একদিন তো স্বীকার করেই বসলেন, পিঁপড়েগুলো নাকি একেবারেই নতুন ধরনের—আলাদা জাতের। কীটতত্ত্ববিদরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যাবেন বিশেষ এই পিঁপড়েদের চেহারা-চরিত্রের বর্ণনা শুনলে। লম্বায় পাক্কা পাঁচ সেন্টিমিটার! ভাবা যায়? আরও বড় আছে! হোক গে অতিকায়, তা-ই বলে কি বাঁদরের মতো পোকা খুঁটতে যেতে হবে? ছ্যা ছ্যা! তবে হ্যাঁ, দানবিক এই পিঁপড়েরা নাকি গোটা তল্লাটটাকে পেটে পুরতে বসেছে। পুরুক গে, পিঁপড়েদের যদি খিদে পায়, রণকুশল ক্যাপটেন কি কামান-বন্দুক নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে? লোকে হাসবে না? এই সময়ে ইউরোপে যদি লড়াই লেগে যায়? ক্যাপটেন গেরিলো তখনও কি মহাবিক্রমে পিপীলিকা নিধন চালিয়ে যাবে? ভাবতেও গা রি-রি করে!

এটা ঠিক যে, পিঁপড়ে-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে রিও নিগ্রোতে। নাচের আড্ডায় ওই যে মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল, ওরাও তো সব খুইয়ে পালিয়ে এসেছে। একদিন নাকি বিকেল নাগাদ পালে পালে হানা দিয়েছিল পিঁপড়েরা। বাড়িঘরদোর ছেড়ে চম্পট দিয়েছিল প্রতিটি মানুষ। নইলে তো পিঁপড়ের পেটেই যেতে হবে। তাই পিঁপড়ে এলেই পালায়, পরে ফিরে আসে। একজন এসেছিল সবার আগে। ওরে বাবা! দেখে কী, ঘরদোর দখল করে বসে রয়েছে পিঁপড়েরা—কেউ যায়নি। তাকে দেখেই আরম্ভ করে দিলে লড়াই! মানুষের সঙ্গে পিঁপড়ের লড়াই!

'লড়াই মানে সারা গায়ে উঠে পড়েছিল, এই তো?...' বলেছিলেন হলরয়েড।

'কামড়ে পাগল করে দিয়েছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঁপড়েদের ডুবিয়ে মেরেছিল। নিজেও কিন্তু মারা গিয়েছিল সেই রাতেই—ঠিক যেন সাপের কামড়ে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল রক্তের মধ্যে?'

'বলেন কী! পিঁপড়ে বিষ ঢালতে পারে?'

'ঈশ্বর জানেন। হয়তো খুব বেশি কামড়েছিল। তবে কী জানেন, লড়াই বিদ্যেটা শিখেছি মানুষ মারার জন্যে, পিঁপড়ে মারার জন্যে নয়।'

এরপর থেকে প্রায় পিঁপড়ে-পুরাণ নিয়ে আলোচনা হত দু'জনের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দারা নাকি এই বিশেষ পিঁপড়েদের নাম দিয়েছে 'সৌবা'। বিশাল এই অরণ্যকে পদানত করতে চলেছে 'সৌবা'রা!

পিঁপড়েদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ছেড়ে দিয়েছেন ক্যাপটেন গেরিলো। পিঁপড়ে জাতটা সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল তিনি। যে পিঁপড়েরা শুধু গাছের পাতা কাটে, তাদের খবর জেনেই এতদিন অনেক বড়াই করেছেন। কর্মীরা আকারে ছোট, পিলপিল করে ছড়িয়ে পড়ে, প্রাণ দিয়ে লড়ে যায়। বড় সাইজের কর্মীরা হুকুম দেয়, শাসন করে, তবে এই শেষোক্ত পিঁপড়েরা যদি চড়াও হয় কারও ওপর, তাহলে গুটিগুটি সটান উঠে যায় ঘাড়ে—আর কোথাও নয়—কামড়ে রক্ত টেনে নেয়। পাতা কেটে শেওলার বিছানা বানিয়ে নেয় এই শ্রেণির পিঁপড়েরা। কয়েকশো গজ পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে এদের বাসাবাড়ি।

পিঁপড়েদের চোখ আছে কি না, এই নিয়ে পুরো দুটো দিন দারুণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। দ্বিতীয় দিনে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হতে হলরয়েড তীরে নেমে গিয়ে বেশ কিছু পিঁপড়ে পাকড়াও করে এনে দেখালেন, কিছু পিঁপড়ের চোখ আছে, কারও কারও নেই।

তারপরেই ঝগড়া লাগল নতুন বিষয় নিয়ে। পিঁপড়েরা কামড়ায়, না হুল ফোটায়?

গোরু-মোষ চরানোর একটা বিস্তীর্ণ জমিতে নেমে এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন গেরিলো।

বললেন, 'বিশেষ এই পিঁপড়েদের নাকি ড্যাবডেবে চোখ আছে। অন্য পিঁপড়েদের মতো অন্ধ নয়—সেইভাবে চলাফেরাও করে না। আড়ালে-আবডালে ড্যাবডেবে চোখ মেলে ওৎ পেতে বসে থাকে।'

'হুল ফোটায় নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, ফোটায়। বিষ আছে ওই হুলেই।'

'অন্য পিঁপড়েদের মতো চড়াও হওয়ার পর চলে যায় না—ঘাঁটি আগলে থেকে যায়।'

'তা ঠিক।'

তামান্দু পেরিয়ে আসার পর প্রায় আশি মাইল পর্যন্ত তীরভূমিতে মানুষের বসতি একেবারেই নেই। তারপরেই নদী আর ততটা চওড়া নয়, দু'পাশের জঙ্গল ক্রমশ কাছে এগিয়ে এসেছে। সেই রাতে একটা ঝুপসি গাছের গাঢ় ছায়ায় নোঙর ফেলল 'বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট'। অনেকদিন পরে শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল প্রত্যেকেরই। পরমানন্দে ডেকে বসে চুরুট খেয়ে গেলেন গেরিলো আর হলরয়েড।

গেরিলোর মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরছে আজব এই পিঁপড়েদের কথা। আতঙ্ক ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত বেটাচ্ছেলেরা কী করে বসবে, তা-ও তো আঁচ করা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে হাল ছেড়ে দিয়ে মাদর পেতে ঘুমিয়ে পড়লেন ডেকের ওপরেই।

মশার কামড়ে ফুলে-ওঠা কবজি রগড়াতে রগড়াতে বসে রইলেন হলরয়েড। তাঁর মাথাতেও হাজারো চিন্তার জট। বনের বিশালতা এই ক'দিনেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাঁকে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন রহস্যময় জঙ্গলের দিকে। মাঝে মাঝে জোনাকির আলোয় আলোকিত নিবিড় তমিস্রার মধ্যে শোনা যাচ্ছে যেন ভিনগ্রহীদের গুঞ্জন—রহস্যনিবিড় তৎপরতায় চঞ্চল যেন অন্ধকারের দেশ!

বনভূমির এই অমানবিক বিশালতায় তিনি যুগপৎ বিস্মিত এবং বিমর্ষ। হলরয়েড জানেন, আকাশে মানুষ নেই, অবিশ্বাস্য প্রকাণ্ড মহাশূন্যে ধূলিকণার মতো ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত নক্ষত্র; তিনি জানেন, মহাসমুদ্রের বিশালতায় মানুষ বিমূঢ় এবং পরাভূত। সমুদ্র শাসন করতে না পারলেও স্থলভূমিকে কবজায় এনেছে ভালোভাবেই। শুধু ইংল্যান্ড কেন, পৃথিবীর যেখানে যত ডাঙা আছে, মানুষের বিজয়কেতন উড়ছে সর্বত্র। এই বিশ্বাস ছিল ইংল্যান্ড ছেড়ে আসার আগে।

কিন্তু রহস্য থমথমে এই বনানী তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে। এখানে মানুষ পরাজয় স্বীকার করেছে। এখানে তার বিজয়কেতন ওড়েনি। এখানকার মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ বনভূমিতে বীরদর্পে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে পোকামাকড়, কচ্ছপ, কুমির, পক্ষী, বিশাল মহীরুহ আর অজগরসম লতার জটাজালের মধ্যে—নেই শুধু মানুষ। দু'-একজন চেষ্টা চালিয়ে হার মেনেছে। সাপ, পোকা, পশু আর জ্বরের খপ্পরে প্রাণ দিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গলে দেখা গেছে পরিত্যক্ত গ্রাম, ভেঙে-পড়া সাদা দেওয়াল, মিনারের ভগ্নস্তূপ। পুমা আর জাগুয়ারই এই মহাবনের প্রভু—মানুষ নয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রভু কে?

পৃথিবীতে যত সংখ্যক মানুষ আছে, তার চাইতেও বেশি সংখ্যক পিঁপড়ে আছে এই জঙ্গলের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে! চিন্তাটা মাথার মধ্যে আসতেই অন্য চিন্তায় পেয়ে বসে হলরয়েডকে। বর্বর মানুষ কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় সভ্য হয়েছে। পিঁপড়েদের ক্ষেত্রেও যে এই ধরনের ক্রমবিবর্তন আসবে না, তা কি কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে? হাজার হাজার দলবদ্ধ পিঁপড়ে বৃহত্তর বহির্জগৎ নিয়ে এতাবৎকাল মাথা ঘামায়নি ঠিকই। কিন্তু মাথা ঘামানোর মতো বুদ্ধিমত্তা তাদের আছে, আছে নিজস্ব ভাষা! বর্বর মানুষ আদিম অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে, পিঁপড়েরাই বা তা পারবে না কেন? মানুষ যেমন পুঁথি আর নথির মধ্যে জ্ঞান সংগ্রহ করে বানিয়েছে হাতিয়ার, গড়েছে বিশাল সাম্রাজ্য, ঘটিয়েছে পরিকল্পনামাফিক সংগঠিত যুদ্ধ—পিঁপড়েরাই বা তা পারবে না কেন?

গেরিলো অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন বিশেষ এই পিঁপড়েদের সম্পর্কে। সাপের বিষের মতোই বিষ ব্যবহার করে এই পিপীলিকাবাহিনী। পাতা-কাটিয়ে পিঁপড়েদের

চাইতেও তারা হুকুম মেনে চলে আরও বড় দলপতির। মাংস খায়, এবং যে জায়গা দখল করে, তা দখলেই রাখে, ছেড়ে দিয়ে চলে যায় না...

বনভূমি নিথর। জাহাজের গায়ে বিরামবিহীনভাবে জল আছড়ে পড়ছে। মাথার ওপরে লণ্ঠন ঘিরে উড়ছে প্রেতচ্ছায়ার মতো মথপোকা।

অন্ধকারে নড়ে উঠলেন গেরিলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঘুমের ঘোরে, 'কে জানে, কী করে বসে।'

দুঃস্বপ্ন দেখছেন নিশ্চয়!

(২)

পরের দিন বাদামার চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছেন শুনে তীরভূমি সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি পেল হলরয়েডের। ডেকে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন সুযোগ-সুবিধে পেলেই আশপাশের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার মতলবে। মানুষের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলেন না। দেখলেন কেবল আগাছায় ছাওয়া একটা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ, আর একটা শেওলা-সবুজ দীর্ঘ পরিত্যক্ত মঠের সামনের দিক—শূন্য গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে একটা অরণ্য-বৃক্ষ এবং মোটা মোটা লতার জটাজালে ঢেকে গেছে দু'হাট করে খোলা প্রবেশপথ। অদ্ভুত হলুদ রঙের এক রকমের প্রজাপতি বেশ কয়েকবার নদী পারাপার করল সেদিন—ডানা তাদের অর্ধস্বচ্ছ। জাহাজে নেমে পড়ল কিছু, নিহত হল তৎক্ষণাৎ। বিকেলের দিকে দেখা গেল একটা বড় ক্যানো। পরিত্যক্ত।

অথচ পরিত্যক্ত বলে মনে হয়নি প্রথমে। দুটো পালই শিথিলভাবে ঝুলছে প্রশান্ত হাওয়ায়। সামনের গলুইতে বসে রয়েছে একটি মনুষ্যমূর্তি। আর-একটা লোক যেন উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু ভাসতে ভাসতে যেভাবে এগিয়ে এল ক্যানোটা গানবোটের দিকে, দেখেই খটকা লাগল প্রত্যেকেরই। দূরবিন কষে গেরিলো বসে-থাকা লোকটির দিকে চেয়ে ছিলেন। বিচিত্র আলো-আঁধারির মাঝে মনে হল যেন ঝুঁকে রয়েছে—বসে থাকা বলতে যা বোঝায় তা নয়। লাল মুখ, নাক নেই। একবার দেখেই আবার দেখবার শখ উবে গেল। অথচ চোখ থেকে দূরবিন নামাতে ইচ্ছে হল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরবিন নামিয়ে হলরয়েডকে ডাকলেন। ভাসমান ক্যানোর লোকজনকেও হেঁকে ডাক দিলেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখলেন ক্যানোর গায়ে লেখা নামটা—'সান্তারোজা'।

গানবোট পাশ দিয়ে যেতেই ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলে উঠেছিল 'সান্তারোজা'। ঝুঁকে-থাকা লোকটা অকস্মাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে। খসে পড়ল টুপি। প্রতিটি

অস্থিসন্ধি যেন খুলে আলগা হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে—কাত হয়ে পড়ল দেহটা—সেই সময়ে পলকের জন্যে দেখা গেল মুখখানা!

ভয়াবহ সেই মুখাকৃতি দেখলেই নাকি গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়!

'কারাম্‌বা!' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গেরিলো। হলরয়েড পাশে এসে দাঁড়াতেই বলেছিলেন, 'দেখেছেন?'

'মরে ভূত হয়ে গেছে! ক্যাপটেন, নৌকা পাঠান ক্যানোয়—কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে।'

'মুখখানা দেখেছিলেন?'

'কীরকম দেখতে বলুন তো?'

'কী করে বলি?... কী করে বলি?... ভাষা নেই বোঝাবার!' বলেই আচমকা হলরয়েডের দিকে পিছন ফিরে প্রচণ্ড হাঁকডাক দিয়ে ক্যাপটেনগিরি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন গেরিলো।

স্খলিত ভঙ্গিমায় ভেসে যাওয়া বড় ক্যানোর পাশাপাশি চলে এসেছিল গানবোট। নৌকো নামিয়ে রওনা হয়েছিল লেফটেন্যান্ট দা কুন্‌হা আর তিনজন নাবিক। কৌতূহলে ফেটে পড়ছিলেন গেরিলো। গানবোটকে নিয়ে এসেছিলেন ক্যানোর একদম পাশে। ফলে, লেফটেন্যান্ট নৌকোয় ওঠবার পর, 'সান্তারোজা'র সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন হলরয়েড।

সুস্পষ্ট দেখলেন, অত বড় ক্যানোর আরোহী বলতে শুধু এই দু'টি লোক। মুখ দেখতে না পেলেও সামনে ছড়িয়ে-থাকা হাত দেখে গা শিরশির করে উঠেছিল। অদ্ভুত পচন ধরেছে হাতে। দগদগে ঘা আর মাংস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার! হুমড়ি খেয়ে পড়ে-থাকা এই দু'টি মনুষ্যদেহের পেছনে উন্মুক্ত খোলের মধ্যে স্তূপীকৃত ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্স। কেবিনের দরজা খোলা। কেউ নেই ভেতরে।

মাঝখানের ডেকে সঞ্চরমাণ অনেকগুলো বিন্দুবৎ কালো বস্তু দেখেই গা কীরকম করে উঠেছিল হলরয়েডের। চোখ সরাতে পারেননি। বিন্দুগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে হুমড়ি খেয়ে-পড়া লোকটার চারপাশ থেকে। ঠিক যেন মোষের লড়াই দেখছিল কাতারে কাতারে মানুষ—পালাচ্ছে বাগড়া পড়ায়।

বলেছিলেন গেরিলোকে, 'ক্যাপো, দূরবিন কষে পাটাতনগুলো ভালো করে দেখুন তো।'

চেষ্টা করেছিলেন গেরিলো। হাল ছেড়ে দিয়ে দূরবিন তুলে দিয়েছিলেন হলরয়েডের হাতে।

খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে দূরবিন ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন হলরয়েড, 'পিঁপড়ে!'

নিছক পিঁপড়ে। কুচকুচে কালো পিঁপড়ে। কাতারে কাতারে অতিকায় পিঁপড়ে। দেখতে সাধারণ পিঁপড়ের মতোই—সাইজে কিন্তু বিরাট। কয়েকটার পরনে ধূসর পোশাকও রয়েছে যেন।

ক্যানোর পাশে নৌকো নিয়ে গিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। গানবোট থেকে হুকুম দিয়েছিলেন গেরিলো—ক্যানোয় উঠতে হবে, এখুনি।

আপত্তি জানিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। ক্যানো থুকথুক করছে পিঁপড়েতে। ওঠেন কী করে?

'পায়ে বুটজুতো আছে তো?' ধমক দিয়ে উঠেছিলেন গেরিলো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে লেফটেন্যান্ট জানতে চেয়েছিলেন, লোক দুটো মারা গেল কীভাবে?

দারুণ কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল দু'জনের মধ্যে। একবর্ণও বুঝতে পারেননি হলরয়েড। দূরবিনটা গেরিলোর হাত থেকে নিয়ে ভালো করে ফোকাস করে দেখেছিলেন পিঁপড়েদের। আর, মড়া দুটোকে।

দেখেছিলেন বলেই, অদ্ভুত পিঁপড়েদের আশ্চর্য নিখুঁত বর্ণনা উপহার দিতে পেরেছিলেন আমাকে।

এত বড় পিঁপড়ে নাকি জীবনে দেখেননি। মিশমিশে কালো গায়ের রং। চলাফেরা রীতিমতো শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সাধারণ পিঁপড়েদের মতো যান্ত্রিক নয়—যেন বুদ্ধি দ্বারা চালিত। প্রায় প্রতি কুড়িটা পিঁপড়ের মধ্যে একটা আয়তনে আরও বড়—মাথা অস্বাভাবিক রকমের বৃহৎ। গেরিলোর বচনমালা মনে পড়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। পাতা-কাটিয়ে পিঁপড়েদের মধ্যেও নাকি দলপতি কর্মী থাকে। হুকুম দেয় সে। বিরাটমস্তিষ্ক এই পিঁপড়েগুলোও হুকুম দিয়ে সংহত এবং সংঘবদ্ধ রেখেছে পিঁপড়েবাহিনীকে। শরীর বাঁকাচ্ছে অদ্ভুতভাবে—যেন চার পা ব্যবহারে অভ্যস্ত। পরনে রয়েছে যেন বিচিত্র ধূসর পোশাক—সাদা ধাতুর সুতোর মতো উজ্জ্বল শ্বেতপটির কোমরবন্ধনী দিয়ে পোশাক আটকানো রয়েছে গায়ে।...

অন্তত হলরয়েডের তা-ই মনে হয়েছিল। যাচাই করার সুযোগ পাননি।

গেরিলো আর লেফটেন্যান্টের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ চরমে ওঠায় নামিয়ে নিয়েছিলেন দূরবিন।

কড়া গলায় ধমকে উঠেছিলেন গেরিলো, 'আমার হুকুম... আপনার ডিউটি... উঠুন ক্যানোয়।'

বেঁকে বসেছেন লেফটেন্যান্ট। ঘিরে দাঁড়িয়েছে মুলাটো নাবিকরা। তারাও ক্যানোয় উঠতে নারাজ।

ইংরেজিতে বলেছিলেন হলরয়েড, 'লোক দুটোকে মেরেছে কিন্তু পিঁপড়েরা।'

ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন ক্যাপটেন। হলরয়েডের কথার জবাব দেননি। গলার শির তুলে আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে পর্তুগিজ ভাষায় হুকুম দিয়েছিলেন অধস্তন কর্মচারীদের, 'ক্যানোয় উঠতে হুকুম দিয়েছি, খেয়াল রাখবেন। যদি না ওঠেন—তাহলে বিদ্রোহী বলে গণ্য করা হবে আপনাকে—আপনার সঙ্গে যারা যারা রয়েছে—তাদেরকেও। ভীরু কোথাকার! লোহার শেকলে বেঁধে কুকুরের মতো গুলি করে মারব বলে দিলাম।'
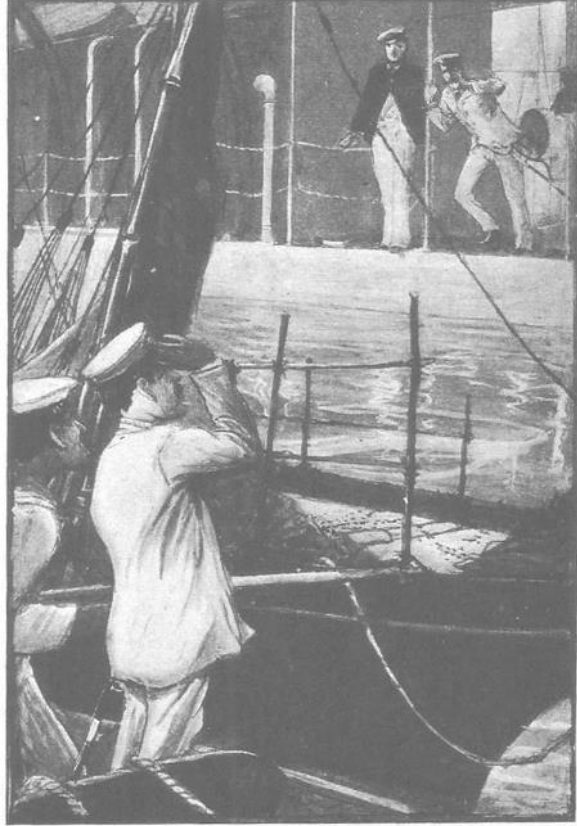
চিত্র ২৩.২ 'মারা গেল কী করে লোকটা?'

সে কী গালাগাল! তাণ্ডবনাচ নাচতে লাগলেন উন্মত্ত ক্রোধে। মুষ্টি পাকিয়ে নাড়তে লাগলেন মাথার ওপর। অপরূপ সেই মূর্তি দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লেফটেন্যান্ট—মুখ নিরক্ত! নাবিকরা স্তম্ভিত!

আচম্বিতে মনস্থির করে ফেললেন লেফটেন্যান্ট। বীরোচিত সিদ্ধান্ত নিলেন। কাষ্ঠদেহে গটগট করে উঠে গেলেন ক্যানোয়। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরকলে দরজা পড়ে যাওয়ার মতো ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল ক্যাপটেনের অবিশ্রান্ত গালিগালাজ। হলরয়েড দেখলেন, দা কুন্‌হার বুটজুতোর পাশ থেকে পিছু হটে যাচ্ছে পিঁপড়েরা। মন্থর চরণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে-থাকা লোকটার পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন লেফটেন্যান্ট। দ্বিধায় পড়লেন যেন। তারপর কোট খামচে ধরে চিৎ করে শুইয়ে

দিলেন। অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে কালো পিঁপড়ের ধারাস্রোত বয়ে গেল জামাকাপড়ের ভেতর থেকে। লাফিয়ে পিছিয়ে এলেন দা কুন্‌হা। বারকয়েক জোরে পা ঠুকলেন ডেকে।

চোখে দূরবিন লাগালেন হলরয়েড। দেখলেন আগন্তুক দা কুন্‌হার পায়ের গোড়ায় বিক্ষিপ্ত পিঁপড়েদের। আর যা দেখলেন, তা তিনি জীবনে দেখেননি।

দৈত্যের পানে ঘাড় বেঁকিয়ে যেমন খুদে মানুষরা তাকিয়ে থাকে, অগুনতি কালো পিঁপড়ে ঠিক সেইভাবে প্যাটপ্যাট করে দেখছে দা কুন্‌হাকে!

ক্যাপটেনের হুংকার শোনা গেল কানের কাছে—'মারা গেল কী করে লোকটা?'

পর্তুগিজ ভাষায় জবাবটা বুঝতে পেরেছিলেন হলরয়েড। এত মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে নেওয়া হয়েছে যে মৃত্যুর কারণ অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

'সামনের লোকটা?' ক্যাপটেনের প্রশ্ন।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পর্তুগিজ ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট। তারপরেই আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে সজোরে পা ঝাঁকুনি দিয়ে কী যেন ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। অদ্ভুতভাবে নাচানাচি করেছিলেন কিছুক্ষণ—যেন অদৃশ্য আতঙ্ককে পা দিয়ে পিষে ফেলতে চাইছেন। তারপর সরে গিয়েছিলেন পাশে। খুব দ্রুত। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সটান দেহে গটগট করে গিয়েছিলেন ক্যানোর সামনের দিকে উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা লোকটার পানে। হেঁট হয়ে দেখেছিলেন কিছুক্ষণ। যেন গোঙিয়ে উঠেছিলেন। কেবিনের মধ্যে পায়চারি করেছিলেন। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে তাঁর সেই ঘোরাফেরা নাকি রীতিমতো শিহরনময়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরস্থির স্বরে কথা বলেছিলেন ক্যাপটেনের সঙ্গে—একটু আগেই অত লাঞ্ছনার বাষ্পটুকুও ছিল না কণ্ঠস্বরে। সাময়িক শৃঙ্খলাবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন নিরুত্তাপ আচরণে।

দূরবিন চোখে লাগিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হলরয়েড। খোলা ডেকে একটি পিঁপড়েও আর নেই—বেমালুম অদৃশ্য! ডেকের তলায় ছায়ার মধ্যে কিন্তু যেন অগুনতি চোখ নজরে রেখেছে দা কুন্‌হাকে।

ক্যানো বাস্তবিকই পরিত্যক্ত—বলেছিলেন লেফটেন্যান্ট। তবে পিঁপড়ে থুকথুক করছে বলে মানুষ নামানো সমীচীন হবে না। গানবোটে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হবে। দড়ির দিকেই এগিয়েছিলেন। নৌকোয় দাঁড়িয়েছিল নাবিকরা দরকার হলে হাত লাগাবে বলে।

দূরবিন কষে তন্নতন্ন করে ক্যানোটাকে দেখছিলেন হলরয়েড।

মনে হয়েছিল যেন খুব সূক্ষ্মভাবে বিরাট তোড়জোড় চলছে পুরো ক্যানোর মধ্যে। ইঞ্চিকয়েক লম্বা কয়েকটা হুকুমদার পিঁপড়েকে দেখলেন সাঁত করে সরে গেল একদিক থেকে আর-একদিকে অদ্ভুত বোঝা ঘাড়ে করে—বোঝাটা যে কী কাজে

লাগবে, তা ঠাহর করেও ধরতে পারেননি হলরয়েড। খোলা জায়গা দিয়ে লাইন দিয়ে যাচ্ছে না মোটেই—যাচ্ছে আধুনিক পদাতিক বাহিনীর মতো ছড়িয়ে পড়ে। লড়াই আরম্ভ হল যেন। বেশ কিছু পিঁপড়ে ঘাপটি মেরে রইল মৃত ব্যক্তির জামাকাপড়ের মধ্যে। বাকি সবাই ঝাঁকে ঝাঁকে সুসংযত সৈন্যবাহিনীর মতো জড়ো হল ঠিক সেইদিকেই, যেদিকে এখুনি পা দেবেন লেফটেন্যান্ট।

হলফ করে বলেছেন হলরয়েড, স্বচক্ষে না দেখলেও তাঁর বিশ্বাস, একযোগে দা কুন্‌হার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পিঁপড়েবাহিনী। আচম্বিতে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠে সজোর পা ঠুকেছিলেন লেফটেন্যান্ট। হুল ফোটাচ্ছে পিঁপড়ে—পরিষ্কার করে বলেছিলেন ক্যাপটেনকে বিষম বিতৃষ্ণায়। চোখে-মুখে প্রকট হয়েছিল ক্যাপটেনের প্রতি আতীব্র ঘৃণা।

পরক্ষণেই ক্যানো থেকে ঠিকরে পড়েছিলেন জলে।

নৌকোর তিন নাবিক তাঁকে টেনে তুলেছিল জল থেকে—ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল গানবোটে।

কিন্তু মারা গিয়েছিলেন সেই রাতেই!

(৩)

ক্যাপটেন গেরিলো কঠোর প্রকৃতি সামরিক পুরুষ হতে পারেন, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ তো বটেই। জ্বরের ঘোরে মৃত্যুর আগে লেফটেন্যান্ট দা কুন্‌হা তাঁকেই দায়ী করেছিলেন তাঁর ওই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য। প্রলাপের ঘোরে বলেছিলেন, ক্যাপটেনই খুন করল তাঁকে!

ক্যাপটেন মনে মনে তা উপলব্ধি করলেও মুখে তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু বৃশ্চিক দংশনের মতো কথাটা তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে পরের দিন। ছটফট করেছেন। আপন মনে বকেছেন। হলরয়েডকে সাক্ষী মানবার চেষ্টা করেছেন। তিনি কেন খুন করতে যাবেন দা কুন্‌হাকে? তিনি কর্তব্য করেছেন, দা কুন্‌হাকেও কর্তব্য করার অর্ডার দিয়েছেন। ক্যানোয় একজনকে উঠতে তো হতই।
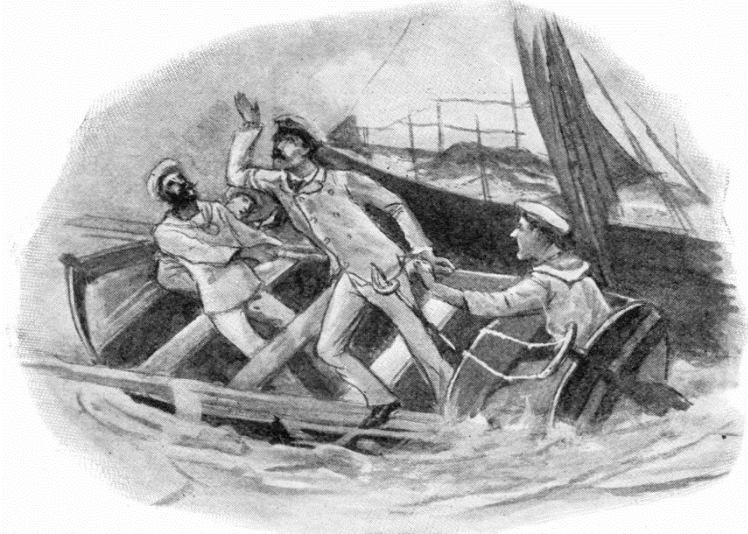
চিত্র ২৩.৩ ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল গানবোটে।

কোনও জবাব দেননি হলরয়েড। জবাব দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। কেবিনে শোয়ানো রয়েছে দা কুন্‌হার বিষজর্জর মৃতদেহ। চোখের সামনে ভাসছে বিষপ্রয়োগে কুশলী শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো বৃহদাকার পিপীলিকাবাহিনীর আক্রমণের দৃশ্য। চক্ষুষ্মান তারা, বুদ্ধিমানও বটে।

দা কুন্‌হার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বিষের জ্বালায়—মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ক্যাপটেন। হলরয়েডকেও প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিরুত্তর থেকেছেন হলরয়েড। দূর বনভূমি থেকে ভেসে এসেছে বাঁদরদের কিচিরমিচির আর ব্যাঙেদের বিকট হল্লাবাজি। কানের ওপর সেই অত্যাচার আরও বিমর্ষ করে তুলেছে মনকে। কিছুতেই ভুলতে পারেননি ভয়াবহ সত্যটুকু—পিঁপড়েগুলোর চোখ আছে, ব্রেনও আছে। পরিধেয় ব্যবহারে অভ্যস্ত, ধাতব সামগ্রী নির্মাণে দক্ষ এবং বিষপ্রয়োগের হাতিয়ার উৎপাদনেও চৌকস। বৃহদাকার পিঁপড়েদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম, কোমরে বেল্ট, কাঁধে অদ্ভুত বোঝা--কী সেই বোঝা? বিষ ফুঁড়ে দেওয়ার অস্ত্র নিশ্চয়। বিষটাও নিশ্চয় বানিয়ে নিয়েছে। নইলে—

আচম্বিতে ক্ষিপ্তের মতো একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন গেরিলো। ক্যানোটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার কী? পুড়িয়ে ফেলা হোক।

দড়ি কেটে, কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পিপীলিকা বোঝাই ক্যানো। আগুনের আভায় প্রদীপ্ত হয়েছিল দু'পাশের বনভূমি। রহস্য থমথমে অন্ধকারের মধ্যে অজস্র চক্ষু যেন নির্নিমেষে দেখেছিল, জলের মধ্যে ভাসমান জ্বলন্ত ক্যানোয় পুড়ে মরছে কাতারে কাতারে পিঁপড়ে—চক্ষুষ্মানদেরই সগোত্র!
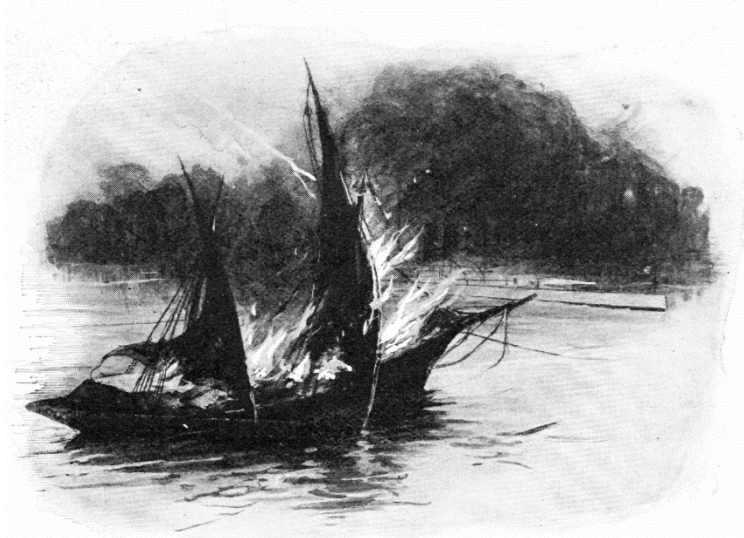
চিত্র ২৩.৪ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পিপীলিকা বোঝাই ক্যানো।

সারাদিন সারারাত অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন গেরিলো। কী যে করবেন, কিছুতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারেননি। হলরয়েডকে জিজ্ঞেস করেছেন, হলরয়েডও জবাব দেননি। পরের দিন সকালবেলা দেখেছেন, বিনিদ্র রজনি যাপন করে অর্ধোন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছেছেন গেরিলো। অদূরে দেখা যাচ্ছে বাদামা। পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর, লতায় ঢাকা চিনিকল, গুঁড়ি আর বেতের ছোট্ট জেটি। উষ্ণ প্রভাতে কিন্তু নিথর নিস্পন্দ সবকিছুই। প্রাণের সাড়া নেই কোত্থাও। মানুষ তো নেই-ই। খাঁ খাঁ করছে বাদামা। পরিত্যক্ত। একটা নরকঙ্কাল দেখা যাচ্ছে তীরভূমিতে। সাদা ধবধবে। মাংস পরিষ্কার। শুধু হাড়গুলো রয়েছে পড়ে।

গেরিলো উচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অকস্মাৎ। পরপর দু'বার বংশীধ্বনি করেও সাড়া না-পাওয়ায় ঠিক করেছিলেন, একাই নেমে গিয়ে দেখে আসবেন। এতগুলো মানুষকে বিষ আর বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা অন্যায়।

মনে মনে সায় দিয়েছিলেন হলরয়েড। মুখে কিছু বলেননি। চোখে কিন্তু দেখেছিলেন, নদীর ধারে সারি সারি চক্ষুষ্মান পিপীলিকার খর-নজর রেখেছে গানবোটের ওপর। দূরে দূরে কুটির আর শুগার মিলের পাশে অদ্ভুত আকারে মাটির ঢিপি আর প্রাচীরও দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যেন সম্পূর্ণ। বাদামা যাদের দখলে, তারা ওত পেতে রয়েছে নতুন হানাদারদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়।
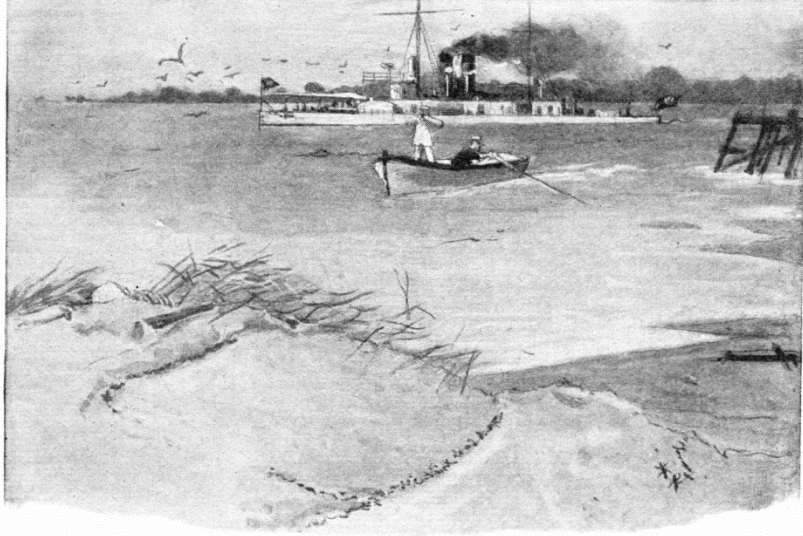
চিত্র ২৩.৫ নদীর ধারে সারি সারি চক্ষুষ্মান পিপীলিকার খর-নজর গানবোটের ওপর।

তাই মত পালটে নিয়েছিলেন গেরিলো। কামান ব্যবহারে বড় কৃপণ ছিলেন গোড়া থেকেই, বারুদ খরচ করতে চাইতেন না কোনওমতেই। সেদিন কিন্তু হুকুম দিয়েছিলেন কামান দাগতে। গুরুগম্ভীর গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল নিস্তব্ধ অরণ্য। মহা আড়ম্বরে উপর্যুপরি গোলা নিক্ষেপ করে গিয়েছিলেন গেরিলো। ধসে পড়েছিল শুগার মিল, উড়ে গিয়েছিল জেটির পেছনকার গুদামঘর।

অবশেষে বুঝেছিলেন, বৃথা চেষ্টা। গোলার অপচয়ই হচ্ছে শুধু—শত্রুনিধন আর হচ্ছে না। বাদামাকে আবার দখল করা যাবে না এভাবে। আবার শুরু হয়েছিল অস্থিরতা। সিদ্ধান্ত নিতে না-পারার যন্ত্রণায় যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। শয়তানের বাচ্চাদের কামান দেগে ধ্বংস করা যাবে না। ফিরেই যেতে হবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করে তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

তাই ফিরে এসেছিল গানবোট। অনেকটা পথ এসে তীরভূমিতে কবরস্থ করা হয়েছিল দা কুন্‌হাকে।

এমন একটা জায়গায়, যেখানে নতুন শ্রেণির এই পিঁপড়েরা এখনও পৌঁছায়নি।

তিন হপ্তা আগে টুকরো টুকরোভাবে পুরো বিবরণটা শুনেছিলাম হলরয়েডের মুখে।

বিশেষ এই পিঁপড়েদের মস্তিষ্ক আছে। আর দেরি করা উচিত নয়। মহাবিপদ আসন্ন—বদ্ধমূল এই ধারণা নিয়েই ইংল্যান্ডে ফিরেছেন হলরয়েড। বুদ্ধিমান এই পিপীলিকাবাহিনী আপাতত যেখানে সক্রিয়, ব্রিটিশ গুয়ানা সেখান থেকে এক হাজার মাইলের মধ্যেই। কাজেই এখন থেকেই হুঁশিয়ার না হলে ব্রিটিশ গুয়ানার যে কী হাল হবে, তা ভাবতেও গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

নারকীয় এই কীটদের যে আর উপেক্ষা করা সমীচীন নয়, ব্রাজিল সরকার তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে পাঁচশো পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে মোক্ষম কীটনাশকের জন্যে। মাত্র তিন বছর আগে অজেয় এই কীট আবির্ভূত হয়েছিল অনতিদূরে পাহাড়ের ওপরে। এর মধ্যেই তাদের বিজয়-অভিযান রীতিমতো বিস্ময়কর। বাতেমো নদীর দক্ষিণ তীরভূমির প্রায় ষাট মাইল জায়গা তাদের পুরো দখলে। মানুষকে একেবারেই তাড়িয়ে ছেড়েছে, অথবা খতম করেছে। জায়গা-জমি, বাড়িঘরদোর, কলকারখানায় ঘাঁটি গেড়েছে।

একটা জলপোতও দখলে এনে ফেলেছিল। অব্যাখ্যাত পন্থায় কাপুয়ানা শাখানদীর ওপর সেতু রচনা করে অ্যামাজনের ভেতরে বহু মাইল পথ নাকি এগিয়ে এসেছে। সাধারণ পিঁপড়েদের মতো তারা নয়, ঢের বেশি সংঘবদ্ধ এবং সমাজবদ্ধ। অন্য পিঁপড়েদের সমাজ বিক্ষিপ্ত, কিন্তু এরা একত্র হয়ে একটা জাত গড়ে তুলেছে। বুদ্ধিমত্তার শেষ এখানেই নয়, ভয়াবহতা প্রকটতর হয়েছে বিষপ্রয়োগের নৈপুণ্যে। বৃহদাকার শত্রুকে বল প্রয়োগে বধ করে না—করে বিষপ্রয়োগে। বিষটা সাপের বিষের মতোই মারাত্মক। খুব সম্ভব উৎপাদনও করে নিজেরা। ওদেরই মধ্যে আয়তনে যারা বড়, তারা ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণাগ্র ক্রিস্টাল বয়ে নিয়ে যায় মানুষের মতো বড় শত্রুদের গায়ে বিঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে।

বিশ্ববাসীকে সজাগ করার মতো বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। চাক্ষুষ বর্ণনা পাওয়া গেছে কেবল হলরয়েডের কাছ থেকেই। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে যেটুকু বলেছেন, চমৎকৃত এবং হুঁশিয়ার হওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। ঊর্ধ্ব অ্যামাজনে ক্রমশ কিংবদন্তির আকারে ছড়িয়ে পড়ছে অসাধারণ এই পিঁপড়েদের অত্যাশ্চর্য কীর্তিকলাপ—কল্পনার আতঙ্ক মিশ্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানারকম অতিরঞ্জিত কাহিনি। বিচিত্র এই পোকারা নাকি বিবিধ হাতিয়ারের ব্যবহার জানে, আগুনের ব্যবহার জানে, ধাতুর ব্যবহার জানে, যন্ত্রবিদ্যাও জানে। তাই পারাহাইবার নদীর তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছে অদ্ভুত কৌশলে—লন্ডনের টেমস নদীর মতোই চওড়া সেই নদী অতিক্রম করেছে পাতাল-বিবর দিয়ে। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি সঞ্চিত থাকে মানুষের মতোই পুঁথি আর নথির মধ্যে—সঞ্চিত বিদ্যেকে কাজে লাগায় প্রয়োজনমতো। আপাতত তারা শুধু অগ্রসর হচ্ছে বিরামবিহীনভাবে এবং পথে মানুষ পড়লেই খতম করে দিচ্ছে নির্দয়ভাবে। বংশবৃদ্ধিও ঘটছে দ্রুতহারে। হলরয়েডের ধ্রুব বিশ্বাস, অচিরেই পুরো নিরক্ষীয় দক্ষিণ আমেরিকা এসে যাবে তাদের আধিপত্যে।

কিন্তু শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই বিজয়কেতন উড়িয়ে তারা ক্ষান্ত হবে, এমন কথা কে বলতে পারে? যে গতিবেগে এগচ্ছে, ১৯১১ সাল নাগাদ হানা দেবে কাপুয়ারানা

এক্সটেনশন রেলপথে—ইউরোপের ধনকুবেরদের টনক নড়বে তখনই।

১৯২০ নাগাদ পেরিয়ে আসবে অ্যামাজনের অর্ধেক। আমার তো মনে হয়, ১৯৫০ কি ১৯৬০-এর মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলবে ইউরোপকে।

পরিশিষ্ট

উপন্যাস

টাইম মেশিন। *টাইম মেশিন*। দ্য নিউ রিভিউ, জানুয়ারি-মে ১৮৯৫।
অলংকরণ: নিকোলা কিউটি, গ্রাফিক ক্লাসিক: এইচ জি ওয়েলস, ভলিউম থ্রি, ২০০২। চিত্র ১.১ - ১.১০।

দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড। *দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড*। পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, ১৮৯৭ (ইউকে)। কসমোপলিটান ম্যাগাজিন, ১৮৯৭ (ইউএস)।
অলংকরণ: ওয়ারইক গোবলে, পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, ১৮৯৭। চিত্র ২.১ – ২.১৭।

ভাবীকালের একটি গল্প। *এ স্টোরি অব দ্য ডেজ টু কাম*। দ্য পল মল গেজেট, জুন-অক্টোবর ১৮৯৯।
অলংকরণ: ফ্রাঙ্ক আর. পল, অ্যামেজিং স্টোরিজ, এপ্রিল-মে ১৯২৮। চিত্র ৩.১, ৩.২।

গল্প

চোরাই জীবাণু। *দ্য স্টোলেন ব্যাসিলাস*। দ্য পল মল বাজেট, ২১ জুন ১৮৯৪।
অলংকরণ: বেঞ্জামিন এডুইন মিন্‌স, পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, জুন ১৯০৫। চিত্র ৪.১।

অদ্ভুত অর্কিড। *দ্য ফ্লাওয়ারিং অব দ্য স্ট্রেঞ্জ অর্কিড*। দ্য পল মল বাজেট, ২ আগস্ট ১৮৯৪।
অলংকরণ: বেঞ্জামিন এডুইন মিন্‌স, পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, এপ্রিল ১৯০৫। চিত্র ৫.১।

হীরে কারিগর। *ডায়মন্ড মেকার*। দ্য পল মল বাজেট, ১৬ আগস্ট ১৮৯৪।
অলংকরণ: বেঞ্জামিন এডুইন মিন্‌স, পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, মার্চ ১৯০৫। চিত্র ৬.১।

ঈপাইওরনিস আয়ল্যান্ড রহস্য। *ইপাইওরনিস আইল্যান্ড*। দ্য পল মল গেজেট, ১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৪।
অলংকরণ: বেঞ্জামিন এডুইন মিন্‌স, পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারি ১৯০৫। চিত্র ৭.১, ৭.২।

শয়তানের ছবি। *দ্য টেম্পটেশন অব হ্যারিঙ্গওয়ে*। দ্য সেন্ট জেমস গেজেট, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫।

ডেভিডসনের আশ্চর্য চোখ। *দ্য রিমার্কেবল কেস অব ডেভিডসন'স আইজ*। দ্য পল মল গেজেট, ২৮ মার্চ ১৮৯৫।
অলংকরণ: ডিন, অ্যামেজিং স্টোরিজ, এপ্রিল ১৯২৭। চিত্র ৯.১।

আত্মার ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন। *আন্ডার দ্য নাইফ*। দ্য নিউ রিভিউ, জানুয়ারি ১৮৯৬।
অলংকরণ: ফ্রাঙ্ক আর. পল (অস্বীকৃত), অ্যামেজিং স্টোরিজ, মার্চ ১৯২৭। চিত্র ১০.১।

সবুজ গুঁড়ো। *দ্য প্ল্যাটনার স্টোরি*। দ্য নিউ রিভিউ, এপ্রিল ১৮৯৬।
অলংকরণ: স্বাক্ষরহীন ছবি, অ্যামেজিং স্টোরিজ, জুলাই ১৯২৭। চিত্র ১১.১।

দেহ-লুঠেরা। *দ্য স্টোরি অব দ্য লেট মি. এলভেসহ্যাম*। দি আইডলার, মে ১৮৯৬।
অলংকরণ: ফ্রাঙ্ক আর. পল, অ্যামেজিং স্টোরিজ, জুন ১৯২৭। চিত্র ১২.১।

নিতল নগরী। *ইন দি অ্যাবিস*। পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, ১ আগস্ট ১৮৯৬।
অলংকরণ: ওয়ারইক গোবলে, পিয়ারসন'স ম্যাগাজিন, ১ আগস্ট ১৮৯৬। চিত্র ১৩.১ - ১৩.৪।

কৃস্ট্যাল ডিম। *দি ক্রিস্টাল এগ*। দ্য নিউ রিভিউ, মে ১৮৯৭।
অলংকরণ: ফ্রাঙ্ক আর. পল, অ্যামেজিং স্টোরিজ, মে ১৯২৬। চিত্র ১৪.১।

প্রস্তর-যুগের একটি গল্প। *এ স্টোরি অব দ্য স্টোন এজ*। দি আইডলার, মে-সেপ্টেম্বর ১৮৯৭।
অলংকরণ: কসমো রোয়ি, দি আইডলার, মে-সেপ্টেম্বর ১৮৯৭। চিত্র ১৫.১ - ১৫.৭।

প্রলয়-তারার ধ্বংসলীলা। *দ্য স্টার*। দ্য গ্রাফিক, ডিসেম্বর ১৮৯৭।
অলংকরণ: ডবলু. স্মল, দ্য গ্রাফিক, ডিসেম্বর ১৮৯৭। চিত্র ১৬.১।

অঘটনবাজ। *দ্য ম্যান হু কুড ওয়ার্ক মির‍্যাক্‌লস*। দি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ, জুলাই ১৮৯৮।
অলংকরণ: এ. ফরেস্টিয়ার, দি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ, জুলাই ১৮৯৮। চিত্র ১৭.১ – ১৭.৯।

জীবন্ত স্বপ্ন। *এ ড্রিম অব আরমাগেডন*। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বাজেট, ২৫ মে - ১৫ জুন ১৯০১।
অলংকরণ: এল. ডাভিয়েল, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বাজেট, ২৫ মে – ১৫ জুন ১৯০১। চিত্র ১৮.১ – ১৮.৬।

পাইক্র্যাফ্‌ট্‌ প্রহেলিকা। *দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট পাইক্র্যাফ্‌ট*। দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, এপ্রিল ১৯০৩।
অলংকরণ: এ. ওয়ালিস মিল্‌স, দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, এপ্রিল ১৯০৩। চিত্র ১৯.১ – ১৯.৪।

জাদু বিপণি। *দ্য ম্যাজিক শপ*। দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, জুন ১৯০৩।
অলংকরণ: এ. ওয়ালিস মিল্‌স, দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, জুন ১৯০৩। চিত্র ২০.১ – ২০.৪।

লোহার কচ্ছপ। *দ্য ল্যান্ড আয়রন ক্ল্যাডস*। দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর ১৯০৩।
অলংকরণ: ক্লাউদে এ. শেপারসন, দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর ১৯০৩। চিত্র ২১.১ – ২১.৮।

অন্ধ যে-দেশে সকলেই। *দ্য কানট্রি অব দ্য ব্লাইন্ড*। দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, এপ্রিল ১৯০৪।
অলংকরণ: ক্লাউদে এ. শেপারসন, দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, এপ্রিল ১৯০৪। চিত্র ২২.১ – ২২.৭।

পিপীলিকা সাম্রাজ্য। *দি এম্পায়ার অব দি অ্যান্টস*। দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর ১৯০৫।
অলংকরণ: সি. জে. স্ট্যানিল্যান্ড, দ্য স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর ১৯০৫। চিত্র ২৩.১ – ২৩.৫।

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
পুস্তক তালিকা

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১: ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০: বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কালসন্দর্ভা: অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক: অঙ্কিতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১: আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড: হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা: বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার
লেখক: সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক: দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক: সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র: কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ: সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক: অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র: রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা: সুদীপ দেব

আদম ও ইভ: কল্পবিজ্ঞানের গল্প সংকলন
লেখক: অমিতাভ রক্ষিত

মনন শীল: তিনটি ইয়ং অ্যাডাল্ট বায়ো থ্রিলার
লেখক: পার্থ দে

ডেকাগন: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার সংকলন
লেখক: ঋজু গাঙ্গুলী

ভয়াল রসের সম্রাট-এইচ পি লাভক্রাফট: শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা, সটীক সংস্করণ।
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

স্বমহিমায় শঙ্কু: দুটি অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ
লেখক: সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব
রণেন ঘোষ রচনা সমগ্র ১: রণেন ঘোষের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও গল্পের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ
আগামীর সাত মুখ: স্প্যানিশ কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সাতটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের সংকলন
অনুবাদ: সৌরভ ঘোষ ও রমা সরকার দাস, সম্পাদনা: অঙ্কিতা

মন্তাজ ইমপ্রিন্টের বই

হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন সমগ্র ১ এবং ২: বিখ্যাত হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটিকে নিয়ে ছয়টি উপন্যাস ও একশোটি গল্প, নাটক, কবিতা
লেখক: শিবরাম চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত, সম্পাদনা: সুদীপ দেব

প্রাপ্তিস্থান: অ্যামাজন, অরণ্যমন প্রকাশনী, দেজ, দে বুক স্টোর (দীপু), বইচই, রিডবেঙ্গলীবুকস, বুকিকার্ট, বইঘর, দ্য বুকটক ইত্যাদি বুকস্টোরে।

কল্পবিশ্বের ডিজিটাল ইবুক

কল্পবিশ্বের বইগুলি এবার পাবেন ইবুক ফরম্যাটেও। পড়তে পারবেন আপনার মোবাইল, কম্পিউটার, আইফোন, আইপ্যাড কিংবা কিন্ডল ডিভাইসে। বিশদে জানতে নিচের লিঙ্ক দেখুন।

https://bit.ly/kalpabiswa

http://bit.ly/2Gru2rQ